Written according to the Syllabus of the Pre-University Course in Bengali, prescribed by the Calcutta University and according to the Syllabus of the University Entrance Course of the Burdwan University.

রচনা-চতুরঙ্গ

[বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বলিত]

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ.

কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, বাংলা কাব্যসাহিত্যের কথা, রবি-পরিক্রমা, বাংলা রচনা ও অনুবাদ-বিধি প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা কর্তৃক লিখিত

স্টুডেন্ট্স্ বুক সাপ্লাই

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রকাশক—
শ্রীগোসাইচরণ দাস
স্টুডেন্ট্‌স্ বুক সাপ্লাই
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ-
১৬ই শ্রাবণ,
১৩৬৭

মুদ্রাকর—
জি. সি দাস
রূপশ্রী প্রেস
১৮, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর পাঠার্থীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রচনা-চতুরঙ্গ বইখানি লিখিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান নিয়মানুসারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর অতি অল্পকালেব মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদিগকে একটি পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে বাংলায় নিজেদের প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারে, গ্রন্থখানি রচনা করার সময়ে সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে।

নূতন পাঠক্রম অনুযায়ী বাংলার যে পরীক্ষা হইবে, তাহাতে পাঠ্যপুস্তকের প্রশ্নোত্তর ভিন্ন (১) বাংলা **ব্যাকরণগত প্রশ্নাদি** জিজ্ঞাসিত হইবে, (২) **রচনা** লিখিতে হইবে, (৩) **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস** বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হইবে এবং (৪) **ভাবসম্প্রসারণ** বা **ভাবার্থ-বিশ্লেষণ** কবিতে হইবে। —রচনার এই চারিটি অঙ্গের একত্রীকরণ **রচনা-চতুরঙ্গ**।

এরূপ একটি পরীক্ষায় যে ধরনের ব্যাকরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, অথবা যে শ্রেণীব রচনা লিখিতে দেওয়া হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি বাখিযা বর্তমান গ্রন্থখানি রচিত। ভাবসম্প্রসারণ ও ভাবার্থ-বিশ্লেষণ অধ্যায়ে কয়েকটি গদ্যপদ্য অনুচ্ছেদের ভাবসম্প্রসারণ করিয়া এ জাতীয় রচনার আদর্শ সম্বন্ধে একটা ধারণা দিবার চেষ্টাও করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ যে পাঠক্রম প্রণয়ন করিয়াছেন উহা অনুসরণ করিয়াই 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' সম্পর্কিত কয়েকটি রচনা গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কেবল বাংলা ছোটগল্পেব ইতিহাস লেখাব ব্যাপারে একটু স্বাধীনতা লওয়া হইয়াছে। বাংলা ছোটগল্পেব ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে, সে প্রসঙ্গে প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ও তৎপরে শবৎচন্দ্রেব প্রসঙ্গ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে—বাংলা ছোটগল্প রচনাব ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র অপরিহায। এইজন্য এ গ্রন্থে ছোটগল্প রচনায রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র শীর্ষক দুইটি রচনা 'বাংলা ছোটগল্প'—এই অধ্যাযে লিখিত হইযাছে। ইহাতে ছোটগল্প রচনার ইতিহাস অনুসরণের সুবিধা হইবে বলিয়াই মনে করি।

গ্রন্থখানিতে প্রয়োজনমত অনুশীলনীও দেওয়া হইল। ছাত্রছাত্রীরা সেগুলি অনুশীলন করিয়া যদি কিছুমাত্রও উপকৃত হয়, তবে আমি আমার সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করিব।

স্কটিশ চার্চ কলেজ
১৬ই শ্রাবণ, ১৩৬৭

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

SYLLABUS—1961

Pre-University Course—Bengali

There shall be one paper in Bengali of three hours' duration carrying 100 marks. Distribution of marks shall be as follows :

*Text (Prose 30+Poetry 20)	...	50 marks
History of Literature	...	20 ,,
Essay ...	...	15 ,,
Grammar and Composition	...	15 ,,
		100

Pieces from the Bengali Text

গদ্যাংশ

১। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র—ললিতগিরি।

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—বঙ্কিমচন্দ্র।

৩। ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ—শুভ উৎসব।

৪। চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র—অভাগীর স্বর্গ।

৫। রায়, জগদানন্দ—অব্যক্ত জীবন।

৬। রেজাউল করিম—সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত আলবেরুণী : সাধক দারা শিকোহ।

পদ্যাংশ

১। চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম—ফুল্লরার বারমাস্যা।

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র—বৃত্রাসুর ও রুদ্রপীড়।

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—ঐকতান।

৪। সেন, দেবেন্দ্রনাথ—বর্ষামঙ্গল।

৫। মল্লিক, কুমুদরঞ্জন—কৃষ্ণা-রজনী।

৬। নজরুল ইসলাম—ফরিয়াদ।

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

[ব্যাকরণ ও রচনা-বিধি]

দ্বিতীয় ভাগ

[রচনা প্রকরণ]

তৃতীয় ভাগ

[বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস]

চতুর্থ ভাগ

[ভাব-সম্প্রসারণ ও ভাবার্থ-বিশ্লেষণ]

রচনা-চতুরঙ্গ

প্রথম ভাগ

ব্যাকরণ ও রচনা-বিধি

॥ ভাষা-প্রকরণ ॥

সাধুভাষা ও চলিত ভাষা

পৃথিবীর সকল দেশের ভাষাতেই মোটামুটি দুইটি রূপ আছে। একটি সাহিত্যের ভাষা, অপরটি মৌখিক ভাষা। সাহিত্যের ভাষাকে **সাধুভাষা**—এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, এবং মৌখিক ভাষাকে **চলিত ভাষা** বলা হইয়া থাকে। সাধুভাষাতেই প্রত্যেক দেশের কাব্যাদি সাহিত্য রচিত হইয়াছে। সাধুভাষাই সাহিত্যে ভাবপ্রকাশের বাহন। মৌখিক ভাষা দৈনন্দিন জীবনে কথোপকথনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধুভাষার পাশাপাশি প্রত্যেক দেশেই নানা অঞ্চলের মৌখিক বা চলিত ভাষাও বর্তমান এবং সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে সকল দেশেই বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশেও সাধুভাষা এবং চলিত ভাষায় প্রভেদ আগেও ছিল, এখনও আছে। আধুনিক বাংলা সাধুভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় :—

ভাষার প্রাচীন অবস্থায় এক সময়ে যে সমস্ত শব্দ প্রচলিত ছিল, বাংলার সাধুভাষায় সেগুলি অধিকসংখ্যায় রক্ষিত হইয়াছে। ভাষার প্রাচীন অবস্থায় ব্যাকরণগত যে বৈশিষ্ট্য ভাষায় অবলম্বিত হইত, বা পদস্থাপনের যে নীতি অনুসৃত হইত, সাধুভাষা প্রধানত তাহাকেই অনুসরণ করিতেছে। সাধুভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি, ইহার ক্রিয়া সর্বনাম প্রভৃতির রূপগুলি মৌখিক ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত ক্রিয়া সর্বনামের রূপসমূহ অপেক্ষা পূর্ণতর।

সাধুভাষার যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, চলিত ভাষারও তেমনি নিজের নানা বৈশিষ্ট্য, নানা নিয়ম আছে ঃ—

চলিত ভাষা সর্বদাই ভাষার প্রাচীন অবস্থায় ব্যবহৃত শব্দাবলীকে বর্জন করিয়া চলে, তৎসম শব্দের স্থলে তদ্ভব শব্দের ও দেশী বা বিদেশী শব্দের ব্যবহার ইহাতে বেশি। সাধুভাষা অপেক্ষা ইহা অনেকাংশে সরল এবং সংক্ষিপ্ত। ইহাতে ধাতুরূপ এবং শব্দরূপের ও সর্বনামপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। চলিত ভাষায় ক্রিয়ার পূর্ণরূপের স্থলে অভিশ্রুতির আধিক্য দেখা যায়। যেমন,—করিয়া >করে, রাখিয়া>রেখে, বলিয়া>বলে, দেখিয়া>দেখে, করিতেছিলাম> করছিলাম, বলিয়াছিলাম>বলেছিলাম ইত্যাদি।

চলিত ভাষায় স্বরসঙ্গতির প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, পরবর্তী স্বরধ্বনির সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য পূর্ববর্তী একটি স্বরের পরিবর্তন হইয়া যায়; অথবা পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের পরিবর্তন হয়। যেমন,—দেশী> দিশী, বিলাতী>বিলিতী, হিসাব>হিসেব, পূজা>পূজো, ধুনা>ধুনো, কুলা >কুলো, নূতন>নতুন।

সাধুভাষায় ষষ্ঠীর বহুবচনান্ত বিভক্তি—'দিগের'। কিন্তু চলিত ভাষায় ষষ্ঠী-বিভক্তির বহুবচনে—'দের'।

এক সময়ে বাংলা গদ্যসাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম যুগে রাশি রাশি সংস্কৃত শব্দ বিভক্তিবর্জিত হইয়া সাধুভাষায় ব্যবহৃত হইত। তখন লোকের এই সংস্কার ছিল যে, চলিত শব্দ পুস্তকে ব্যবহার করিলে, সে পুস্তকের গৌরব থাকে না। সেইজন্য তাঁহারা 'ফোয়ারা'র পরিবর্তে 'প্রস্রবণ', 'ঘূর্ণী'র পরিবর্তে 'আবর্ত', 'গ্রীষ্মে'র পরিবর্তে 'নিদাঘ', 'ঘি' বা 'ঘৃতে'র পরিবর্তে 'আজ্য', 'শুশুকে'র পরিবর্তে 'শিশুমার' প্রভৃতি আভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া গ্রন্থের গৌরব রক্ষা করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহাদের রচনায় এমন সব শব্দ ব্যবহার হইত, যেগুলি সংস্কৃত গ্রন্থাদিতেও ব্যবহৃত হয় নাই, যাহাদের অস্তিত্ব কেবল সংস্কৃত অভিধানেই সীমাবদ্ধ ছিল। দৃষ্টান্ত দিলে আলোচনার বিষয়টি পরিষ্কার হইবে ঃ—

১। একদা প্রভাতকালে, চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী কোলাহলময় হইলে, নবোদিত রবির আতপে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ

হইলে, গগনাঙ্গনবিক্ষিপ্ত অন্ধকাররূপ ভস্মরাশি দিনকরের সম্মার্জনী দ্বারা দূরীকৃত হইলে, সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহনমানসে মানসসরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্মলী-বৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল।—তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরীর অনুবাদ ॥

২। সে এক দিবস কয়েক পয়সা কোথা হইতে পাইয়া কুক্কুট-কুক্কুটী এক যোড়া হট্ট হইতে ক্রয় করিয়া নক্রচক্রাকুল অতিশয় স্রোতোগভীর নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া মনোরথ করিতে লাগিল।—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকৃত প্রবোধচন্দ্রিকা হইতে ॥

৩। সম্প্রতি কাব্যের লক্ষণ কহি শুন। হে প্রিয় শিষ্য! চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয়-রূপ পদ্মবনের হংসী অতএব দোষলেশের গন্ধমাত্রশূন্যা সর্বশুক্লা সরস্বতী তোমার মানসেতে সতত বিলাস করুন। পাণিন্যাদি মুনিকর্তৃক অনুশাসিত স্বয়ংস্পষ্ট যে বাক্যসকল, তাহাদের প্রসাদে এ সংসারে সর্বপ্রকারে শাস্ত্রীয় লৌকিক ব্যবহার প্রবর্ত হয়। সেহেতুক যদি শব্দনাম জ্যোতি এ জগতের শেষ পর্যন্ত দেদীপ্যমান্ না হইত, তবে এ সকল ভুবন অন্ধকারময় হইত।—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকৃত প্রবোধচন্দ্রিকা হইতে ॥

এই সকল রচনা সন্ধি ও সমাসাড়ম্বরে ভারাক্রান্ত। এরূপ ভাষা উৎকট শ্রুতিকটু শব্দবাহুল্যে দুর্বোধ্য গতিবিহীন।

কিন্তু বাংলা সাধুভাষাও বিবর্তনের মধ্য দিয়া ক্রমশ সহজ ও সরল হইয়াছে—সহজবোধ্য হইয়াছে। সাধুভাষার রচনাতে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের বদলে সর্বজনবোধ্য সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

ভাষার রূপান্তরীকরণ

[চলিত ভাষা হইতে সাধুভাষা ঃ সাধুভাষা হইতে চলিত ভাষা]

[ক] চলিত ভাষায় লিখিত বাক্যকে মার্জিত ভাষায় পরিবর্তিত করিতে হইলে—(১) চলিত শব্দগুলির স্থলে সংস্কৃত প্রতিশব্দ বসাইতে হয়। (২) চলিত ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলিকে মার্জিত ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে পরিবর্তন করিয়া লইতে হয়। (৩) অনেক সময় কোন কোন বাক্যাংশকে সমাসবদ্ধ পদে পরিণত করিয়া লইতে হয়। (৪) বাংলার বিশিষ্টার্থক বাক্য বা বাক্যাংশকে অক্ষরে অক্ষরে

শুদ্ধিসংস্কার দান না করিয়া মার্জিত বাক্যাঙ্গের দ্বারা উহাদের ভাবকে প্রকাশ করিতে হইবে। যেমন,—

(১) আপনার বাণ **চোখা**।—আপনার বাণ **তীক্ষ্ণ**। (২) ঘোড়সওয়ার লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে থামাল।—অশ্বারোহী বল্গা আকর্ষণ করিয়া অশ্বের গতি সংযত করিল। (৩) তামাম দুনিয়ায় আজ শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয়েছে।—সমস্ত পৃথিবীতে আজ শ্রেণীসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। (৪) ডাকাতেরা তাকে মেরে-ধরে তার যা-কিছু সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে নদীর ধারে ফেলে রেখে চলে গেল।—দস্যুরা তাহাকে প্রহার করিয়া তাহার যথাসর্বস্ব হরণ করিয়া নদীতীরে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। (৫) শরৎকাল! আকাশে মেঘ নেই। পথঘাট শুকনা। নদী খাল বিল জলে ভরে উঠেছে। হাঁসেরা দল বেঁধে মালার মত আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। নদীর ধারে কাশফুল ফুটে বাতাসে দুলে দুলে সারা হচ্ছে।—শরৎকাল। আকাশ মেঘমুক্ত। পথঘাট জলশূন্য (বা শুষ্ক)। নদী খাল বিল জলে পরিপূর্ণ। হংস-বলাকা মালার মত আকাশপথে উড়িয়া চলিয়াছে। নদীতীরে কাশফুল ফুটিয়া বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া সারা হইতেছে। (৬) এবার পরীক্ষায় **পাস** করবে বলে রমেশ **কোমর বেঁধে লেগেছে**।—এবার পরীক্ষায় **সফলতা** লাভ করিবে বলিয়া রমেশ **বদ্ধপরিকর হইয়াছে**। (৭) সমস্যার গুরুত্ব একটু **তলিয়ে বুঝে দেখো**।—সমস্যার গুরুত্ব একটু **গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়ো**। (৮) লটারিতে কিছু **টাকা পেয়ে** প্রবীর **ধরাকে সরা জ্ঞান করছে**।—লটারিতে কিছু **অর্থ লাভ করিয়া** প্রবীর **দম্ভভরে সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে**।

[খ] মার্জিত ভাষার রীতিতে লিখিত বাক্যকে চলিত ভাষার রীতিতে পরিবর্তিত করিতে হইলে—(১) জটিল দীর্ঘ বাক্যকে ছোট ছোট সরল বাক্যে পরিণত করিতে হয়; (২) সমাসবদ্ধ পদকে ভাঙিয়া দিতে হয়; (৩) সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে চলিত বাংলা শব্দ ব্যবহার করিতে হয়; (৪) ক্রিয়াপদগুলিকে চলিত ভাষার অনুযায়ী করিয়া তুলিতে হয়।

যেমন,—ভাগীরথীর ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা যেমন আমাদের বঙ্গভূমিকে ফলে শস্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ঘরে ঘরে চিরদিন ধরিয়া আমাদের ক্ষুধার

অন্ন ও তৃষ্ণার জল জোগাইয়া আসিতেছে—কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতও তেমনি চিরদিন আমাদের মনের অন্ন-পানের ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে।—রবীন্দ্রনাথ॥

ভাগীরথীর শাখা-প্রশাখা আছে। ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা আছে। এই সব শাখা-প্রশাখা আমাদের বঙ্গভূমিকে ফলে শস্যে পূর্ণ করে রেখেছে। ঘরে ঘরে আমাদের ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল চিরদিন জুগিয়ে আসছে। কৃত্তিবাস রামায়ণ লিখেছেন, কাশীরাম দাস মহাভারত লিখেছেন। গ্রন্থ দুখানি চিরদিন আমাদের মনের অন্ন-পানের অক্ষয় ভাণ্ডার হয়ে রয়েছে।

অকস্মাৎ বসন্তের আবির্ভাবে রোমাঞ্চিত বনভূমির কুসুমাভরণে সজ্জিত তরুলতা নিরীক্ষণ করিয়া তিনি অসীম আনন্দ লাভ করিলেন।

অকস্মাৎ বসন্তের আবির্ভাবে সমস্ত বনভূমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তরুলতা ফুলে ফুলে ভরে গেল। তা' দেখে তাঁর আনন্দের আর সীমা রইল না।

চলিত শব্দের মার্জিত ভাষায় রূপান্তর

অদল-বদল—বিনিময়
অন্ধের নড়ি—নিরাশ্রয়ের অবলম্বন
আইবড়—অনূঢ়, অবিবাহিত,
স্ত্রী ঃ অনূঢ়া অবিবাহিতা
আঁকশি—আকর্ষণী
আঁশ—তন্তু
আক্কেল গুড়ুম—হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত
আক্রা—দুর্মূল্য
আটক—অবরোধ
আনাগোনা—যাতায়াত
আনাড়ী—অনভিজ্ঞ
আন্দাজ—অনুমান
আফসোস—ক্ষোভ, মনস্তাপ
আল্গা—শিথিল
আশকারা—প্রশ্রয়
আবোল-তাবোল—অসংলগ্ন, অসংবদ্ধ বাক্য
আস্তাবল—মন্দুরা
আমল দেওয়া—প্রশ্রয় দেওয়া
আমানত—গচ্ছিত
আয়না, আরশি—মুকুর, দর্পণ
আরজি—আবেদন-পত্র
উড়ানি—উত্তরীয়
উকুন—উৎকুণ
একচোখো—পক্ষপাতী
একঘেয়ে—বৈচিত্র্যহীন

করাত—করপত্র
কার্নিস—বলভি
কালি—মসী
কাঁচুমাচু—কুণ্ঠিত
কান খাড়া করা—উৎকর্ণ হওয়া
কুঁচ (ফল)—গুঞ্জা
কৌটা—মঞ্জুষা
খন্তা—খনিত্র
খালাস—নিষ্কৃতি, অব্যাহতি, উদ্ধার
খিল—অর্গল
খেংরা—সম্মার্জনী
গলাধাক্কা—অর্ধচন্দ্র
ঘুষ—উৎকোচ
ঘোমটা—অবগুণ্ঠন
ঘোলা—আবিল, পঙ্কিল
চশমা—উপনেত্র
চুলকান—কণ্ডূয়ন
ছবি—আলেখ্য, চিত্রপট
ছাউনি—শিবির
ছারপোকা—মৎকুণ
ছুতা—ছল, উপলক্ষ
জাঁকজমক—আড়ম্বর
জানালা—বাতায়ন, গবাক্ষ
জুলফি—কাকপক্ষ
ঝাঁটা—সম্মার্জনী
ঝিঁঝিপোকা—ঝিল্লী
টান—অনটন

ঠক—বঞ্চক
তলওয়ার—অসি, তরবারি,
তাঁবু—শিবির
থোকা—স্তবক
দরদ—সহানুভূতি
দরদী—হৃদয়বান্, সহৃদয়
দোকান—পণ্যশালা
নরম—কোমল, মৃদু, সুকুমার, পেলব
নিমকহারাম—কৃতঘ্ন
নেড়া—মুণ্ডিত (শীর্ষ বা মস্তক)
পরগাছা—উপবৃক্ষ
পলক—নিমেষ
পানা—শৈবাল
পাগড়ি—উষ্ণীষ, শিরস্ত্রাণ
পাপড়ি—দল
পালকি—শিবিকা
পিলসুজ—দীপাধার
ফটক—তোরণ
বড়াই, দেমাক—গর্ব, অহমিকা, দম্ভ, দর্প, অহঙ্কার
বারান্দা—অলিন্দ
বেড়া—বেষ্টনী
বিছা—বৃশ্চিক
মই—অধিরোহণী
মজুর—শ্রমিক
মজুরি—পারিশ্রমিক
মলাট—প্রচ্ছদপদ

মেটে (ঘর)—মৃন্ময়	সুদখোর—কুশীদজীবী
মেরামত—সংস্কার	হরদম—অবিরত
[বাড়ী মেরামত—গৃহ-সংস্কার]	হাই (তোলা)—জ্ভৃণ
মোম—মধুথ	হাতিয়ার—অস্ত্র, আয়ুধ, প্রহরণ
রাশ—বল্গা, রশ্মি	হাড়ে হাড়ে—মর্মে মর্মে
লাগাম—বল্গা	হা'ল—বহিত্র
সুদ—কুশীদ	হুবহু—অবিকল

অনুশীলনী

১। দৃষ্টান্ত সহযোগে সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন কর।

—মাধ্যমিক বিশেষ বাংলা ১৯৫০

২। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলিকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :—

(ক) আমরা শব পোড়াইয়া যখন নদীজলে স্নান করতে নামলাম, তখন নদীর ঢেউসমূহ প্রচণ্ড জোরে পাড়ে আসিয়া ঠেকিতেছিল, তাহার চোটে এখানে-ওখানে নদীর পাড় ভাঙিয়া পড়িতেছিল। একখানা নাও ঘাটের পাশে বাঁধা ছিল, ঢেউয়ের আঘাতে সেখানি দুলিতেছিল।

(খ) শরৎকালে, বৃন্দাবনের কিবা শোভা! চারিদিকে তাল তমাল, শাল পিয়াল বকুল আদি নানাজাতি বৃক্ষ, তদুপরি সহস্র সহস্র পাখী নানারূপ গান কচ্ছে। বায় মন্দ মন্দ বহিতেছে, ব্রজবালকেরা কুঞ্জে কুঞ্জে পথে পথে বেণু বাজাইতেছে। নিশাবসানে দেবালয়সকলে সহস্র সহস্র শাঁখঘণ্টার ধ্বনি হইতেছে। বৃক্ষের উপর অসংখ্য বানর খেলা করিতেছে। সুযোগ বুঝিলেই উহারা গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া লোকের খাদ্যসামগ্রী কাড়িয়া লইয়া পলায়।

(গ) যেদিন লিখিবার ঝোঁক চাপে, সেদিন হঠাৎ এত ভাব মনে এসে পড়ে যে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। কতক যদি বা বলা হয় ত' অনেক পড়ে থাকে। একটুখানি মানুষের মন পেরে উঠবে কেন?

(ঘ) শরৎকাল! আকাশে একটুও মেঘ নাই। দিনগুলো এত বড় যেন আর ফুরোয় না। রোদের এমনি তাপ, পথঘাট শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। কাদা জল কিছুই নেই। নদী খাল বিল ও ডোবার জল আরশির মত ঝকঝক কচ্ছে। কাকের চোখও তার কাছে হার মানে। হাঁসের দল পুকুরের ধারে খেলা কচ্ছে, তাদের ডাক শোনা যাচ্ছে। যেদিকে তাকাও কেবল পাকা ধানের ক্ষেত, মাঠে যেন সোনা ফলেছে।

(ঙ) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঁচিশ দিন পূর্বের কথা। যুধিষ্ঠির সকাল বেলা তাঁর শিবিরে বসে আছেন। সহদেব তাঁকে সংগৃহীত রসদের ফর্দ পড়ে শোনাচ্ছেন। অর্জুন পাঞ্চাল-

শিবিরে মন্ত্রণায় গিয়েছেন, নকুল সৈন্যদের কুচকাওয়াজে ব্যস্ত। ভীম যে এক'শ গদা ফরমাশ দিয়েছিলেন তা পৌঁছে গেছে, এখন তিনি প্রত্যেকটি আস্ফালন করে এক একজন ধার্তরাষ্ট্রের নামে উৎসর্গ করছেন। সব গদা শাল কাঠের, কেবল একটি কাপড়ের খোলে তুলো ভরা। এটি দুর্যোধনের ১৮নং ভ্রাতা বিকর্ণের জন্য।—রাজশেখর বসু ॥

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে মার্জিত ভাষায় রূপান্তরিত কর :—

আক্রা, ছবি, চশমা, আশকারা, উড়ানি, ঝাঁটা, ছারপোকা, ঘুম, সুদ, হাতিয়ার, পিলসুজ, পাপড়ি, পরগাছা, মলাট, মোম, পানা, হা'ল, জানালা, খিল, দোকান, আঁশ, কার্নিস, ঠগ, ছাউনি, খানাস, তলওয়ার, পাগড়ি, লাউ, জুলফি, ঘুঁটে, কেন্নুই, ঝিঁঝি (রব), চাবি, গড়িমসি করা।

॥ শব্দ-প্রকরণ ॥

বাংলা ভাষার উপাদান

[তৎসম : তদ্ভব : অর্ধ-তৎসম : দেশী ও বিদেশী শব্দ]

শব্দভাণ্ডার হইতেছে ভাষার মুখ্য উপাদান বা সম্পদ্। যে ভাষা যত উন্নত, তাহার শব্দভাণ্ডার তত সমৃদ্ধ। অন্যান্য ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া সকল ভাষাই তাহার প্রয়োজনীয় শব্দ আত্মসাৎ করিয়া ভাষার শব্দভাণ্ডার বিশেষভাবে বাড়াইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেমন নব নব ভাবধারা গ্রহণ করিয়া থাকে, ভাষাও তেমনি চারিদিক হইতে নূতন শব্দ, নূতন ভাব সংগ্রহ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। বাংলা ভাষার বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই।

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার বিচার করিলে আমরা প্রধানত দুই শ্রেণীর শব্দ পাই—(ক) **মৌলিক**, অর্থাৎ ভারতীয় আর্যভাষা হইতে গৃহীত শব্দ এবং (খ) **আগন্তুক**, অর্থাৎ দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষা কিংবা বিদেশীয় ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ।

মৌলিক শব্দগুলি আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেখা যাইতে পারে। (১) **তৎসম**, (২) **তদ্ভব**, (৩) **অর্ধ-তৎসম**।

(১) **তৎসম** শব্দাবলী সংস্কৃত হইতে ধার করা শব্দ। এই সকল শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইয়াও সংস্কৃতের তুল্য, অর্থাৎ প্রায় অবিকৃতরূপেই বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত। যেমন,—বায়ু, কুসুম, মন্দ, আকাশ, কৃষ্ণ, অন্ন, কার্য, কুন্তল, অলক, অসুর, ফল, মালা, সুন্দর ইত্যাদি।

(২) **তদ্ভব ঃ** যে শব্দগুলি বৈদিক সংস্কৃত বা লৌকিক সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ভাষার ভিতর দিয়া ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাদিগকে বলা হয় **তদ্ভব** বাংলা শব্দ। অর্থাৎ—'তৎ' (সংস্কৃত) হইতে 'ভব' (উদ্ভূত)। যেমন,—

সংস্কৃত	**প্রাকৃত**	**বাংলা** (তদ্ভব)
দীর্ঘিকা	দিগ্‌ঘিআ	দীঘি
মধ্য	মজ্‌ঝ	মাঝ
বর্ত্ম	বট্ট	বাট
উ	উট্‌ঠ	উট
অর্ধ	অদ্ধ	আধ
সর্প	সপ্প	সাপ
সখা	সহী	সই
নবধর	ণঅধর	নধব
বাষ্প	বপ্‌ফ	ভাপ
অষ্ট	অট্‌ঠ	আট
ষোড়শ	সোলহ	ষোল
উপাধ্যায়	উবজ্‌ঝাঅ	ওঝা
গ্রথতি	গঢ়ই	গড়ে (প্রাঃ বাংলায় গঢে)
দ্বি-অর্ধ	দিঅড্ঢ	দেড়
প্রতিবেশিক	পডিব্রসিঅ	পড়শী
শেফালিকা	সেহালিআ	শিউলী

(৩) **অর্ধ-তৎসম ঃ** যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে গৃহীত, অথচ উচ্চারণে অথবা বানানে সংস্কৃতের মত নাই, সেগুলিকে **অর্ধ তৎসম** বলা হয়। অর্ধ-

তৎসম শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দই, অনবধানতাপ্রসূত বিকৃত উচ্চারণের ফলে এগুলি গঠিত। যেমন,—তৎসম কৃষ্ণ>তদ্ভব কাহ্ন, কানু, কানাই; কিন্তু অর্ধ-তৎসম **কেষ্ট**। তৎসম গ্রাম>তদ্ভব গাঁ; কিন্তু অর্ধ-তৎসম **গেরাম**। তৎসম শ্রদ্ধা> তদ্ভব সাধ; কিন্তু অর্ধ-তৎসম **ছেদ্দা**। তৎসম শ্রী>অর্ধ-তৎসম **ছিরি**। তৎসম বিষ্ণু>অর্ধ-তৎসম **বিষ্টু**।

বাংলা ভাষার **আগন্তুক শব্দাবলী** প্রধানত দুই জাতীয়। (১) **দেশী**, (২) **বিদেশী**।

দেশী শব্দ ঃ ভারতবর্ষীয় আর্যেতর জাতির ব্যবহৃত যে সমুদয় শব্দ বাংলা ভাষায় চলিয়া গিয়াছে, তাহারা **দেশী শব্দ** নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যেমন,— চাউল, তেঁতুল, নালা, খন্দ, কলা (কদলী), নীহার, পুষ্প, মর্কট, কুণ্ড, অটবী, কামড়, ঘোমটা, ঝাড়, ঢেঁকি প্রভৃতি দেশী শব্দ। ইহা ভিন্ন, বহু ধ্বন্যাত্মক শব্দও (Onomatopoeic words) দেশী শব্দ বলিয়া পরিগণিত। যেমন,—কট্ কট্, কুল কুল, ঝন্ ঝন্, টল টল, ঘোড়া-**টোড়া**, বাড়ী-**টাড়ী**, জল-**টল** প্রভৃতি।

বিদেশী শব্দ ঃ বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে বহু বিদেশী শব্দ সহায়তা করিয়াছে। আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক আসিয়াছে। গ্রীক আসিয়াছে, মোগল আসিয়াছে, ওলন্দাজ আসিয়াছে, ফরাসী আসিয়াছে, ইংরাজ আসিয়াছে। উহারা এদেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, কেহ কেহ বাণিজ্য করিয়াছে। ইহাদের সহিত বাঙালীর মেলামেলা হইয়াছে, ভাবের আদানপ্রদান হইয়াছে। ইহারা এমন অনেক জিনিস আমদানি করিয়াছে, যেগুলির কোনো নাম হয়ত আমাদের ভাষায় ছিল না। ইহারা এমন অনেক ভাব ও চিন্তার কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছে, যেগুলিকে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দ আমাদের ভাষায় খুজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই বিদেশীদের ভাষা হইতে অনেক শব্দ আমাদের ভাষায় গৃহীত হইয়াছে।

নিম্নে অতি সংক্ষেপে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত **বিদেশী শব্দের তালিকা** দেওয়া হইল।

গ্রীক ঃ দাম (বিদেশী মূল শব্দ দ্রাখ্‌মে drakhma); সুড়ঙ্গ, সুড়ং (বিদেশী মূল শব্দ surinks)। কোণ (মূল শব্দ gonos); কেন্দ্র (মূল শব্দ kentron)।

লাতিন ভাষার শব্দ ঃ পিক (মূল শব্দ picus)।

পহ্‌লবী ঃ পুঁথি (মূল শব্দ 'পোস্ত'=লিখিবার চামড়া)।

আরবী ঃ আক্কেল, আখের, আজব, আতর, আদব, আদালত, আন্‌কা (=অপরিচিত), আমলা, আমানত, আসল, আসবাব, ইশারা, ইস্তাহার, উকিল, এজাহার, এলেম (আরবী ইলম্‌=বুদ্ধি), ওজর, কলম, কদর, কবুল, কাজী, কাহিল, কেরামৎ, খবর, খাজনা, খাতির, খাবার, খালাস, খাস, খেসারৎ, গরজ, গলদ, গোলাম, জবাব, জামিন, জাহাজ, জাহির, তদারক, তলব, তামাশা, দরখাস্ত, দোয়াত, নকল, নাবালক, ফকির, ফতুর, ফসল, ফয়সলা, ফোয়ারা, কুসরৎ, বদল, বাকি, মজবুত, মজুত, মাফ, মেহনৎ, রকম, রাজী, রায় (মকদ্দমার), লোকসান, শরবৎ, সই (=স্বাক্ষর), সদর, হজম, হাওয়া, হাজির, হুঁকা, হুকুম, হুজুর ইত্যাদি।

ফারসী শব্দ ঃ ফারসী ভাষায় আরবী শব্দ প্রচুর। সেইজন্য ফারসী ভাষার মধ্য দিয়া প্রচুর আরবী এবং তুর্কী শব্দও বাংলা ভাষায় আসিয়াছে। সুতরাং বাংলা ভাষায় ফারসী শব্দ বলিলে মূল ফারসী শব্দ এবং ফারসীর মধ্য দিয়া আগত আরবী এবং তুর্কী শব্দও বুঝিতে হইবে।

ফারসী শব্দের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

আওয়াজ, আঙ্গুর, আন্দাজ, আফসোস, আমীর, আমেজ, আয়েশ, আসমান, আহাম্মক। কবর, কাগজ, কায়েম, কাবার, কিনারা, কিশমিশ, কিস্তী, কেতাব, কেল্লা, কোমর। খরচ, খরিদ, খলিফা, খাজাঞ্চি, খানসামা, খারিজ, খেয়াল। গজ, গজল, গরীব, গালিচা, গোলাপ। চাকর, চেহারা, চৌবাচ্চা। জখম, জমা, জরিমানা, জায়গির, জিদ, জুলুম, জেরা, জেলা, জোয়ান। তরফ, তবলা, তাজ্জব, তাঁবু, তামাদি, তারিখ, তালিকা। দপ্তর, দরবার, দরবেশ, দলিল, দাগ, দারোগা, দালাল, দেমাক, দোকান, দৌলত। নজীর, নরম, নিশান। পরওয়ানা, পর্দা, পশম, পেয়াদা, পোলাও। বকেয়া, বজায়, বজ্জাত, বন্দুক, বরকন্দাজ, বস্তা, বহর, বাদাম, বান্দা, বারুদ, বাহাদুর, বাহার, বুনিয়াদ। ময়দান। রফা, রিফু, রেশম, রোজ। শরম, শহর, শাবাশ। সদর, সনাক্ত, সবুর, সর্দার, সাজা, সাবেক, সালিস, সাহেব, সাহেবিয়ানা, সিন্দুক, সুপারিশ, সেপাই, সেরেস্তা। হাঙ্গামা, হজাব, হাজির ইত্যাদি।

তুর্কী শব্দ ঃ কাঁচি, বেগম, সওগাৎ, কাবু, কুলী, বিবি, উর্দু (=শিবির) ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ— **বাদশা বেগম** ঝমঝমাঝম্ বাজিয়ে চলেছি।

—অমৃতলাল বসু॥

সাথে সাথে চলে **উর্দু** বাজার

হাজার হাজার হাতী! —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত॥

পোর্তুগীজ শব্দ ঃ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে বাণিজ্য-ব্যপদেশে পোর্তুগীজ বণিকগণ বাংলাদেশে যাওয়া-আসা করিতে থাকে। তাহারা বাংলাদেশে অনেক নূতন দ্রব্য আমদানি করে। এই সকল দ্রব্যের নাম পোর্তুগীজ ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়। যেমন,—

আলকাত্‌রা (alcatrao), আনারস (ananas), আলপিন (alfinete), আলমারি (armario), বালতি (balde), কেরানী (carrane), চাবি (chave), ফিতা (fita), ফালতো (falto), গরাদে (grado), গির্জা (igreja), পেঁপে (papaia), পেয়ারা (pera), পেরেক (prego), তামাক (tobaco) ইত্যাদি।

ওলন্দাজ শব্দ ঃ হরতন (harten, রুইতন (ruiten), ইস্কাপন (schopen), তুরুপ (troef)।

ফরাসী শব্দ ঃ কার্তুজ, কুপন, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি।

ইংরাজী শব্দ ঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হইতে অগণিত ইংরাজী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। যেমন,—লণ্ঠন (lantern), গেলাস (glass), টেবিল, চেয়ার বেঞ্চি (bench), গারদ (guard), টিকিট, ইঞ্চি, কার্নিস, কোম্পানি, পালিশ, পুলিস, মেম, বার্নিশ, ভিজিট, সিনেমা, উইল, পাউডার, ডজন, সিল্ক, ডাক্তার, কাপ, ডিশ ইত্যাদি। অনেক ইংরাজী শব্দ বাংলায় এমন পরিবর্তিতরূপে গৃহীত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে আর ইংরাজী বলিয়া চেনাই কঠিন। শব্দগুলি যেন খাঁটি বাংলা শব্দই হইয়া গিয়াছে। যেমন,—আর্দালী (orderly), আস্তাবল (stable), জাঁদরেল (general), তোরঙ্গ (trunk), হাসপাতাল (hospital), লাট (lord), রোঁদ (round) ইত্যাদি।

চীনা শব্দ ঃ চা, চিনি ইত্যাদি।

জাপানী ঃ রিক্‌শা।

ব্রহ্মদেশীয় ঃ লুঙ্গি।

মালয়দেশীয় ঃ সাগু।

পেরুদেশীয় ঃ কুইনাইন।

ইতালীয় ঃ ম্যাজেণ্টা (রং), ম্যালেরিয়া।

বিদেশী শব্দের প্রয়োগ-রীতি ঃ বিদেশী যে সকল শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলি কখনও বা এককভাবে বসিয়া ভাবপ্রকাশে সহায়তা করে, কখনও বা অন্য আর একটি শব্দের সহিত **সমাসবদ্ধ** হইয়াও ব্যবহৃত হয়। যেমন,—

(১) ইংরাজী শব্দের সহিত বাংলা শব্দের সমাস ঃ বাক্সবন্দী, নোটবই, ভোটদাতা, মার্কামারা, বলনাচ, জলপুলিস, হলঘর, ক্যাশটাকা।

(২) ইংরাজী শব্দের সহিত বিদেশী কোনো শব্দের সমাস ঃ মেমসাহেব, ফ্যাশানদুরস্ত, জেলফেরৎ (আসামী), সিপাইসান্ত্রী (ফাঃ সিপাহী + ইং sentry), ডাক্‌টিকিট, লাটসাহেব।

(৩) ইংরাজী শব্দের সহিত ইংরাজী শব্দের সমাস ঃ পোস্ট্‌-অফিস, বাথরুম, ফুটপাথ, কোচম্যান, গ্যাস্‌পোস্ট্‌, ক্যাশ্‌বাক্স, ফাউণ্টেন-পেন, ট্রেড্‌মার্ক, মানিব্যাগ, উড্‌পেন্সিল (wood pencil), আয়রনচেস্ট্‌, লেডিডাক্তার, মোটরকার, লেটার-পেপার, পেপার-ওয়েট্‌, টাইমটেবল, মাইলস্টোন ইত্যাদি।

(৪) আরবী ফারসী শব্দের সহিত তদ্ভব (বাংলা) বা তৎসম শব্দের সমাস ঃ ভোগদখল, শিক্ষানবীস, দিনমজুর, সুবন্দোবস্ত, আইনসঙ্গত, আইনানুগ, কুমৎলব, ঘোড়সওয়ার, ইজ্জতরক্ষা, সুপারিশপত্র, নগদ-বিদায়, ধোপদুরস্ত, দোকানপাট, যৌথকারবার, শহরবাসী, আব্রুরক্ষা, দিনগুজরান, মাসমাহিনা, জীবনবীমা, গোলাপজল ইত্যাদি।

(৫) আরবী ফারসী শব্দের সহিত আরবী ফারসী শব্দের সমাস ঃ নকল-নবীস, খোশমেজাজ, বদহজম, বদমেজাজ, রোজনামচা, আতশবাজি, নিমকহারাম, আবহাওয়া, অন্দরমহল, বেআন্দাজ, বে-আব্রু, বে-বন্দোবস্ত, বিলাত-ফেরৎ, দিলদরিয়া, মিহিদানা, লেফাফাদুরস্ত, পর্দানশীন, চশমখোর, দরদস্তুর, আদবকায়দা, খোশবো ইত্যাদি।

(৬) কতকগুলি আরবী ফারসী শব্দ সমার্থক বাংলা শব্দের সহিত মিলিত হইয়াও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন,— সাজ-সরঞ্জাম, লজ্জা-শরম, মান-ইজ্জত, ধন-দৌলত, ধার-কর্জ, জন্তু-জানোয়ার, সাক্ষী-সাবুদ, পোশাক-পরিচ্ছদ, লোক-লস্কর ইত্যাদি।

বাংলায় বিদেশী শব্দের স্বাভাবিকী-করণ (Naturalization of foreign words)ঃ বাংলা ভাষায় এমন বহু বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেগুলি ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া ভাষার সঙ্গে নিজদিগকে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। এগুলিকে বিদেশী শব্দের স্বাভাবিকী-করণ বলা হয়। যেমন,—

ফারসী—সাহেব (ফাঃ সাহব), আস্তে (=ধীরে) (ফাঃ আহিস্তা), শরম (শর্‌ম্), মরদ (মর্দ্), মুলুক (মুল্‌ক্), দরজা (দরওয়াজা), বে-আক্কেল (বে আকল), ভিস্তি (বিহিস্তি) ইত্যাদি।

পোর্তুগীজ—আনারস (ananas), আলপিন (alfinete), চাবি (chave), গির্জা (igreja), পেঁপে (papaia), পেরেক (prego) ইত্যাদি।

ইংরাজী—কার্নিস (cornice), আস্তাবল (stable), জাঁদরেল (general), ক্যাম্বিস (canvas), ফেরাই (free), মার্কিন (American), বগলস (Buckles), মানোয়ার (man-o'-war) (মানোয়ারী জাহাজ), পাইকার (procurer), মাইরি (By Mary)।

অনুশীলনী

১। বাংলা ভাষার শব্দাবলীকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেখা যাইতে পারে? উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

২। তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ কাহাকে বলে, তাহাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৩। অর্ধ-তৎসম শব্দ কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত সাহায্যে এই শ্রেণীর বাংলা শব্দের বিশেষত্ব সুস্পষ্ট কর। তদ্ভব শব্দের সহিত অর্ধ-তৎসম শব্দের পার্থক্য কোথায়?

৪। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত পাঁচটি বিদেশী শব্দের 'স্বাভাবিকী-করণে'র দৃষ্টান্ত দাও।—মাধ্যমিক বিশেষ বাংলা ১৯৫২।

৫। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্ শ্রেণীর তাহা নির্দেশ কর :—

সুন্দর। কুপন। কার্তুজ। বরফ। পেঁপে। ফিতা। আলতো। কাকা। ছেলে। তোপ। কামান। লাশ। বেগম। জানালা। দোয়াত। কলম। কাগজ। জাঁদরেল। দুয়ার। বউ। মাছ। নিশা। ইমারত। রাণী। পাথর। চক্ষু। চোখ। আঁখি। ঠোঁট। ময়ূর। কলা। আনারস। কাজ-টাজ। চটপট। বিচ্ছিরি। বিস্কুট। নেড়ং। ডবল। সেলেট। ঢেঁকি। খোকা। পাইক। বুড়ো। ওঝা। বেয়াই। দেমাক। লাঙ্গল। পুস্তক। মৌমাছি। চাক (মৌমাছির)। রূপা। ভাত। বালিশ। ময়দান। শৌখীন। পণ্ডিত। সাপ। বারান্দা। শমন। বোতল। শেমিজ। অডিকোলন। কুলা। টোপর। চা। চামচে। আলপাকা। তামাক। সাহেব।

সমার্থক শব্দাবলী

একই শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই প্রচলিত আছে। বাংলা ভাষাতেও এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলির প্রয়োগে সমান—অর্থাৎ, যেগুলির দ্বারা একই—অর্থের বোধ হয়। এগুলিকে **সমার্থক শব্দ** বলে। এই প্রতিশব্দগুলি একার্থবোধক হইলেও ইহাদের মধ্যে ভাবগত কিছু বৈষম্য থাকে। তাই প্রসঙ্গ ও রচনা বুঝিয়া ঠিক শব্দটি প্রয়োগ করিতে হয়। এজন্য সমার্থক শব্দাবলীর সহিত বা একই শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দের সহিত পরিচিত থাকিতে হয়। একই শব্দের পুনঃপুনঃ প্রয়োগে রচনার মাধুর্য নষ্ট হয়। সেজন্যও সমার্থক শব্দজ্ঞান রাখিতে হয়। নিম্নে কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

অঙ্গ—শরীর, কায়, দেহ, তনু, কলেবর, গাত্র, বপু।

অগ্নি—অনল, পাবক, বহ্নি, দহন, হুতাশন।

অন্ধকার—আঁধার, তিমির, তমঃ।

অরণ্য—কানন, অটবী, কান্তার, বিপিন, বন।

অশ্ব—ঘোটক, ঘোড়া, তুরঙ্গ, বাজী, তুরঙ্গম, হয়।

আকাশ—অন্তরীক্ষ, অম্বর, গগন, ত্রিদিব, নভঃ, ব্যোম, দ্যু, শূন্য, নভস্তল, নভোমণ্ডল, ব্যোমমণ্ডল, বিষ্ণুপদ ইত্যাদি।

আনন্দ—আমোদ, হর্ষ, প্রীতি, প্রফুল্লতা।

আম্র—আম, চূত, রসাল, সহকার।

ইচ্ছা—অভিপ্রায়, অভিরুচি, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা ঈপ্সা, কামনা, বাঞ্ছা, বাসনা, মনোরথ, রুচি, লালসা, সাধ, স্পৃহা ইত্যাদি।

ঈশ্বর—ঈশ, জগৎপতি, জগদীশ, জগদীশ্বর, ধাতা, পরমাত্মা, পরমেশ, পরমেশ্বর, বিধাতা, বিধি, বিভু, ভগবান, সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি।

কন্যা—দুহিতা, তনয়া, আত্মজা, সুতা, নন্দিনী, ঝি, মেয়ে ইত্যাদি।

কর্ণ—শ্রবণ, শ্রুতি।

কিরণ—অংশু, কর, জ্যোতি, প্রভা, বিভা, ময়ূখ, দ্যুতি, ভাতি, রশ্মি।

কেশ—অলক, কুন্তল, চিকুর, চুল ইত্যাদি।

খড়্গ—অসি, করবাল, তরবারি, তলোয়ার।

গঙ্গা—ভাগীরথী, জাহ্নবী, সুরধুনী, শৈলসুতা, বিষ্ণুপদী, ত্রিপথগা, হৈমবতী।

গৃহ—আগার, আবাস, আলয়, গেহ, ঘর, নিকেতন, নিলয়, ভবন, মন্দির, সদন, সদ্ম ইত্যাদি।

চক্ষু—নয়ন, নেত্র, অক্ষি, লোচন, দর্শন।

চন্দ্র—ইন্দু, চন্দ্রমা, চাঁদ, তারাপতি, দ্বিজরাজ, নিশাকর, নিশাপতি, বিধু, মৃগাঙ্ক, শশী, শশধর, শশাঙ্ক, সিতাংশু, সুধাকর, সুধাংশু, সোম, হিমাংশু ইত্যাদি।

ছলনা—প্রতারণা, বঞ্চনা।

জ্যোৎস্না—কৌমুদী, চন্দ্রিকা।

জল—অম্বু, জীবন, নীর, বারি, সলিল।

ঢাল—চর্ম, ফলক ইত্যাদি।

তট (তীর)—কুল, তীর, পুলিন, রোধঃ, সৈকত (বালুকাময় তট) ইত্যাদি।

তরঙ্গ—ঊর্মি, কল্লোল, বীচি।

থোকা—গুচ্ছ, স্তবক।

দন্ত—দশন, দাঁত, রদ।

দেবতা—দেব, সুর, অমর, নির্জর, ত্রিদশ, বিবুধ ইত্যাদি।

ধন—অর্থ, বিভব, সম্পদ্, বিত্ত, শ্রী, বসু।

ধনু—কার্মুক, কোদণ্ড, চাপ, শরাসন ইত্যাদি।

নদী—তটিনী, তরঙ্গিনী, নির্ঝরিণী, প্রবাহিণী, সরিৎ, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী ইত্যাদি।

নারী—অঙ্গনা, অবলা, কান্তা, কামিনী, নিতম্বিনী, প্রমদা, বামা, মহিলা, রমণী, রামা, ললনা, সীমন্তিনী, সুন্দরী, স্ত্রী ইত্যাদি।

পক্ষী—অণ্ডজ, খেচর, দ্বিজ, পতত্রী, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, শকুন্ত ইত্যাদি।

পণ্ডিত—কোবিদ, ধীমান্, প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ, বিজ্ঞ, বিদ্বান্, বিশারদ, বুধ, সুধী, সুরি ইত্যাদি।

পদ্ম—অব্জ, অরবিন্দ, উৎপল, কমল, তামরস, নলিনী, পঙ্কজ, শতদল, সরসিজ, সরোজ, সরসিরুহ, সরোরুহ ইত্যাদি।

পর্বত—অচল, অদ্রি, গিরি, নগ, শিখরী, শৈল, শৃঙ্গী, ভূধর।

পুত্র—সুত, নন্দন, আত্মজ, তনয়।

পৃথিবী—অবনী, ক্ষিতি, জগৎ, ধরণী, ধরা, ধরিত্রী, পৃথ্বী, বসুধা, বসুন্ধরা, বসুমতী, ভূ, মহী, মেদিনী, সর্বংসহা ইত্যাদি।

প্রভাত—প্রাতঃ, প্রত্যূষ, ঊষা।

ফুল—কুসুম, প্রসূন, পুষ্প।

বজ্র—অশনি, ত্রিদশায়ুধ।

বস্ত্র—অম্বর, আচ্ছাদন, কাপড়, পরিধেয়, বসন, বাস ইত্যাদি।

বায়ু—অনিল, গন্ধবহ, চঞ্চল, পবন, বাত, বাতাস, মরুৎ, মারুত, সমীর, সমীরণ।

বিদ্যুৎ—সৌদামিনী, ক্ষণপ্রভা, বিজলী, চঞ্চলা, তড়িৎ, অশনি, চপলা ইত্যাদি।

বৃক্ষ—গাছ, তরু, দ্রুম, বিটপী, মহীরুহ, শাখী।

ভার্যা—অর্ধাঙ্গিনী, কলত্র, দার, দারা, পত্নী, বনিতা, সহধর্মিণী, স্ত্রী, জায়া, দয়িতা, কান্তা ইত্যাদি।

ভ্রমর—ভৃঙ্গ, মধুপ, অলি, মধুকর।

মনোহর—অভিরাম, কান্ত, চারু, মঞ্জুল, মনোজ্ঞ, মনোরম, রুচির, রম্য, শোভন, সুন্দর, সুষম ইত্যাদি।

মাতা—জননী, প্রসূতি, অম্বা, প্রসবিত্রী ইত্যাদি।

মৃত্যু—বিনাশ, নাশ, মরণ, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, লোকান্তরপ্রাপ্তি, পরলোকগমন, স্বর্গলাভ, মানবলীলা-সংবরণ ইত্যাদি।

মূর্খ—অজ্ঞান, অজ্ঞ, বিদ্যাহীন।

মেঘ—অভ্র, অম্বুদ, ঘন, জলদ, জলধর, জীমূত, তোয়দ, নীরদ, পয়োদ, বারিদ ইত্যাদি।

যুদ্ধ—আহব, বিগ্রহ, রণ, লড়াই, সংগ্রহ, সংগ্রাম ইত্যাদি।

রাজা—ক্ষিতিপাল, ক্ষিতীশ, নরপতি, নরপাল, নরেন্দ্র, নরেশ, নৃপ, নৃপতি, প্রজানাথ, প্রজাপাল, ভূপ, ভূপতি, ভূপাল, মহীপতি, মহীপাল, রাষ্ট্রপাল ইত্যাদি।

রাত্রি—বিভাবরী, নিশা, নিশীথিনী, যামিনী, রজনী, ত্রিযামা, শর্বরী।

লাবণ্য—কান্তি, শ্রী, সুষমা, সৌন্দর্য ইত্যাদি।

শত্রু—অরাতি, বিপক্ষ, রিপু, বৈরী, দ্বিষৎ।

শব্দ—ধ্বনি, নির্ঘোষ, নাদ, নিঃস্বন, নিনাদ।

সন্ধ্যা—প্রদোষ, গোধূলি, সায়ংকাল, সায়াহ্ন, সাঁঝ।

সমুদ্র—অর্ণব, জলনিধি, জলধি, পারাবার, রত্নাকর, সিন্ধু, সাগর, বারিধি।

সমূহ—আবলী, কুল, গণ, চয়, জাল, নিকর, নিচয়, পটল, বর্গ, বৃন্দ, ব্রজ, মালা, রাজি, শ্রেণী, সমুদয় ইত্যাদি।

সর্প—আশীবিষ, উরগ, পন্নগ, ফণী, বিষধর, ভুজগ, ভুজঙ্গ।

সিংহ—কেশরী, পশুরাজ, মৃগরাজ, মৃগেন্দ্র।

সুগন্ধ—সৌরভ, সুবাস, সুরভি, পরিমল।

সুন্দর—শোভন, মনোহর, রমণীয়, রম্য, সুশ্রী, মঞ্জু, নয়নাভিরাম, প্রিয়দর্শন, কান্ত।

সুন্দরী—শোভনা, তন্বী, কৃশাঙ্গী, বরাঙ্গী, বরাঙ্গনা, রূপসী, সুরূপা।

সূর্য—অরুণ, অর্ক, আদিত্য, তপন, দিনমণি, দিবাকর, প্রভাকর, বিভাকর, বিভাবসু, ভানু, ভাস্কর, মার্তণ্ড, মিহির, রবি, সবিতা, সহস্রাংশু ইত্যাদি।

স্বর্গ—ত্রিদিব, সুরপুর, সুরলোক, দেবলোক, দেবভূমি ইত্যাদি।

স্বামী—পতি, দয়িত, জীবিতেশ, নাথ, প্রভু, কান্ত, বল্লভ, প্রাণেশ, হৃদয়েশ ইত্যাদি।

হস্ত—হাত, কর, ভুজ, বাহু।

হস্তী—করী, কুঞ্জর, গজ, দন্তী, দ্বিপ, দ্বিরদ, নাগ, বারণ, মাতঙ্গ, হাতী ইত্যাদি।

প্রয়োগ ঃ

রামায়ণে সীতার **অগ্নি** পরীক্ষার কথা আছে। '**হুতাশন** তেজে গলে লৌহ।'—মেঘনাদবধ কাব্য॥ 'কি কুক্ষণে…**পাবক**-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি আনিনু এ হৈম গেহে ?—ঐ॥ 'গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে **বিভাবসু**।' 'গরজিলা ভালে **চিত্রভানু**।'—ঐ॥

অন্ধকার রাত্রি। '**আঁধার** সে যেন বিরহিণী বধূ।'

'গুরু গর্জনে নীল **অরণ্য** শিহরে, উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে।' —রবীন্দ্রনাথ॥ অশ্বারোহী সংবাদ লইয়া **কানন-কান্তার** পার হইয়া চলিল। দুর্গম গিরি **কান্তার** মরু। গভীর **বন**। 'নিরখি লোচনলোভা পুলিন-**বিপিন** শোভা ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভোলা মনে।'—বিহারীলাল॥

'হ্রেষিল **অশ্ব** মগন হরষে।' 'চাড়লা **ঘোড়া** এক শত চেড়ী।' 'মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে **বাজী**রাজি।' 'কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাঁপিল মাতঙ্গে নিষাদী; রথে রথী; **তুরঙ্গমে** সাদীবর।'—মেঘনাদবধ কাব্য॥ 'কৃষ্ণ **হয়**-রূ। ধনী।'—ঐ॥ তিনি **হয়**-ব্যূহ ভেদ করিয়া বীরবিক্রমে অগ্রসর হইলেন।

মেঘমুক্ত **আকাশ**। '**অন্তরীক্ষ** হতে দেখে যত দেবগণ।' '**গগনে** গরজে মেঘ ঘন বরষা।' '**অম্বরে** অরুণোদয়, তলে দুলে দুলে বয় তমসা তটিনী-রাণী কুলু কুলু স্বনে।'—বিহারীলাল॥ **অভ্র**ভেদী গিরিশৃঙ্গ। 'আছ **নভো**নীলিমায় বিটপীলতায় শশিতারকার সনে।' '**বিষ্ণু-পদতলে** উরিলা ভবানী।'—মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য॥ 'গগনে গরজে **ঘন**, বহে খর সমীরণ।'—বঙ্কিমচন্দ্র॥

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে। প্রতি গৃহের দ্বারদেশে সেদিন **চূত**পল্লব শোভা পাইতেছিল। 'তবে মিছে **সহকার**-শাখা, তবে মিছে মঙ্গল-কলস।'—রবীন্দ্রনাথ॥

'মা তনয়ে ছলিতে **কন্যা** রূপেতে বাঁধেন আসি' ঘরের বেড়া'—রামপ্রসাদ ॥ গিরি**সুতা** উমা। নবাব-**নন্দিনী**। 'শুন লো রাজার **ঝি**, তোরে কহিতে আসিয়াছি।' 'রুদ্রের-**দুহিতা** দেবী ! কর মোর চিত্তে অধিষ্ঠান।' —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥

প্রাচীন যুগে পুরুষেরাও **কর্ণে** কুণ্ডল পরিতেন। 'পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে **শ্রুতি**।'—কাশীরাম দাস ॥ **শ্রবণে**ন্দ্রিয়।

সূর্য**কিরণ**। সুধাংশুর **অংশু**। 'আজি এ প্রভাতে রবির **কর** কেমনে পশিল প্রাণের 'পর।'—রবীন্দ্রনাথ ॥ স্নিগ্ধ **জ্যোতি**। **ময়ূখ**মালী সূর্য। 'অয়ি **জ্যোতি**র্ময়ি ! অন্ধকারে তুমি ঊষা**প্রভা**।'

যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি।
আশু গৃহে তার হেরিবে না আর নিশীথে প্রদীপ-**ভাতি** ॥

[মিলের খাতিরে এখানে 'ভাতি' শব্দটি জ্যোতি-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।]

নূতন মালিকা পরেছি শিথিল **কেশে**। '**অলক** সাজত কুন্দফুলে, শিরীষ পরত কর্ণমূলে, মেখলাতে তুলিয়ে দিত নবনীপের মালা।' '**চিকুর** স্ফুরিছে, **অলক** উড়িছে।' '**চিকুরে** গলয় জলধারা, মেহ্ বরিখ জনু মোতিমহারা।' —বিদ্যাপতি ॥ আলুথালু **কুন্তল**।

খর **করবাল**। **খড়্গ**ধারী বীর। **অসি**র ঝন্ঝনি। **তরবারি**র আস্ফালন। 'ঢাল-**তলোয়ার** ঝনঝনিয়ে বাজে।'

'তুমি আছ, **গৃহ**বাসে তাই আছে রুচি।—মেথর : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ 'স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল রাখালের খেলা-**গেহ**। খেলা**ঘর**। আনন্দ-**নিকেতন**। সুখ**নিলয়**। বিশ্রাম লাভের নিমিত্ত তিনি শয়ন-**মন্দিরে** গমন করিলেন।

নয়নাশ্রু। আয়ত-**নেত্র** (**লোচন**)। **অক্ষি**যুগল।

'অঞ্জলি ভরিয়া রাজা আনিলা **জীবন**।'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ ॥ 'কিম্বা বিম্বাধরা রমা **অম্বু**রাশি-তলে।'—মেঘনাদবধ কাব্য ॥ **বারি** পতনের শব্দ। **নীর**বিন্দু দূর্বাদলে নিত্য কি রে ঝলমলে ?'—মধুসূদন ॥ **সলিল**-সমাধি

নদী**তট**। '**তীর** ছাপি' নদী কলকল্লোলে এল পল্লীর কাছে রে!'—রবীন্দ্রনাথ॥ '**পুলিন**-বিপিন শোভা।' যমুনা-**পুলিনে**। 'যাদঃপতি-**রোধঃ** যথা চলোর্মি আঘাতে!'—মেঘনাদবধ কাব্য॥

'**ঊর্মি**মুখর সমুদ্র।' **কল্লোল**ময়ী তটিনী। **তরঙ্গ**সঙ্কুল নদী। **বীচি**বিক্ষুব্ধ সাগর।

হাতীর **দাঁত**। '**দ্বিরদ-রদ** নির্মিত দ্বার।'—মেঘনাদবধ কাব্য। **দশন**-পঙ্‌ক্তির শোভা।

হর**ধনু**ভঙ্গ। **কার্মুক** টঙ্কারি। '**কোদণ্ড** টঙ্কার সহ অসির ঝনঝনি।'—মেঘনাদবধকাব্য॥ 'বাসবের **চাপ** যেন ঘনবর শিরে।'—ঐ॥ **শরাসনে** যে শরসন্ধান করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। শকুন্তলা: বিদ্যাসাগর॥

পদ্ম-ফুল। 'চরণ-**পঙ্কজে** রাজে মণিময় কঙ্কণ-নূপুর।'—কবিকঙ্কণ চণ্ডী। 'ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে মা, যথা ফলে মধুময় **তামরস** কি বসন্ত কি শরদে।'—মধুসূদন দত্ত॥

দিতি-**সুত**। পবন-**নন্দন** হনুমান। দশানন**াত্মজ** মেঘনাদ।

পুষ্পবৃষ্টি। **প্রসূন**াসার। 'ছিঁড়িলা **কুসুম**দাম রোষে মহাবলী মেঘনাদ।'—মেঘনাদবধ কাব্য॥

দুরন্ত **পবন**। **সুগন্ধবহ** বহিল চৌদিকে।'—মেঘনাদবধ কাব্য॥

বিদ্যুৎ-চমক। **বিজলী**র ছটা। '**ক্ষণপ্রভা**-সম বিভা খেলিছে কিরীটে।'—মেঘনাদবধ কাব্য॥

নয়না**ভিরাম** দৃশ্য। কোমল**কান্ত** পদাবলী। সু**চারু** তারা। **মঞ্জু** কুঞ্জবন। '**মঞ্জুল** ও হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে, ওলো চঞ্চলা তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে!'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত॥ **রম্য** বনভূমি।

রুশ-জার্মান **সংগ্রাম**। কুরুক্ষেত্র-**যুদ্ধ**। '**লড়াই** করে আশ মিটেছে মিঞা?' কথা ও কাহিনী: রবীন্দ্রনাথ॥ 'লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব **আহবে**।'—মেঘনাদবধ কাব্য॥

গভীর **রাত্রি**। বিরহের **বিভাবরী**। ঘোরা **নিশীথিনী**। শারদ **শর্বরী**। জ্যোৎস্নাময়ী **রজনী**। '**নিশার** শেষে উষার হাসি ফুট্‌ল আকাশে।'

ঘরের **শত্রু** বিভীষণ। '**অরাতি** এসেছে দ্বারে।' 'পড়িয়াছে বীরবাহু বীর চূড়ামণি চাপি '**রিপু**চয়-বলী।'—মেঘনাদবধ কাব্য॥

'দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষৎ-শোণিত নদে নতুবা ডুবিতে—'

—মেঘনাদবধ কাব্য॥

সিংহগর্জন। '**কেশরীর** রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বীতংসে।'—মেঘনাদবধ কাব্য॥

তরুণ **অরুণ** হাসে। অসহ্য **তপন**-তাপ। নির্মল-**সূর্য**-করোজ্জ্বল ধরণী। প্রচণ্ড **মার্তণ্ড**-তাপে তপ্ত ভূমণ্ডল। **সূর্য**মুখী দুঃখী, মলিন-বদনা মরি, **মিহির** বিরহে।'—মেঘনাদবধ কাব্য॥ 'জানু **ভানু** কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।'—মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য॥ অস্ত যায় **দিনমণি**।

স্বর্গের দেবতা। **ত্রিদিব**-বিভব। '**সুরলোকে** বাজে মহাশঙ্খ।'

হস্তপদাদির প্রক্ষালন। **হাত**-পা ধোয়া। **কর**কমল। 'নাহি কি বল এ **ভুজ**মৃণালে?' **বাহু**যুগল।

মদকল **করী**। মদমত্ত **হস্তী**। আফ্রিকার **হাতী**।

রচনামধ্যে অনেক সময়ে অর্থকে জোরালো করিবার জন্য পাশাপাশি দুইটি সমার্থক শব্দ বা প্রায়-সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন,—আমোদ-প্রমোদ, ইঙ্গিত-ইশারা, কাগজ-পত্র, কাজ-কর্ম, কুল-কিনারা, চালাক-চতুর, ছাই পাঁশ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঠাট্টা-তামাশা, ডাক্তার-বৈদ্য, দান-খয়রাৎ, বন-জঙ্গল, বাধা-বিঘ্ন, মণি-মাণিক্য, লজ্জা-শরম, রাজা-বাদশা, সভা-সমিতি, সাজ-সজ্জা, সাধু-সন্ত ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অন্তত তিনটি করিয়া সমার্থক শব্দ লিখ:—

আকাশ, কর্ণ, কিরণ, চক্ষু, চন্দ্র, সূর্য, তরঙ্গ, দন্ত, নারী, পদ্ম, পৃথিবী, ভ্রমর, মৃত্যু, মেঘ, রাত্রি, শব্দ, সন্ধ্যা, প্রভাত, রাজা, যুদ্ধ, সমুদ্র, স্বর্গ, সুগন্ধ।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির তিনটি করিয়া প্রতিশব্দ লিখ ও উহাদের প্রয়োগ দেখাও:—

অগ্নি, অরণ্য, আকাশ, কন্যা, কিরণ, জল, নদী, ধনু, শত্রু, রাত্রি, বিদ্যুৎ।

প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

বাংলা ভাষায় কতকগুলি শব্দ আছে যাহাদের উচ্চারণ প্রায় একরূপ, কিন্তু বর্ণবিন্যাস ও অর্থ বিভিন্ন। এই সকল শব্দ বাস্তবিকপক্ষে পৃথক শব্দ, কিন্তু বাংলার হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর; ন এবং মূর্ধন্য ণ; শ, ষ, স; এবং ব-ফলা, য-ফলা, ম-ফলা প্রভৃতির উচ্চারণ প্রায় একরূপ বলিয়া, ইহারা শুনিতে একরূপ মনে হয়। এইরূপ শব্দ প্রয়োগের সময় অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণবিন্যাস করিতে হয়। বর্ণবিন্যাস ভুল হইলে ঠিক মনোভাবটি প্রকাশ পাইবে না।

নিম্নে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল। তালিকার শেষে কতকগুলি সমোচ্চারিত শব্দের প্রয়োগও প্রদর্শিত হইয়াছে।—

অর্ঘ	মূল্য	অ-বশ	অবাধ্য
[যেমন, মহার্ঘ মহামূল্য]		অবশ	অসাড়
অর্ঘ্য	পূজা	অশক্ত	অসমর্থ
অজাগব	অনিদ্রা	অসক্ত	অনাসক্ত
অজগর	সাপ	অশিত	ভক্ষিত
অণু	ক্ষুদ্রতম অংশ	অসিত	কৃষ্ণ
অনু	পশ্চাৎ	অশ্ম	প্রস্তর
অদিন	অশুভ দিন	অশ্ব	ঘোটক
অদীন	অকাতর	অংশ	ভাগ
অন্ন	ভাত	অংস	স্কন্ধ
অন্য	অপর	আদি	প্রথম
অন্নপুষ্ট	খাদ্যপুষ্ট	আধি	মনঃপীড়া
অন্যপুষ্ট	কোকিল	আপণ	হাট, দোকান
অবদ্য	নিন্দনীয়	আপন	নিজ
[যেমন, অনবদ্য—অনিন্দনীয়]		আষাঢ়	মাসবিশেষ
অবধ্য	বধ্যের অযোগ্য	আসার	বৃষ্টিপাত, জলকণা, ধারা

উপাদান	আদি কারণ	চাষ	কর্ষণ
উপাধান	বালিশ	চাস	চাহিস, প্রার্থনা করিস
কটি	কোমর	চিৎ	চেতন
কোটি	শতলক্ষ, অগ্রভাগ	চিত	চিত্ত
কশা	চাবুক	চির	দীর্ঘ
কষা	কষায় রস	চীর	বস্ত্রখণ্ড
কসা	আঁট, শক্ত	চূত	আম্র
কষ্টি	কষ্টি পাথর	চ্যুত	স্খলিত
কোষ্ঠী	জন্ম-পত্রিকা	জাতি	বর্ণ, সম্প্রদায়
কুট	পর্বত	জাতী	পুষ্পবিশেষ
কূট	গিরিশৃঙ্গ	জাল	ফাঁদ
কুল	বংশ	জ্বাল	তাপ, উত্তাপ
কূল	তট	জালা	বৃহৎ কলস
কৃত	সৃষ্ট	জ্বালা	দাহন
ক্রীত	মূল্যে গৃহীত	তদীয	তাহাব
কৃতদাস	ভৃত্যে পরিণত	ত্বদীয়	তোমার
ক্রীতদাস	গোলাম	তত্ত্ব	সংবাদ
কৃত্ত	কর্তিত	তথ্য	যাথার্থ্য
কৃত্য	করণীয	তরণী	নৌকা
খরা	রৌদ্র	তরুণী	যুবতী
ক্ষরা	ক্ষরিত হওয়া	দার	পত্নী
গোলক	ভাঁটা	দ্বার	দরজা
গোলোক	বিষ্ণুলোক	দারা	পত্নী
গুড়	মিষ্টদ্রব্য	দ্বারা	কর্তৃক
গূঢ়	গুপ্ত	দিন	দিবস
চতুর্	চার	দীন	দরিদ্র
চতুর	চালাক	দীননাথ, দীনেশ	দরিদ্রের প্রভু

দিননাথ, দিনেশ	সূর্য
দীপ	প্রদীপ
দ্বিপ	হস্তী
দ্বীপ	জলবেষ্টিত, ভূভাগ
দুকুল	দুই বংশ
দুকূল	দুই তট, রেশমী বস্ত্র
দূত	চর
দ্যূত	পাশাখেলা
দেবত্ব	দেবভাব
দেবত্র	দেবসেবার্থ ভূমি
দেশ	রাজ্য
দ্বেষ	ঈর্ষা
ধনি	সুন্দরী
ধনী	ধনবান্
ধ্বনি	শব্দ
নিবার	বারণ
নীবার	ধান্যবিশেষ
নিশিত	শাণিত
নিশীথ	অর্ধরাত্র
নীড়	কুলায়
নীর	নীর
পক্ষ	পাখা, মাসার্ধ, দল
পক্ষ্ম	চক্ষুপত্রস্থ রোম
পদ্য	কবিতা
পদ্ম	কমল
পরভৃৎ	কাক
পরভৃত	কোকিল

পরশ্ব	পরদিন
পরস্ব	পরধন
পৃষ্ট	জিজ্ঞাসিত
পৃষ্ঠ	পশ্চাদ্ভাগ
পৌর্ণমাস	যজ্ঞবিশেষ
পৌর্ণমাসী	পূর্ণিমা তিথি
বন্ধ	বাঁধন
বন্ধ্য	নিষ্ফল
বলি	অর্ঘ্য
বলী	বলবান্
বাণ	শর
বান	বন্যা
বারি	জল
বাড়ী	বাটী, আলয়
বিজন	নির্জন
বীজন	বাতাস
বিস্মিত	আশ্চর্যান্বিত
বিস্মৃত	ভ্রান্ত
বেদ	শ্রুতি
বেধ	গভীরতা
বসন	বস্ত্র
ব্যসন	বিপদ
বাণি, বাণী	সরস্বতী, বাক্য
বানি	পারিশ্রমিক, শুল্ক
বিশ	কুড়ি
বিষ	গরল
বিস	মৃণাল

বীণা	তন্ত্রী-বাদ্য	সব	সমস্ত
বিনা	ব্যতিরেকে	শম	শান্তি
ভাষা	কথা	সম	তুল্য
ভাসা	প্রকাশ, আভা, অমজ্জন	শমন	যম
মণ	৪০ সের	সমন	আদালতের ডাক
মন	অন্তঃকরণ	শম্বর	শম্বরাসুর, মৃগ
মতি	বুদ্ধি	সম্বর	সংবরণ
মোতি	মুক্তা	শয্যা	বিছানা
মাণ	কচু	সজ্জা	পোশাক
মান	পরিমাণ, মান্য, অভিমান	শর	বাণ
মূক	বোবা	সর	দুগ্ধসার
মুখ	বদন	স্বর	কণ্ঠধ্বনি
মেদ	মজ্জা	শরণ	আশ্রয়
মেধ	যজ্ঞ	স্মরণ	স্মৃতি
যজ্ঞ	হোম	শান্ত	শিষ্ট
যোগ্য	উপযুক্ত	সান্ত	অন্তযুক্ত
যতি	মুনি	শাপ	অভিশাপ
জ্যোতিঃ	দীপ্তি	সাপ	সর্প
শক্ত	সমর্থ	শারদা	দুর্গা
সক্ত	আসক্ত	সারদা	সরস্বতী
শঙ্কর	শিব	শারি	পাশার ঘুঁটি
সঙ্কর	মিশ্র	সারি, সারী	পাখী বিশেষ
শত	একশ	সারি	শ্রেণী
স্বতঃ	আপনা হইতে	শাল	শালগাছ, পশমী
শণ	পাট		গাত্রবস্ত্রবিশেষ
সন	বৎসর	সাল	বৎসর
শব	মৃতদেহ	শিখ	নানক-পন্থী

সিক	শলাকা	সত্য	প্রকৃত
শিকার	মৃগয়া	সদ্ম	আলয়
স্বীকার	অঙ্গীকার	সদ্য	এখনি, উপস্থিত
শিল	পাষাণ	সর্গ	গ্রন্থের পরিচ্ছেদ
শীল	চরিত্র	স্বর্গ	দেবলোক
শীত	জাড্য	সবিতৃ	সূর্য
শিত	ধবল, শুক্ল	সবিত্রী	জননী
শুক্তি	ঝিনুক	সহিত	সহ
সূক্তি	সুবচন, বেদমন্ত্র	স্ব-হিত	আত্মকল্যাণ
শুচি	শুদ্ধ	সার্থ	বণিক
সূচী	ছুঁচ, নির্ঘণ্ট	স্বার্থ	প্রয়োজন
শ্যাম	কৃষ্ণ	সুত	পুত্র
সাম	বেদ	সূত	সারথি
শ্যেন	বাজপাখী	শূর	বলী, বীর
সেন	উপাধিবিশেষ	সুর	দেবতা, স্বর
শ্রবণ	কর্ণ	সূর	সূর্য
স্রবণ	ক্ষরণ	স্কন্দ	কার্তিকেয়
শ্বশ্রূ	শাশুড়ী	স্কন্ধ	কাঁধ
শ্মশ্রু	গোঁফদাড়ি	হালি	নূতন, হাল
সত্ত্ব	আত্মা, বল	হালী	হলধর, চাষা

নিম্নে কয়েকটি সমোচ্চারিত শব্দের প্রয়োগ দেখান হইল ঃ—

অর্ঘ— দ্রব্যসমূহ মহার্ঘ হইয়াছে।

অর্ঘ্য—অর্ঘ্য লইয়া পূজারী এখনও মন্দিরে আসেন নাই।

অজাগর—এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুঁসিছে।—রবীন্দ্রনাথ॥

অজগর—বনমধ্যে ব্যাঘ্রের গর্জন, হস্তীর বৃংহিত এবং অজগরের ফোঁসফোঁসানি শুনা গিয়াছিল।

অসিত—“পর্বতের মেঘরূপ অসিত অজিন।”

অশিত—অশিত অন্ন ভালরূপ চর্বিত না হইলে জীর্ণ হয় না।

কুল—“এনেছি কি পুত্রবধূ নীচকুল হ'তে ?”

কূল—এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে,

সকলি দিলাম তুলে থরে-বিথরে।—রবীন্দ্রনাথ॥

নিশিত—নিশিত তরবারি।

নিশীথ—নিশীথ রাত্রি, আকাশে চাঁদ নাই; তাই পথিক পথ দেখিতে পাইতেছিল না।

চির—চিরকাল দুঃখে দুঃখেই গেল।

চীর—ভিখারী নারীর চীরবাস আনি'

দিল রাণীদেহে তুলিয়া।—রবীন্দ্রনাথ॥

চূত—কিবা শোভা ধরিয়াছে চূত-মঞ্জরীর দল!

চ্যুত—বৃক্ষচ্যুত ফলগুলি কাহারা যেন কুড়াইয়া লইয়া গিয়াছে!

দুকুল—আমার একুল-ওকুল দুকুল গেল।

দুকূল—কটিতে ছিল নীল-দুকূল

মালতী-মালা মাথে।—রবীন্দ্রনাথ॥

দূত—মনে রাখিও, দূত অবাধ্য।

দ্যূত—দ্যূতক্রীড়া ভাল নয়।

ধরা—টাকা হয়ে লোকটা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

ধরা—তস্করটি ধরা পড়িয়াছে।

ধড়া—পরিধানে পীতধড়া।

পরশ্ব—পরশ্ব দিন ভাল আছে, ঐদিন যাত্রা করিব।

পরস্ব—পরস্বাপহরণকারীকে সকলে ঘৃণা করে।

বিজন—বিজন-প্রদেশ ভগবৎ সাধনার অনুকূল।

বীজন—পাখার বীজনে তাহার শরীর শীতল হইল।

শঙ্কর—যোগমগ্ন শঙ্করের ধ্যান ভাঙ্গিতে গিয়া মদন ভস্মীভূত হন।

সঙ্কর—বাঙ্গালী সঙ্কর জাতি।

শপ্ত—অভিশপ্ত জীবন আর কতকাল যাপন করিব !

সপ্ত—"সপ্ত-পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া।"—রবীন্দ্রনাথ॥

শীকর—ঝর্ণার ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাই বস্ত্রাদি জলশীকর-সিক্ত হইয়াছে।

শিকড়—গাছের শিকড় বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছে।

স্বর্গ—স্বর্গে দেবতারা বাস করেন, মর্ত্যে মানব।

সর্গ—মেঘনাদবধ কাব্যে মোট নয়টি সর্গ আছে।

সাক্ষর—সে সাক্ষর ব্যক্তি।

স্বাক্ষর—কাগজখানিতে স্বাক্ষর করিয়া দাও।

অর্ধাসন—রাজা মুনিবরকে অর্ধাসন ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ জানাইলেন।

অর্ধাশন—অভাবে পড়িয়া তিনি বর্তমানে সপরিবার অর্ধাশনে কাটাইতেছেন।

প্রায়-সদৃশার্থক শব্দাবলী

বাংলা ভাষায় কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলি আপাত-দৃষ্টিতে একার্থবোধক বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি বিভিন্ন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন,—

আকার—গঠন, মূর্তি।

আয়তন—দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ।

সূর্যের **আকার** গোল, উহার **আয়তন** পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণ বড়।

এইরূপ —

(১) **অপরাধ**—রাজবিধি লঙ্ঘনকে 'অপরাধ' বলে।

দোষ—গুণের বিপরীত।

পাপ—ধর্মবিধি লঙ্ঘনের নাম 'পাপ'।

(২) **মহত্ত্ব**—[ভাবার্থে মহৎ + ত্ব] মহতের ভাব।

মাহাত্ম্য—[মহাত্মন্ + ষ্ণ্য] মহাত্মার ভাব।

(৩) **অকর্মা**—কর্মের অযোগ্য।

নিষ্কর্মা—কর্মে বিরত, কর্মহীন।

(৪) **আশঙ্কা**—অনাগত বিপদ্ সম্বন্ধে চিত্তের সংশয়াবস্থা।

ভয়—বিপৎকালে চিত্তের বৈকল্য।

আতঙ্ক—অতিশয় ভয়হেতু চিত্তের বিহ্বলতা।

এবছর ভাল বৃষ্টি হয় নাই, তাই দুর্ভিক্ষের **আশঙ্কা** করিতেছি। কিন্তু দুর্ভিক্ষ আসিলে **ভয়** কি? উহা ত' আমাদের অভ্যস্ত হইয়াই গিয়াছে।

চোখের সামনে দুই-দুইটা খুন হইতে দেখিয়া আমি **আতঙ্কে** শিহরিয়া উঠিলাম!

(৫) **শরীরী**—দেহধারী।

শারীরিক—দেহসম্বন্ধীয়।

'**শরীরী** জীবের পক্ষে **শারীরিক** সুস্থতা অপেক্ষা সুখকর বিষয় আর কিছুই নাই।'—অক্ষয়কুমার দত্ত॥

(৬) **অর্থী**—অর্থের প্রত্যাশী।

অর্থবান—অর্থশালী, ধনবান্।

(৭) **নিদ্রিত**—সুপ্ত।

নিদ্রালু—তন্দ্রাবিষ্ট।

(৮) **পরিশ্রমী**—পরিশ্রমকারী।

পরিশ্রান্ত—ক্লান্ত।

(৯) **আশান্বিত**—আশাযুক্ত।

আশ্বস্ত—আশাপ্রাপ্ত।

(১০) **অস্ত্র**—যাহা নিক্ষেপ করিতে হয়; যেমন—তীর।

শস্ত্র—যাহা হাতে ধারণ করিয়া যুদ্ধাদি করিতে হয়; যেমন—তরবারি।

(১১) **আধি**—মানসিক পীড়া।

ব্যাধি—শারীরিক পীড়া।

(১২) **অহঙ্কার**—'আমি' 'আমার'—এইরূপ ভাব।

গর্ব—বিদ্যা, ধন বা বলের সম্পর্কে সচেতনতাহেতু অন্যকে উপেক্ষা।

দম্ভ—অর্থ-ঐশ্বর্যাদির গর্ব অন্যকে পীড়িত করিলে 'দম্ভ' বলা হয়

(১৩) **নমস্কার**—নতি, নত হইয়া নম্রতা প্রদর্শন।

প্রণাম—পূজনীয়দিগকে বিশেষভাবে নমস্কার।

(১৪) **দয়া**—পরের সুখবিধানের জন্য করুণা।

মায়া—আত্মসুখ-নিমিত্ত দয়া।

(১৫) **কৃপা**—নীচের প্রতি দয়া।

স্নেহ—বয়ঃকনিষ্ঠদিগের প্রতি দয়া।

(১৬) **ভ্রম**—অসাবধানতাজনিত ভুল।

প্রমাদ—অজ্ঞাতজনিত ভুল।

(১৭) **দুঃখ**—মনের ক্ষোভ।

শোক—প্রিয়জনের বিয়োগ বা অনিষ্ট-হেতু মানসিক কষ্ট

(১৮) **হিংসা**—পরের অনিষ্ট করার প্রবৃত্তি।

ঈর্ষা—পরশ্রীকাতরতা।

দ্বেষ—অন্যের প্রতি ঘৃণা।

(১৯) **আগত**—যাহা আসিয়াছে।

আগামী—যাহা আসিবে।

(২০) **আচার**—লোক-ব্যবহার, শাস্ত্রীয় ব্যবহার।

ব্যবহার—ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ব্যক্তিবিশেষের আচরণ।

(২১) **দর্শন**—দেখা।

পরিদর্শন—বিশেষভাবে দেখা।

(২২) **রীতি**—সাধারণ লোকের আচরিত প্রথা।

নীতি—ন্যায়ধর্মানুমোদিত বিধান।

(২৩) **তাণ্ডব**—উদ্দাম নৃত্য।

লাস্য—নারীর ললিত নৃত্য।

(২৪) **ইন্দীবর**—নীলপদ্ম।

কোকনদ—রক্তপদ্ম।

(২৫) **বৃক্ষ**—গাছ।

বৃক্ষক—চারা গাছ।

(২৬) **লতা**—বল্লরী।

লতিকা—ছোট লতাগাছ।

(২৭) **পুস্তক**—বই।

পুস্তিকা—ছোট বই।

(২৮) **নাটক**—নাট্যগ্রন্থ।

নাটিকা—ছোট নাটক।

(২৯) **শাখা**—গাছের ডাল।

প্রশাখা—ক্ষুদ্রতর শাখা।

বাংলা শব্দে ছোট বুঝাইতে সাধারণত শব্দশেষে **'ই'** যোগ করা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন হয়। যেমন,—

ডালা—ডালি। খন্তা—খুন্তি। মাদল—মাদুলি। হাঁড়া—হাঁড়ি ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দগুলির সাহায্যে বাক্য রচনা করিয়া উহাদের অর্থের পার্থক্য দেখাও :—

উষর, উশীর। অবিহিত, অভিহিত। উপাদান, উপাধান। দ্যূত, দূত। সূচি, শুচি। সূক্তি, শুক্তি। বান, বাণ। পালক, পালখ। আঁটি, আঁঠি। তারকা, তাড়কা। কীর্তি, কৃত্তি। দেশ, দ্বেষ। চৈত্য, চৈত্র। পঞ্জর, পিঞ্জর। তুরঙ্গ, তরঙ্গ। চন্দ্রমা, চন্দ্রিকা। অভিরাম, অবিরাম। গোলক, গোলোক। অণু, অনু। অশীলতা, অসিলতা। কুট, কূট। শারদা, সারদা। শ্মশ্রু, শ্বশ্রূ। নিশিত, নিশীথ। অপরিণত, অপরিণীত। অভিনেত্রীগণ, অভিনেতৃগণ। পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছিন্ন। অকিঞ্চন, আকিঞ্চন। অর্ধাসন, অর্ধাশন। আবৃতি, আবৃত্তি। কুশাসন, কুশাসন। অম্বুদ, অম্বুধি। আসার, আষাঢ়। অবিচার, অভিচার। তত্ত্ব, তথ্য। আবেশ, আয়াস। শুক, শূক। খোঁটা, খুঁটি। নোড়া, নুড়ি। দড়া, দড়ি। নিহিত, নিহত। শূদ্রা, শূদ্রী।

২। নিম্নলিখিত শব্দযুগল-সমূহের অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া বাক্যগঠন কর :—

নিপাত, নিপাতন। অভিনিবেশ, উপনিবেশ। প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান। পালন, প্রতিপালন। আরাম, বিরাম। আসব, আহব। কৌতুক, কৌতূহল। যাচক, উপযাচক।

—ক বি মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৫০।

৩। বাক্যরচনার দ্বারা নিম্নের শব্দযুগ্মের মধ্যগত পার্থক্য দেখাও :—

শব, সব। শয্যা, সজ্জা। শান্ত, সান্ত। শিকড়, শীকর। শিকার, স্বীকার। শুচি, সূচী। সর্গ, স্বর্গ। শ্মশ্রু, শ্বশ্রূ। —মাধ্যমিক বিশেষ বাংলা, ১৯৫২।

নানার্থক শব্দ

বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একই শব্দের নানা অর্থ জানিলে ভাষা বুঝিবার সুবিধা হয়; অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক ইত্যাদি বুঝিবার ও প্রয়োগের সুবিধা হয়। নিম্নে কতকগুলি শব্দের বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রদর্শিত হইল।

অঙ্ক—(১) গণিতশাস্ত্র। অঙ্কের পরীক্ষায় কেমন করিয়াছ?

(২) চিহ্ন বা রেখা।

(৩) ক্রোড়। মাতৃঅঙ্কে শিশুর যেমন শোভা তেমন আর কোথাও নহে।

(৪) নাটকের পরিচ্ছেদ। বর্তমানকালে **একাঙ্ক** নাটকের সমাদর বেশী।

(৫) কলঙ্ক। 'তুমি যে ধর্মশীল অকপট ললিতমোহনের চরিত্রে **অঙ্ক** দান কল্লে, এতে আমার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।'—লীলাবতী ঃ দীনবন্ধু মিত্র ॥

অঙ্ক শব্দের অনুপ্রাস ঃ শশাঙ্ক কষেন অঙ্ক অঙ্কে রেখে খাতা।
পঞ্চাঙ্ক নাটক পড়ে নিরঙ্কের ভ্রাতা।

অংশ—(১) ভাগ। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর পুত্রগণ তাঁহার সম্পত্তির সমান অংশ পাইবেন।

(২) অঙ্গ, অবয়ব, মূর্তি।

মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ ॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ ॥

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ ॥

অংশু—(১) রশ্মি, আলোকরেখা, কিরণ। 'সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে।'—মেঘনাদবধ কাব্য ॥

(২) রুচি, কান্তি, দীপ্তি। 'তিনি কথা কহিবার সময়ে মুখপদ্মের নিকটবর্তী ভ্রমরগণকে দশনাংশুদ্বারা শুক্লবর্ণ করিয়া কথা কহিয়াছিলেন।'

—কাদম্বরী ॥

অক্ষ—(১) পাশা।

(২) রুদ্রাক্ষ। অক্ষমালা,—'গলে অক্ষমালা।'

অথর্ব—(১) চতুর্থ বেদ। ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব—এই চারি বেদে তিনি ব্যুৎপন্ন।

(২) অতি বৃদ্ধ। 'অথর্ব উঠিতে নারি আছি এক কোণে।'—শিবায়ন ॥

অম্বর—(১) আকাশ, শূন্য। 'অম্বরে অরুণোদয়, তলে দুলে দুলে বয়
তমসা তটিনী-রাণী কুলুকুলু স্বনে।'—বিহারীলাল ॥

(২) বস্ত্র। যেমন, পীতাম্বর [পীতবর্ণ অম্বর (=বস্ত্র) যাহার], রক্তাম্বর ইত্যাদি। 'আচ্ছাদিল লোচন অম্বরে।'—কবিকঙ্কণ ॥

অর্থ—(১) প্রতিপাদ্য বা তাৎপর্য। এই কবিতাটির অর্থ কি ?

(২) ধন। 'অর্থ ই অনর্থের মূল।'

(৩) প্রয়োজন। লোকে ধর্মার্থে তীর্থ পরিভ্রমণে বাহির হয়।

উত্তর—(১) দিক-বিশেষ। ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্বত।

(২) জবাব। চিঠির উত্তর শীঘ্র দিবে।

(৩) পরবর্তী বা ভবিষ্যৎ। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহার উত্তর-জীবনে কবি হইবেন তাহা তাঁহার শৈশবেই বুঝা গিয়াছিল।

(৪) শ্রেষ্ঠ। লোকোত্তর পুরুষ।

(৫) বিরাট রাজার পুত্র! কৌরবগণ বিরাট রাজার গোধন হরণ করিলে রাজপুত্র উত্তর বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে সারথি করিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন।

কর—(১) হাত। 'বিনি করে বরে কর্ম।'—ঈশ্বর স্তোত্র ঃ আলাওল

(২) কিরণ। 'আজি এ প্রভাতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর।'—রবীন্দ্রনাথ, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ॥

(৩) হস্তিশুণ্ড।

(৪) রাজস্ব। করভার বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রজাসাধারণ কষ্টে পড়িয়াছে।

কলা—(১) সূক্ষ্ম অংশ। 'চন্দ্র সবে ষোল **কলা** হ্রাসবৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি **কলায়** ॥'—ভারতচন্দ্র ॥

[প্রথম 'কলা' শব্দের অর্থ—সূক্ষ্ম অংশ; দ্বিতীয় 'কলা' শব্দের অর্থ— শিল্পবিদ্যা

(২) কদলী। 'কলা রুয়ে না কেটো পাত।
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥'—খনার বচন॥

(৩) শিল্পবিদ্যা। তাঁহার ন্যায় কলাবিদ্ অল্পই দেখা যায়।

কাণ্ড—(১) গাছের গুঁড়ি। বৃক্ষের কাণ্ড হইতে শাখা-প্রশাখা বাহির হয়।

(২) অধ্যায়। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।

(৩) ব্যাপার। এত সব কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আর তুমি তাহার কোন সংবাদই পাও নাই?

কু—(১) কুৎসিত। কখনও কুবাক্য বলিও না।

(২) পৃথিবী। 'কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।'—ভারতচন্দ্র॥

[এখানে কু=(১) কুৎসিত এবং (২) পৃথিবী উভয়ই।]

কুলীন—(১) সৎকুলজাত।

(২) কু (=পৃথিবী)-লীন (=পৃথিবী সম্বন্ধীয় কার্যে একান্ত আসক্ত)।

'পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত।'—ভারতচন্দ্র॥

[কুলীন=(১) সদ্‌বংশ জাত; (২) পৃথিবীর প্রতি আসক্ত বা অনুরক্ত।]

কুল—(১) বংশ। তাহার তিনকুলে কেহ নাই। কুলকলঙ্ক। কুলপ্রদীপ। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। 'কর্বুর কুলের গর্ব মেঘনাদ বলী।'—মধুসূদন॥

'কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুলমান এ কাল সমরে।'—মধুসূদন॥

(২) সমূহ। জীবকুল আকুল হইল। শত্রুকুল ধ্বংস হইল। দেবকুল স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন। 'বরষিল পুষ্পাসার দেবকুল মিলি।'—মেঘনাদবধ কাব্য॥ 'উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে শন্‌শনে।'—ঐ॥

(৩) আবাস, গৃহ। প্রাচীনকালে বিদ্যার্থীদিগকে গুরুকুলে বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইত।

কুমার—(১) যুবরাজ। (২) কার্তিকেয়। (৩) অবিবাহিত ব্যক্তি। (৪) বালক। (৫) কুম্ভকার।

কৃষ্ণ—(১) যদুপতি, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা।

(২) কালো। কৃষ্ণবর্ণ।

গুণ—(১) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ; মানসিক উৎকর্ষ। 'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।'—ভারতচন্দ্র॥ 'প্রভু মোর গুণের সাগর।'

(২) রজ্জু। মাঝিরা গুণ টানিয়া নৌকাখানিকে লইয়া যাইতেছে।

(৩) স্বাভাবিক ধর্ম। জলের গুণ শৈত্য।

(৪) জ্যা বা ধনুর ছিলা। ধনুকে ছিলা দেওয়া।

(৫) পূরণ। আমি এখন গুণ কষিতেছি।

(৬) পরিমাণ। সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক অনেক গুণ বড়।

(৭) শক্তি, প্রভাব। ঔষধের গুণে তিনি দুদিনেই আরোগ্য লাভ করেছেন।

(৮) শুভপরিণাম। লেখাপড়া শেখার অনেক গুণ।

(৯) যাদু বা শক্তি। 'না জানি কি গুণ ধরে মুখানি তোমার।'

(১০) বস্তু-ধর্ম (রূপ রসাদি)। ফুলটির এই গুণ যে ইহার ঘ্রাণ মৃদু।

(১১) মহত্ত্ব। 'কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া ?'

(১২) কাব্য-রসাদির গুণত্রয়।—মাধুর্যগুণ, ওজোগুণ, প্রসাদগুণ।

গুরু—(১) আচার্য। প্রাচীনকালে গুরুগৃহে থাকিয়া ছাত্রগণ বিদ্যাশিক্ষা করিত।

(২) অধিক, অত্যন্ত। বৃষ অপেক্ষা মহিষ গুরুভার বহনে বেশী সমর্থ।

(৩) গম্ভীর। 'গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে।'—রবীন্দ্রনাথ॥

গ্রহণ—(১) আদান, লওয়া। এই পুস্তকখানা গ্রহণ করুন।

(২) পৃথিবীতে সূর্যের ছায়া পতন। সকল অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় 'গ্রহণ' হয় না।

গ্রাম—(১) পল্লী। আমাদের 'গ্রামে' একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

(২) সমূহ। 'তোমার মহিমা, কেবা জানে সীমা, কেবা জানে 'গুণগ্রাম'।'

ঘন—(১) গাঢ়, নিবিড় } 'ঘন ঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে।'
(২) মেঘ } —মেঘনাদবধ কাব্য॥

[উল্লিখিত বাক্যান্তর্গত প্রথম ঘন = গাঢ়, দ্বিতীয় ঘন = মেঘ।]

চক্র—(১) চাকা। দ্বিচক্রযান।

(২) চক্রাকার ছেদক অস্ত্র। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী বিষ্ণু।

(৩) কূট মন্ত্রণা।

(৪) সুদ। চক্রবৃদ্ধি।

জীবন—(১) জল
(২) প্রাণ } 'জীবনে' (=জলে) 'জীবন' আজি দিব বিসর্জন।

তনু—(১) শরীর। রোগজর্জর তনু।

(২) কৃশ, ক্ষীণ। 'তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।'

—সাগরিকা : রবীন্দ্রনাথ॥

চপলা—(১) চঞ্চলা। (২) লক্ষ্মী। (৩) বিদ্যুৎ।

জাতি—(১) জন্ম, উৎপত্তি। জাতিতে মুসলমান।

(২) শ্রেণী। পশুজাতি, মানবজাতি।

(৩) গুণ কর্ম বিভাগজাত বর্ণ, জাত। 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত॥

জীর্ণ—(১) জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ।

(২) পরিপক্ব, যাহা হজম হইয়াছে। খাদ্য জীর্ণ না হইলে শরীরের পুষ্টি হয় না।

জাল—(১) পশু-পক্ষী-মৎস্য ধরিবার সূত্রনির্মিত ফাঁদ। জালে অনেক মাছ পড়েছে।

(২) সমূহ। জলজ্জটাজাল।

(৩) লুতাতন্তু। মাকড়সার জাল।

(৪) মিথ্যা, প্রবঞ্চনা। এ উইল জাল।
'আর একটি সে তৈরী ছেলে
জাল করে নোট গেছেন জেলে।'—সুকুমার রায়, আবোল-তাবোল॥

তারক—(১) রক্ষক, ত্রাণকারী।

(২) চক্ষুর তারা।

(৩) নক্ষত্র। 'নীল আকাশে তারক ভাসে যমুনা গাওত গান।'

—রবীন্দ্রনাথ॥

(৪) অসুর-বিশেষ।—'সুরপতি সহ তারক-সূদন যেন শোভিলা আকাশে।'

—মেঘনাদবধ কাব্য॥

'সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে।'—মেঘনাদবধ কাব্য॥

তাল—(১) গানের পরিমাণ—'তাল' ও সুরে লয় না হইলে গান সুমিষ্ট হয় না।

(২) তাল ফল—ভাদ্রমাসে পাকা 'তাল' পাওয়া যায়।

তারা—(১) কালী
(২) চক্ষুর তারকা } 'এমন দিন কি হবে 'তারা' যবে 'তারা' 'তারা' 'তারা' ব'লে, '**তারা**' বয়ে পড়্‌বে ধারা?'

—রামপ্রসাদ॥

শেষের '**তারা**' = চক্ষুর তারকা।

(৩) নক্ষত্র—রাত্রিকালে আকাশে 'তারা' উঠে।

তীর্থ—(১) পুণ্যস্থান—'মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর-সঙ্গমে তীর্থস্নান লাগি।'

(২) অধ্যাপক—আমরা দুজনে সতীর্থ ছিলাম।

দণ্ড—(১) লাঠি—লৌহদণ্ড। (২) কালের বিভাগ—আড়াই দণ্ডে এক ঘণ্টা।

(৩) জরিমানা—দোষীর মাত্র দশ টাকা দণ্ড হইল।

(৪) শাস্তি—দোষ করিয়াও সে দণ্ড পাইল না।

(৫) রাজার মর্যাদাজ্ঞাপক যষ্টি—রাজদণ্ড ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন।

দ্বন্দ্ব—(১) যুগল
(২) কলহ } 'কেবল আমার সঙ্গে 'দ্বন্দ্ব' অহর্নিশ।'—ভারতচন্দ্র॥

(৩) সমাস-বিশেষ।

দ্বিজ—(১) ব্রাহ্মণ—'দ্বিজ রামপ্রসাদের নতি চরণতলে রেখ রে।'

(২) অণ্ডজ প্রাণী—'বধিয়ে অনেক দ্বিজ সঞ্চারিলে পাপবীজ।'

—কবিকঙ্কণ॥

ধর্ম—(১) পারলৌকিক বিশ্বাস ও উপাসনা-পদ্ধতি—'ব্রাহ্মধর্ম', 'হিন্দুধর্ম' ইত্যাদি।

(২) পুণ্য, দানাদি সৎকার্য—অসৎ পাত্রে দান করিলে ধর্মের পরিবর্তে অধর্ম করা হয়। কাহারও ধর্মকার্যে বাধা দিও না। অহিংসা পরম ধর্ম।

(৩) কর্তব্য কর্ম—পতিসেবাই নারীর প্রধান 'ধর্ম'। ক্ষাত্রধর্ম।

(৪) গুণ, স্বভাব বা শক্তি—জলের ধর্ম নিম্নগামিতা ; খলের ধর্ম পরনিন্দা।

পদ—(১) স্থান, কার্য। (২) শ্লোকের চরণ।

পণ—(২) প্রতিজ্ঞা। (২) কুড়ি গণ্ডা।

পক্ষ—(১) পাখীর ডানা—পক্ষিসকল পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িতেছে।

(২) পার্শ্ব—(ক) আমি সর্বদাই ন্যায়ের পক্ষে থাকিব।

(খ) উভয় পক্ষের বক্তব্য না শুনিলে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না।

(৩) প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্যন্ত পঞ্চদশ তিথি-পরিমিত কাল—পনর দিনে এক পক্ষ হয়। কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ।

(৪) এক এক বিবাহের পত্নী—প্রথম পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ।

পত্র—(১) গাছের পাতা—শুষ্ক পত্র জড় করিয়া তিনি শয্যা প্রস্তুত করিলেন।

(২) চিঠি—অনেকদিন যাবৎ তোমার পত্র পাই না।

(৩) পাখীর পালক। পক্ষী শাবকগুলির গায়ে সবেমাত্র নূতন পত্রোদ্গম হইয়াছে।

(৪) বইয়ের পাতা।

(৫) সমূহ, ইত্যাদি।—কাগজপত্র, চিঠিপত্র, জিনিসপত্র, খরচপত্র।

পথ—(১) রাস্তা। (২) উপায়।

পাত্র—(১) আধার—ভোজনপাত্র, পানপাত্র।

(২) মন্ত্রী—রাজা পাত্র-মিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য করিতেন।

'এ বোল শুনিয়া পাত্র হেঁট কৈল মাথা।'—কবিকঙ্কণ॥

(৩) উপযুক্ত ব্যক্তি—ভক্তির পাত্র, স্নেহের পাত্র, করুণার পাত্র।

(৪) নাটকীয় চরিত্র। (৫) বর—পাত্রের বয়স কত ?

প্রকৃতি—(১) চরিত্র, স্বভাব—এরূপ নির্দয়-প্রকৃতির লোক আর দেখি নাই। শিক্ষাদ্বারা জ্ঞানলাভ অল্প সময়েই হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তন সময়-সাপেক্ষ।

(২) যাহা দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে।

(৩) প্রজা—প্রকৃতি-রঞ্জনই রাজার প্রধান ধর্ম।

(৪) যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ; স্বভাব, নিসর্গ—রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতি গভীর ছিল। প্রকৃতির অনুকরণের দ্বারা শিল্প উৎকর্ষ লাভ করে না।

(৫) নারী। (৬) আদ্যাশক্তি।

বর্ণ—(১) অক্ষর—য র ল ব হ এই পাঁচটিকে অন্তঃস্থ বর্ণ কহে।

(২) রং—আকাশ নীল বর্ণ।

(৩) ব্রাহ্মণাদি জাতি—গুণ ও কর্মভেদে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়।

বাস—(১) বস্ত্র—শুচিবাস। (২) গৃহ, আশ্রয়। (৩) গন্ধ—ফুলের সুবাস। (৪) অবস্থান।

'কুসুমের **বাস** ছাড়ি কুসুমের **বাস**
বায়ুভরে এসে করে নাসিকায় **বাস**।'—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত॥

বাম—(১) বাঁ দিক। (২) মহাদেব। (৩) বিরূপ।

'অনেকের পতি তেঁই পতি মোর **বাম**'—অন্নদামঙ্গল॥

[বাম=(১) বিরূপ; (২) মহাদেব—ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার।]

বিধি—(১) ব্রহ্মা
(২) বিধান, নিয়ম } 'কে পারে 'বিধি'র 'বিধি' খণ্ডিতে এ ভবে?'

বেলা—(১) দিবস, দিনমান—বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল। বেলা অবসান-প্রায়।

(২) বিলম্ব—তুমি রোজ বেলা করিয়া ইস্কুলে আস কেন?

(৩) সময়—বেলা কত হ'ল খেয়াল আছে কি?

(৪) পক্ষ—নিজের বেলায় আঁটিসাঁটি।

(৫) সুযোগ—এই বেলা সরে পড়।

ভাব—(১) সদ্ভাব—তাহার সঙ্গে তোমার ভাব কেমন?

(২) তাৎপর্য—ইহার ভাবার্থ কি?

(৩) স্বভাব—আজকাল তাহার ভাব বড় ভাল নয়।

(৪) অভিপ্রায়—তোমার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারি না।

(৫) সৃষ্টি, জগৎ—'খলনাশিনি, গিরিবাসিনি, ভাব-নাশিনি গো !'

—ভারতচন্দ্র ॥

(৬) চিত্তবিকার—উৎকৃষ্ট ভক্তিগ্রন্থ পাঠে মনে এক অনির্বচনীয় উদাত্ত ভাবের উদয় হয়।

ভূত—(১) অতীত—ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান।

(২) দেবযোনি-বিশেষ—ভূতপ্রেত।

ভোগ—(১) সুখদুঃখানুভূতি। (২) অধিকার। (৩) দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট ভোজ্যাদি। (৪) ভোজন।

মন্দ—(১) ধীর—মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে।

(২) হীন—মন্দ ভাগ্য। (৩) অপকৃষ্ট—মন্দ লোক। (৪) কটু—'নিন্দে তোমা হে নরেন্দ্র মন্দ কথা কয়ে।'—রবীন্দ্রনাথ ॥

মালা—(১) মাল্য—রাধারাণী মেলায় মালা বেচিতে গিয়াছিল।

(২) সমূহ—বিবাহবাটী আলোক-মালায় সজ্জিত হইয়াছে।

'সজনী ভাল করি পেখন না ভেলি।

মেঘমালা সঞে তড়িতলতা জনু

হৃদয়ে শেল দেই গেলী ॥'—বিদ্যাপতি ॥

মূল—(১) শিকড়—মূল উৎপাটন করিলে বৃক্ষ মরিয়া যায়।

(২) আসল, প্রধান—মূল কথা এই, বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।

(৩) আদি, গোড়া—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলে কু-সংস্কার ভিন্ন আর কি থাকিতে পারে ?

(৪) আলু, মূলা ইত্যাদি—মুনিগণ ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন।

(৫) প্রথম লিখিত—এখানি প্রতিলিপি মাত্র, মূল দলিল কোথায় ? মূল গ্রন্থ পাঠে যে সুখ হয়, অনুবাদ পাঠে তাহা হয় না।

রাগ—(১) রঞ্জনদ্রব্য। (২) রক্তবর্ণ। (৩) প্রেম। (৪) সঙ্গীত-শাস্ত্রের ছয়রাগ। (৫) ক্রোধ।

লোক—(১) জগৎ। (২) সমূহ। (৩) মনুষ্য। (৪) জন্ম।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি একাধিক অর্থে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :--

অংশু, অথর্ব, উত্তর, কর, কু, কুল, গুণ, গুরু, ঘন, তনু, তারক, দণ্ড, পক্ষ, প্রকৃতি, মন্দ, সুর, কাণ্ড, ভূত, লোক, রাজা, অভ্র, অচল, অম্বর।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে দুইটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর :—

কড়া, কড়ি, কথা, ডাক, দণ্ড, ছাপা, গজ, পাশ, পান, বারণ, বোঝা, হার, পর, কর।

—ক বি. মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৩৭।

বিপরীতার্থক শব্দ

একটি শব্দ কোন শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিলে, শব্দ দুইটিকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে। বিপরীতার্থক শব্দদ্বয় পাশাপাশি বসাইয়া বা সমাসবদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে রচনা সরস হয়, বক্তব্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ভাবপ্রকাশের বিশেষ আনুকূল্য করে বলিয়া বিপরীতার্থক শব্দ শিক্ষার দরকার।

বিপরীতার্থক শব্দগুলি বিবিধ উপায়ে গঠিত হইতে পারে। যেমন—

(১) সম্পূর্ণ পৃথক শব্দের প্রয়োগ করিয়া।

(২) নঞ্ তৎপুরুষ সমাস করিয়া।

[অর্থাৎ শব্দের আদিতে স্বরবর্ণ থাকিলে **অন্** যোগ করিয়া, শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে **অ** যোগ করিয়া !]

(৩) উপসর্গযুক্ত শব্দ বা ধাতুতে বিপরীতার্থক উপসর্গের প্রয়োগ করিয়া।

(৪) উপসর্গ-যোগে।

সম্পূর্ণ পৃথক শব্দদ্বারা বিপরীতার্থক ভাব প্রকাশ

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
আদি	অন্ত	তরল	কঠিন
অন্তঃ	বহিঃ	গুরু	লঘু
অন্তর	বাহির	কুটিল	সরল
আলোক	অন্ধকার	উদয়	অস্ত

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
স্বর্গ	নরক	দাতা	কৃপণ
সৃষ্টি	প্রলয়	জড়	চেতন
তস্কর	সাধু	বন্ধুর	মসৃণ
তাপ	শৈত্য	জাগ্রত	সুপ্ত
শত্রু	মিত্র	আবাহন	বিসর্জন
সূক্ষ্ম	স্থূল	গ্রাম্য	বন্য
গৃহী	সন্ন্যাসী	গ্রহণ	দান
বিনীত	গর্বিত	ঘন	তরল
চঞ্চল	স্থির	বন্য	গ্রাম্য, গৃহপালিত
তরুণ	বৃদ্ধ	বাল্য	বার্ধক্য
তিরস্কার	পুরস্কার	বিরল	ঘন
দক্ষিণ	বাম	বিষ, গরল	অমৃত
দীর্ঘ	হ্রস্ব	ব্যর্থ	সার্থক
দুর্লভ	সুলভ	শীত	গ্রীষ্ম
দুষ্কৃতি	সুকৃতি	শুভ্র	কৃষ্ণ
ধর্মিষ্ঠ	পাপিষ্ঠ	শোক	হর্ষ
নির্দয়	সদয়	শুষ্ক	আর্দ্র
নির্মল	মলিন	সঞ্চয়	ব্যয়
বিধি	নিষেধ	নৈসর্গিক	কৃত্রিম
আকুঞ্চন	প্রসারণ	পরকীয়	স্বকীয়
উত্তম	অধম	পরুষ	কোমল
জীবন	মরণ	প্রবীণ	অর্বাচীন
পণ্ডিত	মূর্খ	প্রশংসা	নিন্দা
স্তুতি	নিন্দা	প্রাচীন	নব্য
সংক্ষেপ	বাহুল্য	মধুর	তিক্ত, কটু
কু	সু	মিত্রতা	শত্রুতা

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
মিলন	বিচ্ছেদ, বিরহ	সন্ধি	বিগ্রহ
মৃদু	তীক্ষ্ণ, তীব্র	সমষ্টি	ব্যষ্টি
রুগ্ন	সুস্থ	জাগরণ	নিদ্রা
সমাপ্ত	আরব্ধ	স্নিগ্ধ	রুক্ষ
উত্তমর্ণ	অধমর্ণ	সমক্ষ	পরোক্ষ
ঐহিক	পারত্রিক	হলাহল	অমৃত
জন্ম	মৃত্যু	হ্রাস	বৃদ্ধি

নঞ্-যোগে বিপরীতার্থক শব্দগঠন

অশন	অনশন	আচার	অনাচার
আদর	অনাদর	আদায়	অনাদায়
আবৃত	অনাবৃত	আস্থা	অনাস্থা
আহার	অনাহার	ইচ্ছা	অনিচ্ছা
কপট	অকপট	কাচা	আকাচা
খাদ্য	অখাদ্য	গণ্য	নগণ্য
চেতন	অচেতন	জ্ঞান	অজ্ঞান
ধর্ম	অধর্ম	নির্দিষ্ট	অনির্দিষ্ট
ন্যায়	অন্যায়	পটু	অপটু
ভয়	অভয়	ভুঁই	বিভুঁই
সৎ	অসৎ	সরকারী	বেসরকারী
সুখ	অসুখ	হাজির	গরহাজির

উপসর্গযুক্ত শব্দ বা ধাতুতে বিপরীতার্থক উপসর্গের প্রয়োগ করিয়া

অনুকূল	প্রতিকূল	আকর্ষণ	বিকর্ষণ
অনুরাগ	বিরাগ	আপদ্	সম্পদ্
আদান	প্রদান	আরোহণ	অবরোহণ
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	উৎকৃষ্ট	অপকৃষ্ট

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
প্রবৃত্তি	নিবৃত্তি	উন্নতি	অবনতি
বিপদ্	সম্পদ্	বিজয়	পরাজয়
সুলভ	দুর্লভ	সহযোগী	প্রতিযোগী
উন্মীলন	নিমীলন	সুশ্রী	বিশ্রী

একটিতে উপসর্গ-যোগে

অর্থী	প্রত্যর্থী	অর্পণ	প্রত্যর্পণ
ক্রয়	বিক্রয়	ক্রিয়া	প্রতিক্রিয়া
ঘাত	প্রতিঘাত	জয়	পরাজয়
জোড়	বিজোড়	ধ্বনি	প্রতিধ্বনি
পক্ষ	বিপক্ষ, প্রতিপক্ষ	প্রাকৃত	অতিপ্রাকৃত
বাদ	প্রতিবাদ	বাদী	বিবাদী
মান	অপমান	যশ	অপযশ
যোগ	বিয়োগ	রাগ	বিরাগ
স্মৃতি	বিস্মৃতি	সদৃশ	বিসদৃশ

বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ

বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগে রচনায় কিরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

(১) 'কি রাজা, কি প্রজা ; কি স্ত্রী, কি পুরুষ ; কি ধনী, কি দরিদ্র ; সকলেরই স্বীয় কর্তব্যসাধনে তৎপর হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।'—অক্ষয়কুমার দত্ত ॥

(২) 'রাজা প্রজা, দাতা গ্রহীতা, অপকারী অপকৃত, নিন্দুক নিন্দিত, পূজ্য পূজক, ভক্ষ্য ভক্ষক—কেহই সেই অতুল স্নেহের সুখশয্যায় বঞ্চিত নহে।' —কালীপ্রসন্ন ঘোষ ॥

(৩) 'ভারতবর্ষে হিন্দু রাজ্যের উত্থান ও পতন, বৌদ্ধ রাজত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং মুসলমান অধিকারের উদয় ও বিলয়ে অনেক বিচিত্র ঘটনা রাশীকৃত হইয়াছে।'—রজনীকান্ত গুপ্ত ॥

(৪) 'ব্রাহ্মণ্যধর্ম যাহা সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম তাহা সম্প্রসারিত ও অসীম করিয়া তুলে। বৈষম্য হিন্দুদিগের মূল মন্ত্র, সাম্য বৌদ্ধদিগের ধর্মবীজ।'—রজনীকান্ত গুপ্ত ॥

(৫) 'সংসার ভালমন্দ মিশ্রিত; সুখ-দুঃখ জড়িত। সেখানে গুণ আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দোষ আছে।'—অক্ষয়চন্দ্র সরকার ॥

(৬) 'এখানে জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্যের সীমাচিহ্ন লুপ্ত হয়ে এসেছে, অদৃষ্টবাদ এবং কর্মকাণ্ড, বৈরাগ্য এবং সংসারযাত্রা একসঙ্গেই ধাবিত হয়েছে। আবশ্যক এবং অনাবশ্যক, ব্রহ্ম এবং মৃৎপুত্তল, ছিন্নমূল শুষ্ক অতীত এবং উদ্ভিন্নকিশলয় জীবন্ত বর্তমান সমান সমাদর লাভ করেছে।' —রবীন্দ্রনাথ ॥

(৭) 'পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে,
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।'—রবীন্দ্রনাথ ॥

(৮) 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।'—রবীন্দ্রনাথ ॥

(৯) 'স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্যে সুপর্ণা, ঝর্ণা!'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥

(১০) 'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর!
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেই সুরাসুর।'

—শেখ ফজলল করিম ॥

(১১) 'আমরা পূর্ব, তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ, তোমরা শেষ। আমাদের দেশ মানবসভ্যতার সূতিকাগৃহ, তোমাদের দেশ মানবসভ্যতার শ্মশান। আমরা ঊষা, তোমরা গোধূলি। আমাদের অন্ধকার হতে উদয়, তোমাদের অন্ধকারে বিলয়।

'আমাদের রং কালো, তোমাদের রং সাদা। আমাদের বসন সাদা, তোমাদের বসন কালো।…তোমরা দৈর্ঘ্য, আমরা প্রস্থ। আমরা নিশ্চল, তোমরা চঞ্চল। আমাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম,…তোমাদের বুদ্ধি স্থূল…।

'তোমরা বিদেশে ছুটে বেড়াও, আমরা ঘরে শুয়ে থাকি। আমাদের সমাজ স্থাবর, তোমাদের সমাজ জঙ্গম। তোমাদের সুখ ছটফটানিতে, আমাদের সুখ

ঝিমুনিতে। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম।'—প্রথম চৌধুরী, বীরবলের হালখাতা॥

প্রবাদ-প্রবচনে বিপরীতার্থক শব্দ—আগা কেটে **গোড়ায়** জল দেওয়া। শালগ্রামের **ওঠা বসা** সবই সমান। **বজ্র** আঁটুনি **ফস্কা** গেরো। **সুস্থ** শরীর **ব্যস্ত**। **ছেলের** মুখে **বুড়োর** কথা। **পাপের** কড়ি **প্রায়শ্চিত্তে** যায়। ক্রোধের সময় **লঘু-গুরু** জ্ঞান থাকে না। **অগ্র-পশ্চাৎ** বিবেচনা করিয়া কাজ করিবে। **আকাশ-পাতাল** ভাব্‌ছ কি? অন্ধের কিবা **রাত্রি**, কিবা **দিন**। সাত **নকলে আসল** খাস্তা। ইত্যাদি॥

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখ:—

(ক) বিস্তৃত, সঙ্কোচ, সমষ্টি, সুকৃতি, স্থির, হর্ষ, সানু, শূন্য, ব্যর্থ।

—ক বি. মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৪৮॥

(খ) রাগ, জয়, আরোহণ, অগ্রজ, প্রসারণ, আবির্ভাব, শিক্ষক, ওস্তাদ, মরণ, হ্রাস, আপদ, তামসিক, ক্ষয়িষ্ণু, তন্বী, সাধু। —ক. বি মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৪৯॥

২। একই বাক্যের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি শব্দ এবং উহার বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার কর:—

বিষ, ভূত, স্বর্গ, হ্রাস, আরম্ভ, হাসি, বিক্ষিপ্ত, শিক্ষক, সাত্ত্বিক।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীত অর্থবোধক শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা কর:—

হর্ষ, বিরত, বর্ধমান, ঐহিক, সন্ধি, সমষ্টি, শ্রম, প্রফুল্ল, বিস্তৃত, সঙ্কোচ, সুকৃতি, স্থাবর, স্থির, শূন্য, ব্যর্থ, উপকার, আসল, সৃষ্টি, নীরস, চঞ্চল, সাকার, মান, মধুর, বাহির, ইতর, শোক, গুপ্ত, কুটিল, গৌণ, গরল। —ক. বি. মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৪৪ ও ১৯৪৭॥

শব্দ গঠন ঃ কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়

কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ

ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কতকগুলি প্রত্যয় যোগ করিয়া নূতন শব্দ হয়। এই সকল প্রত্যয়কে **কৃৎ প্রত্যয়** বলে। কৃৎ প্রত্যয়-যোগে যে-সকল শব্দ গঠিত হয়, তাহাদিগকে **কৃদন্ত পদ** বলে। কৃৎ প্রত্যয় দুই প্রকার—**সংস্কৃত** ও **বাংলা**।

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

অ (অল্)—হন্ + অল্ = বধ, স্তু + অল্ = স্তব, হৃষ্ + অল্ = হর্ষ। এইরূপ—ভয়, ক্ষোভ, স্পর্শ, ক্রোধ, রোষ, জয়, ক্রয় ইত্যাদি।

অ (ঘঞ্)—ত্যজ্ + ঘঞ্ = ত্যাগ, পচ্ + ঘঞ = পাক, বস্ + ঘঞ্ = বাস। এইরূপ—পাত, ভঙ্গ, শোক।

অ (খল্)—দুর্-গম্ + খল্ = দুর্গম। এইরূপ—সুগম, দুষ্কর।

অ (টক্)—তদ্-দৃশ্ + টক্ = তাদৃশ, সমান-দৃশ্ + ঘঞ্ = সদৃশ। এইরূপ—যাদৃশ, এতাদৃশ।

ক্বিপ্—শাস্ত্র + বিদ্ + ক্বিপ্ = শাস্ত্রবিৎ। এইরূপ—পরিষৎ, সভাসদ্ ইত্যাদি।

ত (ক্ত)—হইয়াছে এই অর্থে কর্মবাচ্যে **প্রযুক্ত ঃ** কৃ + ক্ত = কৃত, ভক্ষ্ + ক্ত = ভক্ষিত। এইরূপ—মুক্ত, জ্ঞাত, খ্যাত, প্রীত, লিপ্ত, তপ্ত ইত্যাদি। এই 'ত' প্রত্যয় ধাতুস্থ ব্যঞ্জনের সহিত মিলিত হইয়া 'ট', 'ধ', 'ঢ' (ঢ়) হইয়া যায়। যেমন—সৃজ্ + ক্ত = সৃষ্ট, লভ্ + ক্ত = লব্ধ। এইরূপ—পৃষ্ঠ, কৃষ্ট, স্নিগ্ধ, বুদ্ধ, রূঢ়।

ভাববাচ্যে—ভিদ্ + ক্ত = ভিন্ন, পচ্ + ক্ত = পক্ব। এইরূপ—হীন, লীন, শীর্ণ ইত্যাদি। গম্ + ক্ত = গত, নম্ + ক্ত = নত, দন্শ্ + ক্ত = দষ্ট, রন্জ + ক্ত = রক্ত।

ইত—পঠ + ইত = পঠিত। এইরূপ—পতিত, চলিত, গ্রথিত।

তব্য, অনীয়—দা + তব্য = দাতব্য, পূজ + তব্য = পূজিতব্য, ভূ + তব্য = ভবিতব্য। এইরূপ—বক্তব্য, গন্তব্য, দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, কর্তব্য, জ্ঞাতব্য। স্মৃ + অনীয় = স্মরণীয়, দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয়। এইরূপ—পঠনীয়, পূজনীয়।

য—কর্ম ও ভাববাচ্যে—লভ্ + য = লভ্য, রম্ + য = রম্য। যোগ্যতা বা ঔচিত্য অর্থে—দা + য = দেয়, বি-ধা + য = বিধেয়। এইরূপ—সহ্য, ধ্যেয়।

অক (ণক)—পঠ্ + ণক = পাঠক, গৈ + ণক = গায়ক, কৃষ্ + ণক = কৃষক, নিন্দ্ + ণক = নিন্দক। এইরূপ—দর্শক, ঘাতক, জনক, চালক ; পরি-ব্রজ্ + ণক = পরিব্রাজক।

অন (ল্যু)—কর্তৃবাচ্যে—নন্দ্ + অন = নন্দন, সাধ + অন = সাধন, বৃধ্ + অন = বর্ধন, ভীষ্ + অন = ভীষণ। এইরূপ—নাশন, সহন, দমন, তপন।

অন (ল্যুট্—অনট্)—ভাববাচ্যে—গম্ + অনট্ = গমন, ভ্রম্ + অনট্ = ভ্রমণ, সেচ্ + অনট্ = সেচন। এইরূপ—শয়ন, দান, মান, স্নান, জ্ঞান, করণ, ক্রন্দন, গান ইত্যাদি।

অন (যুচ্)—ভাববাচ্যে—স্ত্রীলিঙ্গে আ-যোগে—মন্ত্র্ + অন + আ = মন্ত্রণা। এইরূপ—যন্ত্রণা, কল্পনা, গণনা, বন্দনা, বাসনা, ধারণা, অর্চনা, সাধনা, বেদনা, উপাসনা।

আলু (আলুচ্)—কর্তৃবাচ্যে শীলার্থে—দয়ালু, ভয়ালু, তন্দ্রালু।

ইত্র—করণবাচ্যে খন্ + ইত্র = খনিত্র। এইরূপ—বহিত্র (নৌকা), বাদিত্র, পবিত্র।

ইন্ (ণিন্)—কর্তৃবাচ্যে—পুংলিঙ্গে একবচন 'ঈ', স্ত্রীলিঙ্গে 'ইনী' রূপ গ্রহণ করে। যথা—মন্ত্র্ + ইন্ = মন্ত্রিন্ = মন্ত্রী, দা + ইন্ = দায়ী, অনু-গম্ + ইন্ = অনুগামী (পুং), স্ত্রীং—অনুগামিনী। এইরূপ—অধিকারী, সংসারী, ব্যভিচারী, সত্যবাদী, স্তন্যপায়ী, ভাবী, মদ্যপায়ী, মিথ্যাবাদী, ত্যাগী, অনুরাগী ইত্যাদি।

ইষ্ণু—সহ্ + ইষ্ণু = সহিষ্ণু। এইরূপ—বর্ধিষ্ণু, ক্ষয়িষ্ণু।

উ—সনন্ত পা + উ = পিপাসু। এইরূপ—জিজ্ঞাসু, চিকীর্ষু।

উক (উকঞ্)—কর্তৃবাচ্যে শীলার্থে—কাম্ + উক = কামুক ; এইরূপ—ভাবুক, ঘাতুক।

তা (তৃচ্, তৃন্)—কর্তৃবাচ্যে—পা + তৃচ্ = পিতা ; এইরূপ—মাতা, দুহিতা, ভ্রাতা। দা + তৃন্ = দাতা (দাতৃ শব্দ)। এইরূপ—কর্তা, ধাতা, গ্রহীতা, হোতা, যোদ্ধা, নিয়ন্তা, নেতা।

তি (ক্তিন্)—ভাববাচ্যে—মুচ্ + ক্তি = মুক্তি, মন্ + ক্তি = মতি, গম্ + ক্তি = গতি, কৃষ্ + ক্তি = কৃষ্টি। এইরূপ—ক্লান্তি, ঋদ্ধি. সমৃদ্ধি, সৃষ্টি, তুষ্টি, গীতি, স্থিতি।

ন—যত্ + ন = যত্ন, যজ্ + ন = যজ্ঞ। এইরূপ— প্রশ্ন, স্বপ্ন, রত্ন।

মান (শানচ্)—বিদ্ + মান = বিদ্যমান। এইরূপ—ম্রিয়মাণ, প্রবহমান, দৃশ্যমান ইত্যাদি।

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

অ—ছাড়্ + অ = ছাড়, মার্ + অ = মার, হার্ + অ = হার, কাঁদ্ + অ = কাঁদ—কাঁদ-কাঁদ (মুখ), পড়্ + অ = পড়—পড়-পড় (ঘর) ইত্যাদি।

অন—নাচ্ + অন = নাচন, ঝাড়্ + অন = ঝাড়ন, ঢাক্ + অন = ঢাকন। এইরূপ—কাঁদন, ফোড়ন, ঝুলন, দেখন, বাঁধন, খাওন, গড়ন, চলন, মিলন ইত্যাদি।

অন , না— কাঁদ্ + না = কান্না, ঝর্ + না = ঝরনা, কুট্ + না = কুট্‌না, বাজ্ + না = বাজ্‌না, রাঁধ্ + না = রান্না ইত্যাদি।

অনী, নী, উনি, নি—নাচ্ + অনী = নাচনী, ছাঁক + নী = ছাঁকনী, কুর্ + অনী = কুরনী—কুরুনী, ছা + উনী = ছাউনী। এইরূপ—আঁটুনী, চালুনী, কাঁপুনি, কাঁদুনী, জ্বলুনি ইত্যাদি।

অন্ত—ফল্ + অন্ত = ফলন্ত, জী + অন্ত = জীয়ন্ত। এইরূপ—বাড়ন্ত, জাগন্ত, ঘুমন্ত।

আ—ভাব ও কর্মবাচ্যে ধাতুর উত্তর 'আ' হয়। যথা—রাঁধ্ + আ = রাঁধা (ভাত-রাঁধা হাঁড়ী), কাট্ + আ = কাটা (কলম কাটা), রাখ্ + আ = রাখা (কথা রাখা), চল্ + আ = চলা (পায়ে-চলা পথ), গাঁথ্ + আ = গাঁথা, কাচ্ + আ কাচা (কাপড় কাচা)।

আনি, আনী—শুন্ + আনি = শুনানি, পার্ + আনি = পারানি, জ্বাল্ + আনি = জ্বালানি, ঝলক্ + আনি = ঝলকানি। এইরূপ—রাঙানি (চোখ রাঙানি), ঝাঁকানি, নিড়ানী, উড়ানী ইত্যাদি।

আন, আনো—চালা + আন = চালান, মানা + আন = মানান, উড়া + আন = উড়ান। এইরূপ—গড়ান, জ্বালান, কামড়ানো, খিঁচানো, বাঁধানো ইত্যাদি।

আই—খোদ্+আই=খোদাই, ঢাল্+আই=ঢালাই, বাঁধ্+আই=বাঁধাই। এইরূপ—চড়াই, উতরাই, লড়াই, ঝাড়াই, যাচাই ইত্যাদি।

আও—ঘের্+আও=ঘেরাও, পাকড়্+আও=পাকড়াও, চড়্+আও=চড়াও। এইরূপ—ফলাও, লাগাও ইত্যাদি।

আইত, আত—ডাক্+আইত (আত)=ডাকাইত, ডাকাত।

আরী, উরী—ডুব্+আরী (উরী)=ডুবারী, ডুবুরী; ধুন্+আরী (উরী) =ধুনারী, ধুনুরী।

ই—ভাব ও বস্তুবাচক বিশেষ্যে—ঝাঁপ্+ই=ঝাঁপি, ফাঁস্+ই=ফাঁসি, হার্ +ই=হারি, ঝার্+ই=ঝারি ইত্যাদি।

ক্রিয়ার **ব্যতিহার** বুঝাইতে—কাড়াকাড়ি, দেখাদেখি, ধরাধরি, ছড়াছড়ি, হাসাহাসি।

ইত—পাল্+ইত=পালিত। এইরূপ—জানিত, এলায়িত ইত্যাদি।

অতি, তি—ভর্+তি=ভরতি, ঘাট্+তি=ঘাটতি। এইরূপ—বাড়তি, কমতি।

ইয়ে—'পটু' অর্থে। খেল্+ইয়ে=খেলিয়ে, কর্+ইয়ে=করিয়ে। এইরূপ—বলিয়ে, কইয়ে, গাইয়ে, নাচিয়ে, বাজিয়ে ইত্যাদি।

উ—'উপক্রম' অর্থে। নিব্+উ=নিবু নিবু, ডুব্+উ=ডুবুডুবু।

উনে—কাঁদ্+উনে=কাঁদুনে (ছেলে), বক্+উনে=বকুনে (লোক), নাচ্ +উনে=নাচুনে (মেয়ে)।

উয়া, ও—পড়্+উয়া=পড়ুয়া। এইরূপ—পড়ো (ছাত্র) প'ড়ো (বাড়ী), উড়ো (চিঠি)।

ক, অক—মুড়্+ক=মোড়ক, চড়্+অক=চড়ক। এইরূপ—মড়ক, আটক, বৈঠক, চমক, ধমক ইত্যাদি।

ইয়া, এ—খা+ইয়া=খাইয়া—খেয়ে। এইরূপ—বলিয়া—ব'লে, ধুইয়া—ধুয়ে, সারিয়া—সেরে ইত্যাদি।

তি—চল্+তি=চল্‌তি। এইরূপ—চুক্‌তি, ঘাট্‌তি, গুণ্‌তি ইত্যাদি।

ও—'উপক্রম' অর্থে। কাঁদ্+ও=কাঁদো কাঁদো (মুখ)। এইরূপ—পড়ো পড়ো (বাড়ী), মরো মরো (ছেলে)।

তদ্ধিত প্রত্যয়

শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কতকগুলি প্রত্যয়-যোগে নূতন শব্দ গঠিত হয়। এই সকল প্রত্যয়কে **তদ্ধিত প্রত্যয়** বলে। তদ্ধিত প্রত্যয়-যোগে যে-সকল শব্দ গঠিত হয়, তাহাদিগেকে **তদ্ধিতান্ত শব্দ** বলে। কৃৎ প্রত্যয়ের ন্যায় তদ্ধিত প্রত্যয়ও দুই প্রকারের—**সংস্কৃত** ও **বাংলা তদ্ধিত**। বাংলা তদ্ধিত আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) **খাঁটি বাংলা তদ্ধিত** এবং (২) **বিদেশী তদ্ধিত**।

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

অ (ষ্ণ)—অপত্যার্থে শব্দের উত্তর ষ্ণ প্রত্যয় হয়। যথা—পুত্র+ষ্ণ=পৌত্র, রঘু+ষ্ণ=রাঘব, মনু+ষ্ণ=মানব, পাণ্ডু+ষ্ণ=পাণ্ডব, কুরু+ষ্ণ=কৌরব, দুহিতৃ+ষ্ণ=দৌহিত্র।

আয়ন (ষ্ণায়ন)—ভাব, সম্বন্ধীয় বা ভক্ত অর্থে। দক্ষ+ষ্ণায়ন (আয়ন)=দাক্ষায়ণ, নর+ষ্ণায়ন=নারায়ণ, কাত্য+ষ্ণায়ন=কাত্যায়ন, রাম+ষ্ণায়ন=রামায়ণ, দ্বীপ+ষ্ণায়ন=দ্বৈপায়ন।

ই (ষ্ণি)—অপত্যার্থে—সুমিত্রা+ষ্ণি=সৌমিত্রি, দশরথ+ষ্ণি=দাশরথি, রাবণ+ষ্ণি=রাবণি।

এয় (ষ্ণেয়)—অপত্যার্থে—কুন্তী+ষ্ণেয়=কৌন্তেয়, ভগিনী+ষ্ণেয়=ভাগিনেয়, বিমাতৃ+ষ্ণেয়=বৈমাত্রেয়, বিনতা+ষ্ণেয়=বৈনতেয়, গঙ্গা+ষ্ণেয়=গাঙ্গেয়, নিকষা+ষ্ণেয়=নৈকষেয়।

য (ষ্ণ্য)—অপত্যার্থে—দিতি+ষ্ণ্য=দৈত্য, অদিতি+ষ্ণ্য=আদিত্য, চণক+ষ্ণ্য=চাণক্য।

বিকার, ভাব, স্বার্থ, সম্বন্ধ, ভক্ত, উপাসক প্রভৃতি অর্থে অপত্যার্থক প্রত্যয়—

অ (ষ্ণ)—ভাব অর্থে—শিশু+ষ্ণ=শৈশব (শিশুর ভাব), বন্ধু+ষ্ণ=বান্ধব, কুশল+ষ্ণ=কৌশল, মুনি+ষ্ণ=মৌন, লঘু+ষ্ণ=লাঘব, সুরভি+ষ্ণ=সৌরভ, সুভ্রাতা+ষ্ণ=সৌভ্রাত্র। তিল+ষ্ণ (**বিকার অর্থে**)=তৈল। **সম্বন্ধ অর্থে**—মনস্+ষ্ণ=মানস, পৃথিবী+ষ্ণ=পার্থিব, শরীর+ষ্ণ=শারীর। **ভক্ত**

অর্থে—স্ত্রী + ষ্ণ = স্ত্রৈণ, শিব + ষ্ণ = শৈব, বিষ্ণু + ষ্ণ = বৈষ্ণব, শক্তি + ষ্ণ = শাক্ত। **স্বার্থে**—চোর + ষ্ণ = চৌর, কুতূহল + ষ্ণ = কৌতূহল, রক্ষঃ + ষ্ণ = রাক্ষস। **জানে যে** এই অর্থে—স্মৃতি + ষ্ণ = স্মার্ত ; ব্যাকরণ + ষ্ণ = বৈয়াকরণ।

য (ষ্ণ্য)—সুজন + ষ্ণ্য = সৌজন্য (সুজনের ভাব)। এইরূপ—ত্রিলোক—ত্রৈলোক্য, গণপতি—গাণপত্য, প্রাচী—প্রাচ্য, সম্রাজ্ (সম্রাট্)—সাম্রাজ্য, প্রমাণ—প্রামাণ্য, সম – সাম্য, সুহৃদ—সৌহার্দ্য, ভাস্কর—ভাস্কর্য, চোর—চৌর্য, কবি-কাব্য, সহিত—সাহিত্য, বণিজ্—বাণিজ্য।

ইক (ষ্ণিক)—জানে বা অধ্যয়ন করে যে, এই অর্থে—ন্যায় + ষ্ণিক = নৈয়ায়িক (ন্যায় জানে যে), সাহিত্য + ষ্ণিক = সাহিত্যিক। এইরূপ—ইতিহাস—ঐতিহাসিক, ভূগোল—ভৌগোলিক।

উৎপন্ন অর্থে—বসন্ত + ষ্ণিক = বাসন্তিক, সমুদ্র + ষ্ণিক = সামুদ্রিক। এইরূপ—ইহ—ঐহিক, অকস্মাৎ—আকস্মিক, অধ্যাত্ম—আধ্যাত্মিক, গিরি—গৈরিক।

মাসে দেয় বা সম্পন্ন অর্থে—মাস + ষ্ণিক = মাসিক। এইরূপ—বর্ষ—বার্ষিক, দিন—দৈনিক।

ব্যবসায় বা জীবিকা অর্থে—তেল + ষ্ণিক – তৈলিক (তৈলের ব্যবসা যে করে)। এইরূপ—তাম্বূল + ষ্ণিক = তাম্বূলিক, নৌ + ষ্ণিক = নাবিক।

এয় (ষ্ণেয়)—অতিথি + ষ্ণেয় = আতিথেয় (অতিথি-ভক্ত), পুরুষ + ষ্ণেয় = পৌরুষেয়।

ঈয় (ণীয়)—ভাব বা সম্বন্ধীয় অর্থে প্রযুক্ত। জল + ঈয় = জলীয়, স্বর্গ + ঈয় = স্বর্গীয়, স্ব + ঈয় = স্বীয়, স্বকীয়, রাষ্ট্র + ঈয় = রাষ্ট্রীয়, শাস্ত্র + ঈয় = শাস্ত্রীয়, রাজন্ + ঈয় = রাজকীয়, শরৎ + ঈয় = শারদীয়।

ইন্, বিন্—আছে এই অর্থে—জ্ঞান + ইন্ = জ্ঞানী (জ্ঞানিন্ শব্দ, প্রথমার একবচন), মান + ইন্ = মানী, পুষ্কর + ইন্ = পুষ্করিণী, কল্লোল + ইন্ = কল্লোলিনী, হস্ত + ইন্ = হস্তী, শিখা + ইন্ = শিখী, মায়া + বিন্ = মায়াবী, যশস্ + বিন্ = যশস্বী।

মতু, বতু—অস্ত্যর্থে এই দুই প্রত্যয় হয়—শ্রী + মতু (মান্) = শ্রীমান্, ধী + মতু (মান্) = ধীমান্, বুদ্ধি + মতু (মান্) = বুদ্ধিমান, জ্ঞান + বতু (বান্) = জ্ঞানবান, বিদ্যা + বতু (বান্) = বিদ্বান্, তেজস্ + বতু (বান্) = তেজস্বান।

আল, ইল, ল—আছে অর্থে—রস+আল=রসাল (যাহাতে রস আছে), ধার+আল=ধারাল, বাচ+আল=বাচাল। **ইল**—ফেনা+ইল=ফেনিল, পঙ্ক+ইল=পঙ্কিল, জটা+ইল=জটিল। **ল**—মাংস+ল=মাংসল, শ্রী+ল=শ্রীল, শ্যাম+ল=শ্যামল, শীত+ল=শীতল, মঞ্জু+ল=মঞ্জুল, পিঙ্গ+ল=পিঙ্গল, চটু+ল=চটুল।

শ—আছে অর্থে—রোম+শ=রোমশ, লোম+শ=লোমশ, কর্ক (কণ্টক) +শ=কর্কশ।

র—আছে অর্থে—মধু+র=মধুর, নখ+র=নখর, পাণ্ডু+র=পাণ্ডুর, মুখ+র=মুখর, নগ+র=নগর।

ত্ব, তা—ভাব বা গুণ বুঝাইতে—মহৎ+ত্ব=মহত্ত্ব (মহতের ভাব), পশু +ত্ব=পশুত্ব, সতী+ত্ব=সতীত্ব, নারী+ত্ব=নারীত্ব। **তা**—সাধু+তা=সাধুতা, সরল+তা=সরলতা। এইরূপ—উদার—উদারতা, মূর্খ—মূর্খতা, মৌলিক—মৌলিকতা।

ইমন্—ভাবার্থে বিশেষণ শব্দের উত্তর—লঘু+ইমন্ (ইমা)=লঘিমা, মহৎ+ইমন্ (ইমা)=মহিমা। এইরূপ—নীল—নীলিমা, রক্ত—রক্তিমা, গুরু—গরিমা।

তর, তম—দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে **তর** এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে **তম** প্রত্যয় হয়। লঘু+তর=লঘুতর, লঘু+তম=লঘুতম। এইরূপ—শুভ্র—শুভ্রতর, শুভ্রতম; প্রিয়—প্রিয়তর, প্রিয়তম; নিকৃষ্ট—নিকৃষ্টতর, নিকৃষ্টতম।

ঈয়সু, ইষ্ঠ—দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'ঈয়সু' এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় হয়। গুরু+ঈয়সু (ইয়ান)=গরীয়ান, গুরু+ইষ্ঠ=গরিষ্ঠ; লঘু+ঈয়সু=লঘীয়ান, লঘু+ইষ্ঠ=লঘিষ্ঠ; প্রশস্য+ঈয়সু=শ্রেয়ান, প্রশস্য+ইষ্ঠ=শ্রেষ্ঠ; বৃদ্ধ+ঈয়সু=বর্ষীয়ান বা জ্যায়ান, বৃদ্ধ+ইষ্ঠ=বর্ষিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ; বহু+ঈয়সু=ভূয়ান, বহু+ইষ্ঠ=ভূয়িষ্ঠ।

ইত—জাত অর্থে—ফল+ইত=ফলিত, পুষ্প+ইত=পুষ্পিত, কুসুম+ইত=কুসুমিত, আমোদ+ইত=আমোদিত, লজ্জা+ইত=লজ্জিত।

তন, ম, ত্য—সম্বন্ধার্থে—পুরা+তন=পুরাতন, পূর্ব+তন=পূর্বতন, সদা +তন=সনাতন, চিরম্+তন=চিরন্তন। আদি+ম=আদিম, অন্ত+ম= অন্তিম, মধ্য+ম=মধ্যম, অগ্র+ম=অগ্রিম। পশ্চাৎ+ত্য=পাশ্চাত্ত্য, দক্ষিণ +ত্য=দাক্ষিণাত্য।

কল্প—'প্রায়' এই অর্থে—মৃত+কল্প=মৃতকল্প (প্রায় মৃত), ঋষি+কল্প= ঋষিকল্প।

স্থানীয়—'তাহার তুল্য' এই অর্থে—পিতৃ+স্থানীয়=পিতৃস্থানীয় (পিতার তুল্য)। এইরূপ—বন্ধু—বন্ধুস্থানীয়, মাতৃ—মাতৃস্থানীয়।

শালিন্—অস্ত্যর্থে—গুণ+শালিন্=গুণশালী। এইরূপ—ধন—ধনশালী, শক্তি—শক্তিশালী।

আমহ (ডামহ)—পিতা অর্থে—পিতৃ+ডামহ=পিতামহ (পিতার পিতা), মাতৃ+ডামহ=মাতামহ।

মিন্—স্ব+মিন্=স্বামী, বাক্+মিন্=বাগ্মী।

শস্—প্রায়+শস্=প্রায়শঃ, ক্রম+শস্=ক্রমশঃ।

সাৎ (চসাৎ)—অগ্নি+সাৎ=অগ্নিসাৎ, ভূমি+সাৎ=ভূমিসাৎ, ধূলি+ সাৎ=ধূলিসাৎ।

চঞ্চু—দক্ষ অর্থে—বিদ্যা+চঞ্চু=বিদ্যাচঞ্চু, তর্ক+চঞ্চু=তর্কচঞ্চু।

মাত্র—পরিমাণ অর্থে—কিঞ্চিৎ+মাত্র=কিঞ্চিন্মাত্র, তৎ+মাত্র=তন্মাত্র।

ময়—বিকার প্রভৃতি অর্থে—মৃৎ+ময়=মৃন্ময়, হেম+ময়=হেমময়, বাক্ +ময়=বাঙ্ময়, চিৎ+ময়=চিন্ময়।

ত্র—অধিকরণে—সর্ব+ত্র=সর্বত্র, য (যদ্)+ত্র=যত্র। এইরূপ—তত্র, একত্র।

তস্—বস্তু+তস্=বস্তুতঃ, স্বভাব+তস্=স্বভাবতঃ, ফল+তস্=ফলতঃ।

আকিন্—এক+আকিন=একাকী।

ধা (ধাচ্), থা (থাচ্)—প্রকার অর্থে—দ্বি+ধা=দ্বিধা, বহু+ধা= বহুধা, শত+ধা=শতধা। সর্ব+থা=সর্বথা, অন্য+থা=অন্যথা, যদ্+থা=যথা, তদ্+থা=তথা।

দা—অধিকরণ অর্থে—এক+দা=একদা, সর্ব+দা=সর্বদা।

উল (ডুলচ্)—ভ্রাতা অর্থে—মাতৃ+ডুলচ্=মাতুল।

ব্য—ভ্রাতা অর্থে—পিতৃ+ব্য=পিতৃব্য (পিতার ভ্রাতা)।

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

আ—বিভিন্ন অর্থে শব্দের উত্তর আ প্রত্যয়—

নিন্দায় বা অনাদরে-গোপাল+আ=গোপলা। এইরূপ—মাখনা, কেষ্টা, বামনা।

সদৃশ অর্থে—বাঘ+আ=বাঘা (বাঘের সদৃশ—বাঘা তেঁতুল), হাত+আ =হাতা, কদম+আ=কদমা, চাঁদ+আ=চাঁদা।

উৎপন্ন বা আগত অর্থে—পশ্চিম+আ=পশ্চিমা। এইরূপ—দক্ষিণা বা দখিনা (বাতাস); মহিষ>ভয়ষ+আ=ভয়ষা (ঘি), চীন+আ=চীনা।

সম্বন্ধ অর্থে—ভাত+আ=ভাতা।

আছে অর্থে—তেল+আ=তেলা (মাথা), চাল+আ=চালা (চালাঘর), রোগ+আ=রোগা, চাষ+আ=চাষা, জল আছে যেখানে—জল+আ=জলা (জলাভূমি), লোনা (জল)।

আই—আদর অর্থে—কানাই, বলাই, জগাই, মাধাই, নিমাই। ভাবার্থে—বামন+আই=বামনাই, মিঠা+আই=মিঠাই, পালট+আই=পালটাই, বড়+আই=বড়াই, পুষ্টি+আই=পোষ্টাই। বিশেষণ অর্থে বা উৎপন্ন অর্থে—ঢাকা+আই=ঢাকাই! এইরূপ—পাটনাই, খাগড়াই, চোরাই, মোগলাই। পতি অর্থে—ননদ+আই=নন্দাই, বোনাই।

আম, আমি, (ম, মি)—ভাবার্থে—পাকা+আম=পাকাম, পাকামি; ঠক+আম=ঠকাম, ঠকামি; জেঠা+আম=জেঠাম, জেঠামি; নেকা+আম= নেকাম, নেকামি; ভদ্র+আমি=ভদ্রামি; বাঁদর+আমি=বাঁদরামি; গোঁয়ার+আমি (উমি)=গোঁয়ার্তুমি।

আর, আরী, আরি—সদৃশ অর্থে—মাঝ+আর=মাঝার, মাঝ+আরী (আরি)=মাঝারী, মাঝারি। এইরূপ—ঝিয়ারী।

আরু—নিপুণতা, স্বভাব, আকৃতি প্রভৃতি অর্থে—দিশারু (দিক্ নির্ণয়কারী), বোমারু (বোমা নিক্ষেপকারী) ইত্যাদি।

আল—অস্ত্যর্থে, সম্বন্ধ, দেশ বা ব্যবসায় বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়—

ধার + আল = ধারাল, দুধ + আল = দুধাল, তেজ + আল = তেজাল। এইরূপ—পেঁচাল, বাচাল, দাঁতাল, শাঁসাল, জাঁকাল, জমকাল, ঝাঁঝাল, মাতাল, মাথাল, আড়াল, পাকাল। ঘোষ + আল = ঘোষাল (ঘোষনামক গ্রামে বাড়ী যাহার), কাঞ্জিল + আল = কাঞ্জিলাল (কাঞ্জিল গ্রামে বাড়ী যাহার), কাশীয়াল (কেশেল—কাশীবাসী ব্রাহ্মণ), গয়াল (গয়ালী—গয়াবাসী ব্রাহ্মণ), রাখ + আল = রাখাল (গরু রাখা বৃত্তি যাহার)।

আলী, উলি—ভাব বা স্বভাব অর্থে—চতুর + আলী = চতুরালী। এইরূপ—ঠাকুরালী, নাগরালী, সোনালী, রূপালী, ঘটকালী, মেয়েলী।

ই, ঈ—অস্ত্যর্থে—রাগ + ঈ = রাগী। এইরূপ—দামী, ভারী, ঢাকী, দাগী, তেজী, দরদী।

আগত বা উৎপন্ন অর্থে—বৃন্দাবন + ঈ = বৃন্দাবনী। এইরূপ—গুজরাটী, তিব্বতী, জাপানী, কাশ্মীরী, বেনারসী, ভাগলপুরী, বিষ্ণুপুরী (তামাক বা শাড়ী), দেশী, বিলাতী, শান্তিপুরী, পাটনাই, ঢাকাই।

ব্যবসায় বা বৃত্তি অর্থে—তেল + ঈ = তেলী; এইরূপ—দালালি, মাস্টারি, ডাক্তারি, মোক্তারী। ভাবার্থে—বাহাদুর + ঈ = বাহাদুরী; এইরূপ—আমীরী, বড়মানুষী, হুঁশিয়ারী, ছেলেমানুষি, বদমাইশি, চালাকি। ক্ষুদ্রার্থে—কলস—কলসি (ক্ষুদ্র কলস), কাঠ—কাঠি (ছোট কাঠ), পোঁটলা—পুঁটুলি, কোশা—কুশি, দড়া—দড়ি, খোন্তা—খুন্তি ইত্যাদি।

প্রস্তুত অর্থে—পশম + ঈ = পশমী। এইরূপ—রেশমী।

গুণবাচক বিশেষণ—হিসাব + ঈ = হিসাবী; এইরূপ—বাদামী, বেগুনী, খয়েরী।

তারিখবাচক শব্দে—সংখ্যার পূরণার্থে—পাঁচ + ই = পাঁচই; এইরূপ—সাতই, আটই, আঠারই।

ইয়', এ—আগত বা উৎপন্ন অর্থে—পাহাড় + ইয়া (এ) = পাহাড়িয়া (পাহাড়ে), পাড়াগাঁ + ইয়া (এ) = পাড়াগাঁইয়া (পাড়াগেঁয়ে); এইরূপ—চীনে (বাদাম), শান্তিপুরে (ধুতি), ঘাটালে (নৌকা), উত্তুরে (হাওয়া), ভাদুরে।

উপজীবিকা অর্থে—কুঠার+ইয়া=কাঠুরিয়া, কাঠুরে। এইরূপ—জালিয়া, জেলে ; মুটিয়া, মুটে।

মত এই অর্থে—সিঁদুর+এ=সিঁদুরে।

উপকরণবাচক বিশেষণ—মাটি+ইয়া=মাটিয়া, মেটে ; এইরূপ—বেলে, পাথুরে।

'আছে যাহার' এই অর্থে—অহংকার আছে যাহার—অহংকার+এ= অহংকেরে ; এইরূপ—দেমাকে, ফলারে, বে-আক্কেলে, বাহাত্তুরে, বেলে (মাটি), কাঁকুরে (জমি)।

তারিখবাচক শব্দে—বিশে, পঁচিশে, ছাব্বিশে, সাতাশে।

অনাদরে - কালি—কেলে ; এইরূপ—ভীমে, বিশে।

সাদৃশ্য অর্থে—নারকুলে (কুল), জিভে (গজা)।

অভ্যস্ত অর্থে—খোশামোদ+এ=খোশামুদে। এইরূপ—আমুদে।

বিশেষণবাচক অনুকার শব্দে—কন্‌কনে (ঠাণ্ডা), মিট্‌মিটে (শয়তান), টক্‌টকে, ঝক্‌ঝকে।

উ—আদরে—রাম+উ=রামু ; এইরূপ—কানু, রাধু, পাঁচু, রাণু, দুষ্টু।

বিশেষণ অর্থে—নীচু, উঁচু, আগু, পাছু, ঢালু, চালু, ভীতু।

উয়া>ও—সম্বন্ধার্থে—ধান+উয়া=ধানুয়া>ধেনো। এইরূপ - মেঠো, জ'লো, টুলো (পণ্ডিত), টেকো, ঝ'ড়ো (হাওয়া)।

অনাদরে—যাদু—যেদো ; এইরূপ—মধু—মধো, পঞ্চ—পেঁচো, রাধা—রেধো।

আছে এই অর্থে—গোঁফ+ও=গুঁফো ; এইরূপ—ঘেসো (মাঠ), দেঁতো, ভূতো (বাড়ী), কুঁজো, বেতো।

গোছ—সদৃশার্থে—লম্বা+গোছ=লম্বাগোছ; এইরূপ—মাঝারিগোছ, ভদ্রগোছ ইত্যাদি।

ট, টা, টি, টী—সাদৃশ্য, সম্বন্ধ, বৃত্তি প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়—

সাপ+ট=সাপট ; এইরূপ—দাপট, ধোঁয়াট, ভরাট, জমাট, গুমট ; **টা**—চিম+টা=চিমটা ; এইরূপ—ঘেমটা, ঝাপটা, নেঙটা। **টি-টী**—চিম+টি= চিম্‌টি, শুখ (<শুষ্ক)+টী=শুখটি>শুটকী (মাছ)।

টিয়া > টে—ঘোলা + টিয়া = ঘোলাটিয়া > ঘোলাটে, ভাড়া + টিয়া = ভাড়াটিয়া > ভাড়াটে ; এইরূপ—বোকাটে, হিংসুটে, তামাটে, বখাটে, রোগাটে, ঝঞ্ঝাটে, পাঁশুটে, ক্ষ্যাপাটে, ঝগড়াটে।

ড়, আড় > ড়িয়া, ড়ে—সম্বন্ধ, ব্যবসায়, শীল প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয় :

ভাঙ্গ + ড় = ভাঙ্গড়, যোগ + আড় = যোগাড়, যোগাড়ে ; বাসা + ড়িয়া = বাসাড়িয়া > বাসাড়ে, সাপ + ড়িয়া = সাপুড়িয়া > সাপুড়ে। এইরূপ—ঘেসুড়ে, হাতুড়ে।

ড়া, ড়ি—গাছ + ড়া = গাছড়া (গাছ-গাছড়া) ; এইরূপ—রাজড়া (রাজ-রাজড়া), পাতড়া, খাগড়া।

পনা—কার্য অথবা অবস্থা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। দুরন্ত + পনা = দুরন্তপনা ; এইরূপ—গিন্নিপনা, ন্যাকাপনা, দাসীপনা।

পানা—সাদৃশ্যার্থে। চাঁদ + পানা = চাদপানা ; এইরূপ—হাঁড়িপানা, লাল-পানা, ফর্সাপানা।

মন্ত ও বন্ত—অস্ত্যর্থে। শ্রী + মন্ত = শ্রীমন্ত, পয় + মন্ত = পয়মন্ত, ভাগ্য + বন্ত = ভাগ্যবন্ত।

ল, লা, লি—সাদৃশ্য বুঝাইতে। আধলা, পাতলা (পাতার মত), দীঘল, আধুলি।

চা, ছা—মত অর্থে। লাল + চা = লালচা > লালচে, আব + ছা = আবছা (অভ্র > আব + ছা—মেঘের মত)।

সই—অবধি অর্থে অথবা পূর্ণবৃদ্ধি অর্থে—বুকসই, দশাসই।

বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় যেমন বহু বিদেশী শব্দ গৃহীত হইয়াছে, তেমনি কতকগুলি বিদেশী (ফার্সী) প্রত্যয়ও গৃহীত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ অর্থে এগুলি প্রযুক্ত হয়। যেমন—

আনা, আনি—ভাব বা কার্য বুঝাইতে। বাবু + আনা = বাবুয়ানা, বাবু + আনি = বাবুয়ানি। এইরূপ—হিন্দুয়ানি, সাহেবীয়ানা, মুন্শীয়ানা ইত্যাদি।

খোর—খাদক বা অভ্যস্ত অর্থে। সুদ + খোর = সুদখোর। এইরূপ—নেশা-খোর, তামাকখোর, গাঁজাখোর, ঘুষখোর ইত্যাদি।

গর—নির্মাতা অর্থে। কারিগর।

গিরি—ভাব, বৃত্তি বা ব্যবসায় অর্থে। বাবুগিরি, কেরানীগিরি, দারোগাগিরি, ডেপুটিগিরি, পণ্ডিতগিরি, গুরুগিরি।

চি—আধার অর্থে। ধুনা+চি=ধুনচি, ধুনুচি।

দান, দানি—আধার বুঝাইতে। আতরদান, আতরদানি, কলমদান, পিকদানি, বাতিদান, ফুলদানি ইত্যাদি।

দার—অস্ত্যর্থে। দোকানদার, বুটিদার, মজাদার।

বাজ—আসক্ত বা দক্ষ অর্থে। মামলাবাজ, ফাঁকিবাজ, ধড়িবাজ (লোক) ইত্যাদি।

সই, সহি—উপযুক্ত অর্থে। মানানসই, মানানসহি, চলনসই, লাগসই, টেকসই, পছন্দসই ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। কৃৎপ্রত্যয় কাহাকে বলে? কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ে পার্থক্য কি? খাঁটি বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের চারিটি করিয়া দৃষ্টান্ত দাও।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি লিখ ও শব্দগুলি স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার কর :—

আধুলি, নেওটা, আবছা, তুখড়, ধেনো, ফলাও, সেথো, মতি, ক্রোধ, চয়ন, জয়, বুদ্ধি, বৈয়াকরণ, বাঁধাই, কমতি, দ্রৌপদী, আদিত্য, নৈকষেয়, দৌত্য, সৌভ্রাত্র, চড়াই, ভয়ষা, চতুরালি, বাবুয়ানি, পোষ্টাই, গয়ালী, মেয়েলী, ফুলদানি, কালচে, ক্ষেপাটে, রাবণি।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :—

কানাই, বিবাগী, আহ্নিক, সৌধ, রূপসী, ভাঁড়ার, নামতা, কাটারি।

—মাধ্যমিক বিশেষ বাংলা, ১৯৪৬।

৪। খাঁটি বাংলা শব্দে বিদেশী প্রত্যয় যোগের পাঁচটি উদাহরণ দিয়া তাহারা কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা বল। —মাধ্যমিক বিশেষ বাংলা, ১৯৫৩।

৫। নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির সাহায্যে শব্দ গঠন করিয়া কোন্ অর্থে প্রত্যয়গুলি প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা উল্লেখ কর :—

ষ্ণ, ষ্ণিক, ত্ব, তা, আই, উনি, আ, ই, ঈ, লি, চি, পানা, তর, গর, পনা, এ, আন', গিরি, বাজ, চে, দা'নি।

৬। 'আরি'-র তদ্ধিত ও কৃদন্ত প্রয়োগ প্রদর্শন কর।

পদ-পরিবর্তন

বিশেষ্য হইতে বিশেষণ

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অগ্নি	আগ্নেয়	উৎসর্গ	উৎসৃষ্ট
অবধান	অবহিত	উদ্বেগ	উদ্বিগ্ন
অতিথি	আতিথেয়	উন্মাদ	উন্মত্ত
অধ্যাত্ম	আধ্যাত্মিক	উদ্ভব	উদ্ভূত
অভ্যাস	অভ্যস্ত	ঋষি	আর্ষ
অরণ্য	আরণ্য	কাজ	কেজো
অদ্য	অদ্যতন	কায়	কায়িক
অধুনা	অধুনাতন	কাঠ	কেঠো
অন্ত	অন্ত্য	কলঙ্ক	কলঙ্কিত
অকস্মাৎ	আকস্মিক	কুলো	কুলোপানা
অংশ	আংশিক	কুল	কুলীন, কৌলিক
আত্মা	আত্মীয়	কোপ	কুপিত, কোপন
আদি	আদ্য, আদিম	কোণ	কুণো
আরোহণ	আরূঢ়	গ্রাম	গ্রাম্য
আঁশ	আঁশটে	গ্রাস	গ্রস্ত
আসন	আসীন	গুহা	গুহ্য
আঘাত	আহত	গোপন	গোপনীয়
আশ্বাস	আশ্বস্ত	গাঁ	গেঁয়ো
আহ্বান	আহূত	গাছ	গেছো
ইচ্ছা	ঐচ্ছিক, ইষ্ট	গুণ	গুণী
ইহ	ঐহিক	গ্রহণ	গৃহীত
উৎকর্ষ	উৎকৃষ্ট	ঘর	ঘরোয়া
উদ্যম	উদ্যত	চোর	চোরাই

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
চির	চিরন্তন	দুধ	দুধাল (গাই)
চাম	চামসা	ধার	ধারালো
চক্ষু	চাক্ষুষ	ধাতু	ধাতব
চাঁদ	চাঁদপানা	ধোঁয়া	ধোঁয়াটে
ছুঁচ	ছুঁচাল	ধান	ধেনো
জটা	জটিল	ন্যাস	ন্যস্ত
জল	জ'লো	নিদাঘ	নৈদাঘ
জগৎ	জাগতিক	নিন্দা	নিন্দিত
জরা	জীর্ণ	নিয়ম	নিয়মিত
ঝড়	ঝ'ড়ো	নাশ	নষ্ট, নশ্বর
ঝগড়া	ঝগড়াটে	নিদ্রা	নিদ্রালু
ডুব	ডুবো (জাহাজ)	পয়	পয়মন্ত
ঢাকা	ঢাকাই	প্রমাদ	প্রমত্ত
তামা	তামাটে	পাহাড়	পাহাড়ে, পাহাড়ী
তন্দ্রা	তন্দ্রালু	পড়া	পড়ুয়া
তীর	তীরন্দাজ	পড়া (পত্)	পড়ন্ত (বেলা)
তেজ	তেজালো	পাক	পক্ক, পাচ্য
তেজস্	তেজস্বী, তেজী	পান	পীত, পেয়, পানীয়
দরদ	দরদী	প্রণাম	প্রণম্য, প্রণত
দংশন	দষ্ট	পঙ্ক	পঙ্কিল
দেব	দৈব	প্রসাদ	প্রসন্ন
দহন	দাহ্য	পৃথিবী	পার্থিব
দন্ত	দন্তুর	পিতা	পৈতৃক
দম্পতি	দাম্পত্য	পশু	পাশব
দম্ভ	দাম্ভিক	পুর	পৌর
দাঁত	দাঁতাল		

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
পুষ্প	পুষ্পিত	ভয়	ভীত
পরলোক	পারলৌকিক	ভূত	ভৌতিক, ভূতুড়ে
ফল	ফলন্ত	ভাত	ভেতো
ফুল	ফুলেল	মাছ	মেছো
ফেন	ফেনিল	মাঠ	মেঠো
বুদ্ধি	বুদ্ধিমান	মাপ	মাপসই
বায়ু	বায়বীয়	মামলা	মামলাবাজ
বস্তু	বাস্তব	মুখ	মৌখিক, মুখর
বপন	উপ্ত	মেয়ে	মেয়েলী
বচন	উক্ত	মৃৎ	মৃন্ময়
ব্যাঘাত	ব্যাহত	মন	মানসিক
বন	বন্য	মাটি	মেটে
বাঘ	বাঘা	মোঘল	মোঘলাই
বেগুন	বেগুনী	মধু	মধুর, মাধব
বিধি	বৈধ	মাংস	মাংসল
বিধান	বিধেয়	মোহ	মুগ্ধ, মূঢ়
বিশেষ	বিশিষ্ট	রোষ	রুষ্ট
বিশ্বজন	বিশ্বজনীন	রুচি	রোচক, রুচির
বেদ	বৈদিক	রূপা	রূপালী
ভাড়া	ভাড়াটে	লোম	লোমশ
ভ্রম	ভ্রান্ত	লয়	লীন
ভঙ্গ	ভঙ্গুর, ভগ্ন	লেহন	লেহ্য
ভগবান্	ভাগবত	শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধেয়
ভূগোল	ভৌগোলিক	শাপ	শপ্ত
ভেদ	ভেদ্য, ভিন্ন	শ্লেষ	শ্লিষ্ট
ভোগ	ভুক্ত, ভোজ্য	শাঁস	শাঁসাল

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
শ্রী	শ্রীল	সমাস	সমস্ত
শোষ	শুষ্ক	সূর্য	সৌর
শিব	শৈব	সভা	সভ্য
শক্তি	শাক্ত, শক্ত	সুতা	সুতী
শহর	শহুরে	সাঁতার	সাঁতারু
স্বর্ণ	স্বর্ণময়	স্নেহ	স্নিগ্ধ
সর্বভূমি	সার্বভৌম	স্তব	স্তুত
স্তম্ভ	স্তম্ভিত	হৃদয়	হৃদ্য
স্পর্শ	স্পৃষ্ট, স্পৃশ্য	হোম	হব্য
সন্ধ্যা	সান্ধ্য	হিংসা	হিংস্র
স্বদেশ	স্বদেশী	হেমন্ত	হৈমন্তিক
স্বপ্ন	সুপ্ত	হাট	হেটো, হাটুরে
সন্দেহ	সন্দিগ্ধ, সন্দিহান	হাভাত	হাভাতে
সোনা	সোনালী	হুঁশ	হুঁশিয়ার

বিশেষণ হইতে বিশেষ্য

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
অধিক	আধিক্য	এক	ঐক্য
অরুণ	অরুণিমা	একগুঁয়ে	একগুঁয়েমি
অলস	আলস্য	কৃপণ	কার্পণ্য
অনুকূল	আনুকূল্য	কঠিন	কাঠিন্য
উৎকৃষ্ট	উৎকর্ষ	কপট	কপটতা, কাপট্য
উদ্ধত	ঔদ্ধত্য	কুড়ে	কুড়েমি
উদ্গীর্ণ	উদ্গিরণ	কাতর	কাতরতা
উচিত	ঔচিত্য	ক্লীব	ক্লৈব্য, ক্লীবত্ব, ক্লীবতা
উকিল	ওকালতি		
ঋজু	ঋজুতা, আর্জব	গুরু	গৌরব, গুরুত্ব

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
গোঁড়া	গোঁড়ামি	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমত্তা
গোঁয়ার	গোঁয়ারতমি	বিচিত্র	বিচিত্রতা, বৈচিত্র্য
গরীব	গরীবানা	বিকীর্ণ	বিকিরণ
ঘটক	ঘটকালি	ভুক্ত	ভোজন, ভোগ
চঞ্চল	চঞ্চলতা, চাঞ্চল্য	ভগ্ন	ভঙ্গ, ভঞ্জন
চালাক	চালাকি	মন্দ	মান্দ্য, মন্দত্ব
চতুর	চতুরালি, চাতুরী, চাতুর্য	মধুর	মধুরতা, মাধুর্য, মাধুরী
		মহাত্মা	মাহাত্ম্য
চেতন	চৈতন্য	মহৎ	মহত্ত্ব
জড়	জড়তা, জাড্য	বক্র	বক্রিম, রাগ
তরুণ	তারুণ্য, তরুণিমা	লঘু	লঘিমা, লঘুতা, লাঘব
দরিদ্র	দরিদ্রতা, দারিদ্র্য		
দীর্ঘ	দৈর্ঘ্য	শিথিল	শৈথিল্য
দীন	দীনতা, দৈন্য	শীত	শৈত্য
ধীর	ধৈর্য	শূর	শৌর্য
নিরাশ	নৈরাশ্য	সুষ্ঠু	সৌষ্ঠব
নীল	নীলিমা, নীলত্ব	সহায়	সহায়তা, সাহায্য
প্রচুর	প্রাচুর্য	সারবান	সারবত্তা
বড়	বড়াই	সৎ	সত্তা, সত্ত্ব
বেহায়া	বেহায়াপনা	হুঁশিয়ার	হুঁশিয়ারি

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বিশেষ্য পদগুলিকে বিশেষণ পদে পরিণত করিয়া উহাদের প্রত্যেকটির দ্বারা এক একটি বাক্য রচনা কর :—

যশঃ, বাক্, পুরুষ, মৃৎ, অধ্যয়ন, প্রার্থনা, পান, কামনা, উপলব্ধি, আঘাত, সাহিত্য, পরিচয়, বায়ু, শ্রম, আরোহণ, বিদ্যুৎ, গান, কৌতূহল। —ক বি মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৩১, '৩৩, '৩৬।

২। নিম্নোদ্ধৃত বিশেষণ পদগুলিকে বিশেষ্য পদে রূপান্তরিত করিয়া উহাদের সাহায্যে এক একটি বাক্য রচনা কর :—

বাবু, প্রণীত, নিষ্কর্মা, মধুর, প্রপীড়িত, আহৃত, সুগন্ধ, অনাদৃত, দক্ষ, বিপ্রলব্ধা, পরাক্রান্ত, অনভ্যস্ত। —ক. বি মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৩১, '৩৭।

৩। নিম্নের বিশেষ্য পদগুলিকে বিশেষণে এবং বিশেষণ পদগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত কর:—

উচিত, আরূঢ়, সংখ্যা, বস্তু, সুখ, বিহিত, প্রসন্ন, সংক্ষুব্ধ, ধ্যান, বাবু, আসন, ফেন, মুখ, অবসন্ন, ব্যাহত, ইষ্ট, বৈধ। —মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৪২, '৪৪।

৪। নিম্নের বিশেষ্য পদগুলিকে বিশেষণে রূপান্তরিত করিয়া উহাদের সাহায্যে বাক্য রচনা কর :—

নিশা, বচন, বাবু, সূর্য, ঘর, ঢুব, ধান, মাঠ। —ক বি মাধ্যমিক বিশেষ বাংলা, ১৯৫০।

স্ত্রী-প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় কতকগুলি বিশেষ শব্দ ভিন্ন, প্রত্যয় বা বিভক্তি দ্বারা লিঙ্গের পার্থক্য প্রকাশ করা হয় না। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু সর্বদাই লিঙ্গ-বিভেদ প্রদর্শনের জন্য বিশেষ প্রত্যয় ও বিভক্তির প্রয়োগ বর্তমান।

বাংলা ভাষায়,—বিশেষত চলিত বাংলায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিঙ্গভেদে প্রত্যয়ের প্রয়োগ পাওয়া যায় না। 'সুন্দর ছেলে', 'সুন্দর মেয়ে' ; 'লক্ষ্মী ছেলে', 'লক্ষ্মী মেয়ে' ; 'বড় ছেলে', 'বড় বউ', 'বড় গাছ', 'বড় ফুল'—এ সবই বাংলায় চলিত। যে-সকল রচনা চলিত বাংলা ঘেঁষা, তাহাতেও এই রীতি অনুসৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু রচনা যখন গুরুগম্ভীর ও সংস্কৃতের অনুকারী হইয়া উঠে, কিংবা রচনাকে যখন ওজোগুণান্বিত করিয়া তুলিতে হয়, তখন স্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন—সুন্দরী কন্যা, বিদ্বান পুরুষ—বিদুষী নারী, মহতী সভা, মহীয়সী মহিলা, রোরুদ্যমানা বালিকা, মৃন্ময়ী মূর্তি, স্নেহময়ী মাতা, সন্তাপহারিণী নিদ্রা, সুখময়ী উষা, প্রধানা নায়িকা, বিরহবিধুরা রাধা, একাকিনী শোকাকুলা সতী, রত্নগর্ভা জননী, মুখরা স্ত্রী, সাধ্বী নারী ইত্যাদি। আ-কারান্ত ও ঈ-কারান্ত এবং তি-প্রত্যয়ান্ত অনেক বস্তু ও ভাবব্যঞ্জক বিশেষ্য শব্দ সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ। বাংলায় সেই সকল শব্দের বিশেষণ সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী

স্ত্রীলিঙ্গবাচক হইয়া থাকে। যথা—অর্থকরী বিদ্যা, সর্বংসহা ধরিত্রী, স্বর্ণময়ী কাশী, তমিস্রা রজনী বা যামিনী, ঘোরা যামিনী, ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, অচলা ভক্তি, পুষ্পময়ী লতা, বেগবতী নদী, চঞ্চলা ক্ষণপ্রভা, আশা কুহকিনী।

পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করিতে হইলে **নী, আনী, ইনী, উনী, আ, ইকা** প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয় যোগ করিতে হয়, উহাদিগকে **স্ত্রী-প্রত্যয়** বলে।

পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে রূপভেদ তিন প্রকারে হয়, যথা :—

১। স্ত্রী-প্রত্যয় যোগে :—দেব—দেবী, বালক—বালিকা, কামার—কামারনী।

২। বিভিন্ন শব্দ প্রযোগে :—সাহেব—বিবি, নবাব—বেগম, বর—বধূ।

৩। পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক শব্দ যোগে :—এঁড়েবাছুর—বক্‌নাবাছুর, হুলোবিড়াল—মেনিবিড়াল, পুরুষমানুষ—মেয়েমানুষ, গোসাঁই—মা-গোসাঁই, গোসাঁই-গিন্নী।

বাংলা স্ত্রী-প্রত্যয়

জাতি বা পত্নী অর্থে **নী, আনী, ইনী** প্রত্যয় :—ময়রা—ময়রানী, বেদে—বেদেনী, জেলে—জেলেনী, খোট্টা—খোট্টানী, নাপিত—নাপিতানী, মেথর—মেথরানী, কলু—কলুনী, উড়ে—উড়েনী, বাঘ—বাঘিনী, সাপ—সাপিনী, অভাগা—অভাগিনী, পাগল—পাগলিনী, ঠাকুর—ঠাকুরানী, কাঙাল—কাঙালিনী, মাস্টার—মাস্টারনী, মালী—মালিনী ইত্যাদি।

বাংলায় ননদিনী, কুরঙ্গিনী, চাতকিনী, নটিনী, অভাগিনী, অনাথিনী, মাতঙ্গিনী, প্রভৃতি স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি ব্যাকরণশুদ্ধ না হইলেও শুদ্ধ হিসাবে চলিয়া গিয়াছে।

ঈ—জাতি বা পত্নী অর্থে

খেঁকশিয়াল—খেঁকশিয়ালী, বামুন—বাম্‌নী, দেব—দেবী, ছাগল—ছাগলী, ব্যাঙ্গমা—ব্যাঙ্গমী, বাঁদর—বাঁদরী, শালা—শালী, খুড়া—খুড়ী, কুঁদুলে—কুঁদুলী।

আ—জাতি বা পত্নী অর্থে

সাহেব—সাহেবা, অপ্সর—অপ্সরা।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মধ্যম	মধ্যমা	সভাপতি	সভানেত্রী
মন্ত্রী	মন্ত্রিণী	সাহেব	বিবি, মেম
মেধাবী	মেধাবিনী	সুকেশ	সুকেশী
বীর	বীরাঙ্গনা	সূর্য	সূর্যা, সূরী
রায়	রায়গৃহিণী		(=কুন্তী)
রাষ্ট্রপতি	রাষ্ট্রনেত্রী	স্বর্গত	স্বর্গতা
শুক	সারী	হিংসুটে	হিংসুটী

	[পত্নী বুঝাইতে]	[স্ত্রীজাতি বুঝাইতে]
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়াণী	ক্ষত্রিয়া
জোলা	জুলনী	—
দাদা	বৌদি	দিদি
দেবর, ভাশুর	জা	ননদ
বরুণ	বরুণানী, বারুণী	—
বৈশ্য	বৈশ্যানী	বৈশ্যা
বাদশাহ	বেগম	বেগম
ভাই	ভাজ	বোন
রুদ্র	রুদ্রাণী	—
শাহজাদা	বেগম	শাহজাদী
শূদ্র	শূদ্রী	শূদ্রাণী, শূদ্রা

উপসর্গ

ধাতুর বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হইয়া যে-সমস্ত অব্যয় নূতন নূতন অর্থের সৃষ্টি করে, তাহাদিগকে **উপসর্গ** বলে। যেমন—আ-গত, বি-দেশ, পরি-ভ্রমণ ইত্যাদি।

উপসর্গের দ্বারা ধাতুর অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যায়; যথা :—হৃ ধাতুর অর্থ হরণ করা; কিন্তু প্র+হৃ ধাতুর অর্থ প্রহার, এইরূপ সং+হৃ (সংহার)=হত্যা করা, বি+হৃ (বিহার)=ভ্রমণ করা, পরি+হৃ (পরিহার)=ত্যাগ করা।

সংস্কৃতে ২০টি উপসর্গ আছে, যথা ঃ—প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।

এই উপসর্গগুলির কার্য তিন প্রকার। কখনও ইহারা ধাতুর অর্থের পরিবর্তন সাধন করে, কখনও তাহার অনুবর্তন করে, আবার কখনও বা তাহাব অর্থকে বিশিষ্ট করিয়া দেয়।

সংস্কৃত উপসর্গের প্রয়োগ

প্র—উৎকর্ষ, আধিক্য, সম্মুখে, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি অর্থে—প্রভূত, প্রকট, প্রয়াস, প্রকৃষ্ট, প্রগতি, প্রতাপ।

পরা—আতিশয্য, ব্যতিক্রম, অনাদর প্রভৃতি অর্থে-পরাক্রম, পরায়ণ, পরাভব।

অপ—বিয়োগ, বৈপরীত্য, বিকৃতি প্রভৃতি অর্থে—অপমান, অপনোদন, অপলাপ, অপচয়, অপভ্রংশ।

সম্—সম্যক্, সঙ্গত, আভিমুখ্য প্রভৃতি অর্থে—সম্ভাষণ, সম্মুখ, সম্ভব।

নি—নিশ্চয়, নিষেধ, নিন্দা, নিয়ত, অভাব, অতিশয় ইত্যাদি অর্থে—নিদর্শন, নিয়ম, নিবৃত্তি, নিকৃষ্ট, নিগ্রহ, নিযত, নিধি, নিখুঁত, নিদয়।

অব—নিম্ন, ঘৃণা ইত্যাদি অর্থে—অবতরণ, অবরোহণ, অবজ্ঞা, অবহেলা।

অনু—পশ্চাৎ, সাদৃশ্য, সম্যক্, অনুকার, বীপ্সা অর্থে—অনুজ, অনুরূপ, অনুবাদ, অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুসন্ধান, অনুমান।

নির্—অভাব, নিশ্চয়, অতিশয়, প্রভৃতি অর্থে—নির্ণয়, নির্বন্ধ, নির্দোষ।

দুর্—মন্দ, দুঃখ, নিষিদ্ধ অর্থে—নিরন্ন, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুরদৃষ্ট, দুশ্চিন্তা।

বি—সম্যক্, বিরুদ্ধ অর্থে—বিজ্ঞান, বিখ্যাত, বিপক্ষ, বিকার।

অধি—উপরি, আধিপত্য অর্থে—অধিত্যকা, অধিরোহণী (সোপান)।

সু—মঙ্গল, সৌন্দর্য, উত্তমরূপ অর্থে—সুখবর, সুকুমার, সুভাষিত।

উৎ—উপরে, বাহিরে, অতিশয়, অভাব অর্থে—উৎক্ষিপ্ত, উন্নত, উচ্চারণ, উত্তপ্ত, উচ্ছৃঙ্খল।

পরি—চতুর্দিকে, সম্পূর্ণরূপে, দোষকীর্তন, সম্যক্ প্রভৃতি অর্থে—পরিক্ষিপ্ত, পরিচয়, পরিখা, পরিবাদ, পরিপন্থী, পরিতাপ।

প্রতি—বিপরীতভাবে, পশ্চাৎ, বীপ্সা, অনুরূপ অর্থে—প্রতিক্রিয়া, প্রতিকূল, প্রতীচী, প্রতিদিন, প্রতিমূর্তি।

অভি—সম্মুখ, উত্তম, দিক্‌, সম্যক্‌, চিহ্ন প্রভৃতি অর্থে—অভিযান, অভিজাত, অভিমুখ, অভিজ্ঞ, অভিজ্ঞান।

অতি—অধিক, অনুচিত, বিগত অর্থে—অতিশয়, অতিরিক্ত, অতিবৃষ্টি, অত্যাচার, অতীত।

অপি—বাংলা ভাষায় বিশেষ প্রয়োগ নাই—অদ্যাপি, যদ্যপি, তথাপি।

উপ—দিকে, নিকটে, সাদৃশ্য, ক্ষুদ্র প্রভৃতি অর্থে—উপকূল, উপকথা, উপবন, উপগ্রহ।

আ—ঈষৎ, সম্যক্‌, সীমা, অর্থে—আরক্ত, আনত, আগত, আজন্ম, আকর্ণ।

বাংলা উপসর্গ

আ, অনা, অ—'না' অথবা 'কুৎসিত' অর্থে। আলুনি, আধোয়া, আকাঁড়া, অবেলা, অজানা, অনানা, আঘাটা, অখুশী, আকথা, অনামুখ, অনাসৃষ্টি ইত্যাদি।

আ, অ—প্রকৃষ্ট অর্থে বা সাদৃশ্যার্থে। অঘোর (নিদ্রা), আকাঠ (মূর্খ)।

কু—নিন্দনীয় অর্থে। কুকাজ, কুবচন, কুনজর, কুকথা ইত্যাদি।

দর—ঈষৎ অর্থে। দর-কাঁচা, দর-পোক্ত (অর্ধ-পক্ক)।

নি—'না' অর্থে। নিখুঁত, নিদয়, নিলাজ ইত্যাদি।

পাতি—'ক্ষুদ্র' অর্থে। পাতি-কুয়া, পাতিলেবু, পাতিকাক।

বি, বে—'না' অর্থে। বিজোড়, বিভুঁই, বে-টাইম, বে-হেড্‌।

ভর, ভরা—'পূর্ণ' অর্থে। ভর-সাঁঝ, ভরপেট, ভরা-যৌবন ইত্যাদি।

স—'সহিত' অর্থে। সতৃষ্ণ, সজোরে ইত্যাদি।

সু—'প্রশংসার যোগ্য' অর্থে। সুজন, সুছাঁদ, সুডৌল, সুনজর, সুনাম।

হা—'বিগতার্থে'। হাঘরে (গৃহবিহীন), হাভাতে ইত্যাদি।

বিদেশী উপসর্গ

কতকগুলি ফারসী শব্দ ও অব্যয় বাংলা শব্দে উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

গর (না অর্থে)—গররাজী, গরহাজির, গরমিল।

দর (নিম্নস্থ অর্থে)—দরপত্তনি।

ফি (প্রত্যেক অর্থে)—ফি-দিন, ফি-সন।

বে (না অর্থে)—বেচাল, বে-রসিক, বেহাত, বে-টাইম, বে-ঘোরে, বে-মক্কা, বে-বন্দোবস্ত।

হর ('প্রত্যেক' বা 'সর্ব' অর্থে)—হররোজ, হরবোলা, হরদিন, হরসাল, হরঘড়ি।

ইংরাজী head—'হেড্' 'উর্ধ্বতন অর্থে' বাংলায় উপসর্গরূপে কয়েকটি শব্দের সহিতও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেন—হেড্-পণ্ডিত, হেড্-মৌলবী, হেড্-মুহুরী, হেড্-চাপরাসী ইত্যাদি।

কারক-বিভক্তি

বাক্যমধ্যে ক্রিয়া পদের সহিত বিশেষ্য অথবা সর্বনাম পদের যে বিশেষ সম্বন্ধ থাকে তাহাকে **কারক** বলে।

রাম কাগজে তুলি দিয়া ছবি আঁকিতেছে।

এই বাক্যে বিশেষ্য পদ চারিটি।—**রাম**, কাগজ, **তুলি**, ছবি। 'আঁকিতেছে'—পদটি ক্রিয়া। সুতরাং ক্রিয়ার সহিত বিশেষ্য পদগুলির সম্বন্ধ এইরূপ—

(১) **রাম**—(ক্রিয়ার সহিত কর্তৃসম্বন্ধ) = কর্তৃকারক।

(২) **ছবি**—(ক্রিয়ার সহিত কর্মসম্বন্ধ) = কর্মকারক।

(৩) **তুলি** (দিয়া)—(ক্রিয়ার সহিত উপায় বা করণের সম্বন্ধ) = করণকারক।

(৪) **কাগজে**—(ক্রিয়ার আধার বা স্থান বুঝাইতেছে) = আধার বা অধিকরণ সম্বন্ধ।

যদু ঘর হইতে বাহির হইয়া ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিল।

এই বাক্যে **'ঘর'** এই বিশেষ্য দ্বারা ক্রিয়ার স্থান পরিবর্তন বুঝাইতেছে, সুতরাং ইহার সহিত ক্রিয়ার স্থানচ্যুতি বা **অপাদান** সম্বন্ধ (**অপাদান কারক**); এবং

'ভিক্ষুককে' এই বিশেষ্য পদটি **'দিল'** এই ক্রিয়ার পাত্রকে বুঝাইতেছে। সুতরাং উহার সহিত ক্রিয়ার **সম্প্রদান** সম্বন্ধ।

সুতরাং দেখা গেল, বাক্যমধ্যস্থ ক্রিয়া পদের সহিত বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের মোটামুটি এই ছয় রকম সম্বন্ধ হইতে পারে: **কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ**।

ক্রিয়া পদ ভিন্ন অন্যান্য পদের সহিত বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে সম্বন্ধ তাহা কারক পদ-বাচ্য নহে। যেমন 'গাছের ফুল'; 'নদীর মাছ'—এই বাক্যাংশ দুইটিতে ক্রিয়ার স্থান নাই। এক বিশেষ্য পদের সহিত অন্য বিশেষ্য পদের অন্বয় বা সম্বন্ধ '-এর'—এই বিভক্তির দ্বারা দেখান হইয়াছে। সুতরাং 'গাছ' ও 'নদী' এখানে **সম্বন্ধ পদ,**—কারক নহে।

কর্তৃকারক

যে করে বা যাহা হয়, তাহা কর্তা। যথা—সে খেলিতেছে। এখানে 'সে' কর্তা।

কর্তৃকারকে প্রথমা—কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়; যথা—**ফুল** ফোটে। **পাখী** গান করে। **ঈশ্বর** আছেন। "**জীবন** আমায় দেয়নি যাহা **মরণ** দেবে সগৌরবে।"—কালিদাস রায়॥

কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া—কর্ম ও ভাববাচ্যে কর্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়; যথা—

কর্মবাচ্য—**তোমাকে** একথা শুনিতে হইবে।

ভাববাচ্য—**তাহাকে** যাইতে হইবে।

কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি—কর্মবাচ্যে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়; যথা—**আমাদ্বারা** এ কাজ হইবে না। **রাম কর্তৃক** রাবণ নিহত হইয়াছিল। কর্মবাচ্যে তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত কর্তৃপদ প্রধানরূপে উক্ত হয় না বলিয়া উহাকে **অনুক্ত কর্তা** বলে।

কর্তৃকারকে ষষ্ঠী—কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে কখনও কখনও কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়; যথা—কর্মবাচ্য—**আমার** বই পড়া হইয়াছে।

ভাববাচ্য—**আমার** খাওয়া হয় নাই।

কর্তৃকারকে সপ্তমী—কর্তৃবাচ্যে কর্তায় কখনও কখনও সপ্তমী বিভক্তি হয়; যথা—"**গাধায়** খায় পাকা কলা, **শূয়রে** খায় পান"; "**পাগলে** কি না-বলে, **ছাগলে** কি না-খায়"; "গরুড়ের নীড়ে সাধ করে কি **বায়সে**?"—হেমচন্দ্র ॥ **গরুতে** দুধ দেয়।

কর্মকারক

কর্মকারক—কর্তা যাহা করে, তাহাকে কর্মকারক বলে। যথা—"রাম বই পড়িতেছে"—এখানে 'বই' কর্মকারক।

কর্তৃবাচ্যে **কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়**; যথা—**প্রসন্ন ডাক্তারকে** ডাকিয়া আনো।

কর্মে প্রথমা—কর্মবাচ্যে কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়; যথা—ব্যাসদেব **মহাভারত** রচনা করিয়াছেন। **বাঘ** শিকার কর। **মশা** মারতে কামান দাগা। "**স্যাকরা** ডেকে **মোহর** কেটে গড়িয়ে দেবো দানা।"—ছড়া ॥

কর্মে পঞ্চমী—কর্মকারকে অনেক সময় পঞ্চমী বিভক্তি হয়; যথা—"**বাহির** হইতে (বাহিরটাকে দেখিয়া) আশুতোষকে অত্যন্ত দাম্ভিক ভাবিতাম।"

কর্মে ষষ্ঠী—**আমাদের** খেতে দিন।

"এ হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়
হাম নারী **অবলার** বধ লাগে তায়।"—চণ্ডীদাস ॥

কর্মে সপ্তমী—**পুলিসে** খবর দাও।

"ডাক্ দেখি তোর **বৈজ্ঞানিকে**
দেখবো সে উপাধি নিলে
কটা কেন'র জবাব শিখে!"
—রজনীকান্ত সেন ॥

সকর্মক ক্রিয়া ও **অকর্মক ক্রিয়া**—যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাহা সকর্মক ক্রিয়া। যেমন,—মা **ছেলেটাকে** চাঁদ দেখাইতেছেন। **বন্ধুকে** বিশ্বাস করিবে।

যে ক্রিয়ার কর্ম নাই, তাহা অকর্মক ক্রিয়া। যেমন, (১) শিশুটি **ঘুমাইতেছে**। (২) আকাশে চাঁদ **উঠিয়াছে**।—এই দুই দৃষ্টান্তে ক্রিয়ার কোন কর্ম নাই।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া—যে ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে, তাহাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুইটি কর্মের নাম **গৌণ কর্ম** ও **মুখ্য কর্ম**। মুখ্য কর্ম অর্থপ্রধান কর্ম। এইটি না থাকিলে ক্রিয়ার কার্য কখনও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। **মুখ্য কর্মে বিভক্তি বসে না**। মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক কর্ম। গৌণ কর্ম অপ্রধান কর্ম। ইহা ব্যক্তিবাচক কর্ম।

দৃষ্টান্ত ঃ আমি **মিস্ত্রীদেরকে** (=গৌণ কর্ম) পঞ্চাশ **টাকা** (=মুখ্য কর্ম) দিয়াছি। **বাবাকে** (গৌণ কর্ম) **চিঠি** (মুখ্য কর্ম) দিয়ো। আচার্যদেব **আমাকে** (গৌণ কর্ম) **বেদান্ত** (মুখ্য কর্ম) পড়াইতেছেন।

সমধাতুজ কর্ম—ক্রিয়া ও কর্ম মূলত একই ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলে তাহাকে **সমধাতুজ কর্ম** বলে। ইহা ইংরাজীর Cognate Object। সমধাতুজ কর্ম সাধারণত বিশেষণযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ—

বেশ **খেলা** খেলিয়াছ। কি **হাসিটাই** হাসিলাম। মেয়েটি কি **কান্নাটাই** না কাঁদিল।

বিনা বিশেষণেও **সমধাতুজ কর্ম** হয়; যথা :—**বাটনা** বাটে। **কুটনা** কোটে। **বাজনা** বাজায়।

করণ কারক

করণ কারক—কর্তা যাহার দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে,—অর্থাৎ ক্রিয়া নিষ্পত্তির যাহা প্রধান সহায়, তাহাই করণ কারক; যথা—তিনি **লাঠির দ্বারা** সাপ মারিলেন।

করণে তৃতীয়া—পূজারী **ফুল দিয়া** পূজা করিতেছেন।

"**ফুলদল দিয়া** কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী-তরুবরে?"

করণে প্রথমা—তাহারা **লাঠি** খেলিতেছে (লাঠিদ্বারা)।

করণে পঞ্চমী—তোমা হতে এ কাজ হবে না।

করণে ষষ্ঠী—**কালির** দাগ, **অস্ত্রের** আঘাত।

করণে সপ্তমী—আকাশ **মেঘে** ঢাকা, **নৌকাতে** নদী পার হইবে। **গঙ্গাজলে** গঙ্গা পূজা।

সম্প্রদান কারক

স্বত্ব পরিত্যাগপূর্বক যাহাকে দান করা হয়, সেই দানের পাত্রকে সম্প্রদান কারক বলে; যথা—**দরিদ্রকে** বস্ত্র দাও। এখানে 'দরিদ্রকে' সম্প্রদান কারক; কিন্তু 'রজককে বস্ত্র দাও'—এখানে 'রজককে' কর্মকারক; কারণ, এখানে স্বত্ব পরিত্যাগ করা হয় নাই। রজকের নিকট হইতে বস্ত্রটি আবার ফিরিয়া আসিবে।

সম্প্রদানে চতুর্থী—ভিখারীকে ভিক্ষা দাও।

সম্প্রদানে ষষ্ঠী—"দেবতার ধন (দেবতাকে দত্ত)

কে যায় ফিরায়ে লয়ে, এই বেলা শোন্ !"—রবীন্দ্রনাথ ॥

সম্প্রদানে সপ্তমী—"অন্নহীনে অন্ন দান, বস্ত্র **বস্ত্রহীনে**।"

অপাদান কারক

যাহা হইতে কোন দ্রব্য ভীত, চলিত, মুক্ত ইত্যাদি হয়, তাহাকে অপাদান কারক বলে; সে **ব্যাঘ্র** হইতে ভয় পাইতেছে—এখানে 'ব্যাঘ্র হইতে' অপাদান কারক।

অপাদানে প্রথমা— দোকান পালিয়েছিলি কেনরে কেষ্ট?

অপাদানে পঞ্চমী—বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে।

অপাদানে তৃতীয় —"ইন্দ্রনাথের **ক্ষত দিয়া** রক্তস্রোত বহিতে লাগিল।"

অপাদানে ষষ্ঠী—ভূতের ভয়ে তিনি রাত্রে বাহির হন না।

অপাদানে সপ্তমী—"বিরত সতত **পাপে** দেবকুল।"—মধুসূদন ॥

অধিকরণ কারক

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে; অধিকরণ প্রধানত তিন প্রকার—(১) কালাধিকরণ, (২) আধারাধিকরণ এবং (৩) ভাবাধিকরণ।

কালাধিকরণে কাল বা সময়ের অর্থ প্রধান, ভাবাধিকরণে ভাব বা ধাত্বর্থ প্রধান এবং আধারাধিকরণে স্থানের অর্থ প্রধান হয়। আধারাধিকরণ তিন প্রকার; যথা—(ক) ঐকদেশিক, (খ) বৈষয়িক এবং (গ) অভিব্যাপক।

অধিকরণে প্রথমা—এ **বৎসর** ভাল ধান হয় নাই।

অধিকরণে সপ্তমী (কালাধিকরণে)—**প্রভাতে** সূর্যোদয় হয়।

আধারাধিকরণে সপ্তমী (ঐকদেশিক আধারাধিকরণে)—

"ও রাঙ্গা **চরণে** নূপুর হইতে লোচন দাসের সাধ।"

(বৈষয়িক আধারাধিকরণে)—তাহার **ধর্মে** মতি আছে।

(অভিব্যাপক আধারাধিকরণে)—**তিলে** তৈল আছে ;

সমুদ্রজলে লবণ আছে।

ভাবাধিকরণে সপ্তমী—**চন্দ্রোদয়ে** অন্ধকার দূর হইল।

অধিকরণে তৃতীয়া—বনের **ধার দিয়া** নদীটি বহিয়া গিয়াছে।

অধিকরণে পঞ্চমী—**গাছ থেকে** আমরা ফুটবল খেলা দেখছিলাম।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির লিঙ্গ পরিবর্তন কর :—

গায়ক, রজক, পেচক, মৎস্য, বিধাতা, মন্ত্রী, সর্প, সাপ, অরণ্যানী, পরাধীন, সখা, অপরাধী, নিরপরাধ, ভুজঙ্গ, গিন্নী, শিখিনী, চৌধুরী, কবি, বক্তা, যোদ্ধা, সভাপতি, বন্ধু, মেছো, বয়স্য, জা, গুরু, বিদ্বান, সাধু, বাদশাহ, বিবি, গোয়ালা, ছোট।

২। জায়া ও জাতি অর্থে নিম্নলিখিত শব্দগুলির কি কি স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ হইবে নির্দেশ কর :—

আচার্য, শূদ্র, গোপ, উপাধ্যায়, ঋষি।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে অর্থগত পার্থক্য নিরূপণ কর :—

চণ্ডী ও চণ্ডা। ঘট ও ঘটী। স্থল ও স্থলী। হিম ও হিমানী।

৪। বচন কাহাকে বলে? বাংলায় কি কি উপায়ে বহুবচন গঠিত হয় দৃষ্টান্ত সহ বল।

৫। (ক) বিশেষ্যের দ্বিত্বের দ্বারা বহুবচন গঠনের দৃষ্টান্ত দাও।

(খ) বিশেষণের দ্বিত্বের দ্বারা বহুবচন গঠন কর।

৬। সকল কারকেই যে সপ্তমী বিভক্তি ব্যবহৃত হইতে পারে, দৃষ্টান্ত সহযোগে তাহা দেখাইয়া দাও।

৭। নিম্নরেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—

<u>তোমাকে</u> বড় রোগা দেখাইতেছে। <u>দীনে</u> দয়া কর। <u>ঘোড়ায়</u> ঘাস খায়। <u>টাকায়</u> কি না হয়। '<u>অন্ধজনে</u> দেহ আলো'। এ <u>মেঘে</u> বৃষ্টি হবে না। এ <u>কলমে</u> বেশ লেখা যায়। তোমার <u>পুণ্যেতে</u> মাতা তরিব <u>বিপদে</u>। <u>রাক্ষসে</u> বধিবে ভীম তোমার <u>প্রসাদে</u>। যেই জন <u>ধর্ম</u> রাখে তারে <u>ধর্ম</u> রাখে। না করি সন্দেহ, শুনিয়াছি <u>ব্যাসমুখে</u>।

৮। নিম্নলিখিতগুলির নির্দেশমত উত্তর দাও :—

(ক) বহুত্বের আভাস বুঝাইতে কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি।

(খ) বিশেষণ সম্বন্ধ বুঝাইতে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ।

(গ) 'তে' প্রত্যয়যোগে কর্তৃকারক।

৯। 'সে তাস খেলে' এবং 'সে লাঠি খেলে'—এই দুইটি বাক্যে 'তাস' ও 'লাঠি' কি একই কারক বা বিভিন্ন কারক—এ বিষয়ে যুক্তিসহ তোমার উত্তর লিখ। —মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৫০।

সংক্ষিপ্ততা ও সংহতি ঃ একপদে পরিবর্তন

রচনার সরসতা অর্থাৎ প্রসাদ ও মাধুর্যগুণ সংক্ষিপ্ততা ও সংহতির উপর নির্ভর করে। এইজন্য অনেক সময়ে বহু শব্দ ব্যবহারের দ্বারা মনোভাব প্রকাশের পরিবর্তে একটিমাত্র শব্দে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহাতে প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্য অর্থ-মহিমায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। নিম্নে বাক্যের সংক্ষিপ্ততা ও সংহতির উদাহরণ দেওয়া হইল।—

অনুকরণের ইচ্ছা—অনুচিকীর্ষা
অনুসন্ধানের ইচ্ছা—অনুসন্ধিৎসা
অনেক অভিজ্ঞতা আছে যাহার—বহুদর্শী
অন্য দেশ—দেশান্তর
অশ্বের ধ্বনি—হ্রেষা
অসূয়া নাই যে নারীর—অনসূয়া
আট মাসে জন্মিয়াছে যে—আটাশে
আদর্শ রাজা যে ভূমির—রাজন্বতী
আয়ুর পক্ষে হিতকর—আয়ুষ্য
আদব-কায়দা জানে না যে—বেয়াদব
ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন যিনি—জিতেন্দ্রিয়
ইহকালে জাত—ঐহিক
ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস নাই—নাস্তিক
উড়িতেছে যাহা—উড্ডীয়মান
উপকার করিবার ইচ্ছা—উপচিকীর্ষা
উপস্থিত বুদ্ধি—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব
উপকারীর উপকার স্মরণ করে না যে—কৃতঘ্ন

ঋষির দ্বারা উক্ত—আর্ষ
একটি ধারা ধরিয়া যাহা চলে—ধারাবাহিক
একই সময়ে বর্তমান—সমসাময়িক
একই সময়ে—যুগপৎ
একই গুরুর শিষ্য—সতীর্থ
এক হইতে আরম্ভ করিয়া—একাদিক্রমে
একবার শুনিলেই যাহার মনে থাকে—শ্রুতিধর
একস্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায় যে—যাযাবর
কূলের সমীপে—উপকূল
কাটা যায় যাহার দ্বারা—কাটারি
কষায় বর্ণে রঞ্জিত—কাষায়
কন্যা (বা কুমারী) কালে জাত—কানীন
করুণা আছে যার—কারুণিক
কি করিতে হইবে স্থির করিতে পারে না যে—কিংকর্তব্যবিমূঢ়

কোথাও উঁচু কোথাও নীচু—বন্ধুর
কোন উপকারে আসে না যে গাছ—
আগাছা
গভীর রাত্রি—নিশীথ
চাঁদের মতন—চাঁদপানা ; এইরূপ—
কুলোপানা
ছল করিয়া কান্না—মায়াকান্না
জয় করিবার ইচ্ছা—জিগীষা
জুয়া খেলে যে—জুয়াড়ী
জ্বল জ্বল করিতেছে যাহা—
জাজ্বল্যমান
দেখিতে সমান—সদৃশ
নূপুরের ধ্বনি—নিক্কণ
পক্ষীর কলরব—কাকলি
পরলোকে যাহার বিশ্বাস নাই—
নাস্তিক
পরের উপকার করিবার ইচ্ছা—
পরোপচিকীর্ষা
পারের কড়ি—পারানি
পূর্বজন্মের কথা মনে থাকে যাহার—
জাতিস্মর
পূর্বাপর বিচার না করিয়া কাজ করে যে
—অবিমৃষ্যকারী
প্রশংসার যোগ্য—প্রশস্য
প্রত্যহ যে স্নান করে—নিত্যস্নায়ী
প্রথমে মধুর কিন্তু পরিণামে নহে—
—আপাতমধুর

ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায়—
ওষধি
বচনে কুশল—বাগ্মী
বয়সে তুল্য—বয়স্য
বাক্য ও মনের অগোচর—
অবাঙ্‌মানসগোচর
বাঘের চামড়া—কৃত্তি, বাঘছাল
বালকত্ব কাটে নাই যাহার—নাবালক
বালকের অহিত—বালাই
বীর সন্তান প্রসব করে যে নারী—
বীরপ্রসূ ; এইরূপ—রত্নপ্রসূ
বৃহৎ অরণ্য—অরণ্যানী
ব্যাকরণ জানেন যিনি—বৈয়াকরণ
ভবিষ্যৎ দেখে না যে—অপরিণামদর্শী
ভস্মে পরিণত—ভস্মীভূত
ভূষণাদির শব্দ—শিঞ্জন
ময়ূরের ডাক—কেকা
মাসে মাসে দেয়—মাসিক
যাহা আকাশে উড়িয়া বেড়ায়—খেচর
যাহা উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়—
দুরুচ্চার্য
যাহা ক্ষয় হইবে—ক্ষয়িষ্ণু
যাহা খুব দীর্ঘ নয়—অনতিদীর্ঘ,
নাতিদীর্ঘ
যাহা চাটিয়া খাইতে হয়—লেহ্য
যাহা চুষিয়া খাইতে হয়—চূষ্য
যাহা চিবাইয়া খাইতে হয়—চর্ব্য

যাহা ছেদন করা কঠিন—দুশ্ছেদ্য
যাহা ডুবিয়া যাইতেছে—নিমজ্জমান
যাহা নিবারণ করা যায় না—অনিবার্য
যাহা নিশ্চয়ই হইবে—অবশ্যম্ভাবী
যাহা পান করিতে হয়—পেয়
যাহা প্রতিবিধান করা যায় না—অপ্রতিবিধেয়
যাহা বলা হয় নাই—অনুক্ত
যাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না—অনির্বচনীয়
যাহা সহজে অপনীত হইবার নয়—দুরপনেয়
যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়—ভঙ্গুর
যাহা শব্দ করিতেছে—শব্দায়মান ;
এইরূপ—রোরুদ্যমান, উড্ডীয়মান, সঞ্চরমাণ ইত্যাদি।
যাহার অন্য উপায় নাই—অনন্যোপায়
যাহার অন্য কোন কর্ম নাই—অনন্যকর্মা
যাহার অন্য দিকে মন নাই—অনন্যমনা
যাহার অন্য পথ নাই—অনন্যপন্থা ;
এইরূপ—অনন্যগতি
যাহার কিছু নাই—অকিঞ্চন, নিঃস্ব
যাহার কামনা দুরীভূত হইয়াছে—বীতকাম
যাহার কামনা সিদ্ধ হইয়াছে—সিদ্ধকাম
যাহার দুই হাত সমান চলে—সব্যসাচী

যাহার শত্রু জন্মে নাই—অজাতশত্রু
যাহার শরণ লইতে হয়—শরণ্য
যাহার শুনিবামাত্র মনে থাকে—শ্রুতিধর
যাহার সর্বস্ব গিয়াছে—সর্বস্বান্ত
যাহার সব চুরি গিয়াছে—হৃতসর্বস্ব
যিনি স্বয়ং সৃষ্ট হইয়াছেন—স্বয়ম্ভূ
যিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই—অকৃতদার
যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে—পণ্ডিতম্মন্য
যে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কাজ করে না—অবিমৃষ্যকারী
যে আদব-কায়দা জানে না—বেয়াদব
যে নারী কখনও সূর্যকে দেখে নাই—অসূর্যম্পশ্যা
যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে—প্রোষিতভর্তৃকা
যে বিদেশে থাকে—প্রবাসী
যে মুক্তি পাইবার ইচ্ছা করে—মুমুক্ষু
যে সহ্য করিতে পারে—সহিষ্ণু
যে সব সহ্য করিতে পারে—সর্বংসহ
যে সুপথ হইতে বিচলিত হইয়াছে—উন্মার্গগামী
রোগ নির্ণয় করিতে হাতড়ায় যে—হাতুড়ে
লাভ করিবার ইচ্ছা—লিপ্সা

শৃঙ্খলা মানে না যে—উচ্ছৃঙ্খল
সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া—যাবজ্জীবন
সৎকুলে জাত—কুলীন
সাপ খেলান বৃত্তি যাহার—সাপুড়ে
সুন্দর দাঁত যে স্ত্রীর—সুদতী
সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে যাহার (নারী) —নবোঢ়া
সাক্ষাৎ যে দেখে—সাক্ষী
স্বয়ং জন্মিয়াছেন যিনি—স্বয়ম্ভূ
স্পৃহা যাহার দূর হইয়াছে—নিস্পৃহ
হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যের সমাহার—চতুরঙ্গ
হস্তীর চীৎকার—বৃংহিত
হনন করিবার প্রবৃত্তি— জিঘাংসা
হরিণের চামড়া—অজিন
হেমন্তে জাত—হৈমন্তিক

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির প্রতিশব্দ লিখ :—

(ক) হস্তীর চীৎকার। অশ্বের ধ্বনি। ময়ূরের স্বর। পক্ষীর কলরব। ভূষণাদির শব্দ।

—ক. বি মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৪৬॥

(খ) সেনার চালনা যিনি করেন। যাহা অস্ত যাইতেছে। যে মমতা জানে না। যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই। যাহার দুই হাত সমান চলে। ঈশ্বরে যাহার আস্থা নাই। যে সাপ খেলাইয়া জীবিকা অর্জন করে। হরিণের চামড়া। বৃহৎ অরণ্য। উপকারের ইচ্ছা। ধ্যানের যোগ্য।

—ক. বি. মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৪৯॥

(গ) যিনি পরিণাম দেখিয়া কার্য করেন না। যিনি পরের মুখ চাহিয়া কার্য করেন। যে অন্যকে পোষণ করে।

(ঘ) শুনিবামাত্র যাহার মুখস্থ হইয়া যায়। পূর্বজন্মের কথা যে স্মরণ করিতে পারে। বিধি অতিক্রম না করিয়া। যাহার সহিত গোত্র সমান। বর্ণমালার ক্রম বা পরম্পরা রক্ষা করিয়া। কিছুই যাহার নাই। নদী মাতা যে দেশের। কোথাও হইতে যাহার ভয় নাই।

২। নিম্নলিখিত উক্তিগুলির পরিবর্তে একটি মাত্র করিয়া শব্দ বসাও এবং তাহাদের দ্বারা পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর :—

যে বাষ্প উদ্বমন করিতেছে। যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে। যে বিচার না করিয়া কার্য করে। প্রায় আচার্যের ন্যায়। সূর্যের উপাসনা করেন যিনি। কন্যাকালে জাত। ভগবানে যাহার বিশ্বাস আছে। সাক্ষাৎ দেখে যে। সর্বজনের হিতকর। কুসুম ধনু যাহার।

—গৌহাটি বি. মাধ্যমিক, ১৯৫০।

সমাস

পরস্পর সঙ্গত অর্থযুক্ত দুই বা ততোধিক পদের একপদে পরিণত হওয়ার নাম **সমাস**। বাক্যকে সংহত করিয়া বলিতে হইলে তাহাব কোন কোন অংশকে সমাসবদ্ধ করিতে হয়। একাধিক শব্দকে সমাসবদ্ধ করিয়া বাক্য রচনা করিলে বাক্য গাঢবদ্ধ, সৌষ্ঠবযুক্ত ও সবল হয়।

সমাস দ্বারা শব্দ গঠনের নিয়ম ঃ—যে-সমস্ত পদের মিলনে সমাস হয় সাধারণত তাহাদের বিভক্তি লোপ হইয়া একটি নূতন শব্দ গঠিত হয় এবং তাহাব পর তাহাতে যথাযোগ্য বিভক্তি যোগ করা হয়। যেমন—স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট=স্বর্গভ্রষ্ট, রাজার পুত্র=রাজপুত্র, বজ্রের দ্বারা আহত=বজ্রাহত, শূল পাণিতে যাহাব=শূলপাণি। উপরের দৃষ্টান্ত কয়টিতে যথাক্রমে—'হইতে' (৫মী বিভক্তিচিহ্ন), 'র' (৬ষ্ঠী), 'দ্বারা' (৩য়া) এবং 'তে' (৭মী বিভক্তিচিহ্ন) লোপ পাইয়াছে।

অলুক সমাস ঃ—কখনও কখনও সমাস গঠনকালে বিভক্তির লোপ হয় না। যে সমাসে এই অন্বয়জ্ঞাপক বিভক্তি লোপ হয় না সেই সমাসকে অলুক সমাস বলে। যথা—

তৎসম ঃ—যুধিষ্ঠির, ভ্রাতুষ্পুত্র, সরসিজ, মনসিজ, খেচর ইত্যাদি।

বাংলা ঃ—তালের বড়া, গরুর গাড়ি, মামার বাড়ী, তেলেভাজা গায়েহলুদ, হাতেকাটা (সুতা), হাতেখড়ি, গায়েপড়া ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **দ্বন্দ্ব** সমাস বলে। এই সমাসের ব্যাস-বাক্যে 'এবং', 'ও', 'আর' প্রভৃতি অব্যয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—দেব ও দ্বিজ=দেবদ্বিজ, রুই এবং কাতলা=রুইকাতলা, ইট ও কাঠ এবং চুন ও সুরকি=ইটকাঠচুনসুরকি। **এইরূপ**—মাতাপিতা, পিতাপুত্র, পাপপুণ্য, দম্পতি (জায়া ও পতি), অহোরাত্র, (অহঃ ও রাত্রি), অহর্নিশ (অহঃ ও নিশা), কুশীলব (কুশ ও লব), ব্রাহ্মণচণ্ডাল ইত্যাদি।

অলুক দ্বন্দ্ব—বুকে ও পিঠে=বুকেপিঠে। **এইরূপ**—হাতেপায়ে, দুধে-ভাতে, বনে-বাদাড়ে, ঝোপে-ঝাড়ে, মায়েঝিয়ে, হাটে-মাঠে-বাটে ইত্যাদি।

ইত্যাদি অর্থে দ্বন্দ্ব—কাপড়-চোপড় (কাপড় ইত্যাদি), চুরি-চামারি (চুরি এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য কাজ বুঝাইতে—চুরি ও চামারি)। **এইরূপ**—দোকান-পাট, বাসন-কোসন, চাকর-বাকর।

সমার্থক দ্বন্দ্ব—ডাক্তার-বৈদ্য, শাক-সব্‌জি, ঠাট্টা-মস্করা, কাগজ-পত্র ইত্যাদি।

দুই-এর অধিক পদ লইয়াও দ্বন্দ্ব সমাস গঠিত হইতে পারে। যথা—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ, হাত-পা-নাক-কান, পাইক-পেয়াদা-সিপাহী-সান্ত্রী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ইত্যাদি।

তৎপুরুষ

যে সমাসে পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তির লোপ হয় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **তৎপুরুষ** সমাস বলে।

(ক) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

(কর্ম-বাচক)

সাহায্যপ্রাপ্ত (সাহায্যকে প্রাপ্ত), বিস্ময়াপন্ন, দেবাশ্রিত, লোকাতীত, মাসাশৌচ (মাস ব্যাপিয়া অশৌচ), চিরসুখী, চিরশত্রু, ক্ষণস্থায়ী, ছেলে-ভুলানো (ছেলেকে ভুলানো), কলাবেচা, গাধোয়া, রথদেখা ইত্যাদি।

(খ) তৃতীয়া তৎপুরুষ

(করণ-বাচক)

ভস্মাচ্ছাদিত = ভস্ম দ্বারা আচ্ছাদিত, কণ্টকাকীর্ণ, বিস্ময়বিহ্বল, রসসিক্ত, ঘর্মাক্ত, ইচ্ছালব্ধ, ক্ষমাহীন, ঢেঁকিছাঁটা, ঝাঁটাপেটা, মধুমাখা, দা-কাটা ইত্যাদি।

(গ) চতুর্থী তৎপুরুষ

(উদ্দেশ্য-বাচক)

স্বাস্থ্য-বিভাগ (স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে বিভাগ), গো-ব্রাহ্মণ-হিত (গো ও ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে হিত), দেবদত্ত (দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত), মাল-গুদাম (মালের জন্য গুদাম), ডাক-মাসুল, মেয়ে-স্কুল, জীয়ন-কাঠি, শোষ-কাগজ, ধান-জমি, রেল-ভাড়া, বিয়ে-পাগলা ইত্যাদি।

(ঘ) পঞ্চমী তৎপুরুষ

(বিশ্লেষ-বাচক)

তৎসম—শাপমুক্ত (শাপ হইতে মুক্ত), সত্যভ্রষ্ট, অগ্নিদগ্ধ, দূরাগত, যুদ্ধোত্তর, তদ্ভিন্ন ইত্যাদি।

বাংলা—আগাগোড়া (আগা হইতে গোড়া), গাঁছাড়া, গাছপাড়া, বিলাত-ফেরৎ, চাকভাঙা ইত্যাদি।

(ঙ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ

(সম্বন্ধ-বাচক)

অতিথিসেবা (অতিথির সেবা), সৎসঙ্গ, ছাগদুগ্ধ (ছাগীর দুগ্ধ), বিশ্বামিত্র (বিশ্বের মিত্র), বনস্পতি, রাজহংস, ঠাকুরপো, মালগাড়ি, চা-বাগান, পুলিস-সাহেব, জাহাজ-ঘাটা ইত্যাদি।

(চ) সপ্তমী তৎপুরুষ

(স্থান ও কাল-বাচক)

কার্যদক্ষ (কার্যে দক্ষ), রণনিপুণ, কবিগুরু, শিরোধার্য, রৌদ্রপক্ব, কবিশ্রেষ্ঠ, কাশীবাসী, নরাধম, পুরুষোত্তম, আকাশ-গঙ্গা, শ্রুতপূর্ব (পূর্বে শ্রুত), গাছপাকা, গোলাভরা, লিস্টিভুক্ত, কোলকুঁজো, পাড়াবেড়ানী, বাটাভরা, পুঁথিগত ইত্যাদি।

(ছ) নঞ্ তৎপুরুষ

'নাই' বা 'নয়' অর্থে নঞ্ এই অব্যয়ের সহিত পর পদের যে সমাস হয়, তাহাকে **নঞ্ তৎপুরুষ** সমাস বলে। ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে নঞ 'অ'-তে এবং স্বরবর্ণের পূর্বে 'অন' বা 'ন'-তে রূপান্তরিত হয়। বাংলা ভাষায় নঞ-এর নিজস্ব রূপ 'অ', 'আ', বা 'অনা' হইয়া থাকে।

তৎসম—অম্লান (ন ম্লান—ম্লান নহে); এইরূপ—অসুখ, অকাতর, অভূতপূর্ব, অনাদর, অনভিজ্ঞ, অনুন্নত, নাতিশীতোষ্ণ, অনন্য ইত্যাদি।

বাংলা—আভাঙ্গা, আলুনি, অনাছিষ্টি, নামঞ্জুর, নিখরচা, অনামুখো, আকাচা, আঘাটা ইত্যাদি।

(জ) উপপদ তৎপুরুষ

উপসর্গ ভিন্ন অন্য শব্দের সহিত কৃৎপ্রত্যয়যুক্ত পদের যে সমাস হয়, তাহাকে **উপপদ তৎপুরুষ** সমাস বলে। পূর্ব পদ বিভিন্ন কারকের অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

তৎসম—মধুপ (মধু পান করে যে—কর্ম) ; পঙ্কজ (পঙ্কে জন্মে যে—অধিকরণ) ; পাদপ (পাদ বা মূল দ্বারা পান করে যে)। এইরূপ—শাস্ত্রবিৎ, গৃহস্থ, চিরস্থায়ী, স্বল্পভাষী, ইন্দ্রজিৎ, ধনঞ্জয়, ভূচর ইত্যাদি।

বাংলা—ছেলেধরা, ধামাধরা, ঘরভাঙানী, বর্ণচোরা ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব সমাস

যে সমাসে পূর্ব পদে অব্যয় থাকে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **অব্যয়ীভাব সমাস** বলে।

তৎসম—প্রতিমূর্তি (মূর্তির সদৃশ), প্রতিবিম্ব, উপদ্বীপ, উপবন, উপকূল (কূলের সমীপে), উপকণ্ঠ, দুর্ভিক্ষ (ভিক্ষার অভাব), যথাশক্তি (শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া), যথাকাল, যথেচ্ছ, যথাসাধ্য, যথেষ্ট, আকণ্ঠ (কণ্ঠ পর্যন্ত), আজীবন, আকর্ণ, আসমুদ্রহিমাচল, আমূল, প্রতিদিন (দিন দিন), প্রতিগৃহ, অনুক্ষণ, অনুরূপ (রূপের যোগ্য)।

বাংলা—হা-ভাত (ভাতের অভাব), ফি-বছর (বছর বছর), প্রতিঘর, হা-ঘর, মাথাপিছু, জনপ্রতি, মাঠ-কে-মাঠ, জন-কে-জন ইত্যাদি।

কর্মধারয়

যে সমাসে উত্তর পদের প্রাধান্য থাকে এবং পূর্ব পদ উত্তর পদের বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তাহাকে **কর্মধারয়** বলে। এই সমাসে সমস্যমান পদের পূর্ব পদ বিশেষণ এবং পর পদ বিশেষ্য, অথবা উভয়ই সমজাতীয় হইতে পারে।

বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের যোগে কর্মধারয় সমাস :—

তৎসম—মহাপুরুষ (মহান্ যে পুরুষ), নবান্ন, পাণ্ডুলিপি, কদাকার (কু বা কুৎসিত যে আকার), কাপুরুষ (কু + পুরুষ), স্বায়ত্তশাসন, বিশ্বকোষ, নীলোৎপল ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা—হেড-মাস্টার, খাসমহল, জঙ্গীলাট, বেসুর, বে-আরাম, কানাকড়ি, কাঁচকলা, কচিখোকা ইত্যাদি।

বিশেষণ ও বিশেষণ	**তৎসম**—শান্তশিষ্ট (শান্ত অথচ শিষ্ট), নীললোহিত, ঈষদুষ্ণ, পণ্ডিতমূর্খ ইত্যাদি। **খাঁটি বাংলা**—কড়িকোমল, মিঠেকড়া, চালাকচতুর, কাঁচামিঠা, ফিকালাল ইত্যাদি।
বিশেষ্য ও বিশেষ্য	**তৎসম**—রাজর্ষি (যিনি রাজা তিনিই ঋষি), বটবৃক্ষ, পিতৃদেব ইত্যাদি। **খাঁটি বাংলা**—পিতাঠাকুর, ঠাকুরদাদা, পণ্ডিতমশাই ওস্তাদজী, বউঠান ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাসে কোন কোন স্থলে উত্তর পদ পূর্বে বসে। যথা, পুরুষোত্তম (উত্তম পুরুষ)। এইরূপ খাঁটি বাংলায়—ডিমসিদ্ধ, তেলপড়া, গোটাদুই, মাসেক, চালভাজা ইত্যাদি।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়—

কতকগুলি কর্মধারয় সমাসে মধ্যপদের লোপ হয়, এগুলিকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

তৎসম— সিংহাসন (সিংহ-চিহ্নিত আসন), ভিক্ষান্ন (ভিক্ষালব্ধ অন্ন), পলান্ন (পল বা মাংস-মিশ্রিত অন্ন), চতুর্দশ (চতুঃ অধিক দশ), স্বর্ণাক্ষর ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা—বরফজল (বরফ-মিশ্রিত জল), জীবনবীমা (জীবন নাশের ভয়ে যে বীমা), ঘরজামাই, দুধ-সাগু, হাত-পাখা, সিঁদুর-কৌটা ইত্যাদি।

উপমান কর্মধারয়—

তৎসম—তুষার-ধবল (তুষারের ন্যায় ধবল), কুসুম-কোমল, হস্তিমূর্খ, বক-ধার্মিক, ঘনশ্যাম ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা—মিশকালো (মিশির ন্যায় কালো), বিড়াল-তপস্বী, গো-বেচারা, ফুলবাবু ইত্যাদি।

উপমিত কর্মধারয়—

তৎসম--মুখচন্দ্র (চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ), চরণ-কমল, কর-পল্লব, পুরুষ-সিংহ ইত্যাদি।

রূপক কর্মধারয়—

তৎসম—শোকসিন্ধু, হৃদয়মন্দির, চিত্তচকোর, কীর্তিধ্বজা ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা—মনোরথ (মন রূপ রথ), সুখসায়র, পরাণপাখী, চাঁদমুখ, মনমাঝি, ভাবদরিয়া ইত্যাদি।

দ্বিগু

সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে থাকিয়া যে কর্মধারয় সমাস নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে **দ্বিগু সমাস** বলে। এই সমাসে সমষ্টি অর্থ প্রকাশ করে।

তৎসম—পঞ্চবটী (পঞ্চ বটের সমাহার), পঞ্চভূত, অষ্টধাতু, ত্রিভুবন, সপ্তাহ, ত্রিফলা, শতবার্ষিকী ইত্যাদি।

বাংলা—পাঁচফোড়ন, তেমাথা, চৌমুহানী, দুআনি, সেতার (সাতটি তারের সমাহার) ইত্যাদি।

বহুব্রীহি

যে সমাসে সমস্যমান পদদ্বয়ের অর্থ প্রধানরূপে না বুঝাইয়া সমস্ত পদটি তদর্থবিশিষ্ট অন্য কোন বস্তুকে বুঝায় তাহাকে **বহুব্রীহি সমাস** বলে।

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি—পূর্ব পদ বিশেষণ ও পর পদ বিশেষ্য হইলে সমানাধিকরণ হয়।

তৎসম—নীলকণ্ঠ (নীল কণ্ঠ যাহার), পীতাম্বর, অল্পায়ু, নষ্টমতি, দশানন, বীতস্পৃহ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কৃতবিদ্য, সবাক্ (বাক্যের সহিত বর্তমান যে), দ্বীপ (দ্বি বা দুইদিকে অপ্ যাহার), অন্তরীপ, অজ্ঞান (নাই জ্ঞান যাহার), অনন্ত, অদ্বিতীয়, নিরুপায়, নিঃসহায়, নিরুপদ্রব, সুহৃদ ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা—কটাচোখো, হতভাগা, কালামুখো, একরোখা, একগুঁয়ে, আটচালা, আটপৌরে (অষ্টপ্রহরের যোগ্য), বদখেয়ালী, এলোকেশী, লাসপেড়ে, আনাড়ী, অকেজো, অবুঝ, অপয়া (নাই পয় বা ভাগ্য যাহার), সাত-নম্বর (সাত নম্বর যাহার), নির্জলা, শুচিবেয়ে (শুচি বায়ু যাহার), অলক্ষুণে, হা-ভাতে, বেহায়া, বেকার, বেতার ইত্যাদি।

ব্যধিকরণ বহুব্রীহি—পূর্ব পদ বিশেষণ না হইলে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হয়।

তৎসম—পদ্মনাভ (পদ্ম নাভিতে যাহার—বিষ্ণু), শূলপাণি (শিব), পুষ্পধন্বা (পুষ্প ধনু যাহার—কামদেব), কমলাক্ষ, নদীমাতৃক (নদী মাতা যাহার,—যে দেশের), খড়্গহস্ত, জনবিরল, ভাবপ্রধান, শ্রুতিকটু, পদ্মগন্ধি, বাক্‌সর্বস্ব ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা—দিলদরিয়া, মা-মরা, মণিহারা (ফণী) ইত্যাদি।

ব্যতিহার বহুব্রীহি—পরস্পর সাপেক্ষ ক্রিয়া বুঝাইলে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি দ্বারা যে বহুব্রীহি হয় তাহাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি বলে। যথা, কেশাকেশি, লাঠালাঠি, কোলাকুলি ইত্যাদি।

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি—যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত মধ্যপদের লোপ হয়, তাহাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। যথা—মৃগনয়না (মৃগের মত সুন্দর নয়ন যাহার), আটহাতী (আট হাত পরিমাণ যাহার), দশসেরা।

অলুক বহুব্রীহি—গায়েহলুদ, হাতেঘড়ি ইত্যাদি।

নঞ্‌ বহুব্রীহি—বেইমান, অপয়া, নিঃসঙ্গিনী, হাঘরে (ঘর নাই যাহার), বেয়াদব ইত্যাদি।

সমাসবদ্ধ পদ ঃ পূর্ব পদ ও উত্তর পদ

দুই বা ততোধিক শব্দ মিলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-প্রকাশক শব্দ গঠিত হয। এইরূপ শব্দ সমাস-নিষ্পন্ন হইয়া গঠিত হয। নিম্নে এই শ্রেণীর শব্দগঠনের কতিপয দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।—

(ক) পূর্বপদ

অন্ন—অন্নদান, অন্নাভাব, অন্নদাতা, অন্নহীন, অন্নদাস, অন্নপূর্ণা, অন্নজল, অন্নকষ্ট, অন্নসত্র, ইত্যাদি।

অর্থ—অর্থলাভ, অর্থলোভ, অর্থপিশাচ, অর্থগৌরব, ইত্যাদি।

আচার—আচারনিষ্ঠ, আচারভ্রষ্ট, আচার-বিচার, আচারহীন, ইত্যাদি।

আশ্রম—আশ্রমবাসী, আশ্রমহীন, ইত্যাদি।

কর্ম—কর্মকর্তা, কর্মকুশল, কর্মনিষ্ঠ, কর্মফল, কর্মবীর, কর্মভূমি, কর্মভোগ, ইত্যাদি।

গৃহ—গৃহকর্ম, গৃহদেবতা, গৃহপ্রবেশ, গৃহলক্ষ্মী, ইত্যাদি।

তীর্থ—তীর্থভ্রমণ, তীর্থদর্শন, তীর্থবাস, তীর্থকর্ম, ইত্যাদি।

দেব—দেবলোক, দেবদর্শন, দেবদাসী, দেবদুর্লভ, দেবভাষা, দেবভোগ্য, দেবমন্দির, দেবসেনা, ইত্যাদি।

ধর্ম—ধর্মকর্ম, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মচক্র, ধর্মচিন্তা, ধর্মনিষ্ঠা, ধর্মবুদ্ধি, ধর্মরক্ষা, ধর্মলোপ, ধর্মশিক্ষা, ধর্মোপদেশ, ধর্মশীল, ধর্মাধর্ম, ইত্যাদি।

নর—নরলোক, নরসিংহ, নরশার্দূল, নরপিশাচ, নরখাদক, নরাধম, নরশ্রেষ্ঠ, নরনারায়ণ, ইত্যাদি।

পথ—পথচারী, পথভ্রষ্ট, পথরোধ, পথহারা, পথকর, পথখরচা, ইত্যাদি।

পদ—পদগৌরব, পদমর্যাদা, পদক্ষেপ, পদচ্যুত, পদছায়া, পদদলিত, পদধূলি, পদস্খলন, পদাবলী, ইত্যাদি।

পর—পরনিন্দা, পরচর্চা, পরধর্ম, পররাষ্ট্র, পররাজ্য, পরলোক, পরার্থ, ইত্যাদি।

পুরুষ—পুরুষকার, পুরুষ-পরম্পরা, পুরুষব্যাঘ্র, পুরুষসিংহ, পুরুষোচিত, পুরুষোত্তম, ইত্যাদি।

প্রাণ—প্রাণান্ত, প্রাণত্যাগ, প্রাণপ্রিয়, প্রাণলাভ, প্রাণপাত, প্রাণদণ্ড, প্রাণরক্ষা, প্রাণভিক্ষা, প্রাণদান, প্রাণনাশ, প্রাণসংহার, প্রাণান্ত, প্রাণবিসর্জন, ইত্যাদি।

ফল—ফললাভ, ফলহীন, ফলভোগ, ইত্যাদি।

ফুল—ফুলকাটা, ফুলদানি, ফুলদার, ফুলদোল, ফুলধনু, ফুলবাবু, ফুলবাতাসা, ফুলশয্যা, ইত্যাদি।

বন—বনফুল, বনজঙ্গল, বনদেবতা, বনবাদাড়, বনফল, বনবাস, বনবিড়াল, বনভোজন, বনস্পতি, ইত্যাদি।

বিষ—বিষকুম্ভ, বিষক্রিয়া, বিষদুষ্ট, বিষধর, বিষনাশক, বিষবড়ি, বিষদাঁত, বিষবাণ, ইত্যাদি।

ভোগ—ভোগসুখ, ভোগলালসা, ভোগবাসনা, ভোগবিলাস, ভোগস্পৃহা, ভোগাকাঙ্ক্ষা, ইত্যাদি।

মন্ত্র—মন্ত্রগুরু, মন্ত্রতন্ত্র, মন্ত্রদাতা, মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রপূত, মন্ত্রমুগ্ধ, মন্ত্রশক্তি, ইত্যাদি।

মুখ—মুখপদ্ম, মুখশোভা, মুখামৃত, মুখচন্দ্রিকা, মুখরক্ষা, মুখসর্বস্ব, ইত্যাদি।

যোগ—যোগনিদ্রা, যোগবল, যোগভঙ্গ, যোগাযোগ, যোগাসন, ইত্যাদি।

রক্ত—রক্তকমল, রক্তকরবী, রক্তনদী, রক্তপিপাসু, রক্তবীজ, রক্তচক্ষু; ইত্যাদি।

রাজ—রাজকর, রাজটিকা, রাজতন্ত্র, রাজদণ্ড, রাজদূত, রাজদ্রোহ, রাজনীতি, রাজপদ, রাজপথ, রাজপ্রাসাদ, রাজসভা, রাজর্ষি, ইত্যাদি।

লীলা—লীলাখেলা, লীলাময়ী, লীলাস্থল, লীলাবসান, ইত্যাদি।

লোক—লোকচরিত্র, লোকজন, লোকনিন্দা, লোকলজ্জা, লোকলস্কর, লোকশিক্ষা, লোকসংখ্যা, লোকহিত, লোকান্তর, লোকালয়, ইত্যাদি।

শক্তি—শক্তিশালী, শক্তিশেল, শক্তিহীন, শক্তিসামর্থ্য ইত্যাদি।

শিক্ষা—শিক্ষাদান, শিক্ষাগুরু, শিক্ষালয়, শিক্ষাসমস্যা, শিক্ষাসংস্কার, শিক্ষাসঙ্কট, ইত্যাদি।

সত্য—সত্যপালন, সত্যবাদী, সত্যভঙ্গ, সত্যরক্ষা, সত্যসন্ধ, সত্যাগ্রহ, ইত্যাদি।

স্নেহ—স্নেহাস্পদ, স্নেহহীন, স্নেহমুগ্ধ, ইত্যাদি।

হস্ত—হস্তগত, হস্তাক্ষর, হস্তান্তর, হস্তান্তরিত, ইত্যাদি।

হাত—হাতেখড়ি, হাতখরচ, হাতছাড়া, হাতছানি, হাতটান, হাততালি, হাততোলা, হাতধরা, হাতবদল, হাতসাফাই, ইত্যাদি।

(খ) উত্তর পদ

অন্তর—উপায়ান্তর, দেশান্তর, দেহান্তর, দ্বীপান্তর, লোকান্তর, সময়ান্তর, ইত্যাদি।

অন্ন—পরমান্ন, শাকান্ন, হবিষ্যান্ন, পলান্ন, ইত্যাদি।

অর্থ—ভাবার্থ, মর্মার্থ, অনর্থ, বিশেষার্থ, সংক্ষেপার্থ, ইত্যাদি।

আচার—দুরাচার, পাপাচার, সদাচার, অনাচার, স্বেচ্ছাচার, অত্যাচার, ম্লেচ্ছাচার, ইত্যাদি।

আশ্রম—অনাথাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, সন্ন্যাসাশ্রম, ইত্যাদি।

উদ্ধার—পঙ্কোদ্ধার, পাঠোদ্ধার, ইত্যাদি।

কর্ম—গৃহকর্ম, পুণ্যকর্ম, পাপকর্ম, অপকর্ম, বিষয়কর্ম, দুষ্কর্ম, ধর্মকর্ম, ইত্যাদি।

গ্রহ—গলগ্রহ, দুষ্টগ্রহ, নবগ্রহ, শুভগ্রহ, ইত্যাদি।

তীর্থ—সতীর্থ।

দেব—মহাদেব, ভূদেব, পিতৃদেব, গুরুদেব, ইত্যাদি।

ধর্ম—অধর্ম, স্বধর্ম, গৃহধর্ম, নারীধর্ম, পরধর্ম, ইত্যাদি।

পত্র—কাগজপত্র, জয়পত্র, নিমন্ত্রণপত্র, পরিচয়পত্র, পুঁথিপত্র, বাসনপত্র, সন্ধি-পত্র, সংবাদপত্র, ইত্যাদি।

পথ—রাজপথ, কুপথ, সুপথ, বিপথ, ইত্যাদি।

পদ—রাজপদ, গোষ্পদ, শ্বাপদ, ইত্যাদি।

পর—পরার্থপর, স্বার্থপর।

পুরুষ—পিতৃপুরুষ, মহাপুরুষ, পূর্বপুরুষ, চৌদ্দপুরুষ, সুপুরুষ, কাপুরুষ, বীরপুরুষ।

প্রাণ—ধর্মপ্রাণ, দেশপ্রাণ।

ফল—সুফল, কুফল, নিষ্ফল, বিফল, সফল, কর্মফল, ভাগ্যফল।

বন—আম্রবন, কুঞ্জবন, বেণুবন।

বিষ—আশীবিষ, নির্বিষ।

ভোগ—সুখভোগ, দুঃখভোগ, কষ্টভোগ, ফলভোগ, কর্মভোগ।

মণ্ডল—আকাশমণ্ডল, দিঙ্‌মণ্ডল, নভোমণ্ডল, মুখমণ্ডল, সূর্যমণ্ডল।

মুখ—চন্দ্রমুখ, পরাঙ্মুখ, সম্মুখ, ষড়্‌মুখ।

যাত্রা—জীবনযাত্রা, তীর্থযাত্রা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, সমুদ্রযাত্রা।

যোগ—সুযোগ, দুর্যোগ, শুভযোগ, জলযোগ।

রাজ—যুবরাজ, অধিরাজ, ধর্মরাজ, পশুরাজ।

লীলা—মানবলীলা, ইহলীলা, দেবলীলা।

লোক—ভূলোক, মর্ত্যলোক, দ্যুলোক, নরলোক, দেবলোক, কু-লোক।

শক্তি—রাজশক্তি, গণশক্তি, আত্মশক্তি, যথাশক্তি, সঙ্ঘশক্তি, দৈবশক্তি, বাক্-শক্তি, নৌশক্তি, মহাশক্তি, আদ্যাশক্তি।

শিক্ষা—বিদ্যাশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, সুশিক্ষা, কুশিক্ষা।

সত্য—মহাসত্য, অসত্য।

স্নেহ—মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ, সন্তানস্নেহ।

হাত—বেহাত, পাঁচহাত।

অনুশীলনী

১। উদাহরণ সহযোগে নিম্নলিখিত সমাসগুলির পার্থক্য দেখাও :—

কর্মধারয় ও বহুব্রীহি। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি। নঞ্ তৎপুরুষ ও নঞ্ বহুব্রীহি। উপমিত, উপমান ও রূপক কর্মধারয় সমাস।

২। নিম্নলিখিত সমাসগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ কর ও দৃষ্টান্ত দাও :—

অলুক সমাস। ব্যধিকরণ বহুব্রীহি। সমানাধিকরণ বহুব্রীহি। সমার্থক দ্বন্দ্ব। উপমাত্মক বহুব্রীহি। একদেশ সমাস।

৩। নিম্নলিখিত পদগুলির সমাস নির্ণয় কর ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

(ক) তেপায়া। ডাকাবুকো। বিয়েপাগলা। মাথাব্যাথা। চালাক-চতুর। লাঠালাঠি। একঘরে। তেলেভাজা। দাকুমড়া। বকধার্মিক।

(খ) আগাগোড়া। রাজহংস। বাগ্‌দত্তা। আজানুলম্বিত। গাছপাকা। মনোরথ। অভূতপূর্ব। অলক্ষুণে। মতিচ্ছন্ন। আনাড়ী। —ক বি. মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৩৪, '৩৫॥

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পূর্বপদরূপে ব্যবহার করিয়া দুইটি করিয়া সমস্তপদ গঠন কর এবং উহাদের সাহায্যে বাক্য রচনা করিয়া দেখাও :—

অন্ন, নর, পুরুষ, প্রাণ, পথ, বিষ, আচার, যোগ, হাত।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে পরপদরূপে ব্যবহার করিয়া সমস্তপদ গঠন কব এবং উহাদের সাহায্যে বাক্য রচনা করিয়া দেখাও :—

অন্তর, আলয়, পরায়ণ, ভ্রষ্ট, লোক। —ক. বি. মাধ্যমিক, ১৯৪৮॥

শব্দার্থ ঃ অর্থভেদে শব্দের শ্রেণীবিভাগ

শব্দের অর্থ চিরদিন সমান থাকে না। ভাষার একই শব্দ এক সময় একপ্রকার অর্থ এবং সময়ান্তরে অন্যপ্রকার অর্থ বহন করিতে পারে। তাই অর্থের বিভিন্নতা অনুসারে শব্দকে কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ অর্থানুসারে ভাগ করিয়া শব্দের তিনটি শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—যৌগিক শব্দ, রূঢ় (বা রূঢ়ি) শব্দ এবং যোগরূঢ় শব্দ।

যৌগিক শব্দ

যে-সকল শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ ভাবে ব্যুৎপত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়, তাহাদের নাম যৌগিক শব্দ। ইহা তিন প্রকারে গঠিত হইতে পারে। যথা—

(ক) ধাতুর সহিত কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে ঃ—করে যে সে—কর্তা, গায় যে—গাইয়ে, রাঁধে যে (√রাঁধ্ + নী)—রাঁধুনী, যাহা উড়িতেছে (√উড়্ + অন্ত)—উড়ন্ত, পড়ে যে (√পড়্ + উয়া)—পড়ুয়া।

(খ) শব্দের সহিত তদ্ধিত প্রত্যয়ের যোগে ঃ—পণ্ডিতের কার্য (পণ্ডিত + ই)—পণ্ডিতি, রেশমে নির্মিত (রেশম + ঈ)—রেশমী, বেনারসে বা কাশ্মীরে উৎপন্ন (বেনারস + ঈ ; কাশ্মীর + ঈ)—বেনারসী, কাশ্মীরী। এইরূপ—ন্যায় যিনি জানেন—নৈয়ায়িক, শিবের উপাসক—শৈব, মাটির তৈয়ারী—মেটে, উকিলের কার্য—ওকালতি, ইত্যাদি।

(গ) শব্দের সহিত শব্দের যোগে ঃ—দেবের আলয়—দেবালয়, ছায়া-প্রধান তরু—ছায়াতরু, গাছে পাকা—গাছপাকা, হাত ও পা—হাত-পা, কুসুমের মত কোমল—কুসুমকোমল।

রূঢ় শব্দ

যে-সকল শব্দ মাত্র একটি অর্থেই রূঢ় বা প্রসিদ্ধ এবং সে অর্থের সহিত ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই তাহাদের নাম 'রূঢ়' শব্দ। যথা—

সন্দেশ—বাংলা ভাষায় ইহার বর্তমান অর্থ 'মিষ্টান্ন'। এই বিশেষ অর্থেই শব্দটি প্রসিদ্ধ। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—'সংবাদ'। ইহা রূঢ় শব্দ। এইরূপ অন্য বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রচলিত আছে।

হঠাৎ—মূল অর্থ 'সবলে', বিশেষ **অর্থ**—'অকস্মাৎ'।

ডালি—চাঁচারি ইত্যাদির নির্মিত ছোট ডালা, বিশেষ অর্থ—'ভেট'।

দারুণ—মূল অর্থ—কাষ্ঠ (=দারু)-নির্মিত, বিশেষ অর্থ—'কঠিন'।

মৃগ—মূল অর্থ—'পশু' (যেমন—মৃগরাজ), বিশেষ অর্থ—'হরিণ'।

ছড়িদার—মূল অর্থ—'বেত্রধারী', বিশেষ অর্থ (বর্তমানে) 'পাণ্ডার অনুচর'।

দেউলিয়া—'দেউল' শব্দের অর্থ 'দেবমন্দির', সুতরাং 'দেউলিয়া' শব্দের মূল অর্থ ছিল দেবমন্দিরে গৃহীত-আশ্রয় ব্যক্তি। বর্তমান বিশেষ অর্থ—নিঃসম্বল, ঋণশোধে অসমর্থ ব্যক্তি। এখন দেবমন্দিরের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

যোগরূঢ় শব্দ

যে-সকল শব্দের অর্থ ব্যুৎপত্তিগত অর্থের অনুসরণ করিয়াও একটি বিশেষ অর্থে রূঢ় বা প্রসিদ্ধ হয়, তাহাদের নাম **যোগরূঢ়** শব্দ। ইহাও তিন প্রকারে গঠিত হইতে পারে ; যথা—

(ক) কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে ; যথা—যাহা খাওযা হয় তাহা **অন্ন** ; কিন্তু, বিশেষভাবে বাঙালীর খাদ্য 'ভাত' অর্থেই বাংলায় ইহা প্রসিদ্ধ। রাখে যে সে **রাখাল** ; কিন্তু বিশেষভাবে গরু, ছাগল প্রভৃতি রাখে যে তাহাকে বুঝাইতে ইহা প্রসিদ্ধ। এইরূপ—পরিবার, কাটারি, ঝরনা প্রভৃতি শব্দ।

(খ) তদ্ধিত প্রত্যয়ের যোগে ; যথা—রঘুর অপত্য **রাঘব** ; কিন্তু বিশেষ ভাবে রামচন্দ্রকে বুঝাইতেই ইহা প্রসিদ্ধ। হাত আছে যাহার সে **হাতী** ; কিন্তু একমাত্র শুণ্ডধারী বৃহৎ পশুবিশেষকে বুঝাইতেই ইহা প্রসিদ্ধ। **সম্বন্ধী**—মূল অর্থ যাহার সহিত সম্বন্ধ আছে। বিশেষ অর্থ—শ্যালক। এইরূপ—বৈবাহিক, তৈল, বাশি প্রভৃতি শব্দ।

(গ) শব্দের সহিত শব্দ বা ধাতুর যোগে ; যথা—রাজার পুত (=পুত্র)—**রাজপুত** ; কিন্তু রাজপুতানার যোদ্ধা-বিশেষকেই বুঝায়। পঙ্কে জন্মে যাহা—**পঙ্কজ** ; কিন্তু কেবলমাত্র পদ্মকেই বুঝায় (শৈবাল, কুমুদ বা পাঁকাল মাছ প্রভৃতিকে বুঝায় না)।

জলদ—মূল অর্থ—'যাহা জল দেয়', বিশিষ্ট অর্থ—'মেঘ'।

দুর্ভিক্ষ—মূল অর্থ—'ভিক্ষার অভাব', বিশিষ্ট অর্থ—'দেশব্যাপী অন্নকষ্ট'।

শব্দার্থের পরিবর্তন

[শব্দার্থের উৎকর্ষ : অপকর্ষ : সঙ্কোচ : প্রসার ও বিষয়ান্তর-প্রাপ্তি]

প্রত্যেক ভাষাতেই শব্দের অর্থ নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। বাংলা ভাষাতেও যে-সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এমন শব্দ আছে যেগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল শব্দ উদ্ভূত হওয়ার সময়ে উহাদের অর্থ একরূপ ছিল, কিন্তু বর্তমানে অন্যরূপ অর্থ দাঁড়াইয়াছে। শব্দের মূলগত এবং প্রয়োগগত অর্থের বৈষম্য বিচার করিয়া বাংলা শব্দাবলীকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করিয়া দেখা যায়। যথা—শব্দার্থের (১) উৎকর্ষ, (২) অপকর্ষ, (৩) সঙ্কোচ, (৪) প্রসার, (৫) বিষয়ান্তর-প্রাপ্তি। নিম্নে প্রত্যেক শ্রেণীর শব্দের কয়েকটি করিয়া উদাহরণ দেওয়া হইল।—

শব্দার্থের উৎকর্ষ : মূল অর্থ অপেক্ষা অর্থের উন্নতি বা অর্থ-গৌরব দেখা দিলে শব্দার্থের উৎকর্ষ হয়। যেমন—

ধ্যান—মূল অর্থ—'চিন্তা' ; প্রচলিত অর্থ—'পরমার্থচিন্তা'।

মন্দির—মূল অর্থ—'গৃহ' ; প্রচলিত অর্থ—'দেবালয়'।

মান—মূল অর্থ—'পরিমাপ' ; প্রচলিত অর্থ—'সম্মান'।

সংকীর্তন—মূল অর্থ—'গুণাদি কথন' ; প্রচলিত অর্থ—'শ্রীহরির মহিমাগান'।

শব্দার্থের অপকর্ষ : মূল অর্থ অপেক্ষা অর্থের অগৌরব বা হীনতা প্রকাশ পাইলে শব্দার্থের অপকর্ষ হয়। যেমন—

ইতর—মূল অর্থ—'অপর লোক' ; প্রচলিত অর্থ—'নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তি', 'ছোটলোক'।

মহাজন—মূল অর্থ—'মহাপুরুষ', 'মহৎ ব্যক্তি' ; প্রচলিত অর্থ—'বণিক', 'কুসীদজীবী'।

ঝি—মূল অর্থ—'কন্যা' ; সমাসবদ্ধ পদে না থাকিলে প্রচলিত অর্থ—'চাকরানী'। সমাসবদ্ধ পদে থাকিলে—'কন্যা' ; যেমন—ঠাকুরঝি।

বিরক্ত—মূল অর্থ—'বৈরাগ্যযুক্ত' ; প্রচলিত অর্থ—'অসন্তুষ্ট'।

রাগ—মূল অর্থ—'অনুরাগ', 'ভালবাসা', 'রং' ; প্রচলিত অর্থ—'ক্রোধ'।

উজবুক—(তুর্কী উজবেক) মূল অর্থ—'জাতিবিশেষের নাম'—উজবেকিস্তানের অধিবাসী। প্রচলিত অর্থ—'বুদ্ধিহীন', 'বোকা'।

রাম—মূল অর্থ—'রামায়ণ কাব্যের নায়ক', 'সুন্দর' ; প্রচলিত অর্থ—'এক', 'বৃহত্ত্বসূচক বিশেষণ' (যেমন—রাম-দা, রাম-শিঙা ইত্যাদি)।

পাষণ্ড—মূল অর্থ—'ধর্মসম্প্রদায়' ; প্রচলিত অর্থ—'ধর্মজ্ঞানহীন', 'অত্যাচারী'।

ঠাকুর—মূল অর্থ—'দেবতা' ; প্রচলিত অর্থ—'পাচক ব্রাহ্মণ'।

শব্দার্থের প্রসার : কোন কোন শব্দ মূলগত বিশেষ অর্থটি না বুঝাইয়া, সামান্য ব্যাপক অর্থটি বুঝায়, উহাকেই অর্থের প্রসার বলে। যেমন—

তৈল—মূল অর্থ—'তিল হইতে জাত স্নেহপদার্থ' ; প্রচলিত অর্থ—'উদ্ভিদ-জাত যে-কোন প্রকার স্নেহপদার্থ'—নারিকেল তৈল, সরিষার তৈল ইত্যাদি।

বাঁশি—মূল অর্থ—'বংশনির্মিত ফুঁ দিয়া বাজাইবার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ' ; প্রচলিত অর্থ—'যে-কোন প্রকার ফুঁ দিয়া বাজাইবার যন্ত্র'—তালপাতার বাঁশি, টিনের বাঁশি ইত্যাদি।

গাঙ—মূল অর্থ—'গঙ্গানদী' ('গঙ্গা' শব্দ হইতেই উদ্ভূত) ; প্রচলিত অর্থ—'যে-কোন নদী'।

গৌরচন্দ্রিকা—মূল অর্থ—'কীর্তনগানের পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনাজ্ঞাপক পদবিশেষ' ; প্রচলিত অর্থ—'যে-কোন বিষয়ের অবতরণিকা'।

শব্দার্থের সঙ্কোচ :

পঙ্কজ—মূল অর্থ—'পঙ্কে যাহা জন্মে' ; প্রচলিত অর্থ—'পদ্ম'।

মিছরি—(<মিসরীয়) মূল অর্থ—'মিসর দেশে উৎপন্ন দ্রব্য' ; প্রচলিত অর্থ—'শর্করাখণ্ড'।

অন্ন—(<অদ্=খাওয়া হইতে) মূল অর্থ—'যে-কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য' ; প্রচলিত অর্থ—'ভাত'।

মোচ্ছব—(<মহোৎসব) মূল অর্থ—'বড় উৎসব' ; প্রচলিত অর্থ—'বৈষ্ণবদিগের উৎসববিশেষ'।

করী—মূল অর্থ—'কর আছে যাহার' ; প্রচলিত অর্থ—'হস্তী'।

মৃগ—মূল অর্থ—'যে-কোন প্রকার পশু' ; প্রচলিত অর্থ—'হরিণ'।

শব্দার্থের বিষয়ান্তর-প্রাপ্তি : অর্থের আমূল পরিবর্তন ঘটিলে তাহাকে শব্দার্থের বিষয়ান্তর-প্রাপ্তি বলা হইয়া থাকে। যেমন—

তত্ত্ব—মূল অর্থ— 'খবর' ; প্রচলিত অর্থ—'বিবাহাদি কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কুটুম্ববাড়ীতে প্রেরিত উপঢৌকন দ্রব্যাদি'।

সন্দেশ—মূল অর্থ—'সংবাদ' ; প্রচলিত অর্থ—'ছানা ও চিনির সংযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ'।

লক্ষ্মী—মূল অর্থ—'বিষ্ণুপত্নী দেবী লক্ষ্মী' ; প্রচলিত অর্থ—'শান্ত'।

স্তম্ভিত—মূল অর্থ—'স্তম্ভত্বপ্রাপ্ত' ; প্রচলিত অর্থ—'বিস্মিত'।

কেচ্ছা—(<আরবী কিস্‌সা) মূল অর্থ—'কাহিনী', 'গল্প' ; প্রচলিত অর্থ—'কুৎসা'।

তিরস্কার—মূল অর্থ—'অদৃশ্য হওয়া' ; প্রচলিত অর্থ—'ভৎ‌র্সনা'।

প্রসাদ—মূল অর্থ—'অনুগ্রহ' ; প্রচলিত অর্থ—'ভুক্তদ্রব্যের অবশেষ', 'দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোজ্যবস্তু'।

কৃপণ—মূল অর্থ—'কৃপার পাত্র' ; প্রচলিত অর্থ—'ব্যয়কুণ্ঠ'।

নিম্নে শব্দার্থ-পরিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল।—

শব্দ	**মূল অর্থ**	**প্রচলিত অর্থ**
অনিবার	অনিবার্য	সতত
অবদান	পূজা অর্চনার্থ দান	দান
অসুখ	দুঃখ	রোগ
আঙ্গিক	অঙ্গ-সম্বন্ধীয় অভিনয়ের প্রকার	গঠনপ্রণালী
আজি	যুদ্ধ	অশ্ব
আরতি	ক্রীড়া, তৃপ্তি	পূজা
ইতি	এই	পত্রাদির সমাপ্তিসূচক শব্দ
উদ্দেশ	উপায়, পথ	খোঁজখবর

শব্দ	মূল অর্থ	প্রচলিত অর্থ
কম	কমনীয়	অল্প
কল্য	প্রত্যূষকাল	আগামী দিবস
চাপ	ধনু	ভার দেওয়া
ছবি	কান্তি	আলেখ্য
টীকা	গ্রন্থের ব্যাখ্যা	দাহ্য বস্তুবিশেষ
দল	পত্র	বর্গ বা সমূহ
ধুনী	নদী	অগ্নিকুণ্ড
ধূম	ধোঁয়া	উৎসবের আড়ম্বর
নাক	স্বর্গ	নাসিকা
প্রমাদ	ভুল	বিপদ
বলি	—	পশুবধ
যথেষ্ট	ইচ্ছানুরূপ	প্রচুর
লাবণ্য	লবণত্ব	কান্তি

অনুশীলনী

১। বাংলায় নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যবহারে কিভাবে অর্থ-সঙ্কোচন, অর্থ-প্রসারণ বা অর্থ-পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহার আলোচনা কর :—

আঙ্গিক, অবদান, ইতর, রাগ, ছবি, ইতি, সুতরাং, যবনিকা-পতন।

২। "তুমি এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করিও না।" এই বাক্যটিতে 'উচ্চবাচ্য' কথাটির মূলগত অর্থের সহিত ব্যবহারগত অর্থের কি সম্বন্ধ তাহা বুঝাইয়া দাও।

—ক বি মাধ্যমিক, ১৯৫১।

৩। 'বিরক্ত' ও 'নিরীহ'—এই দুইটি শব্দের বাংলা ভাষায় প্রয়োগে সংস্কৃত হইতে কিরূপ অর্থবিভেদ ঘটিয়াছে, তাহা দেখাও। —ক বি মাধ্যমিক, ১৯৫১।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে শব্দার্থের উৎকর্ষ, অপকর্ষ, প্রসার ও সঙ্কোচ কোথায় ঘটিয়াছে তাহা দেখাও এবং প্রত্যেকটির দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :—

সন্দেশ, অন্ন, সম্বন্ধী, মহাজন, ধ্যান, রাগ, তৈল, মন্দির, কালি।

—স্কটিশ চার্চ কলেজ : নির্বাচনী পরীক্ষা, ১৯৫২।

রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ ও আলঙ্কারিক প্রয়োগ

প্রত্যেক ভাষায় এমন অনেক শব্দ, ক্রিয়া-পদ ও বাক্যাংশ আছে যে, আমাদের মনের ভাব তাহাদের দ্বারা সহজে ও সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়। শব্দাদির এইরূপ প্রয়োগকে **রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ** বা **বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ** বলা হইয়া থাকে। রচনাকে সুন্দর ও শক্তিশালী করিতে হইলে, এই সকল সর্বজনপরিচিত রীতিসিদ্ধ বাক্য ও বাক্যাংশগুলি বাক্যরচনাকালে ব্যবহার করিতে হয়।

এই পরিচ্ছেদে বিভিন্নভাবে রীতিসিদ্ধ প্রয়োগের নমুনাস্বরূপ কতিপয় উদাহরণ দেওয়া হইল। এই Idiom-এর ব্যবহার বাংলার চলিত ভাষা বা কথ্য ভাষায়ই দেখা যায়, সাধুভাষা বা মার্জিত ভাষা এই বিষয়ে বড় দরিদ্র। এই প্রয়োগগুলি এবং প্রবাদগুলি মুখ্যত জনসাধারণেরই রচিত, দৈনন্দিন জীবনে কথাবার্তায় বহুল প্রচলিত।

উপর

(১) তিনি আয়ের **উপর** (অতিরিক্ত) ব্যয় করেন।

(২) ছেলের **উপর** (বিষয়ে) আমার কোন হাত নাই।

(৩) মুখের **উপর** (মুখে মুখে) কথা বলিও না।

(৪) টাকার **উপর** (প্রতি) বার্ষিক এক টাকা সুদ।

(৫) লোকটা **উপর** (বাহিরে) চালাক।—ইত্যাদি।

কাঁচা

(১) কাঁচা=শিথিল, ঢিলা, যথা :—**কাঁচা** পাকের সুতায় **কাঁচা** সেলাই, দু'দিনেই নষ্ট হ'য়ে যাবে।

(২) কাঁচা=কোমল, নরম, যথা :—**কাঁচা** বয়সে মন **কাঁচা** মাটির মত থাকে।

(৩) কাঁচা=অপক, যথা :—**কাঁচা** আম, **কাঁচা** পেঁপে।

(৪) কাঁচা=যাহা সিদ্ধ অথবা ঠিকমত সিদ্ধ হয় নাই, যথা :—**কাঁচা** দুধ জাল দেও। তরকারি ও মাংস **কাঁচা** র'য়েছে, খাওয়া যায় না।

(৫) কাঁচা=অস্থায়ী বা পরিবর্তনশীল, যথা :—**কাঁচা** ফর্দ।

(৬) কাঁচা = অনিপুণ, যথা :—**কাঁচা** লোকের **কাঁচা** কাজ।

(৭) কাঁচা = যাহা টিকে না, যথা :—**কাঁচা** রং বা **কাঁচা** পাড়।

(৮) কাঁচা = অমিশ্র, বিশুদ্ধ, যথা :—**কাঁচা** সোনা।

(৯) কাঁচা = আপোড়া, আমা, যথা :—**কাঁচা** ইটের **কাঁচা** গাঁথনি।

(১০) কাঁচা = ওজনে কম, যথা :—**কাঁচা** সেরের মাপ।

(১১) কাঁচা = অল্পজ্ঞান, যথা :—ছেলেটি অঙ্কে বড় **কাঁচা**।

(১২) কাঁচা = অনায়াস-লভ্য, যথা :—**কাঁচা** পয়সা উপায়।

(১৩) কাঁচা = অগভীর, যথা :—**কাঁচা** ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে ছেলেটা কাঁদছে।

(১৪) কাঁচা = মেটে, যথা :—গ্রামের **কাঁচা** বাড়ী ও **কাঁচা** রাস্তা ইত্যাদি।

পাকা

(১) পাকা = পরিণত, যথা :—**পাকা** আম, **পাকা** জাম।

(২) পাকা = অভিজ্ঞ, ঝানু, যথা :—পরীক্ষায় বুঝিলাম, বেশ **পাকা** লোক। "বাবু ক'ন হেসে, বেটা সাধু বেশে **পাকা** চোর অতিশয়।"

(৩) পাকা = পূর্ণ, যথা :—**পাকা** দু'মণ। **পাকা** মাপ।

(৪) পাকা = মজবুত, স্থায়ী, যথা :—**পাকা** রং, **পাকা** গঠন।

(৫) পাকা = পোড়ান, যথা :—**পাকা** ইট দিযে **পাকা** গাঁথনি।

(৬) পাকা = স্থিরীকৃত, যাহার পরিবর্তন হইতে পারে না, যথা :—হিসাবের **পাকা** খাতা। বিবাহের কথা **পাকা** করা।

(৭) পাকা = নিয়মানুসারে সিদ্ধ, যথা :—এ **পাকা** দলিল।

(৮) পাকা = সাদা, যথা :—বুড়ার মাথায় **পাকা** চুল।

(৯) **পাকা** ধানে মই দিচ্ছে (সফল-প্রায় উদ্দেশ্য পণ্ড করিতেছে)।

(১০) শান্তি একেবারে এঁচোড়ে **পাকা** (অকালপক্ক) হ'য়ে গেছে।

(১১) মা, তুমি **পাকা** মাথায় সিন্দূর পর (বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত এয়োস্ত্রী থাক)।

(১২) **পাকা** রাঁধুনীর **পাকা** রান্না, খেলেই বুঝা যায়।

(১৩) শহরের ঘরগুলিও **পাকা**, রাস্তাগুলিও **পাকা**।

(১৪) **পাকা** সোনার (খাঁটি অমিশ্র সোনার) গহনা।

(১৫) বৃদ্ধের **পাকা** হাড়, সহজে হার মানবে না।—ইত্যাদি।

ঠিক

(১) আমি **ঠিক** (ধার্য) করেছি, কাল বাড়ী যাব।

(২) আমাকে **ঠিক** (যথার্থ) কথা বল, আমি কিছু বলব না।

(৩) আমাকে বেশী রাগিও না, আমি তাহ'লে **ঠিক** ক'রে দেব (শাসন করব, পিটিয়ে সোজা করব)।

(৪) ছেলেটিকে তোমার কাছে রেখে গেলাম, তুমি যদি ভাই **ঠিক** ক'রে (সংশোধন ক'রে) দিতে পার।

(৫) ছেলেটিকে দেখিতে **ঠিক** (অবিকল) আমাদের রামের মত।

(৬) তাড়াতাড়ি **ঠিক** (প্রস্তুত) হও, এখনই রওনা হব।

(৭) **ঠিক** (বরাবর) দক্ষিণে গেলেই সমুদ্র।

(৮) এইবার অঙ্কে **ঠিক** (যোগ) দেও। **ঠিকের** ঘর।

(৯) মেজাজের **ঠিক** (স্থিরতা) নাই। হিসাব-পত্র **ঠিক** (স্থির) নাই।—ইত্যাদি।

ভাল

(১) ললিত বাবু বড় **ভাল** মানুষ। (২) সে **ভাল** মানুষের আর দেখা নাই। (৩) **ভাল** আপদ! এখন যাই কোথায়? (৪) **ভাল** কথা! এতক্ষণ মনেই ছিল না। (৫) খবর শুনেছ ত! অসুখ **ভাল** হ'য়ে গেছে। (৬) **ভাল**খাকী ভালর মাথা খাউক! (৭) **ভাল রে ভাল**! এতক্ষণ ছিলি কোথায়? (৮) **ভালয় ভালয়** এখন বিদায় হইতে পারিলে হয়। (৯) আর তোমার **ভাল** হোক্ (মন্দ হোক্)!

মাথা

(১) **মাথা খাওয়া** (নষ্ট করা)—সে যে আলালের ঘরের দুলাল, আদর দিয়ে বাপ তার **মাথা খেয়েছে**!

(২) **মাথা খাওয়া** (দিব্য দেওয়া)—আমার **মাথা খাও**, এই ঝড় মাথায় ক'রে তুমি আজ যেতে পারবে না।

(৩) **মাথা পাতা** (সম্মত হওয়া)—পশ্চাতে পিতা ছিলেন, তা না হ'লে কি এত সহজেই একাজে **মাথা পাতিতাম**!

(৪) **মাথায় হাত দেওয়া** (দুর্ভাবনার ভারে কাতর হওয়া, যেন মাথার ভার

হাত দিয়া রক্ষা করা)—ঝড়ে নৌকা-ডুবির সংবাদে ব্যাপারী **মাথায় হাত দিয়া** বসিয়া পড়িল।

(৫) **মাথা উঁচু করা** (গর্বভরে শির উন্নত করা)—স্বাধীন জাতির লোক তারা, তাই **মাথা উঁচু ক'রে** চলতে জানে।

(৬) **মাথা হেঁট হওয়া** (লজ্জায় মাথা তুলিতে না পারা)—মিথ্যাচরণ ধরা পড়ায় ছেলেটির **মাথা হেঁট হ'য়েছে**।

(৭) **মাথায় হাত বুলান** (প্রবঞ্চনা দ্বারা কায সিদ্ধ করা)—পরের **মাথায় হাত বুলিয়ে** আর ক'দিন সংসার চালাবে ?

(৮) **মাথায় ঢোকা** (বোধগম্য হওয়া)— এই সোজা কথাটিও আজ তোমার **মাথায় ঢুকিতেছে** না কেন ?

(৯) **মাথায় উঠা** (প্রশ্রয় পাওয়া)—কুকুরকে নেই দিলে **মাথায় ওঠে**।

(১০) **মাথা চুলকান** (বুদ্ধি বাহির করিবার জন্য মাথার মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করা)—প্রশ্ন শুনিয়া **মাথা চুলকাইলেই** কি উত্তর মিলিবে ?

(১১) **মাথা কাটা যাওয়া** (অপমানিত হওয়া)—সবার সামনে হার মান্‌তে হ'ল ; ছি ছি, লজ্জায় যে **মাথা কাটা** গেল !

(১২) **মাথা কেনা** (ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করা)—পঁচিশটি টাকা দিয়েই আমার **মাথা কিন্‌তে** চাও ?

(১৩) **মাথা** (শ্রেষ্ঠ)—সাধু ও সুধী জনই সমাজের **মাথা**।—ইত্যাদি।

হাত

(১) **হাত আসা** (অভ্যাস হওয়া)—দিতে দিতেই **হাত আসবে**।

(২) **হাত করা** (আয়ত্ত করা)—সাক্ষীকে টাকা দিয়ে **হাত ক'রেছে**।

(৩) **হাতখোলা** (মুক্তহস্ত)—লোকটা বেশ **হাতখোলা**।

(৪) **হাত গুটান** (নিরস্ত হওয়া)—**হাত গুটিয়ে** ব'সে থাকলেই কি কাজ হ'য়ে যাবে ? চেষ্টা কর।

(৫) **হাত গোনা, হাত দেখা** (হস্তরেখা বিচার করা)।

(৬) **হাতছাড়া** (বেহাত)—লোকটা **হাতছাড়া** হয়ে গেল, হাতে থাকলে অনেক কাজে লাগ্‌ত।

(৭) **হাতছানি দেওয়া** (হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করা)—গাছগুলি বাতাসে নড়ছে, মনে হচ্ছে যেন **হাতছানি দিয়ে** আমাদের ডাকছে।

(৮) (ক) **হাতটান** (কৃপণ)। (খ) **হাতটান** (চুরির অভ্যাস)—এই লোকটার **হাতটান** আছে, রাত্রে সাবধান থেকো।

(৯) **হাত ধরা**। (১০) **হাততালি**। (১১) **হাত থাকা**।

(১২) **হাত পাকান** (অভ্যাস দ্বারা নিপুণ হওয়া)।

(১৩) **হাত-যশ** (সিদ্ধহস্ত বলিয়া খ্যাতি)—কবিরাজমহাশয়ের অল্পদিনেই বেশ **হাত-যশ** হইয়াছে।

(১৪) **কাজে হাত দেওয়া**—আরম্ভ করা, সাহায্য করা।

(১৫) **হাতে কলমে করা**—নিজের হাতে কাজ করিয়া শেখা।

(১৬) **হাতেখড়ি**—বিদ্যারম্ভ। (১৭) **হাতে চাঁদ পাওয়া**—দুরাশা পূর্ণ হওয়া।

(১৮) **হাতে জল না গলা** (কৃপণতা করা)—ওর কাছে গিয়েছে চাঁদা চাইতে, ওর **হাতে যে জলও** গলে না!

(১৯) **হাতেনাতে** (বামাল—red-handed)—লোকটা চুরি করিবার সময়েই **হাতেনাতে** ধরা পড়িয়াছে, শাস্তি পাইবে নিশ্চয়।

(২০) **হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা** (উপস্থিত সুযোগ ত্যাগ করা)।

(২১) **হাতের পাঁচ**—করায়ত্ত বিষয়।

(২২) **কাঁচা হাত**—অনভ্যস্ত। (২৩) **পাকা হাত**—সিদ্ধহস্ত।

(২৪) **কপালে হাত**—খেদে। (২৫) **গালে হাত**—বিস্ময়ে।

(২৬) **বুকে হাত**—সাহস প্রকাশে। (২৭) **মাথায় হাত**—দুর্ভাবনায়।

(২৮) **দক্ষিণ হাতের ব্যাপার**—ভোজন-কার্য।—ইত্যাদি।

চোখ

(১) পরের ঐশ্বর্য দেখে **চোখ টাটান** (ঈর্ষা করা) ভাল নয়। (২) **চোখ টিপে** বা **চোখ ঠার** দিয়ে (ইঙ্গিত ক'রে) কি ব'লছ? (৩) এ বিষয়ে এখন তার **চোখ** (নজর) **পড়েছে**। (৪) তোমার **চোখ পাকান** বা **চোখ রাঙানকে** (ক্রোধকে) আমি ডরাই নাকি? (৫) দুনিয়ার

হাল-চাল দেখে তার **চোখ ফুটেছে** বা **চোখ খুলে গেছে**। (৬) **চোখে আঙ্গুল দিয়ে** না দেখালে আর কোন বিষয় বুঝবে না। (৭) আমার **চোখের উপর** (আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া) ছেলেটা এই কাজ করিতে সাহস পাইল! (৮) আমি তাকে দেখতে পারিনে, সে আমার **চোখের বালি** (চক্ষের শূল)। (৯) ছেলেটার **চোখে মুখে কথা**, কেমন চটপটে ভাব! (১০) তুমি কি **চোখের মাথা খেয়েছ**, যে কিছুই দেখতে পাচ্ছ না ?—ইত্যাদি।

মুখ

(১) এই পুত্র বংশের **মুখ উজ্জ্বল** করিবে।

(২) "পরের বেটী **মুখ করবে মুখ নাড়া** দিয়ে।" (মুখ করা—ভর্ৎসনা করা)।

(৩) **মুখের জোর** না থাকিলে কি উকিল হওয়া যায় ?

(৪) আর **মুখ খারাপ করিও** না (অশ্লীল কথা বলিও না)।

(৫) **মুখচোরা** (লাজুক) জামাই, অভিমানে **মুখ গোঁজ** করেছে।

(৬) নিজের যা সাধ্য তাই কর, পরের **মুখ চাওয়া** ভাল নয়।

(৭) কি অন্যায় কাজ হয়েছে, যে **মুখ চুণ** করেছ ?

(৮) মা! **মুখ তুলে চাও** (প্রসন্ন হও)।

(৯) **মুখ ঝামটা** (তিরস্কার)।

(১০) **মুখ সিটকান** (ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করা)।

(১১) **মুখ বাঁকান** (অনাদর বা উপেক্ষা করা)।

(১২) আয়নায় **মুখ** (প্রতিবিম্ব) দেখা।

(১৩) মা **মুখ ফিরিয়েছেন**, আর ভয় নেই।

(১৪) **মুখ বুজে** লঙ্কায় আগুন দেওয়া (কথা না বলিয়া ভিতরে ভিতরে অনিষ্ট করা)।

(১৫) মিষ্টিতে **মুখ মেরেছে**, একটু চাটনি দাও।

(১৬) ভগবানকে ধন্যবাদ, ছেলে আমার **মুখ** (সম্মান) **রেখেছে**।

(১৭) তোমার **মুখে ফুল চন্দন পড়ুক**!

কথা

(১) আমার সঙ্গে **কথা কাটাকাটি** করিও না (বাদ-প্রতিবাদ করিও না)। (২) আমি তাহাদের বাড়ী যাইব বলিয়া **কথা** (প্রতিশ্রুতি) **দিয়াছি।** (৩) তাহাকে বিশ্বাস নাই, সে বড় **কথা চালে** (এক স্থানের কথা অন্য জায়গায় ছড়ায়)। (৪) উকিল দালাল ইহারা **কথা বেচিয়া খায়।** (৫) সে কেমন কৌশলে **কথা পাড়ে** (প্রসঙ্গ উত্থাপন করে)! (৬) চুপ করাই ভাল, নহিলে **কথায় কথা বাড়ে।** (৭) মাতাপিতার **কথা শুনিবে** (মান্য করিবে)। (৮) **কথায় কথায়** (কথা প্রসঙ্গে) তাহাকে ঘটনাটা জানিয়ে দিলাম। (৯) আমি ভাই তোমাদের কোন **কথায় থাকতে** চাইনে। (১০) কাজ চাই, কেবল **কথায় চিঁড়ে ভেজে না** (ফাঁকি দিয়ে কাজ হয় না)। (১১) হাস কেন, এটা কি **কথার কথা** (সোজা কথা, তুচ্ছ কথা) ?—ইত্যাদি।

ধরা

হস্ত দ্বারা ধারণ করা—লাঠি ধরে, পায়ে ধরে।

অঙ্গে ধারণ করা, পরিধান করা—ভেখ ধরে।

"কি রঙ্গে অঙ্গনা বেশ ধরিলি দুর্মতি ?" —মধুসূদন

যুক্ত হওয়া—বল ধরে, বুদ্ধি ধরে।

জিহ্বায় ধারণ করা, উচ্চারণ করা—"নাম ধ'রে আর ডাকিসনে ভাই, যেতে হবে ত্বরা ক'রে।" —রবীন্দ্রনাথ

আশ্রয় করা—ঠাকুরের দোর ধ'রে তার রোগ ভাল হয়েছে বড় সাহেবকে ধর, তা'হলেই কাজ হবে। সৎপথ ধ'রে চল।

পাকড়ান—চোর ধরেছে, চোরকে ঠেসে চেপে ধরেছে।

আটকান—দোকানে মাল ধ'রে রেখেছে, ছাড়ছে না।

আক্রমণ করা—ডাকাত ধরেছে, ভূতে ধরে, যমে ধরে।

যথাসময়ে যাইয়া পাওয়া—ট্রেন ধরে, ট্রাম ধরে।

সিদ্ধির জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া—গোঁ ধরে, জিদ ধরে।

আরম্ভ করা—গান ধরেছে, পড়াশুনা ধরেছে।

অভ্যাস আরম্ভ করা—মদ ধরেছে, নিয়ম ধরেছে।

আবিষ্কার করা, ঠাওরান—ডাক্তারে রোগ ধরেছে।

প্রদর্শন করা—শত্রুতে খুঁত ধরে, দোষ ধরে।

কল্পনা করা—ধর, যদি ঝড় হয়, তখন নৌকায় কি করবে?

গণ্য করা—তার কথা ধ'র না। তাকে ধ'রে দশ জন।

গুণ প্রকাশ করা—এতদিন পরে ওষুধ ধরেছে।

বেদনা বা বিকারযুক্ত হওয়া—ওলে মুখ ধরে।

উৎপন্ন হওয়া, প্রকাশ পাওয়া—গাছে ফল ধরে, ফুলে কুঁড়ি ধরে, দেওয়ালে নোনা ধরে, চুলে পাক ধরে।

লগ্ন হওয়া—কাপড়ে দাগ ধরে, ঘরে আগুন ধরে।

স্থান পাওয়া—মুখে হাসি আর ধরে না।

বন্ধ হওয়া, থামা—বৃষ্টি ধরেছে, ঔষধে জ্বর ধরেছে।

ঈষৎ পুড়িয়া যাওয়া—হাঁড়ির তলায় ভাত ধ'রে গেছে।

প্রজ্বলিত হওয়া—ভিজে কাঠ শীঘ্র ধরে না।

নির্ধারণ করা—জিনিসগুলির দর ধর।

বিবিধ—কলম ধরা, কান ধরা, গলা ধরা, ঘুণ ধরা, ছেলে ধরা, টান ধরা (অভাব হওয়া), টাল ধরা, ধামা ধরা (খোশামোদ করা), মনে ধরা (মনে লাগা), হাতে ধরা (অনুরোধ করা), হ্যাপা ধরা (ঝুঁকি লওয়া)।—ইত্যাদি।

উঠা

দণ্ডায়মান হওয়া, গাত্রোত্থান করা—আর ব'সে থেকো না, এবার ওঠো। "উঠ, জাগো, শুভকর্মে হও অগ্রসর।"

উপরে যাওয়া, চড়া—ছাদে উঠে, গাছে উঠে।

উদ্গত হওয়া বা গজান—ধানের শীষ উঠিয়াছে।

অবস্থান্তর হওয়া—রোদে ফল পাকিয়া উঠে।

স্খলিত হওয়া—অল্প বয়সে মাথার চুল উঠিবে কেন?

লোপ পাওয়া, বজায় না থাকা—সাহায্যের অভাবে বিদ্যালয়টি উঠিয়া গেল। দোকান উঠিয়া গেল। বাড়ী হইতে অন্ন উঠিল।

উদিত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া—পূর্বদিকে সূর্য উঠে।

বাহির হওয়া—এই বার জল উঠিতেছে।

বৃদ্ধি পাওয়া—জ্বর এখন কত উঠিয়াছে ?

উপরের শ্রেণীতে যাওয়া, প্রোমোশন পাওয়া—জ্যোতি পরীক্ষায় প্রথম হইয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াছে।

বিবিধ—হেঁচকি উঠা, রক্ত উঠা, গায়ে খড়ি উঠা, চোখ উঠা (নেত্ররোগ হওয়া), মন উঠা (তৃপ্ত হওয়া, "ঘরে কি তোর মন উঠে না, মিষ্ট কি পরের ননী"), রব উঠা, নেচে উঠা (আনন্দে মত্ত হওয়া), উঠে পড়ে লাগা (উৎসাহের সহিত কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া)।—ইত্যাদি।

লাগা

ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লেগেছে (বেধেছে, আরম্ভ হয়েছে)। আমার কিছুই ভাল লাগে না (ভাল বোধ হয় না)। জামায় কত খরচ লাগ্‌বে (পড়্‌বে) ? ঘরে আগুন লেগেছে (ধরেছে)। আমার ঠাণ্ডা লেগেছে। নূতন লোকটিকে খুব মনে লেগেছে (পছন্দ হয়েছে)। বাড়ী পৌঁছিতে দেড় দিন লাগে (আবশ্যক হয়)। তুমি আমার পিছনে লেগেছ (ক্রমাগত দোষ ধরিতেছ) কেন ? কাজে লেগে যাও (উৎসাহের সহিত আরম্ভ কর)। কথাটি এখানে বেশ লাগে (সঙ্গত হয়)। অনুভূতির কাছে যুক্তি কোথায় লাগে (থাকে) ? নৌকা ঘাটে লেগেছে (সংলগ্ন হয়েছে)। গ্রহণ লেগেছে (আরম্ভ হয়েছে)। বড়লোকের মেয়ে, একটুতেই গায়ে লাগে।

আসা—গা আসা, হাত আস, কথা আসা, মনে আসা, ছুটে আসা

করা—কাজ করা, কবুল করা, হাত করা, গা করা, গুণ করা, খুশী করা, তার করা, নাম করা, পার করা, মুখ করা, হল্লা করা, ফাঁস করা, কিল্‌বিল্ করা।

কাটা—সময় কাটা, বিপদ কাটা, কথা কাটাকাটি করা, সুতা কাটা, খাল কাটা, টেরি কাটা, ছড়া কাটা, তাল কাটা, জিভ কাটা (লজ্জায়), নাক কাটা, ছানা কাটা।

খাওয়া—কিল খাওয়া, খাবি খাওয়া, সুদ খাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া, হিমশিম খাওয়া, বকুনি খাওয়া।

চলা—দিন চলা, হাত চলা, মতে চলা, জল চলা (তাদের জল চলে না= তাহারা অস্পৃশ্য), এক কাপ চা চলবে ? এ টাকা চলবে না, বিধবা বিবাহ এদেশে চলে না।

তোলা—হাত তোলা (প্রহার করা), মুখ তুলিয়া চাওয়া (প্রসন্ন হওয়া), হাই তোলা, পটল তোলা, জাতে তোলা, মাথায় তোলা (প্রশ্রয়) দেওয়া, শিকেয় তোলা।

দেখা—হাত দেখা, নাড়ী দেখা, অসময়ে দেখা, দেখিয়া লওয়া।

দেওয়া—কান দেওয়া, কথা দেওয়া, তা দেওয়া, তাল দেওয়া, তুড়ি দেওযা, ধাপ্পা দেওয়া, নাড়া দেওয়া, খোঁটা দেওয়া, জলে দেওয়া, জাত দেওয়া।

বসা—দই বসা, বর্ষায় ছাদ বসে গেছে, জমিতে প্রজা বসেছে, বাজার বসা, মন বসা, সর্দি বসা, বসে থাকা (বেকার থাকা), দাঁত বসান, চোখ বসে যাওয়া।

রাখা—মনে রাখা, চোখ রাখা, পায়ে রাখা, দূরে রাখা, মজুত রাখা, মন রাখা, ভাব রাখা, হিসাব রাখা।

মারা—চড় মারা, চাল মারা, অন্ন মারা, পকেট মারা, জাত মারা, পাতড়া মারা, প্রাণে মারা, ভাতে মারা।

বিশেষ্য পদের বিশিষ্ট ব্যবহার

কান—কান পাতলা, কান ভারী করা, সাত কান করা, দুকান কাটা (নির্লজ্জ), কান ভাঙ্গান, কানে তালা ধরা।

গা—গা রিরি করা, গা ঢাকা দেওয়া, গায়ে ধূলা দেওয়া, গা ম্যাজ্ ম্যাজ করা, গা ঘিন্ ঘিন্ করা, গা ঝাড়া দেওয়া, গায়ে বাতাস লাগা, গা ঘোরা, গা জালা করা।

চোখ—চোখ খোলা, চোখের বালি (চক্ষুশূল), চোখ পাকান, চোখে আঙুল দেওয়া।

নাক—নাকে কাঁদা, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা, নাক ডাকান, নাকে খত দেওয়া, নাকে দড়ি দিয়া ঘুরান।

পেট—পেটে সওয়া (কুকুরের পেটে ঘি সয় না), পেটের ছেলে (পুত্রস্থানীয়), পেটে কথা থাকা, পেটে পেটে বুদ্ধি, পেটে পোরা।

মাথা—মাথা খাওয়া, মাথা ঘোরা, মাথায় তোলা (আদর দেওয়া), মাথা ধরা, মাথা ঠাণ্ডা করা, রাগের মাথায়, মাথা উঁচু করা, মাথা কাটা যাওয়া।

মুখ—মুখ করা (ভৎর্সনা করা), মুখ নাড়া দেওয়া, মুখ ভার করা, মুখ রক্ষা করা, মুখ বন্ধ করা, মুখ সামলান, মুখে ফুলচন্দন পড়া, মুখের কথা।

হাত—হাত করা, হাত গুটান (সাহায্য বন্ধ করা), হাত দেওয়া, হাতের পাঁচ (শেষ ভরসা), পাকা হাত, হাতে থাকা।

বিশেষণের বিশিষ্ট প্রয়োগ

কাঁচা—কাঁচা ঘর, কাঁচা হাত, কাঁচা মাল, কাঁচা পয়সা, কাঁচা সর্দি।

খাঁটি—খাঁটি সোনা, খাঁটি লোক, খাঁটি কথা, খাঁটি বাঙালী।

চড়া—চড়া দাম, চড়া মেজাজ, চড়া আওয়াজ, চড়া গলা, চড়া কথা।

ভরা—ভরা ভাদর, ভরা নদী, ভরা বয়েস, ভরা যৌবন।

ভাঙা—ভাঙা মন, ভাঙা বাড়ী, ভাঙা হাড়।

পাকা—পাকা মাল, পাকা কথা, পাকা দেখা, পাকা ঘুঁটি, পাকা খেলোয়াড়, পাকা লেখা।

মোটা—মোটা বুদ্ধি, মোটা সুর, মোটা কাপড়, মোটা লাভ।

মরা—মরা নদী, মরা মন, মরা গাঙ্ (মরা গাঙে বান ডাকা)।

বাসী—বাসী মুখ, বাসী কাপড়, বাসী ফুল, বাসী বিয়ে।

বাঁকা—বাঁকা কথা, বাঁকা চোখ, বাঁকা চাউনি, বাঁকা বুদ্ধি, বাঁকা মন।

বদ্ধ—বদ্ধ কালা, বদ্ধ জল, বদ্ধ পাগল, বদ্ধ ধারণা।

ফাঁকা—ফাঁকা বুলি, ফাঁকা আওয়াজ, ফাঁকা মাঠ, ফাঁকা চাল।

অনুকারী অব্যয়ের বিশিষ্ট প্রয়োগ

বাংলা বাগ্‌বিধির আলোচনায় অনুকারী অব্যয়গুলির আলোচনা খুবই প্রয়োজনীয়। বাস্তবধ্বনির অনুকৃতি হইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহারা উৎপন্ন হইলেও বাস্তবধ্বনির অনুকৃতি অপেক্ষা বিশিষ্ট ভাবের প্রাধান্যই ইহাদের মধ্যে লক্ষণীয়। যথা :—

আই ঢাই—গরমে প্রাণ আই ঢাই করা।

আন্ চান্—প্রাণ আন্ চান্ করা।

আঁকুবাঁকু—আমাদের খাওয়াবার জন্য তিনি খুব আঁকুবাঁকু করতে লাগলেন।

আম্‌তা আম্‌তা—বকুনি খেয়ে আম্‌তা আম্‌তা করা।

ইস্‌-পিস্‌—রাগে গা ইস্‌-পিস্‌ করা।

উশ্‌-খুশ্‌—মন উশ্‌-খুশ্‌ করা।

খ্যাঁক্‌ খ্যাঁক্‌—তিনি খ্যাঁক্‌ খ্যাঁক্‌ করে তেড়ে এলেন।

কড়মড়—দাঁত কড়মড় করা।

কড় কড়—কড় কড় করে মেঘ ডেকে উঠলো।

কট্‌মট্‌—কট্‌মট্‌ করে চেয়ে থাকা।

কট্‌ কট্‌—কট্‌ কট্‌ করে কটু কথা শুনিয়ে দেওয়া।

কিল্‌-বিল্‌—পোকা কিল্‌-বিল্‌ করা।

খট্‌ খট্‌—বুড়োর শরীর খারাপ কোথায়? বেশ ত' খট্‌ খট্‌ করে চলে বেড়াচ্ছে।

খাঁ খাঁ—খালি বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে।

খিল্‌ খিল্‌—খিল্‌ খিল্‌ করে হাসা।

খুঁৎ খুঁৎ—মন খুঁৎ খুঁৎ করা।

গুর গুর (গুরু গুরু)—বুক গুর গুর করা,—"গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে।"

গোঁ গোঁ—যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করা।

গাঁক্‌ গাঁক্‌—অত গাঁক্‌ গাঁক্‌ করে চেঁচাচ্ছিস্‌ কেন?

গম্‌ গম্‌—সভা গম্‌ গম্‌ করছে।

গিজ্‌ গিজ্‌—লোক গিজ্‌ গিজ্‌ করছে।

ঘিন্‌ ঘিন্‌—ঘেন্নায় গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করছে।

ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌—আর আব্দেরে ছেলের মত ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করিস্‌ নে!

ঘুর ঘুর—সারাদিন আমার কাছে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে।

চিন্‌ চিন্‌—ফোড়াটা চিন্‌ চিন্‌ করছে।

চোঁ চোঁ—গরু চোঁ চোঁ করে ফ্যান্‌টা খেয়ে নিলে।

চচ্চড়—রোদ্দুরে গা চচ্চড় করছে।

চোট্‌পাট্‌—চোট্‌পাট্‌ জবাব দেওয়া।

ছল্‌ ছল্‌—চোখ ছল্‌ ছল্‌ করা।

ঝিম্‌ ঝিম্‌—মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করা।

ঝাঁ—ঝাঁ করে চারটে সন্দেশ নিয়ে আয় ত'।

ঝাঁ ঝাঁ—রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে।

ঝম্‌ ঝম্‌—ঝম্‌ ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ঝলমল—"বিজরি জরির আঁচল, ঝলমল ঝলমল
নামিল নভে বাদল ছল ছল বেদনায়।"

ঝর্‌ঝর্‌—ঝর্‌ঝর্‌ করে দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো।

ঝিন্‌ ঝিন্‌—পা-টা ঝিন্‌ ঝিন্‌ করছে, মাথা ঝিন্‌ ঝিন্‌ (ঝিম্‌ ঝিম্‌) করা

টপ্‌ টপ্‌—তার চোখ দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে জল পড়তে লাগলো।

টিপ্‌ টিপ্‌—টিপ্‌ টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে।

টিম্‌ টিম্‌—দোকানটি টিম্‌ টিম্‌ করে কোনও রকমে চলছে।

টগ্‌বগ্‌—রাগে গায়ের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগলো।

টন্‌ টন্‌—ব্যথায় মনটা টন্‌ টন্‌ করে উঠলো।

টল্‌মল্‌—ব্যবসা টল্‌মল্‌ করছে।

টল্‌ টল্‌—তার চোখের কোণে জল টল্‌ টল্‌ করছে।

টিক্‌ টিক্‌—দিনরাত টিক্‌ টিক্‌ করিস্‌ নি।

ঢক্‌ ঢক্‌—সে ঢক্‌ ঢক্‌ করে এক ঘটি জল খেয়ে ফেললো।

ঢিপ্‌ ঢিপ্‌—বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করা।

তক্‌ তক্‌—চারিদিক পরিষ্কার তক্‌ তক্‌ করছে।

তল্‌ তল্‌—ফোড়াটা পেকে তল্‌ তল্‌ করছে।

থই থই—পুকুরে জল থই থই করছে।

থই তাথই—"তালী বন থই তাথই, করতালি হানে ঐ।"

দর দর—দর দর ধারায় চোখের জল গড়িয়ে পড়লো।

দপ্‌ দপ্‌—ফোড়াটা দপ দপ্‌ করছে।

ধাঁ—ধাঁ করে এক কাপ চা নিয়ে এসো ত'।

ধক্ ধক্—ধক্ ধক্ করে আগুন জ্বলে উঠলো।

ধুক্ ধুক্—এখন তার প্রাণটি ধুক্ ধুক্ করছে, কখন যায় তার ঠিক নেই।

নড়বড়—অত নড়বড় করছো কেন? ছুটে এসো না!

নিশ্ পিশ্—রাগে আমার হাতটা নিশ্ পিশ্ করতে লাগলো, মনে হলে কয়েক ঘা বসিয়ে দিই।

পিট্ পিট্—বিড়াল ছানাটা চোখ পিট্ পিট্ করে চাইছে।

পিল্ পিল্—পিল্ পিল্ করে লোক আসতে লাগলো।

ফুটফুটে—"ফুটফুটে জোছনায় ধব্‌ধবে আঙিনায় একখানি মাদুর পা[illegible]য়ে··" —গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

বোঁ—আমি এখুনি বোঁ করে ঘুরে আসছি, একটু বসো।

বোঁ বোঁ—বোঁ বোঁ করে ঘোরা।

রী-রি—রাগে গাটা রী-রি করে উঠলো।

লক্ লক্—তরোয়ালটা লক্ লক্ করছে।

শাঁ শাঁ—শাঁ শাঁ করে ঝড় বইছে।

শন্ শন্—তীরটা শন্ শন্ করে কানের পাশ দিয়ে চলে গেল

শির্ শির্—ভয়ে আমার গা শির্ শির্ করে উঠলো।

হাঁ—হাঁ করে চেয়ে আছিস্ কেন?

হাঁ হাঁ—লোকটা হাঁ হাঁ করে ছুটে এলো।

হুড়্মুড়্—বিপদ হুড়্মুড়্ করে ঘাড়ে এসে পড়লো।

হু হু—শোকে প্রাণের ভিতরটা হু হু করছে।

যুগ্মশব্দ = দ্বিরুক্ত শব্দ = ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ

বাঙ্গালা ভাষায় মনের ভাবকে সম্যকরূপে প্রকাশ করিবার জন্য বহু যুগ্মশব্দের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। একটি শব্দের সহিত তাহার সহযোগী শব্দটি প্রযুক্ত হইয়া সম্যক ভাবপ্রকাশ ঘটে। এই শব্দগুলি সাধারণত দুই প্রকারের। (১) প্রায় **সমভাবার্থক** ও (২) **বিপরীত ভাবার্থক**। যেমন—

প্রায় সমভাবার্থক যুগ্মশব্দ

অনুনয় বিনয়	চালাক চতুর	বল বিক্রম	রাজা বাদশা
অভাব অভিযোগ	জীর্ণ শীর্ণ	বাধা বিঘ্ন	রীতি নীতি
অভাব অনটন	জাঁক জমক	বৃষ্টি বাদল	লজ্জা শরম
আত্মীয় স্বজন	ঝড় ঝাপটা	বিধি ব্যবস্থা	মান ইজ্জত
আদর যত্ন	ঠাট্টা তামাশা	ভয় ডর	লোক জন
আপদ বিপদ	ঠাকুর দেবতা	ভুল ভ্রান্তি	শক্তি সামর্থ্য
আমোদ প্রমোদ	ঢাক ঢোল	মান মর্যাদা	সুখ শান্তি
আশা ভরসা	তর্ক বিতর্ক	মাথামুণ্ডু	সাধু সজ্জন
কূল কিনারা	দয়া মায়া	মুটে মজুর	সাধন ভজন
কড়া ক্রান্তি	ধন দৌলত	যান বাহন	হাট বাজার
গল্প গুজব	পাঁজি পুঁথি	যুদ্ধ বিগ্রহ	হাঁক ডাক
চাল চলন	পোশাক পরিচ্ছদ	রস কষ	হৃষ্ট পুষ্ট

বিপরীত ভাবার্থক যুগ্মশব্দ

অগ্র পশ্চাৎ	আলো আঁধার	কেনা বেচা	দেনা পাওনা
আকাশ পাতাল	আয় ব্যয়	ছোট বড়	দোষ গুণ
আগা গোড়া	ইতর ভদ্র	জন্ম মৃত্যু	ন্যায় অন্যায়
আদান প্রদান	উত্থান পতন	জয় পরাজয়	পাপ পুণ্য
আমদানি রপ্তানি	ওঠা বসা	দিন রাত	মান অপমান

দ্বিরুক্ত শব্দ

বাঙ্গালা ভাষায় একই শব্দ দ্বিত্ব বা দ্বিরুক্তি করিয়া বহু নূতন শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকল শব্দ নূতন অর্থ বুঝাইয়াছে।

নিম্নলিখিত দুই উপায়ে ইহা সাধিত হয়।—(১) একই শব্দের পুনরুক্তি দ্বারা। যেমন,—

আশায় আশায়	চোখে চোখে	ভালোয় ভালোয়
একে একে	টাটকা টাটকা	মনে মনে
কথায় কথায়	টাকা টাকা	মধ্যে মধ্যে
কাঁদ কাঁদ	তুল তুলে	মানে মানে
খাঁ খাঁ	দলে দলে	রাশি রাশি
গরম গরম	পদে পদে	শীত শীত
গলায় গলায়	পায় পায়	সকাল সকাল
ঘরে ঘরে	পেটে পেটে	হাতে হাতে
ঘণ্টায় ঘণ্টায়	ফাঁকা ফাঁকা	হাড়ে হাড়ে

(২) অনুকার বা বিকার-জাত শব্দ দ্বারাও দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হয়, উহারাও বিশিষ্ট অর্থ-জ্ঞাপক। যেমন,—অসুখ-বিসুখ। চেয়ে-চিন্তে। জল-টল। পয়সা-টয়সা। ভাত-টাত। ঘোড়া-টোড়া। কাজ-কাজ। মোটা-সোটা। বাসন-কোসন। বই-টই।—ইত্যাদি।

শব্দদ্বৈত বা দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অর্থের পার্থক্য অনুসারে দ্বিরুক্ত শব্দের শ্রেণীবিভাগ করা হইল।—

(১) **পৌনঃপুন্য বা পুনরাবৃত্তি** বুঝাইতেঃ দৌড়াদৌড়ি, সাধাসাধি, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, বাড়ী বাড়ী।

(২) **আতিশয্য বা বহুলতা** বুঝাইতেঃ হাজার হাজার লোক, নতুন নতুন বই, "মুঠো মুঠো রাঙা জবা কে দিল তোর পায়?", দিস্তা দিস্তা কাগজ, ধানে ধানে আঙিনা ভরেছে, জলে জলে দেশ পচে গেল, ইত্যাদি।

(৩) **দেশ, কাল অথবা বস্তুর নিকটবর্তিতা** বুঝাইতেঃ মাঝামাঝি, ঘেঁষাঘেঁষি ইত্যাদি।

(৪) **অবস্থিতি** বুঝাইতেঃ লম্বালম্বি, পাশাপাশি (অবস্থিত), কোণাকুণি ইত্যাদি।

(৫) **সময়ের সীমা** বুঝাইতেঃ রাতারাতি, বেলাবেলি ইত্যাদি।

(৬) **সাদৃশ্য** বা **মৃদুতা** বুঝাইতে অথবা **ঈষদর্থেঃ** জ্বর জ্বর লাগা, ফাঁকা ফাঁকা ঠেকা, কাঁদ কাঁদ হওয়া, যাব যাব করা, পড় পড় হওয়া, ঢুলু ঢুলু চোখ, কাদা কাদা ভাত, হাসি হাসি মুখ ইত্যাদি।

(৭) **'প্রত্যেক'**—এই অর্থে শব্দের দ্বিরুক্তি—গাছে গাছে পাখী ডাকিতেছে, ভিক্ষুক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, জন্মে জন্মে যেন এই পৃথিবীতে জন্মাই ইত্যাদি।

(৮) **তীব্র আকাঙ্ক্ষা** বুঝাইতেঃ মরুভূমির যাত্রীরা জল জল করিয়া চাৎকার করিতেছিল। ছেলেটা দুধ দুধ করিয়া সারা হইয়া গেল ইত্যাদি।

(৯) **পরম্পরা** বুঝাইতেঃ স্তরে স্তরে সাজাও, আশায় আশায় আছি ইত্যাদি।

(১০) **বিশেষ্যের অর্থের সরলতা** সৃষ্টি করিতে; অথবা **দল, গুচ্ছ** বুঝাইতেঃ রাবণের দশ দশটা মাথা কাটা গেল, প্রতি ঘাঁটিতে বিশ-বিশজন লোক মোতায়েন, এক একবারে পাঁচ পাঁচজন করিয়া এস, দশ দশ গাছি করিয়া আটি বাঁধিবে ইত্যাদি।

(১১) **উপক্রম** বুঝাইতে—বাড়ীটা পড় পড় হয়েছে, নিবু নিবু দীপ, ডুবু ডুবু নৌকা, মর মর ছেলেটা, যাব যাব করছি, কাঁদ কাঁদ, খাই খাই করেও খাওয়া হল না, ইত্যাদি।

(১২) **আগ্রহ** ও **উৎকণ্ঠা** প্রকাশার্থেঃ বল বল আবার বল, চল চল আর দেরি কোরো না, ধর ধর এখনি পড়ে যাবে।

(১৩) **প্রভৃতি** বা **ইত্যাদি** বুঝাইতেঃ ভাতটাত, পয়সাটয়সা, জলটল, ঘোড়া-টোড়া ইত্যাদি।

(১৪) **ফ যোগে অবজ্ঞায়ঃ** ভাত-ফাত, লুচি-ফুচি, তাস-ফাস, কাজ-ফাজ ইত্যাদি।

সংখ্যা ও **প্রকারের বাহুল্য** বুঝাইতে কোন কোন শব্দে দ্বিত্বের পর একটি বর্ণ বাড়ে। যেমন—

রাজা-রাজড়া, গাছ-গাছড়া, বাড়-বাড়ন্ত, জম-জমাট ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক বা অনুকরণাত্মক শব্দ

আমাদের বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ আছে, সেগুলি অনুকরণাত্মক। এগুলিকে **প্রতিধ্বনিমূলক** শব্দও বলা যাইতে পারে। এই শব্দগুলিব কোন অর্থ নাই, কিন্তু ইহারা ধ্বনিসঙ্কেতের দ্বারা ভাব, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। **ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি অব্যয় পদ,** কিন্তু বাক্যে সাধারণত বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, **ভনভনে** মাছি, **থমথমে** বাত, **কড়কড়ে** ভাত, **গনগনে** আগুন, **কনকনে** শীত, **ধিকিধিকি** জ্বলছে, **গুটি গুটি** চলছে।

নিম্নে ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইল –

কুল কুল—নদী কুল কুল করিয়া বহিতেছে।

সোঁ সোঁ—সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে।

সন্ সন্—সন্ সন্ করিয়া বাতাস বহে।

হা হা—সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কুহু কুহু—পাতার আড়াল হইতে একটা কোকিল কুহু কুহু করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

এইরূপ—গুন গুন (মৌমাছি গুন গুন করিতেছে), ভন ভন, কিচমিচ, কিচিরমিচির, ভেক ভেক (কুকুরের ভেক ভেক ডাক), ভেউ ভেউ, টুপটাপ, টিপটিপ, টাপুর টুপুর ইত্যাদি।

গুণ বা **ভাব** বুঝাইতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও তাহাদের প্রয়োগ—

(ক) **শূন্যতা** বা **পূর্ণতা-বাচক**—শূন্য বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে। মাঠ ধু ধু করছে। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। পুকুরে জল থৈ থৈ করছে।

(খ) **বর্ণের স্বরূপ-বাচক**—টুকটুকে লাল। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না। ধব্‌ধবে সাদা। কুচকুচে কালো। মিশমিশে কালো।

(গ) **শরীরের অনুভূতি-বাচক**—মাথা কন কন করে। বুক ধড়ফড় করছে। গা রি রি করা। হাত সুড় সুড় করছে। গা ছমছম করছে।

(ঘ) **গতি-বাচক**—সে গট গট ক'রে চলে গেল। ব্যাঙটা থপ্ থপ্ ক'রে এগিয়ে আসছে। লোকটা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

এইরূপ—থপাস্ থপাস্, সুড় সুড়, ধাঁ ধাঁ ইত্যাদি।

(ঙ) **কঠোরতা-বাচক**—কটমট ক'রে চাওয়া। খটখটে রোদ।

(চ) **চঞ্চলতা-বাচক**—পিলপিল, চুলবুল, কিলবিল, টলমল।

(ছ) **লালিত্য ও কোমলতা-বাচক**—তুলতুলে, টুলটুলে, ঢলঢল।

ই-যোগে কোন কোন **ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিশেষ্য** হয়। যেমন,—

ঝুমঝুমি, টিমটিমি, চকমকি, টিকটিকি, ডুগডুগি ইত্যাদি।

কতকগুলিতে 'আনি' যোগে **ভাববাচক বিশেষ্য**ও হয়। যেমন,—

ধড়ফড়ানি, কনকনানি, বকবকানি, দপদপানি।

কোন কোন ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিরুক্তির মধ্যে একটি আ-কার আসে, কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয়। যেমন,—

টুপটাপ, দুপদাপ, গুপগাপ, ঠকাঠক, কচাকচ, "ছলচ্ছল, টলট্টল, কলক্কল তরঙ্গা।"—ভারতচন্দ্র॥

ধ্বন্যাত্মক শব্দে স্বরবর্ণের বিভিন্নতা অর্থের বিভিন্নতা সৃষ্টি করে। যেমন,—

টাপুর-টুপুর—বড় ও ছোট ফোঁটা (বৃষ্টির)।

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদেয় এল বান।"

টুপুর-টুপুর—ছোট ছোট ফোঁটা বা নূপুরের শব্দ।

"টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।"

টিপ্-টিপ্—ছোট ছোট জলের ফোঁটা।

টপ্-টপ্—বড় বড় ফোঁটা।

ঝিরঝির—ধীরে ধীরে বা ক্ষীণ ধারায় ঝরা।

ঝির ঝির ক'রে বৃষ্টি পড়ছে।

ঝর-ঝর—বেগে ঝরা।

ঝর ঝর ক'রে জল ঝরছে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অন্তত তিনটি বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :—

উঠা, কাটা, চলা, তোলা, বসা, ধরা, গা, মাথা, মুখ, হাত, পা, কাঁচা, চড়া, ভরা, মরা, বাসী।

২। অর্থের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :—

আই-ঢাই, আঁকুবাঁকু, ইসপিস, খাঁ খাঁ, গম্ গম্, চচ্চড়, টলমল টিকটিক, ধাঁ, নড়বড়, পিটপিট, দড়াদড়ি, ঝিলিক, ধকধক।

৩। অর্থগত পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :—

ধবধবে, কুচকুচে ; ধু ধু, হুহু ; শীত, শীতশীত ; টাটকা, টাটকা টাটকা ; টাকা, টাকা টাকা ; রাশি, রাশি রাশি ; সকাল, সকাল সকাল ; কাদা, কাদাকাদা, হাঁ, হাঁ হাঁ ; টপটপ, টপাটপ ; ঝরঝর, ঝিরঝির, ঝাঁ, ঝাঁ ঝাঁ, ঝমঝম, ঝিমঝিম ; ঝনঝন, ঝিনঝিন ; টপটপ, টিপটিপ ; ভাতটাত, ভাতফাত।

৪। সমভাবার্থক শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :—

কড়া—। —ভরসা। ঢাল—। হাতে—। পাঁজি—। রাজা—। —শবম। —তামাশা। —বিগ্রহ। মাপ—। যান—। —ভজন। —ইজ্জত। বিধি—। চালাক—।

৫। বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :—

আকাশ—। আমদানি—। আলো—। ইতর—। পতন—। জয়—।

৬। দৃষ্টান্তের দ্বারা নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলি বুঝাইয়া দাও :—

আতিশয্য বুঝাইতে শব্দদ্বৈত, সময়ের সীমা বুঝাইতে শব্দদ্বৈত ; ঈষদর্থে শব্দদ্বৈত, আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা বুঝাইতে শব্দদ্বৈত, উপক্রম বুঝাইতে শব্দদ্বৈত। শূন্যতা বুঝাইতে ধ্বন্যাত্মক শব্দপ্রয়োগ ; পূর্ণতা বুঝাইতে ধ্বন্যাত্মক শব্দপ্রয়োগ ; বর্ণের স্বরূপবাচক ধ্বন্যাত্মক শব্দপ্রয়োগ।

বিশিষ্ট পদ ও বাক্যাংশের ব্যবহার

অকূলে কূল পাওয়া (বিপদে আশ্রয় পাওয়া)—এই বিপদের সময় তোমাকে পেয়ে আমি অকূলে কূল পেয়েছি।

অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া)—অত ভিড়ে আমি যাবো না, তাহলে ভিড়ের চাপেই আমাকে অক্কা পেতে হবে।

অকাল কুষ্মাণ্ড (অপদার্থ)—তিনি যে এত বড় একটি অকাল কুষ্মাণ্ড, তা আমি জানতুম না।

অর্ধচন্দ্র দান করা (গলাধাক্কা দেওয়া)—জমিদার রুষ্ট হয়ে বললেন, "ভাল কথায় যদি না যাও তাহলে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দেবো।"

অগ্নিশর্মা (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ)—তিনি ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট (এককালে অনেকেই কর্তা সাজিলে কাজ নষ্ট)—আর লোকের দরকার নেই, অনেক সন্ন্যাসীতে শেষে আবার গাজন নষ্ট হবে।

অন্ধের যষ্টি (একমাত্র অবলম্বন)—ঐ নাতিটিই ছিল বৃদ্ধের কাছে অন্ধের যষ্টি-স্বরূপ।

অরণ্যে রোদন (বৃথা চেষ্টা)—এখানে কাকুতি-মিনতি করে অরণ্যে রোদন হচ্ছে চাঁদ, ওতে কিছু লাভ হবে না।

অমাবস্যার চাঁদ (যাহা দেখা যায় না)—তোমার দেখা পাওয়া ভার, একেবারে যে অমাবস্যার চাদ হয়ে উঠেছো।

আক্কেল-সেলামি (দণ্ড)—তাঁর ফাউণ্টেন পেন্‌টি হারিয়ে আমার ত্রিশ টাকা আক্কেল-সেলামি দিতে হয়েছে।

আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়লোক হওয়া)—লটারিতে টাকা পেয়ে তার আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

আদা জল খেয়ে লাগা (বিশেষ চেষ্টা করা)—আমার অনিষ্ট করবার জন্যে নবীন ত' আদা জল খেয়ে লেগেছে।

আদায় কাঁচকলায় (পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন)—হেডমাস্টারে সেক্রেটারিতে আদায় কাঁচকলায় সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে।

আঁতে ঘা দেওয়া (মনে কষ্ট দেওয়া)—তুমি বড্ড লোকের আঁতে ঘা দিয়ে কথা কও।

আপনার চরখায় তেল দেওয়া (আপন কাজে মনোযোগী হওয়া)—পরচর্চায় দরকার কি? আপনার চরখায় তেল দাও না!

আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) —তিনি যে এমন আমড়া কাঠের ঢেঁকি তা আমি জানতুম না।

ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ব)—তোমার মত ইঁচড়ে পাকা ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

উলুবনে মুক্তা ছড়ানো (অস্থানে অমূল্য বস্তু নিক্ষেপ)—এই মূর্খদের কাছে অত কথা কইছেন কেন? উলুবনে মুক্তা ছড়িয়ে লাভ কি?

উপরোধে ঢেঁকি গেলা (অনুরোধে কষ্ট স্বীকার করা)—লোকে উপরোধে ঢেঁকি গেলে আর তুমি সন্দেশ দুটো খেতে পারবে না ?

একাদশে বৃহস্পতি (খুব সুসময়)—তার এখন সময় খুব ভাল, একেবারে একাদশে বৃহস্পতি।

এক ক্ষুরে মাথা মোড়ানো (একই স্বভাব বিশিষ্ট)—তারা সব কটা ভাই-ই চোর, সবারই এক ক্ষুরে মাথা মোড়ানো—কে চুরি করেছে ধরবে কি করে ?

এক ঢিলে দুই পাখী মারা (এক প্রচেষ্টায় দুই উদ্দেশ্য সাধন করা)—ইংরাজ বাংলা বিভাগ করে এক ঢিলে দুই পাখী মারলেন ; হিন্দুদের জব্দ করলেন —মুসলমানদের হাত করলেন।

কড়ায় গণ্ডায় (পুরাপুরি)—দেশে অজন্মা, তবুও জমিদার তার খাজনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিলো।

কান পাতলা (অস্থির-মতি)—তিনি বড় কান পাতলা লোক, তাঁর মোসাহেবটি যা বলেন তাই তিনি বিশ্বাস করেন।

কেঁচে গণ্ডুষ করা (নূতন করিয়া কার্যারম্ভ)—আড্ডা দিয়ে দিয়ে পড়াশুনা ত' সব হজম করে ফেলেছি, এখন আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে তবে পাস করতে পারব।

কানু ছাড়া গীত (একমাত্র প্রসঙ্গ)—তোমার কি ঐ কানু ছাড়া গীত নেই ? অন্য কথা পাড়ো।

কালনেমির লঙ্কাভাগ (কাজের আগেই ফলের প্রত্যাশা করা এবং ব্যর্থ হওয়া)—কর্তাবাবুর অসুখ করতেই তাঁর কুপোষ্যের দল কালনেমির লঙ্কাভাগের ফন্দি আঁটতে লাগলো।

কলুর বলদ (নির্বিকার)—আমরা কলুর বলদের মত সংসারের ঘানি টেনেই চলেছি।

কাঁচা পয়সা (অনায়াস-লভ্য অর্থ)—তাঁর হাতে এখন কিছু কাঁচা পয়সা হয়েছে, তাই মেজাজ গরম।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বাহির হওয়া (সামান্য বিষয় হইতে গুরুতর বিষয়ের উদ্ভব)—এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে তুমুল ঝগড়া বেধে গেল, কে জানতো কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরুবে !

কাঁচা ধানে মই দেওয়া (খুব অনিষ্ট করা)—আমি কি তার কাঁচা ধানে মই দিয়েছি, যে সে আমার উপর এত খড়্গ-হস্ত হয়েছে ?

কথায় চিঁড়ে ভেজে না (কথায় বা মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে কার্যসিদ্ধি হয় না) —মন্ত্রীদের মিষ্টি কথায় গরীবদের দুঃখের চিঁড়ে ভিজবে না, কাজ চাই।

কপাল ফেরা (সৌভাগ্যের উদয়)—সকলেই আশা করেছিল যে স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে গরীবদের কপাল ফিরবে।

কুরুক্ষেত্র বেধে যাওয়া (নিদারুণ কলহের সূত্রপাত)—একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে দুই জায়ে কুরুক্ষেত্র বেধে উঠলো।

কান ভারী করা (ক্রমাগত নিন্দাবাদের দ্বারা মন বিরূপ করিয়া তোলা বা বিশ্বাস নষ্ট করা)—ঐ দুমুখোটা আমার বিরুদ্ধে বড়বাবুর কান ভারী করেছে, তাই আজকাল আর তিনি আমায় বিশ্বাস করেন না।

কাঁচা হাত (পটুতার অভাব)—এই লেখার মধ্যে কাঁচা হাতের যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা (শত্রুর দ্বারা শত্রু নাশ করা)—মুখুজ্জে এবং চাটুজ্জে এই দুঘরই তাঁর শত্রু, তাই তিনি একজনকে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চেষ্টা করলেন।

খাঁ খাঁ করা (শূন্য বোধ হওয়া)—মেয়েটা শ্বশুরবাড়ী গেছে, বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করছে।

খয়ের খাঁ (তোষামোদকারী)—যদু হচ্চে জমিদারবাবুর খয়ের খাঁ, তাঁকে তোষামোদ করাই তার পেশা।

খোঁটা দেওয়া (গঞ্জনা লাঞ্ছনা দেওয়া)—আশ্রিতদের ভাতের খোঁটা দিও না, তাতে তাদের বড় কষ্ট হয়।

খাল কেটে কুমীর আনা (বিপদ ডাকিয়া আনা)—তার মত মামলাবাজ লোককে ঘর ভাড়া দিও না, খাল কেটে কুমীর আনা উচিত নয়।

গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা (প্রথমে যত্ন না লইয়া শেষকালে যত্ন লওয়া)—গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে কি আর ফল হয় ?

গরু মেরে জুতা দান (অনিষ্ট করিয়া সামান্য দানের দ্বারা অপরাধ স্খালনের চেষ্টা)—আমাদের কারবারটা হস্তগত করে আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে চাইছেন ? এই গরু মেরে জুতা দান না করলেই ভালো হতো।

গোকুলের ষাঁড় (নিশ্চিন্ত নিষ্কর্মা)—সে খায় দায় ঘুরে বেড়ায়, যেন গোকুলের ষাঁড়।

গৌর-চন্দ্রিকা (ভূমিকা)—আর গৌর-চন্দ্রিকার প্রয়োজন কি ? বক্তব্যটা বলে ফেলো।

গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া (আশা দিয়া বঞ্চিত করা)—এত আশা দিয়ে আমায় বঞ্চিত করলে ? গাছে তুলে মই কেড়ে নিলে, এই তোমার ধর্ম ?

ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া (সুযোগ বুঝিয়া অলস হইয়া পড়া —বাড়ীতে নতুন বউ আসতেই গিন্নীটি একেবারে ঘোড়া দেখে খোঁড়া হলেন।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া (গুরুতর বিপদের আশঙ্কা দূরীভূত হইলে স্বস্তিবোধ) —সে আপদটা বিদায় হয়েছে, আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো !

চিনির বলদ (ভারবাহী মাত্র, ফলভোগী নয় যে)—আমরা ব্যাঙ্কের কেরানী, শুধু চিনির বলদ, টাকা নাড়াচাড়া করি বটে, কিন্তু টাকা পাই না।

চুল-চেরা (অতি সূক্ষ্ম বিচার বা হিসাব)—একটা মোটামুটি হিসাব দাও না ! আমি চুল-চেরা হিসাব চাইছি না।

ছিনে জোঁক (নাছোড়বান্দা)—উড়িয়া ভিখারীটি ছিনে জোঁকের মত তাকে ধরে রইল এবং শেষ পর্যন্ত ভিক্ষা আদায় করে তবে ছাড়ল।

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো (শেষ অবলম্বন)—ঐ বউটি হয়েছে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, যত দোষ যত অন্যায় সব কিছুর জন্যই বেচারীকে দায়ী করা হয়।

ছাই-চাপা আগুন (অপ্রকাশিত তেজ বা প্রতিভা)—দারিদ্র্যের চাপে পড়ে ওর প্রতিভা ছাই-চাপা আগুনের মত ফুটলো না।

জিলিপির প্যাঁচ (কুটিল বুদ্ধি)—তিনি সুবিধার লোক নন, তাঁর মনের মধ্যে জিলিপির প্যাঁচ।

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ (সকল কাজে সমান পটুতা)—তিনি খুব করিতকর্মা লোক, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবই তিনি করেন।

জলাঞ্জলি দেওয়া (বিসর্জন দেওয়া)—যেদিন থেকে তাকে ঘরে এনেছি, তখন থেকেই আমাকে সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে।

জলে ফেলা (বৃথা নষ্ট করা)—তোমার মত মূর্খকে আমি ব্যবসা করবার জন্য টাকা দেবো ? তার চেয়ে টাকাগুলো জলে ফেলে দেওয়াই ভাল।

ঝোপ বুঝে কোপ মারা (সুযোগ বুঝিয়া আঘাত হানা)—এখন একটু সহ্য করে চলো, তারপর সুযোগ এলে ঝোপ বুঝে কোপ মেরো।

ঝাঁকের কই (দলগত স্বার্থ সম্পর্কে সতর্ক ব্যক্তি)—ওরা আমাদের দলের লোকই নয়, দিন কতক আমাদের সঙ্গে মিশছে, পরে আবার ঝাঁকের কই নিজেদেব ঝাঁকে ফিবে যাবে।

ঝ'ড়ো কাক (রুক্ষ মূর্তি)—এই সামান্য ত্রিশ মাইল ট্রেনে এসেই ঝ'ড়ো কাকের মত চেহারা হয়ে গেলো ?

টাকার কুমীর (বহু টাকার অধিকারী বা মালিক)—তাঁকে তুমি চেন না, তিনি একটি টাকার কুমীর।

টেক্কা দেওয়া—কর্মচারীটি তার পুরানো মনিবকে টেক্কা দিয়ে একটি বিরাট দোকান ফাঁদলো।

ঠগ্ বাছতে গাঁ উজোড় (সকলেই এক দলের)—ভাল লোক ত' আর দেখতে পাই না, ঠগ্ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে গেল।

ঠোঁট-কাটা (বেহায়া, রূঢ়ভাষী)—সে ঠোঁট-কাটা লোক, স্পষ্ট রূঢ় কথা বলতে তার বাধে না।

ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর (উভয় সঙ্কট)—আমার হয়েছে ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর ; কি যে করি বুঝতে পারছি না।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে কোন কাজ করা)—লোকটা ডুবে ডুবে জল খায়, ওকে দেখলে বোঝা যায় না যে ভিতরে ভিতরে এত কাজ গুছিয়ে নিয়েছে।

ডুমুরের ফুল (যাহা চোখে দেখা যায় না)—তোমার আর দেখাই পাওয়া যায় না, একেবারে যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছ।

ডাকাবুকো (খুব সাহসী)—লোকটা ডাকাবুকো, ওর ভয়-ডর নেই।

ঢাকের বাঁয়া (যাহার কোনও প্রয়োজন নাই)—সভায় তিনি সভাপতির পাশে বসে শুধু সভার বাহার বাড়িয়েছিলেন, কোন কাজই করেন নি, যেন ঢাকের বাঁয়া।

ঢিমে তেতালা (মন্থর)—যে রকম ঢিমে তেতালা ভাবে কাজ করছো এতে কখন যে কাজ শেষ হবে তা জানি না।

তিন নকলে আসল খাস্তা (নকলের জন্য আসলের ক্ষতি)—আজকাল ভালো লোককে চিনবো কি করে? তিন নকলে আসল খাস্তা।

তাসের ঘর (ক্ষণভঙ্গুর)—দমকা বাতাসে তাসের ঘরের মতই আমার এ ঐশ্বর্য মিলিয়ে যেতে পারে।

তুলসী বনের বাঘ (বিড়াল-তপস্বী)—তাকে দেখতে ভালমানুষ, কিন্তু সে ভিতরে ভিতরে শয়তান ; একেবারে তুলসী বনের বাঘ।

তীর্থের কাক (যাহারা স্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করে)—আজ পরীক্ষার খবর বেরুবে, ছেলেরা তীর্থের কাকের মত প্রতীক্ষায় বসে আছে।

তুঁষের আগুন (যে জ্বালা সহজে প্রশমিত হইতে চাহে না)—স্বামীর শোক তাঁকে তুঁষের আগুনের মত ধিকি ধিকি পোড়াচ্ছে।

তিলকে তাল করা (সামান্য বিষয়কে গুরুতর করিয়া তোলা)—তিলকে তাল করে একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে কুরুক্ষেত্র বেধে উঠলো।

দুষ্টা সরস্বতী (দুর্বুদ্ধি)—তখন বোধ হয় দুষ্টা সরস্বতী তাঁকে ভর করেছিল, নতুবা এমন অন্যায় কাজ করবার লোক তিনি নন।

দিনে ডাকাতি (জুলুম করিয়া প্রকাশ্যভাবে অপহরণ)—এ যে দিনে ডাকাতি, এতটা জুয়াচুরি কি ভাল?

দাঁত-ভাঙা (অত্যন্ত দুরূহ)—এমন দাঁত-ভাঙা ভাষা ব্যবহার কোরো না।

দক্ষযজ্ঞ (লণ্ডভণ্ড ব্যাপার, বিশৃঙ্খলা)—সুরের আলোচনা থেকে হল তর্ক, তর্ক থেকে হাতাহাতি, তারপর দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।

দুমুখো সাপ—তিনি এর কথা ওকে এবং ওর কথা একে বলে দুজনেরই কান ভাঙান ; তিনি একটি দুমুখো সাপ।

দাঁত ফুটান (অর্থগ্রহণ করা)—ফরাসী ভাষায় আমার যতটুকু বিদ্যে, তাতে এই লেখাতে দাঁত ফুটান আমার সাধ্য নয়।

দু'নৌকায় পা দেওয়া (দুই দিক বজায় রাখার চেষ্টা)—পড়াশুনা যদি করতে চাও, তাহলে সিনেমা করার শখ ছাড় ; দু'নৌকায় পা দিয়ে সুবিধা হবে না।

দিনে তারা দেখা (অসম্ভব কল্পনা)—নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা।

ধুয়া ধরা (ছল অবলম্বন করা)—জিন্না সাহেব ধুয়া ধরলেন, মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান চাই।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা (অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পৃথিবীকে তুচ্ছ জ্ঞান করা)—হঠাৎ কিছু টাকা হাতে পেয়ে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগলেন।

নিজের কোলে ঝোল টানা (স্বার্থ রক্ষার জন্য চেষ্টা)—নিজের কোলে ঝোল টানার মধ্যে মহত্ত্ব কি আছে ?

নয়নের মণি (অতিশয় প্রিয়)—ছেলেটি মায়ের নয়নের মণি।

নয় ছয় (নষ্ট করা)—ঐ বিশাল সম্পত্তিটা ছেলেগুলো দুদিনেই নয় ছয় করে দিল।

নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা (অর্থ সঞ্চয়ের প্রবল প্রেরণা)—তোমার হয়েছে নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা, বেশ কিছু জমিয়েছো, তাই আরও জমাতে চাও ; তুমি খরচ করবে কি করে ?

ননীর পুতুল (আদুরে গোপাল)—শরীরটাকে শক্ত সমর্থ করো, ননীর পুতুল হয়ে দুনিয়ার কোন্ কাজ করবে ?

নাম রাখা (যশ অক্ষুণ্ণ রাখা)—এই ছেলেটি বড় হলে বাপের নাম রাখবে।

নাম ডোবান (সম্মান নষ্ট করা)—ছেলেটির পড়াশুনায় চাড় নেই, ও ওর সুপণ্ডিত বাপের নাম ডোবাবে।

পুকুর চুরি (বড় রকমের চুরি)—কর্তা ব্যক্তিদের পুকুর চুরির ফলে ব্যাঙ্কটি লালবাতি জেলেছে।

পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করা (গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করা)—আমি ত' কিছু করিনি, তুমিই ত' পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করছো।

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা (পরকে ঠকান)—পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ক'দিন চালাবে ? কাজকর্মের যোগাড় করো।

পর্বতের আড়ালে থাকা—বাবা যতদিন ছিলেন ততদিন পর্বতের আড়ালে ছিলুম ভাই ! এখন অথই জলে পড়েছি।

পোয়া বারো (খুব সুখের অবস্থা)—জমিদারের অসুখ, নায়েব গোমস্তাদের এখন পোয়া বারো।

পারের কড়ি (পরকালের পাথেয়)—চিরকাল সংসারের বোঝাই বইলুম, পারের কড়ি সংগ্রহ করা হলো না।

পায়া ভারী (অহঙ্কারের অবস্থা)—তার এখন পায়া ভারী, সে একটা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছে।

পুঁটিমাছের প্রাণ (ক্ষুদ্রশক্তি)—আমাদের পুঁটিমাছের প্রাণ, তোমাদেব সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবো কেন ?

পাকা ধানে মই (সিদ্ধপ্রায় উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা)—আমি কি তার পাকা ধানে মই দিয়েছি যে সে আমার এত অনিষ্ট চিন্তা করছে ?

পরের ধনে পোদ্দারি (পরের অর্থ লইয়া দান-ধ্যান ব্যয়)—বাবা মারা যেতেই শ্বশুরমশাই আমাদের বাড়ীতে এসে বসলেন এবং আমাদের সম্পত্তি নিয়ে পরের ধনে পোদ্দারি আরম্ভ করলেন।

পাঁচ কান করা (জানাজানি করা)—কথাটা পাঁচ কান করো না।

পাথরে পাঁচ কিল (উন্নত অবস্থা)—তার এখন পাথরে পাঁচ কিল, নিজে বড় একটা অফিসার, ছেলেরাও ভাল ভাল চাকরি করছে।

পর্বতের মূষিক প্রসব (বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া)—সভায় বড় বড় বক্তৃতা হলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলো পর্বতের মূষিক প্রসব।

পিঠটান দেওয়া (পলায়ন করা)—ছেলেটা আমের ঝাঁকা থেকে দুটো আম তুলে নিয়েই পিঠটান দিলে।

ব্যাঙের আধুলি (সামান্য সম্বল)—পৈতায় পাওয়া চল্লিশটি টাকাই হয়েছে খোকার কাছে ব্যাঙের আধুলি, ওই দিয়ে সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা কিনবে বলে মনে করে।

বর্ণচোরা (কপট ব্যক্তি)—লোকটি একটি বর্ণচোরা আম, ওকে ওপর থেকে বোঝবার জো নেই যে পেটে পেটে ওর শয়তানী বুদ্ধি।

বিড়াল-তপস্বী (কপট সাধু)—ওপরে ফোঁটা-তিলক, ভিতরে পরের সর্বনাশ চিন্তা, লোকটা বিড়াল-তপস্বী।

বেঙের সর্দি (অসম্ভব ব্যাপার)—ঐ বুড়ো খয়ের কাঠের অসুখ করবে? বেঙের আবার সর্দি হয় নাকি?

বালির বাঁধ (ক্ষণস্থায়ী)—"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।"

বুদ্ধির ঢেঁকি (বুদ্ধিহীন)—"হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।"—রবীন্দ্রনাথ ॥

বামন হয়ে চাঁদে হাত (অসম্ভব আশা)—বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাও কোন্ সাহসে?

বড় মুখ (বহু প্রত্যাশায়)—বড় মুখ করে তোমার কাছে এসেছি, আমাকে হতাশ করো না।

বুক দিয়ে পড়া (আন্তরিকতার সহিত দুঃখ-মোচনের চেষ্টা)—তাঁর এই বিপদে আত্মীয়স্বজনেরা এসে বুক দিয়ে পড়লেন।

বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা (অশোভন)—এমন রূপগুণহীন ছেলের ঐ বউ! এ যে বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা।

বাগে পাওয়া (কায়দায় পাওয়া)—তাকে একবার বাগে পেলে আমি মজা দেখিয়ে দেবো।

বিদুরের খুদ (শ্রদ্ধায় দেওয়া সামান্য ভোজ্য)—আমি বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করতে পারি নি, এই বিদুরের খুদটুকু খেয়েই আপনাদের তৃপ্ত হতে হবে।

ভূতের বেগার (ব্যর্থশ্রম)—সারা জীবনটা পরের কাজে ভূতের বেগারই খেটে মলুম।

ভাগের মা (ভাগের কাজ)—ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

ভিজে বিড়াল (বাহিরে নিরীহ, ভিতরে হিংস্র)—ছেলেটিকে দেখতে ভিজে বিড়ালটি, কিন্তু ওর পেটে পেটে বজ্জাতি।

মাছের মা (স্নেহমমতাবিহীন)—মাছের মায়ের আবার পুত্রশোক! শুনলে হাসি পায়।

মাছিমারা কেরানী (চিন্তাশক্তিবিহীন ব্যক্তি)—তুমি যেন মাছিমারা কেরানী, একটুও বিচারশক্তি নেই।

মণিকাঞ্চন যোগ (যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন)—যেমন হবুচন্দ্র রাজা তেমনই গবুচন্দ্র মন্ত্রী, একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে।

মনের ঝাল ঝাড়া (ক্রোধ প্রকাশ করা)—একটু সুযোগ পেলেই চেঁচামেচি করে তিনি মনের ঝাল ঝাড়েন।

মান্ধাতার আমল (অতি রাতন কাল)—সেই মান্ধাতার আমলের প্রথাগুলো কি এখনও মেনে চলতে হবে ?

মানে মানে (মান-মর্যাদা বজায় থাকিতে থাকিতে)—এখন আমাকে মানে মানে বিদায় দাও।

ম্যাও ধরা (বিপদের ঝুঁকি লওয়া)—তুনিয়ার মেয়েকুটুমকে ত' নিমন্ত্রণ করতে চাইছ, কিন্তু ম্যাও ধরতে রাজী আছ কি ?

মিছরির ছুরি (মুখে মধু, কার্যে অনিষ্টকারী)—আমার বন্ধুটি হচ্চে মিছরির ছুরি, মুখে মধু ঢালা, আর অন্তরে বিষ।

মাথা কাটা যাওয়া (অপমানিত হওয়া)—আমার ছোট ভাই ভদ্রলোকটির সঙ্গে এমন তুর্বিনীত ব্যবহার করলো, যে তাতে আমার মাথা কাটা গেলো।

মুখ করা (গালি দেওয়া)—পরিশ্রম সহ্য হয়, কিন্তু বড়বাবুর অনর্থক মুখ করা সহ্য হয় না।

মন ওঠা (পরিতৃপ্ত হওয়া)—এত খরচ করে তত্ত্ব পাঠানো হলো, তবু কুটুম-বাড়ীর কারোরই মন উঠলো না।

মায়া কান্না (কপট কান্না)—দারোগা সাহেব বল্লেন, "তোমার ঐ মায়া কান্নায় আমাদের মন গলবে না।"

মুখ রাখা (মর্যাদা রক্ষা করা)—আমার ছাত্রটি ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে আমার মুখ রেখেছে।

মুখ তুলে চাওয়া (প্রসন্ন হওয়া)—ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন না ?

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া—পিতার মৃত্যু-সংবাদে তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো।

মাঠে মারা যাওয়া (ব্যর্থ হওয়া)—আমি যেমনই বক্তৃতা দিতে উঠলুম অমনি মাইক্রোফোনটা গেল বিগড়ে, আমার বক্তৃতাটা মাঠে মারা গেল।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা (দুঃখের উপর দুঃখ)—ওর যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, ওকে নতুন করে শাস্তি দিয়ে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না।

মুখ চুন করা (ম্লানমুখ হওয়া)—ছেলেটি খুব অহঙ্কার প্রকাশ করে বাড়ী থেকে বেরুলো, তারপর ফেল্ করার সংবাদ শুনে মুখ চুন করে বাড়ী ফিরলো!

রাবণের চিতা (চির দুঃখানল)—পুত্রশোকের দুঃখ তাঁর বুকে সব সময়ে রাবণের চিতার মত জ্বলছে।

লঙ্কাকাণ্ড (অগ্নিকাণ্ড)—আগুন নিয়ে খেলা করো না, শেষে খড়ের চালে আগুন লেগে একটা লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাবে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার (অজস্র ধনসম্পদ)—না বুঝে খরচ করলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও শূন্য হয়ে যায়।

লেজে খেলানো (অনর্থক ঘোরানো, হয়রান করা)—বড়বাবু আমার ভাইকে চাকরি দেবেন বলেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত লেজে খেলাচ্ছেন, কাজে কিছুই করেন নি।

শাপে বর (দুর্ভাগ্য ভাবী সুখের কারণ)—এই পরীক্ষায় ফেল্ হওয়াটা তার কাছে শাপে বর হয়ে উঠলো,—নতুন করে পরিশ্রম করে সে ভাল ছেলে হয়ে উঠেছে।

শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ)—আমরা শিরে সংক্রান্তি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি, কখন যে কি দুঃসংবাদ আসে তার ঠিক নেই।

শাঁখের করাত (উভয় সঙ্কট)—আমার হয়েছে শাঁখের করাত, এগুলেও বিপদ পেছুলেও বিপদ।

শিবরাত্রির সল্‌তে (একমাত্র বংশধর)—এই নাতিটিই হচ্ছে বৃদ্ধের শিবরাত্রির সল্‌তে।

ষাঁড়ের গোবর (অপদার্থ)—সতীশ একটি ষাঁড়ের গোবর, ওর দ্বারা কোন কাজই হবে না।

সোনায় সোহাগা (শুভ সংযোগ)—মেয়েটির যেমন রূপ তেমনি গুণ, যেন সোনায় সোহাগা।

সাত খুন মাপ (গুরুতর অপরাধের শাস্তি মাপ)—তিনি মন্ত্রীমশাই-এর ভায়া, তাঁর ত' সাত খুন মাপ।

সাপে নেউলে (ঘোর শত্রুতা)—এখন হেড্ মাস্টারের সঙ্গে সেক্রেটারির সাপে নেউলে সম্পর্ক।

সাত ঘাটের জল খাওয়ান (নাকাল করা)—আমি তাকে সাত ঘাটের জল খাওয়াবো তবে ছাড়বো।

সাপের পাঁচ পা দেখা (গর্বান্ধ হইয়া যাহা হয় না তাহাই দেখা)—তার অত অহঙ্কার কেন? সাপের পাঁচ পা দেখেছে নাকি?

হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা প্রকাশ করা)—তাঁর অনেক গোপন কথা জানি, বাড়াবাড়ি করেন ত' হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (উপস্থিত সুযোগ ত্যাগ করা)—এমন চাকরি ছেড়ে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।

হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল)—চাকরি জোটে ত' ভালই, নইলে হাতের পাঁচ আমাদের পৈতৃক বৃত্তি যজমানি ত' আছেই, তাতেই নিজেব পেটটা চালিয়ে নিতে পারব।

হরিহর আত্মা (অচ্ছেদ্য বন্ধু)—তাঁদেব দুজনে খুব ভাব, একেবারে হরিহর আত্মা!

হ-য-ব-র-ল (বিশৃঙ্খলা)—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটু হ-য-ব-র-ল হয়ে আছে।

হাতটান (চুরির অভ্যাস)—ছেলেটির একটু হাতটান আছে।

হেস্তনেস্ত (নিষ্পত্তি)—আমি এই ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই।

হাতভারী (কৃপণ)—ও লোকটা ভীষণ হাতভারা, ওর হাত দিয়ে জল গলে না।

হাড় জুড়ান (শান্তি পাওয়া)—স্ত্রী রাগ করে স্বামীকে বললেন,—"আমি জানি, আমি মরলেই তোমাদের হাড় জুড়ায়।"

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—আর বৃথা তর্ক করে লাভ কি? বইটা খুলেই দেখো না, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।

হাড়ে বাতাস লাগা (স্বস্তি বোধ করা)—মেয়েটার একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে আমার হাড়ে বাতাস লাগে।

হাত কালি করা (নিজেকে কলঙ্কিত করা)—যত টাকাই দাও না কেন, ঘুষ নিয়ে তিনি হাত কালি করবেন না।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির প্রয়োগ করিয়া পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর :—

চিনির বলদ; কূপমণ্ডূক; ডুমুরের ফুল, পুকুর চুরি; মণিকাঞ্চন যোগ; সাপে-নেউলে, অরণ্যে রোদন; বিড়াল-তপস্বী, তাসের ঘর; উত্তম মধ্যম; অন্ধের যষ্টি; সোনায় সোহাগা, হাতের পাঁচ; শাঁখের করাত; মিছরির ছুরি; আকাশ-কুসুম; ব্যাঙের আধুলি; রাজযোটক, শিরে সংক্রান্তি; বিসমিল্লায় গলদ; তীর্থের কাক; গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল; ছেলের হাতের মোয়া; আঠারো মাসে বছর; দশচক্রে ভগবান ভূত; সাপের পাঁচ পা; কালনেমির লঙ্কাভাগ; বোঝার উপর শাকের আঁটি; সুখের পায়রা, বিনা মেঘে জল; বালির বাঁধ; অমাবস্যার চাঁদ, তুলসী বনের বাঘ; গায়ে কাঁটা দেওয়া; হাড়ে হাড়ে চেনা; অর্ধচন্দ্র দান; ভিজে বেড়াল; 'সুশীতল বারি-নিক্ষেপ'; তালপাতার সেপাই; চোখে সরিষার ফুল দেখা; মাথা হেঁট করা; মুখে ফুলচন্দন পড়া; হাত ধুয়ে বসা, ডাল-ভাঙা ক্রোশ; কলুর বলদ; বাঘেরাদুধ; যখের ধন, বিদুরের খুদ; রাবণের চিতা।

—ক. বি. মাধ্যমিক ১৯৩৪, '৩৯, '৪১, '৪২, '৪৪ (অতিরিক্ত), '৪৯ ও '৫২ ॥

২। নিম্নলিখিত যে-কোন পাঁচটি বাক্যাংশের অর্থ লিখ এবং উদাহরণস্বরূপ বাক্য রচনা কর :—

ভুঁইফোঁড়; অন্ধের নড়ি; ষাঁড়ের গোবর; দা-কুমড়া; তেলে বেগুনে; মাথার মণি; ছেলের হাতের মোয়া; সুখের পায়রা; তিলকে তাল; কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

—ঢা. বি মাধ্যমিক, ১৯৫০ ॥

উপযুক্ত পদযোজনা

বাংলা ভাষায় যে সকল বিশেষ্য পদ আছে, তাহার পূর্বে অনেক সময় উপযুক্ত বিশেষণ পদ সংস্থাপন করার প্রয়োজন হয়। তবে কোন্ বিশেষ্য শব্দের পূর্বে ঠিক কোন্ বিশেষণ শব্দটি বসিতে পারে, সে সম্বন্ধে জ্ঞান রাখিতে হয়।

নিম্নে বিশেষণের সহিত উপযুক্ত বিশেষ্য পদ প্রয়োগের কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

বিশেষণ	**বিশেষ্য**	**বিশেষণ**	**বিশেষ্য**
অপার	মহিমা	কানপাতলা	মানুষ
অক্লান্ত	পরিশ্রম	কান্ত	পদাবলী
অগাধ	জ্ঞান	কাটখোট্টা	চেহারা
অগোছালো	সংসার	কাঁচা	কাজ, পয়সা
অতল	সমুদ্র	ক্ষণস্থায়ী	জীবন
অন্তিম, দুগ্ধফেননিভ	শয্যা	খনখনে	আওয়াজ
অপলক	নেত্র	গম্ভীর	অম্বর
অপোগণ্ড	বালক	গালভরা, মধুর, মিষ্টি	হাসি
অলীক	স্বপ্ন, স্বপন	ঘুটঘুটে, সূচীভেদ্য	অন্ধকার
আটপৌরে	কাপড়	ঘর-আলো-করা, দুরন্ত,	ছেলে
আন্তরিক, প্রগাঢ়	ভালবাসা	শান্ত, ছটফটে, বেয়াড়া	ছেলে
উগ্র	গন্ধ, মূর্তি	চুলচেরা	বিচার
উত্তাল	তরঙ্গ	জ্যোৎস্নাময়ী	রজনী
ওজস্বিনী	ভাষা	জটিল	সমস্যা
কটকটে, কাঠফাটা,	রোদ	জন্মগত	সংস্কার
চড়চড়ে, সোনালী	রোদ	জলহারা	মেঘ
তত্ত্বজ্ঞ	ঋষি	পটলচেরা	চোখ

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
তেমাথা, চৌমাথা, চওড়া, পাকা, কাঁচা	রাস্তা	ফাঁকা	কথা, ঘর
		ফুটফুটে	জ্যোৎস্না
তালকানা	লোক	বিলোল	কটাক্ষ
তরুণ	অরুণ	বেনামা	সম্পত্তি
দাহ্য	বস্তু	বেসুরো	গান
দুমুখো	সাপ	ভাঙা	বাড়ী
দুরপনেয়	কলঙ্ক	মর্মস্পর্শী	সংবাদ
দুর্গম	পথ, গিরি	মৃদু	সমীরণ
দুর্জ্ঞেয়	চরিত্র	মোটা	বুদ্ধি
দুষ্কর	কর্ম	রম্য	দৃশ্য
দুশ্চর	তপস্যা	রোষকষায়িত, রক্ত	লোচন
দুস্তর	পারাবার	লোল	চর্ম
দোহারা	চেহারা	শোভন	সংস্করণ
ধূসর, রক্ত	বর্ণ	সুনীল, ফেনিল	জলধি
নিবিড়	অরণ্য	হৃদয়বিদারক	দৃশ্য, ঘটনা

প্রয়োগ ঃ বিশেষ্যের পূর্বে উপযুক্ত বিশেষণ বসায় বাক্যের ভাব ও সৌন্দর্য কেমন সুস্পষ্ট হইয়াছে দেখ।—

জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত শুভ্র যেন সে নবনী।—রবীন্দ্রনাথ॥

সারাদিন আকাশে **ছেঁড়া মেঘের** আনাগোনার বিরাম ছিল না।—শরৎচন্দ্র॥

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার।—নজরুল ইসলাম॥

যেদিন **সুনীল জলধি** হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ।—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়॥

ফুটফুটে জ্যোৎস্না, ধবধবে আঙিনা।

অপরাহ্ণের কাছাকাছি একটা গাঢ় **কালো মেঘ** দিকচক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল।

বাড়ীর দোতলা ঘরের বিশেষ একটা **খোলা জানালার** প্রতি **রোষকষায়িত লোচনে** অগ্নিবৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।—শরৎচন্দ্র, (মেজদিদি)॥

ভগবান্ ভানু **রক্ত নয়নে** হেরিলা নিলাজ নিঠুর লীলা।

—রবীন্দ্রনাথ, (পতিতা) ॥

বলি, **ফুলেল তেল-টেল** মাখা অভ্যাস নেই ত'?—শরৎচন্দ্র, (মেজদিদি) ॥

আশ্বিনের **সোনালী রোদ** পড়ে পৃথিবী হাসছে।

তরুণ অরুণ হাসে।

পুস্তকটির একটি **শোভন সংস্করণ** সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

"**গম্ভীর অম্বরে** যথা নাদে কাদম্বিনী।"—মাইকেল, (মেঘনাদবধ কাব্য) ॥

বাক্যের প্রকারভেদ ও রূপান্তরীকরণ

সরল বাক্যকে জটিল বা মিশ্র বাক্যে রূপান্তরীকরণ

সরল বাক্যকে জটিল বা মিশ্র বাক্যে রূপান্তরিত করিতে হইলে, সরল বাক্যের অন্তর্গত কোন কৃৎ বা তদ্ধিত বা সমাস-নিষ্পন্ন পদকে অথবা পদসমষ্টিকে সম্প্রসারিত করিয়া খণ্ড বাক্যে অর্থাৎ অপ্রধান বাক্যে পরিণত করিতে হয়; যেমন—

সরল বাক্য—বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্বত্র পূজিত হন।

জটিল বাক্য—যাঁহার বিদ্যা আছে, সেই ব্যক্তি সর্বত্র পূজিত হন। (কৃদন্ত পদকে ভাঙ্গা হইয়াছে)

সরল বাক্য—দাশরথি রামচন্দ্রের বুদ্ধি-বিক্রমের তুলনা নাই।

জটিল বাক্য—দশরথের পুত্র রামচন্দ্র, তাঁহার বুদ্ধি-বিক্রমের তুলনা নাই। (তদ্ধিতান্ত পদকে ভাঙ্গা হইযাছে)

সরল বাক্য—অনুর্বর ভূমিতে ভাল ফসল হয় না।

জটিল বাক্য—যে ভূমি উর্বর নহে, সেখানে ভাল ফসল হয় না। (সমাসান্ত পদকে ভাঙ্গা হইয়াছে)

সরল বাক্য—সে তাহার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করিতেছে।

জটিল বাক্য—সে যে কার্য করিয়াছে, তাহার জন্য অনুশোচনা করিতেছে। (সমাসান্ত পদকে ভাঙ্গা হইয়াছে)

সরল বাক্য—সর্পদষ্ট ছেলেটি মারা গিয়াছে।

জটিল বাক্য—যে ছেলেটিকে সর্প দংশন করিয়াছিল, সে মারা গিয়াছে।

জটিল বা মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তরীকরণ

জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত করিতে হইলে, জটিল বাক্যের অন্তর্গত অপ্রধান বাক্যাংশকে কৃৎপ্রত্যয়, তদ্ধিতপ্রত্যয় অথবা সমাস-প্রয়োগের দ্বারা একটিমাত্র পদে পরিণত করিয়া সঙ্কুচিত করিয়া লইতে হয় ; যেমন—

জটিল বাক্য—যে আগুন জ্বলিতেছে, তাহাতে হাত দিও না।

সরল বাক্য—জ্বলন্ত আগুনে হাত দিও না। (কৃৎ-প্রয়োগ)

জটিল বাক্য—শিবের উপাসক যে সন্ন্যাসীটি আসিয়াছিল, সে আজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সরল বাক্য—শৈব সন্ন্যাসীটি আজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। (তদ্ধিত-প্রয়োগ)

জটিল বাক্য—সূর্য যখন উদিত হইল, তখন অন্ধকার দূরীভূত হইল।

সরল বাক্য—সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হইল। (সমাস-প্রয়োগ)

জটিল বাক্য—সমুদ্র হইতে জাত যে কড্ মাছ, তাহার তেল উপকারী।

সরল বাক্য—সমুদ্রজাত কড্ মাছের তৈল উপকারী। (সমাস-প্রয়োগ)

জটিল বাক্য—যে মিথ্যা কথা বলে, তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না।

সরল বাক্য—মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না। (সমাস-প্রয়োগ)

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরীকরণ

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত করিতে হইলে, সরল বাক্যের অন্তর্গত কোন পদসমষ্টি বা বাক্যাংশকে একটি নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যে পরিণত করিতে হয়। পরে নূতন গঠিত বাক্যটিকে মূল বাক্যের সহিত যুক্ত করার জন্য সংযোজক, বিয়োজক, নিমিত্তার্থক, সঙ্কোচক প্রভৃতি অব্যয়ের একটি ব্যবহার করিতে হয়। বাক্যমধ্যে অসমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে, তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করিয়া নূতন বাক্য গঠন করিতে হয় ; যেমন—

সরল বাক্য—গঙ্গানদী হিমালয় পর্বত হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

যৌগিক বাক্য—গঙ্গানদী হিমালয় পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে এবং বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

[এখানে 'এবং' এই সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার হইয়াছে এবং অসমাপিকা ক্রিয়া 'হইয়া'-কে সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করিয়া নূতন বাক্য গঠন করা হইয়াছে।]

সরল বাক্য—অসুস্থতাহেতু আমি বিদ্যালয়ে আসিতে পারি নাই।

যৌগিক বাক্য—আমি অসুস্থ ছিলাম, এই নিমিত্ত বিদ্যালয়ে আসিতে পারি নাই।

সরল বাক্য—তিনি দরিদ্র হইলেও তাঁহার মন বড় উদার।

যৌগিক বাক্য—তিনি দরিদ্র, কিন্তু তাঁহার মন বড় উদার।

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তরীকরণ

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তরিত করিতে হইলে, যৌগিক বাক্যের একটি নিরপেক্ষ বাক্যকে মূল বাক্যরূপে স্থির করিয়া অন্য বাক্য বা বাক্যগুলিকে একটি পদ, পদসমষ্টি অথবা বাক্যাংশে সঙ্কুচিত করিতে হয়। সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করিয়া অব্যয়গুলি পরিত্যাগ করিতে হয়; যেমন—

যৌগিক বাক্য—বৃদ্ধ ছুটিয়া হস্তিনীর মৃতদেহের নিকট লুটাইয়া পড়িলেন এবং তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সরল বাক্য—বৃদ্ধ ছুটিয়া গিয়া হস্তিনীর মৃতদেহের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

যৌগিক বাক্য—ভাল করিয়া পড়, নতুবা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবে।

সরল বাক্য—ভাল করিয়া না পড়িলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবে।

যৌগিক বাক্য—আমি অঙ্কটি কষিতে পারি নাই, কিন্তু তুমি পারিবে।

সরল বাক্য—আমি অঙ্কটি কষিতে না পারিলেও তুমি পারিবে।

মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরীকরণ

মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত করিতে হইলে, মিশ্র বাক্যের অন্তর্গত অপ্রধান খণ্ডবাক্যকে নিরপেক্ষ বাক্যরূপে পরিণত করিতে হয়। এইজন্য নিত্যসম্বন্ধী

অব্যয়ের (Correlatives) পরিবর্তে সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় ব্যবহার করিতে হয়। অনেক সময় কেবল কমা (,) বা সেমিকোলন (;) দিলেই চলে, অব্যয়ের ব্যবহার দরকার হয় না ; যেমন—

মিশ্র বাক্য—যদিও তাহার সামর্থ্য নাই তথাপি সাহস আছে।

যৌগিক বাক্য—তাহার সামর্থ্য নাই, কিন্তু সাহস আছে।

মিশ্র বাক্য—যদি তুমি বড় হইতে চাও ত' আগে ছোট হও।

যৌগিক বাক্য—আগে তুমি ছোট হও, তবে বড় হইবে।

মিশ্র বাক্য—মধুসূদন যে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

যৌগিক বাক্য—মধুসূদন বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

মিশ্র বাক্য—এখন হইতে যদি নৌকায় পাল না খাটাও, তাহা হইলে সন্ধ্যার পূর্বে রসুলপুরে পৌঁছান যাইবে না।

যৌগিক বাক্য—এখন হইতেই নৌকায় পাল খাটাও নতুবা সন্ধ্যার পূর্বে রসুলপুরে পৌঁছান যাইবে না।

মিশ্র বাক্য—যদি শ্রম কর তবে অবশ্যই ফল পাইবে।

যৌগিক বাক্য—শ্রম কর, অবশ্যই ফল পাইবে।

যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তরীকরণ

যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বা জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করিতে হইলে, যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত একটি উপাদান বাক্য ব্যতীত অন্য উপাদান বাক্য বা বাক্যগুলিকে অপ্রধান খণ্ডবাক্যরূপে পরিণত করিতে হয় এবং সংযোজক ও বিয়োজক অব্যয়ের পরিবর্তে নিত্যসম্বন্ধী অব্যয় ব্যবহার করিতে হয় ; যেমন—

যৌগিক বাক্য—তিনি ধার্মিক সত্য, কিন্তু কখনও নিজেকে ধর্মশীল বলিয়া প্রচার করেন না।

মিশ্র বাক্য—যদিও তিনি সত্যই ধার্মিক, তথাপি কখনও নিজেকে ধর্মশীল বলিয়া প্রচার করেন না।

যৌগিক বাক্য—সত্য কথা বল, তোমায় ক্ষমা করা হইবে।

মিশ্র বাক্য—যদি সত্য কথা বল ত' তোমায় ক্ষমা করা হইবে।

যৌগিক বাক্য—রামলালের বয়স কম ছিল, দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না।

মিশ্র বাক্য—যদিও রামলালের বয়স কম ছিল, তথাপি দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না।

যৌগিক বাক্য—লোকটা তাহাকে কত ভর্ৎসনা করিল, সে কোন প্রত্যুত্তর দিল না।

মিশ্র বাক্য—যদিও লোকটা তাহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিল, তথাপি সে কোন প্রত্যুত্তর দিল না।

অনুশীলনী

১। সরল বাক্যে পরিণত কর :-

(ক) যাহার কথায় বিশ্বাস করা যায় না, তাহার কথার মূল্য কি? (খ) জীবন দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি। (গ) যে ব্যক্তি অভাব কাহাকে বলে কখনও অনুভব করে নাই, সে পরের দুঃখে কাতর হইবে কিরূপে? (ঘ) যেসকল মানব ধর্মপরায়ণ, তাঁহারাই সুখী। (ঙ) তোমার দুরদৃষ্ট যে, তুমি তাহার সাক্ষাৎ পাও নাই। (চ) জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। (ছ) মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন তাহার বুদ্ধি ঠিক থাকে না। (জ) আমি যে ঘোড়াটি কিনিয়াছি, তাহার মূল্য দুইশত টাকা। (ঝ) যদি ভগবানকে ডাক, তাহা হইলে তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন।

২। নিম্নলিখিত সরল বাক্যগুলিকে মিশ্র বাক্যে পরিণত কর :—

(ক) চরিত্রবান ব্যক্তিকে সকলেই সম্মান করে। (খ) নবদ্বীপ বৈষ্ণবদিগের মহা তীর্থক্ষেত্র। (গ) বিদ্বান্ ব্যক্তি সকল দেশে পূজ্য। (ঘ) তিনি এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইলেন। (ঙ) তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়া তাঁহার কোন অভাব ছিল না। (চ) অদ্য প্রাতঃকালে বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের অনেক উপকার হইবে।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে যৌগিক বাক্যে পরিণত কর :—

(ক) আমি নানাকার্যে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই।

(ক) আমি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিলেও তাহার দুর্দশার অবসান হইল না।

বাক্য-সংযোজন ও বাক্য-বিয়োজন

অর্থের পরিবর্তন না ঘটাইয়া পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বাক্যকে একটি বাক্যে প্রকাশ করার নাম বাক্য-সংযোজন। বাক্য-সংযোজন নানা উপায়ে হইতে পারে ; যথা—

১। সরল বাক্যসমূহযোগে একটি সরল বাক্য গঠন ;

২। সরল বাক্যসমূহযোগে একটি যৌগিক বাক্য গঠন ,

৩। সরল বাক্যসমূহযোগে একটি জটিল বাক্য গঠন ;—ইত্যাদি।

১। সরলবাক্য সমূহযোগে একটি সরল বাক্য গঠন ঃ

(ক) **বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী ঃ** সূর্য উদিত হইল। পক্ষিগণ কুলায় পরিত্যাগ করিল।

সংযুক্ত বাক্য ঃ সূর্য উদিত হইলে পক্ষিগণ কুলায় পরিত্যাগ করিল।

(খ) **বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী ঃ** তিনি হিমালয় পর্বতে আরোহণ করিলেন। তুষাররাশি সূর্যকিরণে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল ; তিনি তাহা নিরীক্ষণ করিলেন। উহাতে তাঁহার আনন্দ হইল।

সংযুক্ত বাক্য ঃ তিনি হিমালয় পর্বতে আরোহণ-পূর্বক সূর্যকিরণে সমুজ্জ্বল তুষাররাশি নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত হইলেন।

(গ) **বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী ঃ** অকস্মাৎ বসন্তের আবির্ভাব হইল। সমস্ত বনভূমি রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তরুলতা কুসুমাভরণে সজ্জিত হইল। তিনি তাহা নিরীক্ষণ করিলেন। উহাতে তাঁহার পুলক জাগিল।

সংযুক্ত বাক্য ঃ অকস্মাৎ বসন্তের আবির্ভাবে রোমাঞ্চিত বনভূমির কুসুমাভরণে সজ্জিত তরুলতা নিরীক্ষণ করিয়া তিনি পুলকিত হইলেন।

(ঘ) **বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী ঃ** ঈশ্বরচন্দ্র মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতা তাঁহাকে বাড়ী যাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। দামোদরে তখন ভীষণ বন্যা। তিনি নৌকা পাইলেন না। তিনি সাঁতার কাটিয়া দামোদর নদ পার হইলেন।

সংযুক্ত বাক্য ঃ বাড়ী যাইবার জন্য মাতার পত্র পাইয়া মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র নৌকা না পাওয়াতে ভীষণ বন্যায় দামোদর নদ সাঁতার কাটিয়া পার হইলেন।

(ঙ) **বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী ঃ** আমি ঘোড়ায় উঠিলাম। ঘোড়াটিকে ঘন ঘন কশাঘাত করিতে লাগিলাম। তখন সে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িল। তাহার গতি ঠিক বিদ্যুতের মত দ্রুত লইল। ঘোড়া উত্তর দিক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

সংযুক্ত বাক্য ঃ আমি ঘোড়ায় উঠিয়া তাহাকে ঘন ঘন কশাঘাত করিতেই সে উর্ধ্বশ্বাসে বিদ্যুদ্‌বেগে উত্তর দিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে লাগিল।

২। সরল বাক্যসমূহযোগে একটি যৌগিক বাক্য গঠন ঃ

(ক) **বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী ঃ** গুরুমহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বালককে মারিলেন না। বালক বড়ই ভয় পাইয়াছিল। তাহার অপরাধ গুরুতর হইয়াছিল। কিন্তু সে সত্য কথা বলিয়াছিল। এইজন্য সেবার গুরুমহাশয় তাহাকে মার্জনা করিলেন।

সংযুক্ত বাক্য ঃ গুরুমহাশয় তথায় উপস্থিত হওয়াতে বালকটি বড়ই ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু সে সত্য কথা বলায় তাহার অপরাধ গুরুতর হইলেও তিনি তাহাকে না মারিয়া সেবার মার্জনা করিলেন।

(খ) **বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী ঃ** একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস। অদূরে একটি পানাপুকুর। তাহার চারিপাশে জঙ্গল।

সংযুক্ত বাক্য ঃ একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস, অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাশে জঙ্গল।

(গ) **বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী ঃ** অপু রোজ পাঠশালায় যাইত। পাঠশালায় যাইবার সময়ে সে বই-দপ্তর লইয়া যাইত। তাহার দিদি তাহার সঙ্গে যাইত। তাহার মা তাহার চুল আঁচড়াইয়া তাহাকে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিতেন।

সংযুক্ত বাক্য ঃ অপু রোজ বই-দপ্তর লইয়া তাহার দিদির সহিত পাঠশালায় যাইত এবং তাহার মা তাহাকে তাহার চুল আঁচড়াইয়া পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিতেন।

৩। সরল বাক্যসমূহযোগে একটি মিশ্র বাক্য গঠন ঃ

(ক) **বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী ঃ** এইস্থানে আমি সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইয়াছিলাম। আপনার হস্তে তালবৃন্ত ছিল। উহা আপনি আমার

মস্তকের উপর ধারণ করিয়া আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন। এই কথা আমার স্মরণ হইতেছে।

সংযুক্ত বাক্য : আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইলে আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধারণ করিয়া আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন।

(খ) **বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী :** আমাদের জাহাজ ছাড়িল। তখন ভোর হইতেছিল। কিন্তু চারিদিক বেশ ভাল করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না।

সংযুক্ত বাক্য : যখন আমাদের জাহাজ ছাড়িল তখন ভোর হইতে থাকিলেও চারিদিক বেশ ভাল করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত বিচ্ছিন্ন বাক্যগুলিকে একটি সরল বাক্যে পরিণত কর :—

(ক) কৌশাম্বীর রাজা সূর্যবংশীয়। তিনি ব্রাহ্মণপক্ষপাতী ছিলেন। বশিষ্ঠকে তিনি পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। অমনি বিশ্বামিত্র ও পরশুরামের দল ক্ষেপিয়া উঠিলেন।

(খ) সূর্য অস্তগমন করিল। চন্দ্র উদিত হইল। আমরা ভ্রমণে বহির্গত হইলাম।

(গ) বালকটি অনাথ। সে একখানি মলিন বস্ত্র পরিয়া রহিয়াছে, তাহার বস্ত্রখানি জীর্ণ। বালকটির বয়স সাত বৎসর।

(ঘ) বেহুলা ভেলায় যাইয়া বসিলেন। তাঁহার ললাট সিন্দূর ও চন্দনে লিপ্ত ছিল। তিনি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবী-প্রতিমার ন্যায় মনে হইতেছিল।

(ঙ) কার্থেজ নগরে এণ্ড্রোক্লিস্ নামে এক ক্রীতদাস ছিল। তাহার প্রভু তাহার প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিতেন। সে তাঁহার নিকট হইতে পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে গোপনে প্রভুগৃহ ত্যাগ করিল। নগর হইতে কয়েক মাইল দূরে এক অরণ্য ছিল। সে তথায় লুক্কায়িত হইল।

রচনা-শুদ্ধি

বাঙ্গালা রচনায় নানাজাতীয় অশুদ্ধির সম্ভাবনা আছে। এই সমস্ত অশুদ্ধির মধ্যে বানানগত অশুদ্ধি বেশি। ইহা ভিন্ন, সন্ধিঘটিত ভুল, লিঙ্গঘটিত ভুল, কৃদন্ত ও তদ্ধিতঘটিত ভুল, সমাসঘটিত ভুল, ভ্রান্ত অর্থে শব্দ-প্রয়োগঘটিত ভুল, রচনা-শৈলীর ভুল, অলঙ্কারাদির প্রয়োগের ভুল, শ্রুতিকটুতা, অপ্রযুক্ততা, প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধতা, নিরর্থকতা ইত্যাদি নানাজাতীয় ভুল রচনার মধ্যে ঘটিতে পারে।

ই ঈ ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বাল্মিকা	বাল্মীকি	ভাগিরথী	ভাগীরথী
পিপিলিকা	পিপীলিকা	শারিরীক	শারীরিক
নিপিড়িত	নিপীড়িত	কৃষিজিবী	কৃষিজীবী
নিশিথ	নিশীথ	জিবনী	জীবনী
পূজারীনি	পূজারিনী	বিভিষিকা	বিভীষিকা
পুষ্করিণি	পুষ্করিণী	গরিয়সী	গরীয়সী

—ইত্যাদি

উ ঊ ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নুপুর	নূপুর	স্ফুর্তি	স্ফূর্তি
মুষিক	মূষিক	শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
দুষিত	দূষিত	অনুভুতি	অনুভূতি
লঘুকরণ	লঘূকরণ	বিদ্রুপ	বিদ্রূপ
বঁধু	বঁধূ	অনসুয়া	অনসূয়া
বধু	বধূ	ক্রুর	ক্রূর

—ইত্যাদি

ণত্ব ও ষত্ব ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ	অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ণ
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	বণ	বন
নারায়ন	নারায়ণ	(কিন্তু আম্রবণ, খদিরবণ শুদ্ধ)	
প্রণষ্ট	প্রনষ্ট	সুসেন	সুষেণ
মাননীয়াষু	মাননীয়াসু	হরিসেন	হরিষেণ
কল্যাণীয়েসু	কল্যাণীয়েষু		(কিন্তু কপিসেনা)
সুসুপ্তি	সুষুপ্তি	সুসমা	সুষমা
পিতৃ-স্বসা	পিতৃষ্বসা	নিসেবিত	নির্ষেবিত

র, ড়—বাঙ্গালায় অনেক ক্ষেত্রে লেখার মধ্যে র ও ড়-এর ভুল দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় র ড় এক জিনিস নহে এবং অনেক সময়েই র-এর স্থলে ড় প্রয়োগ করিলে অর্থেরও পরিবর্তন হইয়া যায়। যথা :—

চর = নদীর চর
চড় = চপেটাঘাত

মরা = মরিয়া যাওয়া
মড়া = মৃতদেহ

ছার = ছারপোকা, তুচ্ছ
ছাড় = ছাড়িয়া দাও

চন্দ্রবিন্দু—মূল সংস্কৃত শব্দগুলিতে যদি ং, ঙ, ঞ, ণ, ন অথবা ম থাকে তাহা হইলে সেই সমস্ত শব্দ হইতে উদ্ভূত বাঙ্গালা শব্দে চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ করিতে হয়; যথা :—কণ্টক > কাঁটা, রন্ধন > রাঁধা, দন্ত > দাঁত, বংশী > বাঁশী, ছন্দ > ছাঁদ।

ঃ, ও—বিসর্গ (ঃ) এবং ও-কারের সমস্যা সন্ধির অপ্রয়োগঘটিত ভুলের ব্যাপার; বিসর্গ-সন্ধির নিয়মগুলি জানা থাকিলে, এই জাতীয় ভুলগুলি এড়াইয়া চলিতে পারা যায়; এই জাতীয় সন্ধিগুলি লক্ষণীয়; যথা :—মনঃ + পীড়া = মনঃপীড়া; কিন্তু মনঃ + যোগ = মনোযোগ, মনঃ + সংযোগ = মনঃসংযোগ; কিন্তু মনঃ + হর = মনোহর ইত্যাদি।

অন্যান্য বানান-ঘটিত অশুদ্ধি—অন্যান্য বানান-ঘটিত অশুদ্ধি সাধারণত এইভাবে ঘটিয়া থাকে। যথা :—

যুক্তাক্ষর-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বিদ্যান	বিদ্বান্	উজ্জল	উজ্জ্বল
লক্ষী	লক্ষ্মী	ইয়ত্বা	ইয়ত্তা

উচ্চারণ দোষ-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ব্যেক্তি	ব্যক্তি	সম্মান	সম্মান
নেয্য	ন্যায্য	তেজ্য	ত্যাজ্য
ব্যাথা	ব্যথা	অনাটন	অনটন
পিচাশ	পিশাচ	কামাক্ষা	কামাখ্যা
বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়	আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা

য-ফলা ও ব-ফলা-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
স্বাস্থ	স্বাস্থ্য	সান্তনা	সান্ত্বনা
সন্নাসী	সন্ন্যাসী	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
বৃহৎপতি	ব্যুৎপত্তি	প্রতিদ্বন্দিতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
জৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ	সত্ত	স্বত্ব

কয়েকটি বানান ভুলের উদাহরণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনাটন	অনটন	দাশরথী	দাশরথি
অজাগর	অজগর	বাল্মিকী	বাল্মীকি<বল্মীক
আষাড়	আষাঢ়	মেঘনাথ	মেঘনাদ
ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ	বাসুকী	বাসুকি
এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা	মধুসুদন	মধুসূদন
অমাবস্যা	অমাবস্যা	অনুকুল	অনুকূল
ঊর্নণাভ	ঊর্ণনাভ	দুর্বিসহ	দুর্বিষহ
প্রজ্জালিত	প্রজ্বালিত	ধন্বন্তরী	ধন্বন্তরি
প্রকোষ্ট	প্রকোষ্ঠ	ষড়যন্ত্র	ষড়্‌যন্ত্র (ষট্+যন্ত্র)
সম্মুখ	সম্মুখ	স্নেহাশীষ	স্নেহাশিস্
ভৌগলিক	ভৌগোলিক<ভূগোল	অনুসূয়া	অনসূয়া (অসূয়া)
পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য<পুরোহিত	সুরধনী	সুরধুনী<ধুনী=নদী
অপগণ্ড	অপোগণ্ড	প্রসংশা	প্রশংসা
গোলকনাথ	গোলোকনাথ<গোলোক	ত্রহস্পর্শ	ত্র্যহস্পর্শ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আভাষ	আভাস	অভ্যস্থ	অভ্যস্ত
চব্যনপ্রাস	চ্যবনপ্রাস	গড্ডালিকা	গড্ডলিকা
সারথী	সারথি	কৌতুহল	কৌতূহল
ধ্বংশ	ধ্বংস	সন্ধা	সন্ধ্যা

বিশেষণের অপপ্রয়োগ-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বিশ্রী গন্ধ	দুর্গন্ধ (গন্ধের শ্রী থাকিতে পারে না, সুতরাং বিশ্রী এই বিশেষণের সার্থকতা নাই)
সমূহ বিপদ	বিষম বিপদ
বয়স্ক লোক	পূর্ণবয়স্ক লোক
যথেষ্ট ক্ষতি	খুব ক্ষতি (ক্ষতির মধ্যে ইষ্ট কিছু থাকিতে পারে না)
ভযানক ভাল	অত্যন্ত ভাল, খুব ভাল (ভাল ভয়জনক হইতে পারে না)
তিন বৎসর ব্যাপী	ত্রিবর্ষব্যাপী বা তিন বৎসর ধরিয়া
স্বর্গীয় পিতৃদেব	স্বর্গত পিতৃদেব
আশ্চর্য ব্যাপার	আশ্চর্যজনক ব্যাপার
গোপন কথা	গুপ্ত কথা
উন্মাদ যুবক	উন্মাদগ্রস্ত যুবক
অস্তমান সূর্য	অস্তায়মান সূর্য
মহীয়সী মহিলা	মহতী মহিলা
ভয়ানক ভয়	দারুণ ভয়
আরোগ্য হওয়া	রোগমুক্ত হওয়া, আরোগ্যলাভ করা
অসাধ্য অসুখ	দুশ্চিকিৎস্য অসুখ
পঞ্চম বর্ষীয় বালক	পঞ্চ বর্ষীয় বালক (পঞ্চম কথাটি ক্রম-বাচক)
সাংসারিক বুদ্ধিহীন	সংসার-বুদ্ধিহীন
অধীনস্থ	অধীন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দ্বিতীয় সংখ্যক	দ্বিসংখ্যক
ভীষণ আনন্দ	গভীর আনন্দ
বীতরাগ জন্মিল	বীতরাগ হইল
অজীর্ণ রোগ	অজীর্ণতা রোগ
প্রিয়পাত্র	প্রীতিপাত্র
দেবী অন্তর্ধান হইয়াছেন	দেবী অন্তর্হিতা হইয়াছেন; দেবীর অন্তর্ধান হইয়াছে
আপ্রাণ চেষ্টা	প্রাণপণ চেষ্টা

বিশেষ্যের অপপ্রয়োগ-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আশ্চয বোধ করা	আশ্চর্যান্বিত হওয়া
বিদায় হওয়া	বিদায় লওয়া
গৃহিণী রোগ	গ্রহণী রোগ
দারিদ্রতা দোষ	দারিদ্র্য দোষ
সহ্যের অতীত	সহনের অতীত
নাম স্বাক্ষর করা	নাম স্বাক্ষরিত করা
প্রতিমার নিরঞ্জন	প্রতিমার নীরাজনা বা নীরমজ্জন
আভ্যুতিক	আভ্যুদয়িক
জলছত্র	জলসত্র
আবশ্যক নাই	আবশ্যকতা নাই
পুষ্পের সুরভি	পুষ্পের সৌরভ
সৃজনীশক্তি	সৃষ্টিশক্তি

পুনরুক্তি-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অশ্রুজল	অশ্রু	পশ্চাৎ অনুসরণ	অনুসরণ, পশ্চাৎ গমন
কর্তব্য কর্ম	কর্তব্য	আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সজ্জন ব্যক্তি	সজ্জন	প্রত্যক্ষ গোচর	প্রত্যক্ষ
নিজস্ব ধন	নিজস্ব	সদা সর্বদা	সর্বদা
সমতুল্য	তুল্য	সবিনয়পূর্বক	বিনয়পূর্বক, সবিনয়ে
স্মিতহাস্য	স্মিত	সাবধানপূর্বক	সাবধানে

অব্যয়ের অপপ্রয়োগ-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তিনি ধনী **কিন্তু** উচ্চবংশজাত	তিনি ধনী **এবং** উচ্চবংশজাত
তাহার **উপর** আমার কোনও অভিযোগ নাই	তাহার **প্রতি** আমার কোনও অভিযোগ নাই
তোমাদের **সঙ্গে** এ খবরটা পাইয়াছি	তোমাদের **নিকট হইতে** এ খবরটা পাইয়াছি
তাহার **প্রতি** ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি	তাহার **উপর** ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি
আমাদের চালচলন তোমাদের **অপেক্ষা** পৃথক	আমাদের চালচলন তোমাদের চালচলন **হইতে** পৃথক

সম্বন্ধ পদের অপপ্রয়োগ-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নির্জলা গাইয়ের দুধ	গাইয়ের নির্জলা দুধ
তাজা পুকুরের মাছ	পুকুরের তাজা মাছ
বাড়ীর টাট্কা মাখন-তোলা ঘি	টাট্কা মাখন-তোলা বাড়ীর ঘি
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেল	ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধ হোটেল
বৈজ্ঞানিক ক্রিমির মহৌষধ	ক্রিমির বৈজ্ঞানিক মহৌষধ
তিনি আসিবার পূর্বে	তাঁহার আসিবার পূর্বে

ক্রিয়া ও কর্তার (অথবা কর্মের) সম্পর্কের অসাবধানতা-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তিনি বিদ্যালয় মন্দির পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন।	তিনি বিদ্যালয় স্থাপন, মন্দির নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন।
তাঁহার মধুর গান ও সুন্দর মূর্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম।	তাঁহার মধুর গান শুনিয়া ও সুন্দর মূর্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম।
পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করিলে বুদ্ধি ও ভদ্রতা শিক্ষা করা যায়।	পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করিলে বুদ্ধি বাড়ে ও ভদ্রতা শিক্ষা হয়।
তিনি দেশের সেবা, অজ্ঞের শিক্ষা দরিদ্রের প্রতি দয়া করিয়াছেন।	তিনি দেশের সেবা করিয়াছেন, অজ্ঞের শিক্ষা-ব্যবস্থা করিয়াছেন, দরিদ্রের প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিয়াছেন।

সন্ধিঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মনযোগ	মনোযোগ	নিস্ফল	নিষ্ফল
শিরমণি	শিরোমণি	পশ্বাধম	পশ্বধম
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	দ্রুবাদৃষ্ট	দ্রুবদৃষ্ট
সদ্যজাত	সদ্যোজাত	নিরোগ	নীরোগ
বাক্‌দান	বাগ্‌দান	নিরস	নীরস
পৃথকান্ন	পৃথগন্ন	চক্ষুদ্বয়	চক্ষুর্দ্বয়
হৃদ্‌কম্প	হৃৎকম্প	জগজন	জগজ্জন
বিপদ্‌পাত	বিপৎপাত	বারম্বার	বারংবার
আবিস্কার	আবিষ্কার	কিম্বা	কিংবা
পুরষ্কার	পুরস্কার	কিম্বদন্তী	কিংবদন্তী
পোস্টাফিস	পোস্ট অফিস	অত্রাদালতে	অত্র আদালতে

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দিগেন্দ্র	দিগিন্দ্র	জ্যোতীন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	জ্যোতীশ	জ্যোতিরীশ
জগমোহন	জগন্মোহন	শুদ্ধাশুদ্ধি	শুদ্ধাশুদ্ধি

বিঃ দ্রঃ—(১) বাংলায় একপদে, ধাতু এবং উপসর্গে, অথবা সমাসেই শুধু সন্ধি বিধেয় ; সংস্কৃতের মত বাঙ্গালায় যেখানে-সেখানে সন্ধি করিলে ভুল হয়। যথা :—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
এই কথা শুনিয়া তিনি **মুখাবনত** করিলেন।	এই কথা শুনিয়া তিনি **মুখ অবনত** করিলেন।
তোমরা দেশের **মুখোজ্জ্বল** কর।	তোমরা দেশের **মুখ উজ্জ্বল** কর।

(২) অবাঙ্গালা শব্দের সহিত বাঙ্গালা শব্দের অথবা সংস্কৃত শব্দের সহিত ইংরাজী বা ফারসী শব্দের সন্ধি হয় না; এইজন্যই পোস্টাফিস, অত্রাদালতে প্রভৃতি লেখা ঠিক নয়। তবে ভোটাধিকার, ইংলণ্ডাধিপতি প্রভৃতি আজকাল প্রায় চল হইয়া গিয়াছে।

সমাস-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গুণীগণ	গুণিগণ	কালীদাস	কালিদাস
পক্ষীশাবক	পক্ষিশাবক	দেবীদাস	দেবিদাস
যোগীবেশ	যোগিবেশ	ছাগীদুগ্ধ	ছাগদুগ্ধ
রাজাগণ	রাজগণ	মহারাজা	মহারাজ
যুবাগণ	যুবগণ	অহর্নিশি	অহর্নিশ
মহদুপকার	মহোপকার	মধ্যরাত্রি	মধ্যরাত্র
নির্ধনী	নির্ধন	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
নিরোগী	নীরোগ	মাতারূপে	মাতৃরূপে
সলজ্জিত	সলজ্জ	বিদ্বান সমাজ	বিদ্বৎসমাজ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ক্রেতাগণ	ক্রেতৃগণ	সাবধানী	সাবধান
সুগন্ধ পুষ্প	সুগন্ধি পুষ্প	দুর্গন্ধিপবন	দুর্গন্ধ পবন
নিরলস	অনলস	নিরুদ্বিগ্ন	নিরুদ্বেগ
পথমধ্যে	পথিমধ্যে	সমধর্মী	সমধর্মা
সহ্যাতীত	সহনাতীত	মহিমাবর	মহিমবর
সানুনয়পূর্বক	সানুনয়ে বা অনুনয়পূর্বক	আয়ুক্ষয়	আয়ুঃক্ষয়
		নিরপরাধী	নিরপরাধ

বিঃ দ্রঃ—(১) খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সহিত ইংরাজী, ফারসী বা প্রাকৃতজ শব্দের সমাস দূষণীয়। যথা :—মহৌষধিবিরুদ্ধবীর্য-সাপ, দুগ্ধফেননিভ-বিছানা, ইংলণ্ডাগত রাজপুরুষ।

(২) "ও" বা "এবং" দ্বারা যুক্ত অনেকগুলি পদ থাকিলে, তাহাদের শেষের পদ দুইটিকে বিচ্ছিন্নভাবে ধরিয়া সমাসবদ্ধ করা উচিত নয়। যথা :—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
এমন সুখশান্তি ও **ঐশ্বর্য ভরা** দেশ আর ছিল না।	এমন সুখশান্তি ও **ঐশ্বর্যে ভরা** দেশ আর ছিল না।
রাম জটায়ুকে **শোণিত ও কর্দমাক্ত** অবস্থায় দেখিলেন।	রাম জটায়ুকে **শোণিত-সিক্ত ও কর্দমাক্ত** অবস্থায় দেখিলেন।

কৃৎ-তদ্ধিত প্রত্যয়াদি ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	জাগ্রত	জাগ্রৎ
উচিৎ	উচিত	সত্ত্বা	সত্তা
একত্রিত	একত্র	সিঞ্চন	সেচন
অসহ্যনীয়	অসহ্য, অসহনীয়	নিঃশেষিত	নিঃশেষ
ব্যবসা	ব্যবসায়	বাহুল্যতা	বাহুল্য
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	ব্যাকুলিত	ব্যাকুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘর্ণীয়মান	ঘূর্ণ্যমান	প্রযুজ্য	প্রয়োজ্য
নিরাপদেষু	নিরাপৎস্থ	আবরিত	আবৃত
মান্যমান	মান্য	ভাসমান	ভাসন্ত ('দীপ্যমান'
মাধুরিমা	মধুরিমা		অর্থে ভাসমান শুদ্ধ)
আহরিত	আহৃত	গৃহীতা	গ্রহীতা
ত্যাজ্যপুত্র	ত্যক্ত পুত্র	বপিত	উপ্ত
অধীতব্য	অধেতব্য	রাজনৈতিক	রাজনীতিক
হন্তারক	হন্তৃক	শতবার্ষিক	শাতবর্ষিক
চর্বচোষ্য	চর্ব্যচূষ্য	প্রত্নতাত্ত্বিক	প্রাত্নতত্ত্বিক
নিশ্চয়তা	নিশ্চয়, নৈশ্চিত্য	সততা	সাধুতা, সত্তা
দংশিত	দষ্ট	সখ্যতা	সখ্য
উৎসর্গিত	উৎসৃষ্ট	বিশৃঙ্খলা	বিশৃঙ্খলতা
দাহ্যশক্তি	দাহিকা শক্তি	নির্ভরতা	নির্ভর

লিঙ্গ-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
চতুর্থা	চতুর্থী	বুদ্ধিমতী রমণীগণ	বুদ্ধিমতী রমণীরা
ভাগ্যিমানী	ভাগ্যবতী		(বা বুদ্ধিমান্
লক্ষ্মীমতী	লক্ষ্মীবতী		রমণীগণ)
অনাথিনী	অনাথা	পঞ্চমা কন্যা	পঞ্চমী কন্যা
নিরপরাধিনী	নিরপরাধা	বয়স্থা কন্যা	বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা
শ্রদ্ধাস্পদা	শ্রদ্ধার্হা	গৃহকর্তৃ	গৃহকর্ত্রী
নায়কী	নায়িকা	সুন্দরী অভিনেতৃ	সুন্দরী অভিনেত্রী
চণ্ডালিনী	চণ্ডালী	মায়াবীনি	মায়াবিনী
ভগ্নী	ভগিনী	সাম্যবাদীনি	সাম্যবাদিনী
শিবানী	শিবা	পাপীনী	পাপীয়সী
মুখরা স্ত্রীলোক	মুখরা স্ত্রী	পয়স্বীনী	পয়স্বিনী

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সুকেশিনী	সুকেশী	যশস্বীনী	যশস্বিনী
মহা সভা	মহতী সভা	মৎসা	মৎসী
বৈষ্ণবী ভাব	বৈষ্ণব ভাব	মাধুরিমা	মাধুরী (মাধুর্য)
মূর্তিমান দয়া	মূর্তিমতী দয়া	সুজলা দেশ	সুজল দেশ
সনাতনী পন্থা	সনাতন পন্থা	লক্ষ্মীস্বরূপিণী	লক্ষ্মীস্বরূপা

বচন-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনেক বালকেরা	অনেক বালক	মৃগযূথসমূহ	মৃগযূথ, মৃগসমূহ
দৃশ্যাবলীসমূহ	দৃশ্যাবলী	যাবতীয় নরগণ	যাবতীয় নর
সমুদয় পক্ষিগণ	সমুদয় পক্ষী	সকল মনুষ্যেরা	সকল মনুষ্য
ছাত্রগণেরা	ছাত্রগণ	নানাবিধ দৃশ্যাবলী	নানাবিধ দৃশ্য

অনাবশ্যক প্রত্যয়াদিযোগ-ঘটিত অশুদ্ধি

এই জাতীয় রচনাগুলি ব্যাকরণের বিচারে হয়ত অনেক সময় সমর্থনযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু এরূপ ব্যবহার দূষণীয়।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ
অচিন্ত্যনীয়	অচিন্ত্য	মৈত্রতা	মিত্রতা, মৈত্রী
অংশীদার	অংশী	স্বত্বাধিকার	স্বত্ব বা অধিকার
অদ্যাপিও	অদ্যাপি	সখ্যতা	সখ্য
তথাপিও	তথাপি	দারিদ্রতা	দারিদ্র্য, দরিদ্রতা
মহাবলসম্পন্ন	মহাবল	মাধুর্যতা	মধুরতা, মাধুর্য
বাহ্যিক	বাহ্য	নিঃসম্পর্কীয়	নিঃসম্পর্ক
সবিনয়পূর্বক	বিনয়পূর্বক	বাহুল্যতা	বাহুল্য

লক্ষ্যার্থক পদের অপপ্রয়োগ-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তেলে বেগুনে **রেগে** ওঠা	তেলে বেগুনে **জ্বলে** ওঠা
ধোঁকা **খাওয়া**	ধোঁকা **লাগা**
মাঠে হাঁড়ি ভাঙা	**হাটে** হাঁড়ি ভাঙা
একাদশ বৃহস্পতি	**একাদশে** বৃহস্পতি
ডানাকাটা **অপ্সরী**	ডানাকাটা **পরী**
কাঞ্চনমণি সংযোগ	**মণিকাঞ্চন** সংযোগ
পড়ি উঠি করিয়া লাগা	**উঠি পড়ি** করিয়া লাগা
সে-ত **গৃহের সন্তান**	সে-ত **ঘরের ছেলে**
মস্তকের ঘর্ম চরণে পাতিত করিয়া	মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
কাঁঠাল পাকলে কাকের কি ?	বেল পাকলে কাকের কি ?
যত রাগে তত বর্ষে না	যত গর্জে তত বর্ষে না
বারো মাসে বছর	আঠারো মাসে বছর
হাতে পাঁজি বিষ্যুৎবার	হাতে পাঁজি মঙ্গলবার

বিঃ দ্রঃ—এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে (১) প্রচলিত বাগ্বিধিগুলি ভাষার মধ্যে এমন ভাবে চলিয়া গিয়াছে যে, কোনও শব্দের প্রতিশব্দ বসাইলে, অথবা লক্ষ্যার্থক পদগুচ্ছের শব্দের পরম্পরা বদলাইলে ভুল হইবে ; (২) যে লক্ষ্যার্থক পদে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ আছে তাহাকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত করিলেও ভুল হয়।

অলঙ্কার প্রভৃতির অপপ্রয়োগ-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তিনি শোকানলে মগ্ন হইলেন।	তিনি শোকসাগরে মগ্ন হইলেন।
মহত্ত্ব-বীজ তাঁহার হৃদয়পটে উপ্ত হইল।	মহত্ত্ব-বীজ তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইল।
তিনি কুবেরের ন্যায় দাতা, কর্ণের ন্যায় ধনী।	তিনি কর্ণের ন্যায় দাতা, কুবেরের ন্যায় ধনী।

পদ্যে ব্যবহার্য শব্দের গদ্যে ব্যবহার-জনিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তাহার ভকতি নাই।	তাহার ভক্তি নাই।
মনের হরষে তিনি হাসিতে লাগিলেন।	মনের হর্ষে তিনি হাসিতে লাগিলেন।
একথা বিস্তারিয়া বল।	একথা বিস্তার করিয়া বল।

অনুশীলনী

১। যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অশুদ্ধি শোধন কর :—

(ক) পুরস্কার, কল্যাণীযেসু, শুটকেশ, উজ্জল, অধ্যয়ণ, বিগ্যান, দুরাদৃষ্ট, শাঁপ, পৌরহিত্য, অজাগব, তেজেন্দ্র, জ্যোতিন্দ্র, সক্ষম, প্রাণীগণ, কটূক্তি, সায়াহ্ন। —ক. বি. মাধ্যমিক অতিবিক্ত '৬৭॥

(খ) অপবাহ্ন, অত্যাধিক, অকুল, উত্যক্ত, কিম্বা, জিবিকা, ত্যাক্ত, ধড়পাকড়, নীরীক্ষণ, পরিত্যাজ্য, রাজাগণ, নিরোগ, দুরাবস্থা, ইতিমধ্যে, যশলাভ, মনোকষ্ট, নিরব, দুর্বিসহ, চক্ষুরোগ, শিরচ্ছেদ, পিতাহীন, ভ্রাতাগণ, নিরপরাধী, হস্তীপৃষ্ঠে, লজ্জাস্কর, সশঙ্কিত, সবিনযপূর্বক, সিংহিনী, গায়কী, পাশ্চাত্য, কল্যাণবরেষু, নিরাপদেষু, স্বাতন্ত্র, বৈচিত্র, আবশ্যকীয়, একত্রিত, নিরভ্র।

২। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদসমূহের অশুদ্ধি শোধন কর :—

(ক) ব্যাধিগ্রস্থ লোকেব সংস্পর্শ বর্জন করিবে। তাহার নির্দোষ প্রমাণ করিতে সকলেই উদ্‌গ্রীব। কৌতুহলের বশবর্তী হইয়া তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিল। প্রজ্জলিত হুতাশনে কে হস্তার্পণ করিবে? মুমুর্ষুর শুশ্রূষা করাই পরম ধর্ম। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের পরিনীতা স্ত্রী। যাহাবা পরান্নভোজী, তাহারা সকলেই অধম। যাহার সংগে তোমার সখ্যতা হইয়াছে, তাহার সংগে মিশিলে তুমি উচ্ছন্ন যাইবে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হইয়াছিল। পরস্পব যুদ্ধমান জাতির মধ্যে বিজীগিষা এত প্রবল যে শান্তির সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহার পৌরহিত্যে শান্তি-সমিতির অনুষ্ঠান হইবে, তিনি একজন পক্কশ্মশ্রূধারী

সাংবাদিক। তাঁহার মনবৃত্তি কাহারও অবিদিত নাই। উর্দ্ধমুখে পথ চলিলে পতন অবস্যম্ভাবি। সাতিশয় ব্যয় করিয়া উৎসবাদি করা এখনকার অর্থ-শংকটের দিনে যুক্তিযুক্ত নহে। বরঞ্চ সৌজন্যতার দ্বারা লোকের সহিত সৌহার্দ্র স্থাপন করা ভাল।

(খ) তাহার যখন বয়ক্রম পনর বৎসর তখন তাহার একটি ভাই জন্মে। সেই সদ্যজাত শিশুর বাঁচিবার আশা ছিল না, এজন্য তাহার মাতা অত্যন্ত মনোকষ্টে থাকিতেন। তোমাদের ব্যাবহার অত্যন্ত লজ্জাস্কর, আমি তোমার অনেক দোষ ক্ষমা করিয়াছি, কিন্তু এখন তাহার এত আতিশয্যতা হইয়াছে, যে আমি সহ্য করিতে পারি না। সংসারে শান্তিরক্ষা করিতে হইলে ঐক্যতা রক্ষার দরকার। অত্র পত্র বাড়ীর ঠিকানায় পাঠাইলাম।

(গ) একদা আমাবস্যার রাত্রে বহু দস্যুগণ ভাগিরথী-তীরে যাইয়া এক ধনী ব্যাক্তির নৌকা প্রদর্শন করিল। তাহারা ছোট একখানি ডিঙ্গীতে চড়িয়া ধীর কুঞ্জরের দ্রুত-গতিতে সেই নৌকাটার উপরে আসিয়া পড়িল। নৌকা-স্বামী সশঙ্কিত হইয়া সানুনয়পূর্বক বলিলেন, "তোমরা যদি কিছু অর্থ লইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তবে আমি দিতে প্রস্তুত আছি।" দস্যু পরিষ্কার ভাবে বলিল—"আমরা ছাড়িব না, নৌকা লুণ্ঠন করিব।"

(ঘ) মৃদু মলয়ানীল সমীরণে বনকুসুম আন্দোলিত হইতেছিল; শাখার উপর পক্ষীর নীরগুলি দুলিতেছিল। আমরা সামান্য পরিচ্ছেদ পরিয়া বেড়াতে গিয়াছিলাম, সুতরাং আমরা যে রাজপ্রসাদে বাস করি তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। —ক. বি. মাধ্যমিক বাংলা ১৯৪৭ ॥

(ঙ) তাঁহার দুরাবস্থা দেখিলে সত্যই দুঃখ হয়। বিপ্লবের সময়ে সকলে সশঙ্কিত হইয়া বাস করে। ভারতবর্ষের দারিদ্রতা অবর্ণণীয়। বাঙ্গালীর মধ্যে ঐক্যতা নাই। তাহার কথায় বড়ই মনোকষ্ট হইল।

রচনা

দ্বিতীয় ভাগ

রচনা-প্রকরণ

বাংলার ঋতুপর্যায়

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ সূচনা ঃ গ্রীষ্মকাল ঃ উহার রূপ ও প্রকৃতি—উপকারিতা ও সুখসুবিধা—বর্ষা ঃ বর্ষার রূপ ও প্রকৃতি—সুখসুবিধা—শরতের আবির্ভাব—শরৎকাল ঃ উহার রূপ ও প্রকৃতি—শরতের উৎসব ও পূজার আনন্দ—হেমন্ত ঋতু—শীতকাল ঃ উহার রূপ ও প্রকৃতি—সুখসুবিধা—উৎসব ও পূজা-পার্বণ—বসন্তকাল ঃ উহার রূপ ও প্রকৃতি—উপসংহার।

বাংলায় ছয়টি ঋতু। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। এই ছয়টি ঋতুর রূপও সুস্পষ্ট।

চৈত্রের শেষের দিক হইতেই গ্রীষ্মের প্রস্তুতির সূচনা। উত্তাপ চৈত্র হইতে একটু একটু করিয়া বাড়িতে থাকে। সেই তাপে নদী-খাল-বিলের জল ধীরে ধীরে শুকাইতে আরম্ভ হয়। শেষে গ্রীষ্ম যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন স্বল্পবারিপূর্ণ দীঘি-কূপ ত' শুকাইয়া যায়ই, বহু খাল-বিলও জলহীন হইয়া পঙ্কশয্যা বহন করিতে থাকে।

গ্রীষ্মকে কবিরা তপোমগ্ন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। সত্যই গ্রীষ্ম ঋতু যেন সন্ন্যাসী,—কেবল তাহাই নয়, ভৈরব সন্ন্যাসী! ভৈরবের মতই ভয়াল তাহার রূপ। গ্রীষ্মের তাপে পৃথিবীর শ্যামলতা শুকাইয়া ধূলি-ধূসর রূপ ধারণ করে। ধূর্জটীর তৃতীয় নয়নোৎক্ষিপ্ত বহ্নিতে যেমন মদন ভস্মসাৎ হইয়াছিল, গ্রীষ্মের অগ্নিকণাতেও তেমনই ভূমির বাসন্তী-শ্রী দগ্ধ হইয়া যায়। সেই অগ্নিরশ্মি এমনই প্রখর যে সেদিকে চাহিতে পারা যায় না, চোখ ধাঁধিয়া যায়।

মানুষেরাও গ্রীষ্মের তাপে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। অবিরত ঘর্মক্ষরণের দরুন কর্মে মন আসে না, তৃষ্ণার দরুন ঘন ঘন জলপানের প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। স্নিগ্ধ বস্তুমাত্রই তখন পরম তৃপ্তিকর মনে হয়। স্নিগ্ধ জলে স্নান, স্নিগ্ধ জল পান, স্নিগ্ধ ছায়ায় বিশ্রাম, স্নিগ্ধ বায়ু সেবনই তখন একমাত্র কাম্য হইয়া উঠে।

গ্রীষ্মের খর রৌদ্র মানুষের একটা বড় উপকার সাধন করে। বাতাসে যে-সকল অদৃশ্য রোগের বীজাণু ঘুরিয়া বেড়ায়, কিংবা আবর্জনা-স্তূপে যে-সব বীজাণু আত্মগোপন করিয়া থাকে, প্রখর সূর্যকিরণে উহারা সমূলে বিনষ্ট হয়। এইরূপে মানুষ বহু রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়।

গ্রীষ্ম ফুলের কাল না হইলেও ফলের কাল। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু এই সময়েই পাকিয়া থাকে।

গ্রীষ্মে ধরণীর শুষ্কতা, বর্ষায় ধরণীর শ্যামলতা। মেঘের গুরু গর্জনে নীল অরণ্য তখন শিহরিত হয়, স্নিগ্ধ বারিধারার স্পর্শে চারিদিকের রুক্ষতা দূর হয়, বৃক্ষপত্রের ধূলি-আস্তরণ ধৌত হইয়া প্রকাশ পায় সজীব সবুজ রং। খাল-বিল-দীঘি কানায় কানায় ভরিয়া উঠে, নদীতে নদীতে পণ্য-সম্ভার লইয়া নৌকা ছুটে, মাটির বুকে নবতৃণদলে উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়, কদম-কামিনী-কেয়া-জুঁই আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠে। কোন কোন পল্লী ময়ূরের কাংস্যক্রেঙ্কার ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে।

কৃষিপ্রধান দেশ বাংলা ঠিক এই সময়টির জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। ধান্য রোপণের সময় এই বর্ষাকাল,—মানুষের উদরান্ন প্রস্তুতির সময়। বৃষ্টি না পাইলে ধান জন্মে না, ধান না হইলে অন্নাভাব ঘটে, পরিণতি হয় মহামারী দুর্ভিক্ষ। বর্ষাকাল বাঙালীর জীবন।

অতি-বর্ষা আবার তেমনই খারাপ। উহাতে ধানের ক্ষতি হয়, অনেক সময় নদীতে বন্যা জাগে, ঘরদ্বার ভাসিয়া যায়, বহু প্রাণেরও বিনাশ ঘটে, ঝরা পাতা ও মরা গাছপালা পচিয়া মশার সৃষ্টি করে, ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করে, বহু মানুষের মৃত্যুর পথ সুগম করে। যাহারা দরিদ্র, জীর্ণ কুটীরই যাহাদের একমাত্র মাথা গুঁজিবার ঠাঁই, অতি-বর্ষায় তাহাদের দুঃখের আর অন্ত থাকে না।

বর্ষাকাল বাংলার ও ভারতের কবিগণের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। বর্ষার রিমঝিম সুরে সুর মিলাইয়া এদেশের কবি যত কাব্য রচনা করিয়াছেন, পৃথিবীর সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়। অন্য দেশে এদেশের মত বর্ষাও নাই, বর্ষার কবিতাও নাই।

যাঁহারা অফিস-আদালতে কাজ করেন, তেমন লোকেদের কাছে কিন্তু বর্ষার আদর নাই। বর্ষার দিনে অফিসে যাইতে তাঁহাদিগকে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হয়। তবে রাত্রির কর্মক্লান্ত অলস প্রহরে বর্ষা সকলেরই কাম্য, সকলেরই প্রীতিকর।

বর্ষাকালে হিন্দুদের কয়েকটি পার্বণ পালিত হয়, তন্মধ্যে রথযাত্রা, ঝুলন এবং জন্মাষ্টমী উল্লেখযোগ্য।

বর্ষার বর্ষণ-বেগ যখন ধীরে ধীরে কমিতে থাকে, আকাশের কালো মেঘে তখন একটু-একটু করিয়া সাদা রং দেখা দেয়, মেঘের গুরু গুরু ডাক থামিয়া যায়, বিজলী-চমকের ঘটাও অদৃশ্য হইতে থাকে,—এমনি করিয়া একদিন প্রসন্নহাস্য শরৎ উপস্থিত হয়। আকাশের কান্নাও থামিয়া যায়, ভারী মুখে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠে।

শরৎ ক্রীড়া-চঞ্চল কিশোর বালকেব মত। আসে, হাসে আর বাঁশী বাজায়। সেই বাঁশীর সুরে সুরে শিউলী ফুল জাগিয়া উঠে, কাশফুলে দোলা লাগে, জ্যোৎস্নায় জাগে স্বপ্নের শিহরণ। আর জাগে ছুটির ছন্দ, জাগে আগমনীর গান। আনন্দময়ী মা আসিবেন, শরতের সুরে সুরে যেন এই ধ্বনিই বাজিতে থাকে। কি ধনী কি দরিদ্র, সকলের কাছেই শরৎ আনন্দময়। যাঁহারা স্কুল-কলেজ অফিস-আদালতে কাজ করেন, তাঁহারা কয়েক দিনের জন্যও ছুটি পান। প্রবাসীরা গৃহে ফিরেন, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব মিলনের আনন্দে উৎসুক হইয়া উঠেন।

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পূজার কাল এই শরৎ। ইহাকে পূজার ঋতু বলিলেও চলে। কেবল দুর্গা পূজা নয়, কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা, শ্যামা পূজাও এই সময়ে হইয়া থাকে। আর-একটি প্রধান উৎসব হয় শরৎকালে,—দীপান্বিতা উৎসব। বাঙালীর একটি বিশিষ্ট পর্বও পালিত হয় এই সময়ে,—ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। এই পর্বটি সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর নিজস্ব পর্ব। এই পর্বকে উপলক্ষ্য করিয়া ভ্রাতা-ভগিনীর যে-অপূর্ব স্নেহ-সম্পর্ক পরিকল্পিত হইয়াছে, তেমন মধুর আর-কিছু অন্য কোন দেশে নাই।

কার্তিকের মাঝামাঝি হইতেই হিম পড়িতে আরম্ভ হয়। উহাই হেমন্তের সূচনা। হেমন্ত ঋতু শীতের পূর্বাভাস মাত্র। তথাপি উহা শীত ঋতু নয়।

শরতের মার্জিত নির্মল দিনেরও ভাল করিয়া সমাপ্তি ঘটে নাই, আবার শীতের হিম-জর্জর দিনও আসে নাই,—এমনই একটি কাল এই হেমন্ত।

হেমন্তকালে কার্তিক পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা হইয়া থাকে। এই সময়কার রাস-পর্বও স্মরণীয়।

হেমন্তের পরিণতি শীতে। শীতের প্রতাপ বার্ধক্যের মত। সজীবতাকে, প্রাণস্পন্দনকে সে যেন নীরস নির্জীব করিয়া দেয়। এই সময়ে গাছের পাতা খসিয়া পড়ে, ডালপালা রিক্তপত্র হইয়া যায়। এই সময়ে দিন ছোট হয়, রাত্রি বড় হয়।

শীতকালে ধান পাকে। কৃষকদের মধ্যে তখন চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া যায়। ধান কাটা, ধান মাড়াইয়ের আনন্দে তখন তাহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া যায়। বর্ষায় যাহা রোপণ করিয়াছিল, শীতে তাহা ঘরে তোলে। বর্ষায় কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধন, শীতে সিদ্ধি।

বাঙালী চাষী-জীবনের দুইটি স্মরণীয় আনন্দ-পর্ব এই শীতকালেই উদ্‌যাপিত হয়,—নবান্ন আর পৌষ-পার্বণ। পয়সা না হোক্, চাল-গুড়ের পিঠাও অন্তত চাই পৌষ-পার্বণে। দরিদ্রের ওই-ই সুখ।

শীতকালে অতসী, গাঁদা, দোপাটি, কুন্দ, সূর্যমুখী প্রভৃতি ফুল যেমন ফুটিয়া থাকে,—কমলালেবু, আখ, বেগুন, মূলা, কফি, মটরশুঁটি, আলু, টমাটো প্রভৃতি ফল এবং তরকারিও জন্মিয়া থাকে তেমনই প্রচুর। বস্তুত শীতকালে আহারে সুখ আছে।

শীতকালে বড়দিন-উৎসব হইয়া থাকে। বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব সরস্বতী পূজার কালও এই শীতকালে। ইহা বিশেষ করিয়া বিদ্যার্থীর পূজা। দুর্গা পূজা ভিন্ন, অন্য আর কোন পূজায় বাঙালীর প্রাণ এমন আনন্দে নাচিয়া উঠে না। বাঙালী একদিকে যেমন শক্তি-পূজার সাধক অন্য দিকে তেমনই ললিত-কলার পূজারী।

শীতের পরেই বসন্তের আবির্ভাব। বসন্ত ঋতুর শ্রেষ্ঠ, তাই সে ঋতুরাজ। রাজার মতই তার প্রাচুর্য, রাজার মতই অজস্র সম্পদ। সেই প্রাচুর্য নবীনতার, সেই সম্পদ পুষ্পের। বসন্তের আগমনে শীতের রিক্ততা কাটিয়া যায়,

শুষ্ক বৃক্ষশাখা রসপরিপূর্ণ হয়, গাছের ডালে ডালে কিশলয় মঞ্জরিত হইয়া উঠে, দক্ষিণ বাতাসের দোলায় জাগে মর্মর-ধ্বনি, কবির চিত্তে জাগে নব নব ছন্দ, গায়ককে দোলা দেয় 'হিন্দোল'। প্রাচীনকালের বসন্ত-উৎসবের অবারিত আনন্দের কল্পনা এই বসন্তকে ঘিরিয়াই পরিকল্পিত হইয়াছিল। দোল-উৎসবরূপে আজিও উহা আমাদের অন্তরকে অনুরাগে রঞ্জিত হইবার জন্য আহ্বান করে।

বসন্তের একটা রূঢ় বাস্তব-রূপও আছে। বসন্তেই সবাপেক্ষা মারাত্মক রোগ 'বসন্ত' এবং 'কলেরা'র প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। উহার মর্মান্তিক শোক-গভীর মূর্তির কথা চিন্তা করিয়া অনেকেই আবার বসন্তের অবসান কামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু মানুষের কামনায় বসন্তের কিছুই যায় আসে না, সে তাহার কাজ করিয়া যায়।

বাংলাদেশের ছয় ঋতু গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত পর পর পর্যায়ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার সময় হইলে আপনিই চলিয়া যায়। মহা সৃষ্টির মহা-নিয়মে তাহারা বিধৃত। প্রত্যেক ঋতুর একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, সেই রূপে উদ্ভাসিত হইয়া এক একটি ঋতুর আবির্ভাব ঘটে। উহার ফলে ধরণী তাহার পুরাতন রূপের আবরণটি খসাইয়া ফেলিয়া নবীন সৌন্দর্যে হাসিয়া উঠে। বাংলার বিশ্বপ্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য ঐ ছয় ঋতুর আসা-যাওয়ার ফলেই ঘটিতেছে।

বাংলাদেশের উৎসব

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ বাংলার উৎসব বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচায়ক—শারদীয় দুর্গোৎসব ঃ ইহার তাৎপর্য দুর্গোৎসবের বর্তমান রূপ—সরস্বতীপূজা ঃ উহার তাৎপর্য -পূজার বর্তমান রূপ দোল উৎসব ঃ উহার তাৎপর্য—বর্তমান পরিণতি—দেওয়ালী উৎসব ঃ উহার তাৎপর্য—বর্তমান পরিণতি—উপসংহার ঃ উৎসবের আদর্শচ্যুতি—উৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণন।

ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান, বিশেষতঃ পূজা উপলক্ষে বাঙালী চিরকালই উৎসব করিয়াছে। এমন উৎসব ভারতের অন্য কোন প্রদেশে আর দেখা যায় না, সংখ্যায় এত উৎসবও আর চোখে পড়ে না। কথায় বলে, বাংলায় 'বারো

মাসে তেরো পার্বণ'। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে অভাব আছে, অনটন আছে, দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে। কিন্তু সাংসারিক সুখদুঃখে অথবা প্রাত্যহিক প্রয়োজনের নির্মম তাড়নায় বাঙালী মুহ্যমান হয়ে পড়ে নাই। ঋতুতে ঋতুতে উৎসবের সমারোহ করিয়া সে তাহার দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-বেদনাকে লঘু করিয়া লইয়াছে, প্রাত্যহিক জীবনের নানা গ্লানি ও বেদনাকে মুছিয়া ফেলিয়া নূতন কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পুনরায় হাসিমুখে দুঃখ-দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম সুরু করিয়াছে। মাসে মাসে উৎসব-অনুষ্ঠান পূজা-পার্বণই বাঙালীর জীবনীশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাহার প্রাণশক্তির উৎসমুখে প্রেরণা যোগাইয়াছে। এইরূপে উৎসব ও পূজা বাঙালীর জাতীয় জীবনের অঙ্গ হইয়া গিয়াছে। বাঙালী জাতিকে বুঝিতে হইলে তাই তাহার পূজা-উৎসবের পরিচয় আগে লইতে হইবে, নহিলে বাঙালীর প্রকৃতির ও সাধনার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে না।

বাঙালীর উৎসবের মধ্যে দুর্গাপূজাই সর্বপ্রধান। পুরাণোক্ত এই পূজা বহুকাল হইতেই বাঙালীর একান্ত নিজস্ব পূজা হইয়া উঠিয়াছে, আর এই উৎসবই তাহার মনে সর্বাপেক্ষা উদ্দাপনার সঞ্চার করে। দুর্গাপূজার প্রতি তাহার এই বিশেষ আকর্ষণের মধ্যেই বাঙালীর জাতি-প্রকৃতির অর্থ নিহিত আছে। মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা শক্তির প্রতীক, সকল দেবতার তেজ সংহরণ করিয়াই মহামায়ার সৃষ্টি। বাঙালীও স্বভাবে শাক্ত, এই কারণে শক্তিপূজার প্রতিই তাহার বিশেষ আকর্ষণ। তবে শক্তির মধ্যে বাঙালী কেবল ভীমা ভয়ঙ্করীর রূপ দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারে না, উহার কান্ত কোমল রূপের উপাসনাও সে করে। তাই শক্তিময়ীকে সে কন্যা-রূপেও কল্পনা করিয়াছে, দুর্গাপূজা তাই বাৎসল্যের পূজাও বটে।

দুর্গোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ বিজয়া-উৎসব। এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে আত্মীয়তা ও মৈত্রীর যে একটি অপূর্ব মধুর ভাব রহিয়াছে, এমনটি পৃথিবীর আর কোথাও নাই। দশমী দিবসে প্রতিমা-বিসর্জনের পরেই এই 'কোলাকুলি' উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং উহার জের বহুদিন পর্যন্ত চলে। এই উপলক্ষে শত্রুমিত্রনির্বিশেষে সকলেই পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, এবং প্রার্থনা

করে যেন এই প্রীতি ও আত্মীয়তার বন্ধন পরস্পরের মধ্যে চিরকাল অটুট থাকে।

বাঙালী চিরকাল এই মৈত্রীর সাধনাই করিয়া আসিয়াছে। উৎসব তাহার উপলক্ষ মাত্র। উহাকে ঘিরিয়াই সে প্রীতিকামনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। এই আত্মীয়তা, এই প্রেমের উদ্বোধনই তাহার পূজা। কিন্তু এখনকার দুর্গাপূজায় এই প্রীতির ভাবটিরই অভাব দেখা যায়। দুর্গাপূজা এক্ষণে 'সর্বজনীন' হইযাছে বটে, কিন্তু উহা কেবল নামে। সর্বজনের হৈ-চৈ ও বাগাড়ম্বর উহাতে আছে, কিন্তু আন্তরিক প্রীতির স্পর্শ নাই। পূজা এক্ষণে প্রতিযোগিতা ও জাঁকজমকে পর্যবসিত; প্রতিমা এক্ষণে তথাকথিত 'আর্টে'র বিকৃত ভঙ্গিমাত্র; মন্ত্র হইয়াছে লাউডস্পীকারের যন্ত্রসঙ্গীত। পূর্বে পূজামণ্ডপে যে স্নিগ্ধ ঘৃতের প্রদীপটি চক্ষু জুড়াইত, আজ আর তাহা জ্বলে না। আজ বিজলী আলোব প্রাচুর্যই চোখ ধাধাইয়া দেয়।

দুর্গোৎসবের পরেই সরস্বতীপূজার উল্লেখ করিতে হয়। স্বল্পব্যয়সাধ্য বলিয়া বাসন্তী শ্রীপঞ্চমীতে অধিকাংশ বাঙালীর ঘবেই এই পূজা হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া স্কুলে-কলেজে ও ছাত্রাবাসে সরস্বতী পূজাতেও সমারোহ দেখা যায় বেশি। বর্তমানে সরস্বতী পূজাতেও সর্বজনীন পূজার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, তাই শহরে অধিক সংখ্যায় সর্বজনীন সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিদ্যার চরম প্রকাশ কাব্যে ও সঙ্গীতে। তাই বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তেই ভগবতী ভারতীর মূর্তি কল্পনা করা হইয়াছে। সবশুক্লা এই দেবী শুচিতা ও পবিত্রতার প্রতীক। ইনি মানুষের হৃদয়কে পবিত্র ও নির্মল করেন, ইঁহার শুভ্র বর্ণের ইহাই তাৎপর্য। আবার অবিদ্যার অন্ধকার নাশ করেন বলিয়া ইনি জ্যোতির্ময়ী। খণ্ড খণ্ড শত শক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে যে এক অখণ্ড সৃষ্টি-শতদল তাহারই উপর দেবীব অধিষ্ঠান। জ্ঞান মানুষকে পূর্ণতা দান করে—শতদল সেই পূর্ণতারই রূপক। দেবীর বাহন হংস। হংস নীর হইতে ক্ষীর অর্থাৎ সার বস্তু গ্রহণ করিতে জানে। প্রকৃত জ্ঞানলিপ্সু মানবমনও সংসারের অসার বস্তু হইতে সার বস্তু, মিথ্যার ভিতর হইতে সত্যকে

গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ মনই দেবীকে বহন করিতে পারে,—বাহন হংসের ইহাই স্বরূপ।

আগে যখন আমরা সরস্বতীপূজা করিতাম, তখন আমাদের মধ্যে নিষ্ঠা ছিল, ভক্তি ছিল; দেবীর স্বরূপ অনুধ্যান করিবার প্রয়াস ছিল। ছাত্রেরাও আগে কেবল বৎসরের একটা দিন বাণীর পূজা করিয়াই অধ্যয়ন-তপস্যা সমাপ্ত করিত না, বিদ্যাভ্যাসের জন্য সমগ্র বৎসর ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা করিত এবং উহাকেই সত্যকার বাণী-পূজা বলিয়া মনে করিত। কিন্তু বর্তমানে তাহাদের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়াস শিকায় উঠিয়াছে, চাঁদার খাতা হাতে লইয়া ছুটাছুটি ও পূজার সময়ে হৈ-চৈ করাকেই সরস্বতীপূজার তাৎপর্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। যে-দেবী পবিত্রতার প্রতীক তাঁহারই বিসর্জন-শোভাযাত্রা কুৎসিত আবিলতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। যে-জ্ঞানলাভের জন্য শ্রদ্ধা ও বিনয়ের প্রয়োজন, সেই জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রীর পূজায় এখন অহঙ্কার ও অজ্ঞানতাই বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; প্রতিমা-গঠন ও আনুষঙ্গিক সাজসজ্জার ব্যাপারে প্রতিযোগিতার দাম্ভিকতাই এখন পূজার্থীদের ধ্যান-ধারণা।

দোলোৎসবও বাঙালীর অন্যতম প্রধান উৎসব। কবে দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে দোললীলায় মাতিয়াছিলেন, ভক্ত বাঙালী আজিও তাহারই স্মরণে এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অবশ্য ইহার সঙ্গে পূর্বকালের বসন্ত-উৎসবের সমারোহও আসিয়া মিশিয়াছে। কিন্তু আমরা প্রধানত শ্রীকৃষ্ণের দোললীলাকে স্মরণ করিয়াই এই উৎসব করিয়া থাকি। এই উৎসবে আবীর-কুঙ্কুম ছড়াইয়া আকাশকে আমরা লাল করিয়া তুলি, পিচকারিতে তরল রং ভরিয়া পরিচিত-অপরিচিত সকলের অঙ্গেই উহা ছুড়িয়া তাহাদের বসন রঙীন করিয়া তুলি। বসনের মত রক্তিম অনুরাগে সকলের মনকে রঞ্জিত করাই হোলি-উৎসবের তাৎপর্য।

কিন্তু বর্তমানে এই উৎসবের নির্মল আনন্দও আবিলতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এখন রঙের বদলে আলকাতরা মাখানো ও কাদা ছোড়াছুড়িই এই উৎসবের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে আমরা এই উৎসবের নামে এমনই প্রমত্ত হইয়া উঠি যে, অনেকে শালীনতাবোধকেও হারাইয়া ফেলি। প্রীতির উৎসবে বহু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটিয়া থাকে।

দেওয়ালী সর্বভারতীয় উৎসব। বাংলায় এই উৎসবের প্রাধান্যও বড় কম নহে। দুর্গাপূজার পরেই প্রথম অমাবস্যায় যে শ্যামাপূজা হইয়া থাকে, সেই পূজা উপলক্ষেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে রাত্রিকালে প্রত্যেক বাঙালীর ঘরেই সারি সারি দীপ জ্বলিয়া উঠে। দীপাবলীর দ্বারা অন্ধকারকে আমরা আলোকময় করিতে চেষ্টা করি। এই অন্ধকারের নানারূপ অর্থই সম্ভবপর। ইহা মহাকালের অন্ধকারও হইতে পারে, অজ্ঞানতাব অবিদ্যার অন্ধকারও হইতে পাবে, মিথ্যা দুঃখ-বেদনার অন্ধকারও হইতে পারে। আমাদের কর্ম দ্বারা আমরা মহাকালকে জয় করিতে চাই, জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া অজ্ঞান ও অবিদ্যাকে দূর করিতে চাই, আনন্দের দ্বারা বেদনাকে ভুলিতে চাই—দীপান্বিতা উৎসবের তাৎপর্য ইহার যে-কোনও একটা হইতে পারে। কবি বলিয়াছেন, এই দিনে হেমন্তিকা—

ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো আপন আলো
জয় করো এই তামসীরে।

তামসীকে জয় করিবার উৎসবই দীপালী-উৎসব। আলোক, আনন্দ ও সত্যের বিপরীত যাহা কিছু তাহাই 'তামসী'।

বর্তমানে এই উৎসবও লক্ষ্য ভুলিয়া উপ-লক্ষ্যের পানে ছুটিয়াছে। বাজি-বারুদ পোড়ানই এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি বড়দেব দেখাদেখি ছেলেরাও আজকাল ইচ্ছা করিয়াই নিরীহ পথচারীদের গায়ে বিপজ্জনক বাজি ছুড়িতে সঙ্কোচবোধ করে না; বরং উহাকেই এই উৎসবের একমাত্র আনন্দ বলিয়া তাহারা ধরিয়া লইয়াছে।

উপরে যে-কয়টি উৎসবের তাৎপর্য এবং উহাদের প্রাচীন ও বর্তমান রূপের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হইযাছে যে, আমরা উৎসবের ব্যাপারে লক্ষ্য ভুলিয়া উপ-লক্ষ্যকেই প্রধান করিয়া তুলিয়াছি। নিষ্ঠা, আনন্দ ও প্রীতি অপেক্ষা অকারণ দাম্ভিকতা, শালীনতাবোধহীন অভব্যতাই আমাদের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে। কেবল দুর্গোৎসব, সরস্বতীপূজা, দীপান্বিতাই নহে,

অন্যান্য উৎসবের বেলাতেও আমরা একইরূপ কার্যক্রম অনুসরণ করি। তাহা ছাড়া, উৎসব উপলক্ষে বাঙালী চিরকাল যেখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতাইয়াছে, সেইখানে এখন দলাদলিটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। একটা পাড়ায় এখন পাঁচটা সর্বজনীন পূজা হয়। এইরূপে উৎসব আমাদিগকে এক না করিয়া বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন করিয়া তুলিতেছে।

কিন্তু উৎসবের উদ্দেশ্য ত' তাহা নয়। উৎসব মানুষকে এক করে, আত্মীয় করে, অন্তরঙ্গ করে, আনন্দ দেয়। যাহা আমাদিগকে বিভক্ত করে, অভব্য করে, তাহা কখনও উৎসব হইতে পারে না।

সর্বজনীন পূজা

প্রবন্ধ-সঙ্কেত : সর্বজনীন পূজা কাহাকে বলে?—সর্বজনীন দুর্গা ও সরস্বতী-পূজা—পূজার আয়োজন—পূজার প্রতিমা—প্রাচীন ও আধুনিক দুর্গাপূজা—বর্তমানে সর্বজনীন পূজার পরিণতি—উপসংহার : নির্মলতা, আচার-অনুষ্ঠানমূলক পূজার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা।

সবজনীন পূজা বিংশ শতাব্দীরই সৃষ্টি, এবং শহরেই উহার ক্ষেত্র প্রায় সীমাবদ্ধ। উহাকে শহরের পূজা বলিলেও ভুল বলা হয় না। অথচ এই পূজার মূল উৎস পল্লীগ্রাম। উনবিংশ শতাব্দীতেও দেখা গিয়াছে, বাংলার পল্লীতে যখনই বসন্ত বা ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তখনই গ্রামের লোক চাঁদা তুলিয়া শীতলা বা ওলাইচণ্ডীর পূজা দিয়াছে। গ্রামেরই কোন পুরাতন বট বা অশ্বত্থ গাছের তলায় সামিয়ানা টাঙাইয়া পূজামণ্ডপ তৈয়ারী হইয়াছে, প্রচুর সমারোহের সঙ্গে ঢাক-ঢোল বাজিয়াছে, পাঁচখানা গ্রামের লোক একত্র হইয়া প্রসাদ পাইয়াছে। তৎকালে ঐ পূজার নাম দিয়াছিল বারোয়ারি পূজা। 'বারোপকারিক' হইতেই 'বারোয়ারি' শব্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ দশজনের উপকারার্থেই বারোয়ারি পূজা হইত। 'সর্বজনীন পূজা' গ্রামের ঐ 'বারোয়ারি পূজা'রই রাজসংস্করণ।

ঠিক কবে এই সর্বজনীন পূজার প্রথম প্রচলন হইয়াছে, তাহার ইতিহাস খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব। তবে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই

পূজা প্রচুর পরিমাণেই হইত। এক্ষণে উহার সমারোহ উগ্রতর হইতে উগ্রতম হইয়া উঠিয়াছে। 'তর' 'তম'-এর পর আর কি প্রত্যয় আছে জানি না, যদি কিছু থাকে তবে অদূর ভবিষ্যৎ সর্বজনীন পূজা উহারই প্রতীক্ষা করিতেছে।

সর্বজনীন পূজার মধ্যে দুর্গা এবং সরস্বতী-পূজাই প্রধান। মনে হয়, দুর্গাপূজাকে উপলক্ষ করিয়াই সর্বজনীন অন্যান্য দেবীপূজার প্রচলন হইয়াছে। দুর্গাপূজা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য পূজা, ধনী ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে উহা করা সম্ভবপর ছিল না। আগে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়ীতেই ঐ পূজা হইত, পাড়ার পাঁচজন ঐখানে সমবেত হইয়াই পূজার আনন্দ উপভোগ করিত। যে-কোন কারণেই হউক, অপরের পূজার মধ্যে সাধারণ মানুষের আনন্দ যখন কমিয়া আসিল, তখনই তাহারা এমন একটি পূজার প্রচলন আকাঙ্ক্ষা করিল, যে পূজা তাহাদের সকলের পূজা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। দশজনে মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া পূজা করিতে লাগিল। ইহাতে পূজাও হইল, আবার সেই পূজাকে নিজের বলিয়া ভাবিবার আত্মপ্রসাদ লাভও হইল।

গোড়ায় সর্বজনীন পূজায় পূজাই লক্ষ্য ছিল। তখন যাহার যেরূপ সাধ্য চাঁদা দিত, পূজায় শাস্ত্রীয় আচারগুলি নিষ্ঠার সহিত পালিত হইত, যাহারা পূজা করিত তাহাদের মধ্যে একটা প্রীতির ভাব বিরাজ করিত। কিন্তু বর্তমানে পূজা অপেক্ষা পূজার আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলিই বড় হইয়া উঠিয়াছে, উপ-লক্ষ্যই লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই সর্বজনীন পূজার উগ্রতম বিবর্তিত রূপ।

এক্ষণে পূজার দেড়-দুই মাস আগেই, যেখানে পূজা হইবে তাহারই নিকটবর্তী স্থানে লাল সালুর কাপড় টাঙাইয়া উহাতে বড় বড অক্ষরে সর্বজনীন পূজার বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। ইহার পরেই ছাপানো চাঁদার খাতা হাতে পূজার উদ্‌যোক্তাগণ পাড়ার বাড়ী বাড়ী হানা দিতে থাকে। ইহাদের দেখিলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কারণ, ইহারা প্রায়শই গৃহস্থদের উপর চাঁদার জন্য অন্যায় জুলুম করিয়া থাকে, অনেক সময় এমন একটা অঙ্ক হাঁকিয়া বসে, যাহা দেওয়া গৃহস্থের সাধ্যাতীত। আবার ইহাদের চাহিদামত চাঁদা

না দিলে, গৃহস্থকে নানারূপে লাঞ্ছিত হইতে হয়। পূজার চাঁদা এক্ষণে আনন্দের নহে, ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

পূজা আরম্ভ হইবার আট-দশ দিন আগে হইতেই পূজা-মণ্ডপ বাঁধিবার ধূম পড়িয়া যায়। উপরে 'কারুকার্যখচিত বিরাট আচ্ছাদন', নীচে বিচিত্র আলোকসজ্জার প্রস্তুতি। কোথাও কোথাও পূজা প্রাঙ্গণ হইতে আরম্ভ করিয়া দূরে রাজপথ পর্যন্ত রাস্তা সজ্জিত হয় এবং প্রান্তসীমায় তৈয়ারী হয় বিচিত্র রকমের তোরণ।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্য দেখা যায় প্রতিমার ব্যাপারে। এ বিষয়ে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিযোগিতার আর অন্ত থাকে না। এ যদি তিন-হাত 'ঠাকুর' করে, তবে ও'র 'ঠাকুর' হওয়া চাই চার-হাত উঁচু। এক দলের প্রতিমা যদি হয় অজন্তা-ভাস্কর্যের অনুকরণে, আর এক দলের প্রতিমা হইবে তবে মৌর্য-আমলের ভাস্কর্য অনুসরণ করিয়া। এক পাড়ার প্রতিমা যদি হয় সাদা মার্বেলের রঙের, আর-এক পাড়ার প্রতিমা হইবে তবে ব্রোঞ্জরঙা। প্রতিমার কত রকম বৈচিত্র্যই না চোখে পড়ে! সেই বৈচিত্র্য এমনি আধুনিক উগ্রতায় মোড়া যে, এতকালের চোখে-দেখা দেবদেবীর শাস্ত্রসম্মত মূর্তির কথা প্রায় ভুলিয়া যাইতে হয়। সরস্বতীকে মনে হয় প্রাচ্য নৃত্যপরা কোন আধুনিকা, দেব-সেনাপতি বীর কার্তিকেযকে দেখিয়া 'আলালের ঘরের দুলাল'কেই মনে পড়ে। ইঁহারা নাকি 'আর্টের ঠাকুর'!

মূর্তির মত পূজাও হইয়া উঠিয়াছে আধুনিক রকমের। উহাতে মন্ত্রপাঠ কোনরকম করিয়া সারা হয়, আর সর্বক্ষণ বাজিতে থাকে লাউডস্পীকারের চোঙার মুখে নানারূপ সিনেমা-সংগীত। এই লাউডস্পীকার বর্তমানে একটি বিভীষিকা হইয়া উঠিয়াছে। লাউডস্পীকার না হইলে সর্বজনীন পূজাই হয় না, অথচ উহার ক্লান্তিহীন বিরাট আওয়াজে পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।

সর্বজনীন পূজার প্রতিমা-বিসর্জনও এক বীভৎস ব্যাপার। লরিতে গাড়ীতে করিয়া প্রতিমা গঙ্গামুখে যাত্রা করে, প্রতিমার চারিপাশে ইলেকট্রিক আলো জ্বলিতে নিভিতে থাকে, ঢাকঢোলের পরিবর্তে ব্যাগ্‌পাইপ-ড্রাম বাজিতে থাকে,

আর লরির উপরের অথবা মিছিলের সঙ্গের লোকেরা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে পথ অতিক্রম করে। আবার কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান শাস্ত্রীয় বিসর্জনদিবসের পরেও তিন দিন, চারি দিন, এমন কি সপ্তাহকাল ধরিয়া প্রতিমা-বিসর্জনের নাম করে না। তখন পূজা-মণ্ডপে পূজা থাকে না, থাকে শুধুই হৈ-হুল্লোড়।

সর্বজনীন পূজার এই বর্তমান রূপ জাতির পক্ষে বড়ই লজ্জাকর। কারণ পূজা জাতির আত্মিক শক্তিরই একটা প্রকাশ। এই শক্তিপ্রকাশের মধ্যে যদি নির্মলতা না থাকে, যদি প্রীতি না থাকে, যদি আচার-নিষ্ঠা না থাকে, তবে জাতির আত্মাই উহাতে অপমানিত হয়, আর জাতির আত্মা যখন অপমানিত হয়, তখন জাতির ঘোরতর দুর্দিন। জাতিকে এই অবমাননার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে সবজনীন পূজা যাহাতে সার্থকনামা হয়, যাহাতে সবজনের হিতকর হয়, তাহাই করিতে হইবে।

বৃক্ষরোপণ উৎসব

প্রবন্ধ-সংকেত—গাছপালার সহিত মানুষের নিবিড় সম্পর্কের বর্ণনা—প্রাচীন ভারতে বনভূমি—বর্তমান যুগের যন্ত্রবাদী মানুষের গাছপালার প্রতি উপেক্ষা-অনাদর—উহার কুফল—দেশের আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত গাছপালা বনভূমির সম্পর্ক—ভারত সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত বনমহোৎসব—উহার সার্থকতা কিসে?—রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষরোপণ-উৎসব—উহার তাৎপর্য—উপসংহার]

সৃষ্টির আদি যুগ হইতেই গাছপালার সহিত মানুষের নিবিড় সম্বন্ধ। বৃক্ষ-শ্রেণীই বনভূমিরূপে আদিম বর্বর মানুষের আশ্রয়স্থল ছিল—আদিম মানব বাস করিত তরুকোটরে কিংবা ঘন-পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশাখার তলে। অসভ্য মানব লজ্জা নিবারণ করিত বৃক্ষ-বল্কলে, বনের জীবজন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত তখন বৃক্ষশাখা ব্যবহৃত হইত আয়ুধরূপে। পরে যখন মানুষ আগুন জ্বালিতে শিখিল, তখনও বৃক্ষশাখা ও বৃক্ষপত্র ব্যবহৃত হইত ইন্ধনস্বরূপে। সভ্য মানুষ যখন ভাষা-লিখনকে স্থায়ী করিতে চাহিল, তখনও সে শরণাপন্ন হইল বৃক্ষপত্রের।

ভূর্জপত্রের পুঁথির কথা আমরা জানি, তালপাতার পুঁথিরও অভাব নাই। মিশরদেশে 'পেপিরাস' নামক গাছের ছাল ব্যবহৃত হইত লেখার জন্য। এইভাবে মানুষের সঙ্গে ও মানব সভ্যতার সঙ্গে গাছপালা, বনভূমি এবং বনসম্পদের একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে গাছপালা, বনভূমি এবং বনসম্পদ্‌কে ভিত্তি করিয়াই একদিন মানব সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতে বনভূমি একটি আধ্যাত্মিক মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছিল। নির্জনতার মধ্যে ছিল শান্ত-রসাস্পদ ধ্যানশীল ঋষির তপোবন। চতুরাশ্রমের তৃতীয় আশ্রম ছিল 'বানপ্রস্থ'। ভারতের শ্রেষ্ঠ দুইটি মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত,—পঞ্চবটী, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্য, কাম্যবন প্রভৃতি বনভূমির বিচিত্র বর্ণনায় পরিপূর্ণ। প্রাচীন ভারতের রোগ-নিবারক বিবিধ ঔষধও প্রস্তুত হইত বৃক্ষাদি হইতে। বেদমন্ত্রে 'বনস্পতি মধুময় হোক'—এই প্রার্থনা রহিয়াছে।

কিন্তু বর্তমান যুগের যন্ত্রবাদী মানুষ জড়বাদের দিকে যতই অগ্রসর হইতেছে, মানুষের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর এই বনভূমির প্রতি ততই তাহার অবহেলা ঔদাসীন্য দেখা দিয়াছে। কেবল অবহেলা উপেক্ষা নয়, নিজেরই প্রয়োজনে আজ মানুষ বৃক্ষাদির উচ্ছেদ সাধন নির্মমভাবেই করিযাছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনের জন্য অতীতের অরণ্যাচ্ছাদিত অনেক অঞ্চলই ক্রমাগত অরণ্যমুক্ত করিয়া আবাদযোগ্য করা হইতেছে। ইহাতে আমরা কেবল ছায়া ও ফল হইতেই বঞ্চিত হইতেছি না, প্রাণধারক শস্যাদির উৎপাদন-প্রাচুর্য হইতেও বঞ্চিত হইতেছি।

আধুনিক বিজ্ঞান নানাভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে, দেশের আবহাওয়া, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, তাহার বনভূমির আয়তন এবং পরিমাণের উপরই নির্ভরশীল। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, বৃক্ষহীন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অল্প। অধিকন্তু যে সকল অঞ্চল উদ্ভিদ-বিরল এবং মৃত্তিকাকণাসমূহকে সংবদ্ধ রাখিবার জন্য বৃক্ষরাজি নাই, সে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হইলে তথাকার কৃষিক্ষেত্রসকলের

উপরিস্থ মৃত্তিকাস্তরের বৃষ্টির জলে ধুইয়া যাওয়ার প্রবণতা থাকে এবং ভূমিক্ষয়ের ফলে সে সমস্ত কৃষিক্ষেত্র তাহাদের উৎপাদিকা শক্তি হারাইয়া ফেলে। এইরূপে বৃক্ষরাজি বিনাশের পরিণাম খাদ্যোৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গাছপালা বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিয়া ভূমিক্ষয় রোধ করে, বন্যার রোধও গাছপালার দ্বারা সম্ভবপর। গাছপালা না থাকিলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ক্রমেই নীচে নামিয়া যায়। ফলে দেশের খাল-বিল সব শুকাইয়া উঠে এবং দেশের বহু অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয়। অন্যদিকে বৃক্ষাদি রোপণের দ্বারাই যে মরুভূমিকে পযন্ত রোধ করা যায়, আমেরিকাব এটোয়া জেলা তাহার প্রমাণ। কয়েক বৎসর আগেও এটোয়া দ্রুত মরুভূমিতে পরিণত হইতেছিল। কিন্তু ইহার প্রতিবিধানের জন্য সবকার হইতে সেখানে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করা হয়, এবং উহারই ফলে তিন চার বৎসরের মধ্যে সেখানে একটা বিশাল বনভূমি গড়িয়া উঠিযা মরুর অগ্রগতিকে রোধ করিয়াছে। আজ এটোয়া সুন্দর বৃক্ষশোভিত একটি দর্শনীয় অঞ্চল।

আমেরিকায প্রতি বছর অতি যত্নের সঙ্গে শত শত গাছ পোঁতা হয় এবং এগুলির সুবৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়া থাকে। সোভিযেট রাশিয়াতেও দেশের বনভূমির শ্রীবৃদ্ধির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইয়া থাকে। প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই পৃথিবীর সকল দেশে অরণ্যের আয়তন এবং বৃক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইযাছে। ভারতবর্ষও আজ অর্থনৈতিক কারণেই তাহার নষ্ট বনসম্পদকে পুনর্জীবিত করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে।

বর্তমান ভারতরাষ্ট্রে বনভূমির পরিমাণ মাত্র ১১·৫ শতাংশ। কিন্তু দেশের প্রয়োজনের পক্ষে উহা ২৫ শতাংশ হওয়া একান্ত দরকার। পূর্বে ভারতে যথেষ্ট বনভূমি ছিল,—এমন কি পাঁচশত বৎসর আগেও যে সকল জায়গায় সুন্দর সুন্দর বনভূমি ছিল বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, সেই সকল জায়গায় আজ বনভূমির চিহ্নমাত্রও নাই। উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে বিরাট জঙ্গলে মাত্র সাড়ে চারশত বৎসর আগে সম্রাট্ বাবর শিকার করিতে যাইতেন, সেই জায়গায় আজ বিরাজ করিতেছে মরুভূমি সদৃশ প্রান্তর।

বনভূমির মূল্য সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে না পারার জন্য উর্বরা শস্যশ্যামলা বহু অঞ্চল ঊষর মরুতে পরিণত হইয়াছে। সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ যে, রাজপুতানার মরুভূমি বৎসরে প্রায় আধ মাইল করিয়া আগাইয়া আসিতেছে। ভারতের বনভূমিকে যথাযথভাবে বিস্তৃত ও বর্ধিত করিতে পারিলে, তবেই মরুভূমির এই অগ্রগতি রোধ করা যাইবে।

সুখের বিষয় যে, ভারত সরকার বৃক্ষরোপণ-বিষয়ে কিছুকাল হইল বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। ১৯৫০ সালে তদানীন্তন খাদ্যমন্ত্রী শ্রী কে. এম্ মুন্সীর উৎসাহে সরকার আমাদের দেশের বনসম্পদ বৃদ্ধির একটি পরিকল্পনা করেন। ঐ বৎসরের ১লা জুলাই সরকারীভাবে দেশের নানাস্থানে বৃক্ষরোপণ উৎসব পালিত হয়। উহাই 'বনমহোৎসব' নামে পরিচিত। বৃক্ষসম্পদ্ বৃদ্ধির কাজে জনসাধারণকে ব্রতী করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই বনমহোৎসব পরিকল্পিত হইয়াছে।

বৃক্ষ ভূমিক্ষয় নিবারণ করে, বৃষ্টিহীন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সূচনা করে, দেশের শীতাতপ ও বর্ষার মৃদুতা অথবা তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে—বৃক্ষই প্রাণীকে আহার্য দান করে, মানুষকে ফল দান করে। জ্বালানী কাঠ বৃক্ষরাজি হইতেই পাওয়া যায়, এবং বনভূমি হইতে সংগৃহীত জ্বালানী কাঠের ব্যবহারের মধ্য দিয়াই গোময়ের জ্বালানীরূপে অপচয় নিবারণ করা যায়—উহা জমির সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। স্নিগ্ধ ছায়া, ফুলের সৌরভ এবং বর্ণশোভা বৃক্ষেরই দান। বৃক্ষরাজি শুধু খাদ্যই দেয় না—সূর্যরশ্মি পান করিয়া বৃক্ষ আনন্দরস পরিবেশন করিতেছে। গাছপালার সবুজ রং হইতেছে জীবনের রং, বাঁচিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্ভূত যে আশা—তাহারই রং। এইজন্যই বৃক্ষরোপণ একদিন আমাদের দেশে পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। সম্রাট্ অশোক পথ নির্মাণ করিয়া তাহার দুই পাশে শ্রেণীবদ্ধভাবে ছায়া-সুনিবিড় ফলবান বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। মানুষ ও পশুর জন্য নানাবিধ ঔষধের বৃক্ষদ্বারা উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের নরপতিগণ এবং মুসলমান শাসনকালে কোন কোন বাদশাহও বৃক্ষরোপণের দ্বারা প্রজাসাধারণের হিতসাধন করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। বাংলার জমিদারবর্গও একদিন বৃক্ষরোপণকে পুণ্যকর্ম বলিয়াই মনে করিতেন।

বৃক্ষরোপণকে উৎসবের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত-নৃত্যাদির মধ্য দিয়া তিনি বৃক্ষরোপণ উৎসব পালন করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে যে কেবল কবির শিল্পচেতনা এবং সৌন্দর্যানুভূতি ছিল তাহা নহে, ররং ঐ বৃক্ষরোপণ দ্বারা তিনি প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গে আধুনিক ভারতের বৈজ্ঞানিক জীবনের একটি সেতু রচনা করিতেই চাহিয়াছিলেন।

এক্ষণে সরকারী উদ্‌যোগে প্রতি বৎসরই 'বনমহোৎসব' হইতেছে। জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য উহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রতি বৎসর কেবল বৃক্ষরোপণ করিলেই হইবে না। যাহাতে রোপিত বৃক্ষসকল সযত্নে পালিত ও বর্ধিত হয়, সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অধিকন্তু উহা যাহাতে একটা বার্ষিক আমোদ ও আড়ম্বরের প্রাণহীন প্রথায় পর্যবসিত না হয়, সে দিকেও সচেতন থাকিতে হইবে। তবেই দেশের জনসাধারণ এই উৎসবের গভীর তাৎপর্য অনুভব করিতে পারিবে এবং বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়া সরকারের সহায়তার জন্য আগাইয়া আসিবে। সরকার ও দেশের জনসাধারণ—উভয়-পক্ষের সহযোগিতা ভিন্ন এই শুভকর প্রয়াস কখনই ব্যাপক ও সফল হইতে পারে না। ইহা স্মরণ করিয়াই আমরা কবির সঙ্গে নিখিল-প্রাণের খাদ্য ও আনন্দ পরিবেষক শ্যাম বনভূমিকে আবাহন করি—

"মরু বিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে
হে প্রবল প্রাণ!
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে
হে কোমল প্রাণ!"

নববর্ষের উৎসব

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ নববর্ষ-উৎসবের তাৎপর্য—বাংলার নববর্ষ-উৎসব—নববর্ষোৎসবের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব—বিভিন্ন দেশের নববর্ষ উৎসব—উপসংহার ঃ সার্থক নববর্ষোৎসব।

মানুষ নববর্ষকে বিশেষভাবে স্মরণ করিবার জন্যই নববর্ষের উৎসবের সূচনা করিয়াছে। এই উৎসবের মূলে রহিয়াছে পুরাতন ও বিগতকে বিস্মৃত

হইয়া নূতনকে বরণ করিবার মনোবৃত্তি। পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রির তিক্ত স্মৃতি মানুষের নিকট খুব রুচিকর নহে, তাই সে নূতন আশায় সেই স্মৃতিকে ভুলিতে চায়; উৎসবের আনন্দ-কলরবের মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি-লোকসানের হিসাব ভুলিয়া নবীন সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষার খাতা খুলিয়া বসে। ব্যবসায়িক মানুষের নূতন খাতা মহরত তাহার মনের এই নূতন খাতারই প্রতীক। বিগত বর্ষ যাহাদের নিকট অপ্রীতিকর হয় নাই, সেই সিদ্ধকামেরাও পূর্ণতর সিদ্ধির আশায় নববর্ষের উৎসব করিয়া থাকে।

আমরা বাঙালী। বাংলা সন বৈশাখ হইতে গণনা করা হয়। পয়লা বৈশাখ বাঙালীর নববর্ষ। বসন্তের শেষ আমেজটুকু গায়ে মাখিয়া, শেষ-ফোটা বকুলের গন্ধ বহিয়া, ভাবুক-কবির প্রাণে নবীনতার উন্মাদনা জাগাইয়া, নিরাশচিত্তে আশার সঞ্চার কবিয়া নূতন বছরের প্রথম দিনটি আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়। কবি তাঁহার কবিতার খাতা খুলিয়া বসেন—ব্যবসায়ীরা নূতন খাতা খুলিয়া বসে, আম্রপল্লবে পুষ্পমাল্যে গৃহ সজ্জিত হয়, আতরে ধূপবাসে পরিবেশ সুরভিত হইয়া উঠে, নিমন্ত্রিতেরা আসিয়া হালখাতার জমার ঘর পূর্ণ করিতে থাকেন আর মিষ্টিমুখ করিয়া যান। এমনি মনোরম পরিবেশ বাঙালীর ঘরে-ঘরেই দেখা যায়। এই নববর্ষে, আত্মীয় আত্মীয়কে, বন্ধু বন্ধুকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। যাহারা দূরে আছে, রঙীন পত্রে বিচিত্র ভাষায় তাহাদের নিকট নববর্ষের প্রীতিসম্ভাষণ পৌঁছিয়া থাকে। অধুনা বহু সমিতি বা সঙ্ঘ এই উপলক্ষে নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া থাকেন। সেখানে গানে বাজনায়, আবৃত্তিতে-নববর্ষের উৎসবকে সফল করিয়া তুলিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ধর্মপ্রাণ তাঁহারা বেদশাস্ত্রপাঠ, পূজার্চনা প্রভৃতি মাঙ্গলিক আচরণের ভিতর দিয়া নববর্ষোৎসব পালন করেন। মোট কথা, সকলেই কামনা করে,—নববর্ষ যেন তাহাদের জীবনকে নব নব সার্থকতায় ভরিয়া তোলে, সকলের ঘরেই যেন বিরাজ করে সুখ, শান্তি ও প্রীতি।

আমাদের এই নববর্ষোৎসবের ইতিহাস কবে হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সঠিক বিবরণ কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু একঘেয়ে জীবনে

বৈচিত্র্য-উপভোগের বাসনা হইতেই যে ইহার জন্ম হইয়াছিল, এ বিষয়ে বোধ করি তর্কের অবকাশ নাই।

পয়লা বৈশাখ বাঙালীর নিকট নববর্ষের দিন বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেও, গত কিছুকাল ধরিয়া এবং এখনও বহু বাঙালীর মধ্যে আর-একটি নববর্ষোৎসব অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। উহা পয়লা জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইংরাজ শাসনের আমলে তাহাদের ভাষা, আচার-আচরণ হইতে শুরু করিয়া অনেক কিছুকেই আমরা অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়াছিলাম। ইংরাজী সাল-তারিখের সঙ্গে ইংরাজী রীতিতে '১-লা জানুয়ারি' পালন করাও তেমনি অনুকরণের ফল। এখনও ঐ তারিখে বহু ব্যক্তি পাশ্চাত্য প্রথায় বিজাতীয় ভাষায় প্রীতিসম্ভাষণ বা শুভেচ্ছা-লিপি প্রেরণ করিয়া নববর্ষের উৎসব করিয়া থাকেন।

কেবল আমাদের মধ্যেই নহে, পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই নববর্ষ-উৎসবের অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। প্রায় সকল দেশেই পান-ভোজন, নৃত্য-গীত, ক্রীড়া-কৌতুক প্রভৃতি নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া নববর্ষ-উৎসব পালিত হইয়া থাকে।

তবে যিনি যেমন ভাবেই উৎসব করুন না কেন, একথা সকলেরই মনে রাখা কর্তব্য যে, উৎসব শুধু একটা প্রথা নয়; উহা মানুষের আত্মারই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ। মানুষ প্রত্যহ উৎসব করে না, প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বাহিরেই তাহার উৎসবের আয়োজন। নববর্ষের উৎসবের দিনে আমাদের মধ্যে জাগ্রত করিতে হইবে মৈত্রীকে, সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে মানুষে মানুষে আত্মার আত্মীয়তাকে, তবেই আনন্দের মধ্যে, প্রীতির মধ্যে আমাদের উৎসব সার্থক হইয়া উঠিবে।

জীবনচরিত পাঠের আবশ্যকতা

প্রবন্ধ-সংকেত : ইতিহাসের শিক্ষা ও জীবনচরিতের শিক্ষা—জীবনচরিত পাঠের কৌতূহল ও তাহার কারণ—মহৎজীবনের বৈচিত্র্যময় কাহিনী শিক্ষার মূলস্বরূপ—জাতির উপর মহাত্মা ব্যক্তিগণের জীবনচরিতের প্রভাব—আত্মচরিত ও মানবজীবনে উহার প্রভাব—উপসংহার।

ইতিহাস যেমন মানবজাতির ইতিবৃত্ত, জীবনচরিত তেমনি মনুষ্যবিশেষের ইতিহাস। যেমন ইতিহাস, প্রাচীন পিতামহের ন্যায় জগতের অতীত কথার অবতারণা করিয়া, মানবজাতির নির্বাণোন্মুখ আশাকে জাগাইয়া তোলে,—কোন্ জাতি উন্নতির সোপানে ক্রমে ক্রমে কিরূপে উঠিল, ক্রমে আবার কি হেতু সেই জাতি জলে জলবুদ্‌বুদের মত মিলাইয়া গেল, তাহা বলিয়া নিয়ত শিক্ষা দেয়,—মনুষ্যের জীবনচরিতও মনুষ্যকে সেইরূপ উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে। ব্যক্তি-জীবনের ইতিহাস মূল্যবান্ ও শিক্ষাপ্রদ। কারণ, সে কাহিনী ব্যক্তি-বিশেষের মর্মস্থল স্পর্শ করিয়া মনুষ্যমনে আশা, উৎসাহ, মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বকে জাগাইয়া তোলে। কারণ, সকল হৃদয়েই একই আশা-উৎসাহ, একই সুখ-দুঃখ উত্থান ও পতন।

মহাপুরুষগণের জীবন অতি বিচিত্র। তাঁহাদের জীবনচরিত পাঠ করিবার জন্য স্বভাবতই কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। যে সকল মহাত্মা পৃথিবীতে আসিয়া কেবল খাইয়া শুইয়াই কাল কর্তন করিয়া যান নাই, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে জীবন-যাপনের আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনকথা জানিবার জন্য মানুষের অদম্য তৃষ্ণা। তাঁহাদের শৈশবকাল কিভাবে অতিবাহিত হইত, যৌবনকালে কোন্ কোন্ গুণ তাঁহাদের মধ্যে বিকাশলাভ করিয়াছিল, পরিপক্ক প্রৌঢ়দশায় উপনীত হইয়া সমাজের অভিনয়ভূমিতে তাঁহারা কিরূপ কার্য করিতেন, এ সমস্ত কথা জানিবার ইচ্ছা বালক বৃদ্ধ যুবা, সকলের মনেই দুর্বার।

মহাত্মা ব্যক্তিগণের জীবনের বৈচিত্র্যময় কাহিনী হইতে নীতিশিক্ষার অবকাশ রহিয়াছে। মহাপুরুষগণের জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়

যে তাঁহারা শত সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তবে বড় হইয়াছেন, যশস্বী হইয়াছেন। দেখিতে পাই, যখনই তাঁহারা সমাজের কোনো সংস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অথবা মানুষের মঙ্গলের জন্য যখনই তাঁহারা কোনো চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই পর্বতপ্রমাণ বাধা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুদ্যত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের উদ্যম তাহাতে বিপর্যস্ত হয় নাই। তাঁহারা বীরত্বের সহিত যাহা ন্যায় বা ধর্ম বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাকেই অবলম্বন করিযাছেন এবং শেষ পর্যন্ত অন্যায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে জয়ী হইয়া ন্যায় ও ধর্মকেই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করিযাছেন। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী তাহা আমরা বুঝিয়াছি এবং ঐ আদর্শে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

পৃথিবীর মহাপুরুষগণের জীবনচরিত পাঠ করিলে, ক্রমেই মন নীচভাব পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যোচিত উচ্চতার প্রতি অনুরক্ত হয়, আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটে। মহামতি মনুষ্যগণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিযা রাখিলে, তাঁহাদের জীবনের আদর্শ অনুধ্যান করিলে, আমরা মহত্ত্বের দ্বারে উপনীত হইতে পারি। চিত্ত ও চরিত্রের সমুন্নতির জন্য জীবনচরিত পাঠ করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

মানুষের জীবনচরিত মানুষকে তাহার শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন করে। মানুষের মধ্যে যে শক্তি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, মহাত্মা ব্যক্তিগণের জীবনচরিত অনুশীলন করিয়া মানুষের সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির বিকাশ ঘটিয়া থাকে।

কেবল ব্যক্তিগতভাবে নয়, জাতিগতভাবেও মহাপুরুষদিগের জীবনচরিতের প্রভাব অপরিসীম। যে জাতির মধ্যে কবি, দার্শনিক, কর্মবীর, ধর্মবেত্তা প্রভৃতি মহাপ্রাণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, সেই জাতি আত্মবিশ্বাসপরায়ণ হইয়া উঠে। জাতির নিদারুণ দুঃসময়ে কিংবা ঘোরতর অবনতির নিরাশ্যময় অন্ধকারে মহাপুরুষগণের জীবনচরিত মনুষ্যমনে নূতন আশা উৎসাহ সঞ্চার করিয়া থাকে।

জীবনচরিত দুই শ্রেণীর হইতে পারে। এক শ্রেণীর জীবনচরিত অন্যের দ্বারা লিখিত হয়, আর এক শ্রেণীর জীবনচরিত মনুষ্যের স্বরচিত জীবনবৃত্তান্ত।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবনচরিতকে 'আত্মচরিত' বলা হইয়া থাকে। পরের দ্বারা লিখিত জীবনচরিতে অনেক সময়েই মানুষের বাহিরের জীবন, মানুষের বাহিরের কার্যকলাপের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর জীবনচরিত অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের অন্তর্গত নিত্যপ্রকৃতির, সমগ্রতার পরিচায়ক হয় না। অনেক সময়েই জীবনচরিতে মহাত্মা পুরুষদিগের আভ্যন্তরীণ জীবনের পূরা পরিচয় ব্যক্ত হয় না। এই হিসাবে আত্মচরিত শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি। ইহাতে বিবিধ ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মহৎ জীবন কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি। কোন্ প্রভাবে জীবন পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারি। তবে এই শ্রেণীর জীবনচরিতেরও একটি মহৎ ত্রুটি লক্ষিত হয়। ইহাতে অনেক সময় স্বগুণপক্ষপাতিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। আত্মচরিত-রচয়িতা অনেক সময়ে ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে তাঁহার চরিত্র কিভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখাইতে পারেন না। কারণ, মানুষমাত্রেই মনের মধ্যে নিজের মহত্ত্ব প্রকাশ করার ব্যাকুলতা বর্তমান। মানুষ সরলভাবে অকপট চিত্তে তাহার দোষগুণ বা জীবনের সকল গূঢ়কথা অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেন, তিনি সার্থক আত্মচরিত রচনা করিতে অক্ষম। কিন্তু যে ব্যক্তি আপনাকে অন্য সকল মানুষের মত বিবেচনা করিয়া, নির্লিপ্তভাবে এবং অকপটে আপন কাহিনী লিখিতে পারেন, তাঁহার রচিত চরিতাখ্যানই সার্থক আত্মচরিত। ঐরূপ জীবনচরিতই মনুষ্যের জীবনবিকাশে সহায়তা করিতে পারে।

মোট কথা, জীবনচরিত একটি জীবনের দ্যুতিকে চিরস্থায়ী করিতে চায়, সকল কালের ও সকল দেশের লোকের মধ্যে একটি জীবনের আদর্শকে প্রসারিত করিয়া দিতে চায়। সুতরাং জীবনচরিত পাঠ করিয়া বিভিন্ন দেশে ও কালে আবির্ভূত মহাত্মাদিগের জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা জন্মে, তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা কার্যকলাপ দেখিয়া আমরাও সেই ধারায় নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি।

তোমার জীবনের আদর্শ পুরুষ

[আই. এ., আই. এস্-সি. ঃ ১৯৪৯]

(স্বামী বিবেকানন্দ)

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ সূচনা—তোমার জীবনের যিনি আদর্শ পুরুষ তাঁহার নামোল্লেখ ঃ স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ রামকৃষ্ণদেবের বাণীর ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক—বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তুমি কোন্ কোন্ অনুপ্রেরণা পাও ?—সেবাধর্ম—সমাজসংস্কার—স্বদেশপ্রেম—পাশ্চাত্যজগতে ভারত ও হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচার—ভারতীয় সাধনার মূর্ত প্রতীক।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জগতে যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, তখনই এক একজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহামানব আবির্ভূত হইয়া মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। মানুষ যখন উন্নতির পথ হারাইয়া ফেলে, কোনমতে শ্রেয় ও সত্যলাভের পথ খুঁজিয়া পায় না, অথবা কোন কারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, তখন নির্দিষ্ট জীবনব্রত লইয়া, আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। ইহারা মানবজাতির সম্মুখে উন্নতির পথনির্দেশক স্তম্ভস্বরূপ, মানবজাতিকে এই সকল মহাত্মা পুরুষ সত্য ও শ্রেয়োলাভের পথ প্রদর্শন করেন। ইহারা জাতির বহু যুগের তপস্যার ফল, ইহারা ভবিষ্যৎ যুগের স্রষ্টা।

এমনই এক মহাত্মা পুরুষ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই মহামানবের আবির্ভাবকাল উনবিংশ শতাব্দী। তখন বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার স্রোতোধারা প্রবাহিত হইয়াছে, বাঙালী ইউরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতায় পূর্ণদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। স্বদেশের ধর্মে, শাস্ত্রে, সমাজে, সংস্কারে, সাহিত্যে বাঙালীর আস্থা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অস্পৃশ্যতার পাপ দেশকে শক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছে। সে যুগ বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিপর্যয়ের যুগ। এই যুগে আবির্ভূত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে অধঃপতিত বাঙালীকে

উন্নতির পথে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন, যেভাবে ভ্রান্তির মোহজাল হইতে মুক্ত হইবার ইঙ্গিত তিনি বাঙালীকে দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা এদেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাই স্বামী বিবেকানন্দ আমার জীবনের আদর্শ পুরুষ।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। বুদ্ধদেবের বাণীর প্রচারক যেমন ছিলেন অশোক, শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর প্রচারক যেমন ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈতাচার্য, রায় রামানন্দ, নরোত্তম দাস; আর, ব্যাখ্যাতা যেমন রূপ গোস্বামী, কবি কর্ণপুর বা জীব গোস্বামী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ; খ্রীষ্টের বাণীর প্রচারক যেমন ছিলেন সেণ্ট পল, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণীর পরিপূর্ণ প্রতীক তেমনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণের ধ্যানলব্ধ সত্যকে স্বামী বিবেকানন্দ জগৎসমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। এক কথায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব মূল গ্রন্থ, স্বামী বিবেকানন্দ তাহার টীকা-ভাষ্য।

বেদান্তের ধর্মকে কর্মময় জীবনে রূপদান করিবার নিমিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উপনিষদ বলিয়াছেন—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। চরাচরে সর্বত্রই ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। নরের মধ্যেও নারায়ণ আছেন। উপনিষদের ঐ বাণীর আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবেপ্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

এই যে আমাদের মধ্যে দীন দরিদ্র, আর্ত মানুষ রহিয়াছে, বিবেকানন্দ বুঝিয়াছিলেন যে তাহাদের সেবাই ভগবৎসেবা। রুদ্ধ ঘরের দেবালয়ের কোণে পাষাণ-প্রতিমার মধ্যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ না করিয়া হীন পতিতের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই এই মহামানবের সমস্ত জীবন মানুষগঠন ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবাতেই কাটিয়াছিল। তিনি বলিতেন, 'দরিদ্রদেবো

ভব', 'মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্রকে দেবতাজ্ঞানে সেবা কর, সর্ববিধ অত্যাচার হইতে তাহাকে রক্ষা কর। মূর্খকেও দেবতাজ্ঞানে সেবা কর, তাহাকে শিক্ষা ও জ্ঞান দান করিয়া তাহার অন্তরের শক্তির বিকাশ ঘটাও। বিবেকানন্দের ঈশ্বর ছিলেন এই মর্ত্যেরই দুর্গত মানুষ, মর্ত্যের ধূলি তাঁহার গায়ে, মর্ত্যের পঙ্কে তাঁহার দেহ সিক্ত। কর্মযোগী বিশ্বপ্রেমিক সন্ন্যাসী এই মানুষের জন্যই কাঁদিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিকতা ছিল ঐহিকতায় মণ্ডিত। বিবেকানন্দের সাধনার ইহাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বামীজির জীবনব্যাপী ঐ সাধনার অনুসরণ যেন আমরা করিতে পারি। জনসেবার মধ্য দিয়া ধর্মসেবা করিবার যে আদর্শ তিনি অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা যদি আমাদের দেশের আদর্শ হয়, তবে দেশের ভবিষ্যৎ সমুন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে। হিন্দুধর্মের মর্যাদাও তাহা হইলে রক্ষিত হইবে।

বিবেকানন্দ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ইত্যাদিকে তিনি কখনও সহ্য করেন নাই বা সমর্থন করেন নাই। জাতিভেদ প্রথার উপর তিনি খড়গহস্ত ছিলেন। অস্পৃশ্যতাই যে হিন্দুধর্মের অবনতির মূল কারণ, সে সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সন্দেহই ছিল না।

বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমের তুলনা নাই। আমেরিকার ঐশ্বর্যের বিলাস-পুরীতে একবার তাঁহাকে সুসজ্জিত একটি গৃহে কোমল শয্যার উপর শুইতে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু দেশের দুর্গত দীনহীন ছিন্নকন্থামাত্রসম্বল অগণিত নরনারীর কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি সেই সুকোমল শয্যায় শয়ন করিতে পারেন নাই। মেঝের উপর শুইয়া কেবল তাঁহার গেরুয়া উত্তরীয়খানি গায়ে দিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার মানসিক বল ও সুগভীর দেশপ্রীতির পরিচায়ক। মনের বলে তিনি আমেরিকার মত দেশের শীত, মাত্র একখানি সুতির উত্তরীয় গায়ে দিয়া সহ্য করিয়াছিলেন। এমনিতর দেশপ্রীতি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হউক।

ভারতবর্ষের ও হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যকে তিনি জগৎসমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। সে যুগে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব ও হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগৎ ছিল সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, উদাসীন। পাশ্চাত্যের এই অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য

দূর করিয়া ভারতের প্রতি পাশ্চাত্যের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি সর্বপ্রথম তিনিই আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতের বাণী 'বেদাহম্'—আমি জানি। বাস্তবিক ভারতবর্ষ এমন কিছু জানে যাহা বিশ্বকে শুনাইবার, জানাইবার। স্বামী বিবেকানন্দ মূক ভারতবর্ষের সেই বাণী জগৎসমক্ষে প্রচার করিয়া জগৎবাসীকে বিস্মিত বিমূঢ় করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভারতের চিরকালের বাণী মিলনের বাণী, ভারতের সাধনা—ঐক্যের সাধনা। ভারতের পথ অমৃতসন্ধানের পথ—ঐ পথের শেষ শান্তিতে, মিলনে। ভারত বিশ্বাস করিত ঐক্যের অভাবে মানুষ বর্বর হয়, ঐক্যের শৈথিল্যে মানুষ হয় ব্যর্থ। তাই শক, হূনদল, পাঠান, মোগল যত জাতিই ভারতে আসিয়াছে, সকলেরই এখানে স্থান হইয়াছে, সকলেই পাইয়াছে সম্মান ও স্বীকৃতি। প্রাচীন ভারত ছিল সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত। মানবাত্মার গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে তাহাকেই সে স্বীকার করিত।

কিন্তু ক্রমশ ভারত তাহার এই সাধনবাণী বিস্মৃত হইল। দেশে দেখা দিল জাতিভেদ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, শাস্ত্রীয় বাহ্যবিধির কৃত্রিমতা। জনগণ শাস্ত্রকারের কর্তৃত্ব মানিয়া লইল বিনা বিচারে,—চলিতে লাগিল শাস্ত্রের রাজপথে—বাঁধা পথের বিধান মানিয়া। ভারতের প্রবহমান মননধারা রুদ্ধ হইল, ভারতবাসীর মন জিজ্ঞাসাশূন্য, বিচারবুদ্ধি ও আত্মকর্তৃত্বহীন হইল। অভ্যাস ও লোকাচারের দাসত্ব করিতেই ভারতবাসী তখন তাহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিল। সংস্কার ও প্রথার প্রতি ভারতের এক মিথ্যা মোহ জন্মিল। জনসাধারণের চিন্তাশক্তি প্রাচীন সংস্কারের অনুসরণেই ব্যয়িত হইয়া গেল। ভারত তখন ঘরে বসিয়া মৃত যুগেরই মন্ত্র জপ করিতেছিল। প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করিবার—অর্থাৎ, নূতন সমস্যার সমাধান করিবার মত ক্ষমতা ভারতবর্ষের ছিল না। এমনি এক দুর্দশার দিনে, ভারতের শাশ্বত বাণীকে বহন করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক। তাঁহার উদার জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত হৃদয়ে সকল মানবের স্বীকৃতি ছিল। তাই তৎকালীন ভারতকে তিনি প্রাচীন ভারতের চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন ঐক্যবাণী শুনাইলেন। তিনি বলিলেন—

"ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর! সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল,—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই! বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই!"

এইরূপে বিবেকানন্দ ভারতেরই ঐক্যের ধর্ম, আদর্শ, সঙ্কল্প ও সাধনাকে পুনর্জাগ্রত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ধ্যান ছিল এক নূতন ভারতবর্ষ, সেই ভারতবর্ষে কোনরূপ দুর্বলতা থাকিবে না, অস্পৃশ্যতা থাকিবে না। কৃষক, তাঁতী, কামার, কুমার, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সকলে এক হইয়া রচনা করিবে মহামিলনের সেই ভারতবর্ষ—'মহা-ভারত'। সেই 'মহা-ভারত'কে গড়িয়া তুলিবার ভার আমাদের উপর বর্তাইযাছে। আমাদের মঙ্গলের জন্য, ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের নিমিত্ত ভারতবর্ষকে মহামানবের মিলনতীর্থে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা স্বামীজি সেদিন অনুভব করিয়াছিলেন।

ভারত-ইতিহাসের পুরোগামিনী যে গতি ঘৃণাবিদ্বেষের দ্বারা ব্যাহত হইয়াছিল, তাহাতে নূতন জোয়ারের সঞ্চার করার প্রয়োজন অনুভব করেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু ভারতের অতীতকে তিনি যে কেবল চলমান করিয়া যান নাই, ভবিষ্যতের জন্যও তিনি সুপ্রচুর সম্ভাবনা রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মানবতার প্রধান ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষে সেদিন মানবতার বাণী পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু মহৎ মানবতার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত এই পুরুষ অতীত ভারতেরই উদার মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইযা দেশবাসীর মধ্যে প্রীতি ও ঐক্যের মিলনসেতু রচনা করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা যেন সেই উন্নত মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারি, আমাদের জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের সাধনাকে যেন সফল করিয়া তুলিতে সমর্থ হই।

দেশভ্রমণ

প্রবন্ধ-সংকেত : দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য—ভারতীয়দের তীর্থদর্শনস্থলে দেশভ্রমণ—দেশভ্রমণ ও প্রত্যক্ষ শিক্ষা—প্রাচীন পরিব্রাজক এবং বিখ্যাত ভ্রমণকারীদিগের দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য ও ফল—দেশভ্রমণের আবশ্যকতা ও সুফল।

বিরাট্ বিশাল এই পৃথিবী—অজানা তাহার রহস্য; বিচিত্র তাহার রূপ। সেই অজানাকে জানিবার, বিচিত্র বিশাল এই পৃথিবীর সহিত পরিচয় স্থাপন করিবার আকাঙ্ক্ষা মানবমনে দুর্নিবার। তাই মানুষ দেশভ্রমণে বাহির হয়, পরিচিতের গণ্ডিটুকু, সীমার বাঁধনটুকু পিছনে ফেলিয়া অপরিচিত ও অনন্ত-বিস্তৃত এই বিশাল পৃথিবীময় বেড়াইবার প্রেরণা মানুষ অনুভব করে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে দেশভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা মানবমনে বিরাজিত। যখন আকাশচারী বিমানপোত আবিষ্কৃত হয় নাই, যেদিন পৃথিবীতে ট্রেন মোটর ছিল না, যেদিন বিজ্ঞানের দান জলযান সৃষ্ট হয় নাই,—যেদিন পৃথিবী ছিল আজিকার চেয়ে অনেক বড়, অজ্ঞাত, অনেক অংশই অপরিচিত দুর্গম,—সেদিনও মানুষ অজানা সেই পৃথিবীর পথে পথে বাহির হইয়াছে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। সেদিনকার মানুষও সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গভঙ্গের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত, মরুভূমির অনন্ত বালুকাবিস্তার তাহার কল্পনায় মায়াজাল বিস্তার করিত। যে পথ এক দেশ হইতে অন্য দেশে, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে চলিয়া গিয়াছে, তাহা মানুষকে ঘর ছাড়িবার রহস্যময় ভাষা শুনাইত। পরবর্তী কালেও বিজ্ঞানের প্রসাদে যখন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কত পথ খুলিল, কত রথ ছুটিল,—তখনও পৃথিবীর সাগর উপকূল, মরুভূমির আগুন-ঝরা বাতাস, দূরদূরান্তরের অরণ্যপ্রান্তর মানুষের কানে কানে কি কথা শুনাইয়াছে কে জানে? সুদূরের সেই আহ্বানে মানুষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এবং অজানা অদেখাকে দেখিবার জন্য মানুষের মন তাহার পক্ষ বিস্তার করিয়াছে।

দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য বিবিধ। নানাপ্রকার উদ্দেশ্য লইয়াই মানুষ দেশভ্রমণে বাহির হয়। প্রধানত মানুষ তাহার জ্ঞানের ক্ষুধা ও ঈশ্বরানুরাগ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য দেশভ্রমণে বাহির হয়।

তীর্থদর্শনের জন্য এককালে পুণ্যলোভাতুর ভারতীয়েরা দেশভ্রমণে বাহির হইতেন। দেশভ্রমণ এখনও পুণ্যকর্মরূপে আমাদের দেশের লোকদিগের নিকট পরিগণিত। কারণ, ইহার ফলে ঈশ্বরের সৃষ্টিবৈচিত্র্য চোখে পড়ে, বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের অনন্ত বিকাশ দেখিয়া তাঁহার মহামহিম মূর্তি মানসপটে জাগে, ধর্মভাব বর্ধিত হয়।

(শিক্ষার, জ্ঞানের সম্পূর্ণতার জন্যও দেশভ্রমণের আবশ্যকতা রহিয়াছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্থান, বিখ্যাত শিল্পকলার কেন্দ্র, প্রাচীন চৈত্য বিহার, বিভিন্ন দেশের মঠ মন্দির—এগুলি মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। বিভিন্ন দেশেব রীতিনীতি, লোকসমাজ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাইবার জন্যও দেশভ্রমণ একান্তভাবেই আবশ্যক। নূতন দেশেব শিক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম ইত্যাদি জানিবার আকাঙ্ক্ষাবশেও দেশভ্রমণ করা হইয়া থাকে।)

সুপ্রাচীনকালে হুয়েন সাং, মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়ান, ইবন-বাতুতা প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ ভারতে আসিযাছিলেন। ইহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে ভারতের বিভিন্ন যুগের ইতিহাসের উপকবণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। ভাস্কো ডা গামা, কলম্বস, লিভিংস্টোন, মঙ্গো পার্ক, কাপ্টেন কুক প্রভৃতি ভ্রমণকারীর প্রচেষ্টায় পৃথিবীর কত নূতন দেশের কথাই জানা গিয়াছে! এই সকল ভ্রমণকারীর জন্যই পৃথিবীভ্রমণের নূতন নূতন পথ জানা গিয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কত নূতন পথের সন্ধান মিলিয়াছে।

অজানা দেশের কথা, পৃথিবীর যে-সকল অঞ্চলে মানুষ তাহার পদচিহ্ন আঁকিয়া আসিতে পারে নাই সেই সব অঞ্চলের সংবাদ জানিবার জন্য ইওরোপ আমেরিকাবাসীরা দুর্গম মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়াছে, হিমালয়ের তুষার-মণ্ডিত চূড়ায় উঠিবার সাধনা করিয়াছে। উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু অভিমুখে যাত্রা করিয়া সেখানকার রহস্য জানিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীবাসীকে সেখানকার রহস্য জানাইয়া তাহাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়াছে।

(দেশভ্রমণের ফলেই এক দেশের শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য অন্য আর-এক দেশে প্রসারলাভ করে। বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্প, সাহিত্য ও

সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে পৃথিবীতে সভ্যতা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নব রূপায়ণ ঘটিয়া থাকে ; সভ্যতার অমৃতরূপ ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায়, শিল্প সাহিত্য সমৃদ্ধতর হইয়া উঠে। দেশভ্রমণে কবির কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে, দার্শনিকের চিন্তার খোরাক জুটে, ঐতিহাসিক পুরানো যুগের ভাষা শুনিতে পান, ভূতত্ত্ববিদ্ ধরিত্রীবক্ষনিহিত রত্নরাজির সন্ধান পাইয়া থাকেন।)

(দেশভ্রমণের ফলে মনের সঙ্কীর্ণতা, ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারসকল দূর হইয়া যায়, চিত্তক্ষেত্রের প্রসার ঘটে। কিন্তু কেবল মানসিক উৎকর্ষই নহে, দেশভ্রমণে মানুষের শারীরিক উন্নতিও হয়। মানুষ কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠে, মানুষের মধ্যে দুঃসাহসিক অভিযানের স্পৃহা জাগে। ইহারই ফলে মানুষ দুর্গম মরুদেশে, দুরারোহ পর্বতমালায়, হিংস্র জানোয়ার আর নরখাদক মনুষ্যসঙ্কুল অরণ্যে অভিযান করে। যে পথে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রৌদ্রের দাহনজ্বালা, যে পথে কঠিন বরফ আর সর্বব্যাপী তুষারের ভয়; যে পথে অশরীরী মৃত্যু কাল-কটাক্ষ ছড়াইয়া রাখিয়াছে,—দেশভ্রমণের নেশায় মানুষ সে পথেও পা বাড়াইতে দ্বিধাবোধ করে না। অনেকে চিত্তের শান্তির জন্য, শোকতাপ এবং বৈচিত্র্যহীন জীবনের অবসাদ দূরীভূত করিবার জন্য দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।)

আধুনিক সভ্যতার একটি প্রধান রীতি হইল এই যে, জগতের প্রত্যেকটি দেশ প্রত্যেকটি অপর দেশের সঙ্গে ভাবের ও সভ্যতার আদান-প্রদান করিয়া চলিবে। ভাব, চিন্তা ও সামাজিক সম্পর্ক বিনিময়—ইহাদের লইয়াই আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন। ভাব, চিন্তা ও সামাজিক সম্পর্ক বিনিময়ের পথ খুলিয়া যায় বলিয়াও দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা মানবজীবনে রহিয়াছে।

তাছাড়া, পুঁথিগত জ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মিলন ঘটিলে মনের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়। দেশভ্রমণ মানুষকে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দান করিতে সমর্থ। এই কারণে পাশ্চাত্য দেশসমূহে দেশভ্রমণকে শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া মনে করা হইয়াছে। আমরা এদেশে ইহাকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখি নাই। যেদিন শিখিব, সেদিন আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে, সার্থক হইবে।

বিজ্ঞান ও মানব-সভ্যতা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ আদিম মানব ও তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী—সভ্যতার সূচনা—মানব-সভ্যতা ও বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ—ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা—বিজ্ঞানের দান, মসী, অক্ষর ও কাগজ উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি—বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র—বিজ্ঞানের ধ্বংসরূপ—বিজ্ঞানের সত্যকার উদ্দেশ্য—উপসংহার।

বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালের। আদিম মানুষ ছিল একান্ত অসহায়, কিন্তু বুদ্ধি ছিল তাহার একমাত্র সম্বল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—মানুষের চারিদিকে প্রকৃতির নিষ্ঠুর প্রকোপ, আর অরণ্যের হিংস্র জন্তুর বিভীষিকা। তখন মানুষ ঘর বাঁধিতে জানিত না, চাষ-বাস করিতে জানিত না। তাহারা বাস করিত তরুকোটরে অথবা পর্বতকন্দরে, খাইত বনজাত ফল-মূল অথবা কাঁচা পশুমাংস—কারণ আগুন তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। মানুষ তখন নগ্ন থাকিত, অথবা গাছের ছাল কিংবা পশুর চামড়া পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিত।

কিন্তু ক্রমশ মানুষ তাহার এই অসহায় অবস্থা, এই আদিম বর্বরতা কাটাইয়া উঠিল। মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিতে শুরু করিল। শীত গ্রীষ্ম বর্ষার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত মানুষ কুটীর বাঁধিল, অরণ্যের হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য পাথরের কত রকম অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করিল। আগুন জ্বালাইতে শিখিল—সেই আগুনে মানুষ পশুমাংস বা বনজাত ফল-মূল পুড়াইয়া খাইতে শিখিল। সভ্যতার প্রথম প্রভাত সূচিত হইল।

এইরূপে মানুষ তাহার অসহায় অবস্থা কাটাইয়া উঠিবার জন্য সৃষ্টির আদিম কাল হইতে ক্রমাগত যে অশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, তাহারই নাম বিজ্ঞান। মানব-সভ্যতার বিকাশে এই বিজ্ঞানের দান অপরিমেয়। বিজ্ঞানই মানব-সভ্যতাকে অগ্রগতির পথে চালিত করিয়াছে। শস্য ও বস্ত্র উৎপাদনের জন্য আদিম মানুষ এই বিজ্ঞানের দুয়ারেই ধরনা দিয়াছিল। বিজ্ঞানও মানুষকে বলিয়া দিয়াছিল হলকর্ষণ করিবার উপায়, সূতা কাটিবার ও তাঁত বুনিবার উপায়।

'তারপর যতই দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, মানবের রুচি প্রকৃতি ও প্রয়োজন তত নূতনতর রূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। বিজ্ঞানের দুয়ারে মানব নিত্য নূতন দাবি উপস্থিত করিতেছিল। বিজ্ঞানও অকপটে মানবের নিত্যকার প্রয়োজন মিটাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল।'

এইভাবে বিজ্ঞানের সহায়তায় গ্রামের পত্তন হইল, মানুষ ঘরবাড়ী বাঁধিতে শিখিল, প্রকৃতির উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজিয়া বাহির করিল। নগর বসিল—বাজার-হাট বসিল। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যে অত্যন্ত অসুবিধা। সওদা বিনিময়ে সওদা কিনিতে হয়। মুড়কি দিয়া মুড়ি কিনিতে হয়। বিজ্ঞান মাটি খুঁড়িয়া হঠাৎ একদিন হাজির করিল সোনা, রূপা, তামা, দস্তা—পৃথিবী মধ্যস্থ কত ধাতু, কত রত্ন! তারপরে মুদ্রা-মুদ্রণ কার্যও সমাপ্ত করিয়া দিল বিজ্ঞানই। শেষ পর্যন্ত এই মুদ্রাই সওদা-বিনিময়ের ব্যবস্থা পরিবর্তিত করিয়া দিয়া কায়েমী হইয়া বসিল।

'বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসের সেই আদিম কাল হইতে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বিভিন্ন দ্রব্যরাশি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসাধনের শৌখিন বস্তুটি পর্যন্ত উদ্ভাবন করিয়াছে। বিজ্ঞানের বলেই মানুষ দূরকে নিকট করিয়াছে।' প্রকৃতি সাগর-প্রান্তর-নদী-পর্বত স্থাপন করিয়া মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, বিজ্ঞানের বলে মানুষ সেই ব্যবধান ঘুচাইয়া এক দেশের সহিত অন্য দেশের, এক জাতির সহিত অন্য জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির যোগসূত্র স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

'এক দেশ ও অন্য দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার এবং নিকট সম্পর্ক স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে মানুষ বিজ্ঞানের সহায়তাতেই নানাবিধ যানবাহন উদ্ভাবন করিয়াছে। জলপথের জন্য নৌকা তৈয়ারী হইয়াছে, মাল বহিবার রকমারি জলযান উদ্ভাবিত হইয়াছে। অনুকূল-প্রতিকূল বাণিজ্য-বায়ুর অস্তিত্ব বাহির হইয়াছে, পথহারা নাবিকের জন্য দিগ্‌দর্শন যন্ত্র আসিয়া দেখা দিয়াছে, ঝড়-ঝঞ্ঝার আকস্মিক আক্রমণ সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্য বায়ুমান যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যের শত সহস্র সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়া লক্ষ্মীলাভের উপায় খুঁজিয়া পাইয়াছে।'

সৃষ্টির সেই প্রথম দিন হইতেই মানুষের বুকে কত আশা, কত সুখ, কত শোক, কত দুঃখ জমিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল ; খোঁজ তাহার কেহ রাখিত না। মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্ক মিলিত হইয়া আসিল বিজ্ঞানের মন্দিরে। সেখানে তাহারা লাভ করিল মসী-অগ্নরের বর। অতঃপর মানুষ তাহার অন্তরের লিখন লিখিয়া ফেলিল ভূর্জপত্রে। মানুষের বুকের কথা মানুষের হাতের লেখায় মূর্ত হইয়া উঠিল।

গেল বহুদিন—মানুষ দেখিল, তাহার ভূর্জপত্র শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার অন্তরের লেখা বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিজ্ঞান-দেবতার কাছে পুনরায় মানব বরপ্রার্থী হইল। শুরু হইল মানবের বিজ্ঞানের সাধনা। সাধনায় মানব সিদ্ধিলাভ করিল—কাগজের ও মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভব হইল। মানুষ নূতন করিয়া শ্লোক লিখিল, তাহা মুদ্রিত হইতে লাগিল। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস রচনা করিয়া মানুষ অমর হইতে লাগিল। বিজ্ঞানের বলে মানুষ কালজয়ী হইল।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি পরম বিস্ময়কর। প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান গেলিলিও-কেপলার-নিউটনের হাত ধরিয়া নামিয়া আসিয়া, ফ্যারাডে-হেলমহোৎজের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া এ যুগের কুরী-আইনস্টাইনের বিজ্ঞানাগারে কি আশ্চর্য উন্নতি ও প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা কঠিন। তবে মানুষের প্রয়োজনে বিজ্ঞান যে কতখানি সহায়তা করিয়াছে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের দ্বারা মাত্র এক শতাব্দীকালের মধ্যে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমেরিকার সন্ধান মিলিয়াছে—নূতন কত দেশ আবিষ্কারের পথ প্রথম প্রশস্ত হইয়াছে। কত যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, ফ্যাক্টরী হইয়াছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সুদূর আকাশের গোপন রহস্যের আচ্ছাদন উন্মুক্ত হইয়া মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়াছে। স্টীম-এঞ্জিন তৈয়ারী হইয়াছে—তাহারই সহায়তায় জলপথে ও স্থলপথে বাষ্পীয় যান চলিয়াছে, বস্ত্র-প্রস্তুতের যন্ত্র তৈয়ার হইয়াছে।

আকাশের বিদ্যুৎকে মানুষ তাহার ভৃত্য করিয়াছে—ফলে বিজলী বাতি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, টেলিভিশান প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, উন্নততর মুদ্রাযন্ত্র

বিদ্যুতের সাহায্যে চালিত হইয়া আজ অতি অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি মুদ্রিত করিতেছে। একটি যন্ত্র দশ হাজার মজুরের কাজ করিতেছে, মানুষকে কঠিন পরিশ্রমের হাত হইতে মুক্তি দিয়াছে। জলস্রোত—যাহা এতকাল বৃথাই বহিয়া যাইত, তাহা হইতে তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন করিয়া মানুষ আজ সেই বিদ্যুতের সাহায্যে আলো জ্বালাইতেছে, কলকারখানা চালাইতেছে।

এই বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষ আকাশকে জয় করিয়াছে। কল্পনার পুষ্পকরথ আজ সত্যসত্যই আকাশপথ অতিক্রম করিতেছে। এরোপ্লেনসমূহ অতি অল্প সময়ে আজ দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতেছে। বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজ জল-স্থল-অন্তরীক্ষকে জয় করিয়াছে। আধুনিক যুগের মানুষ ভূগর্ভের খনিতে নামিয়া মণি-মাণিক্য আহরণ করিয়া আনে, সাগরতল হইতে মুক্তা তুলিয়া আনে, স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী নদীর বুকে সেতু বাঁধিয়া বিজ্ঞানের বিজয়কেতন উড্ডীন করে। আর কত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নাম করিব! বিজ্ঞানের দানে পৃথিবীর যে কি কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় দান চিকিৎসাশাস্ত্র। লিস্টারের অ্যান্টিসেপ্‌টিক, জেনারের বসন্ত রোগের টিকা, পাস্তুরের পাগলা কুকুর শিয়াল দংশনের প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌শান, ব্রহ্মচারীর কালাজ্বর-নিবারক ইউবিয়া স্টিবামিন, রণ্টজেন ও মাডাম কুরীর আবিষ্কৃত রণ্টজেন রশ্মি ও রেডিয়াম—এ সকলই কত কোটি লোকের জীবনরক্ষা যে করিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

বিজ্ঞানের নিত্য নব নব উদ্ভাবনে সৃষ্টি থাকিবে, না ধ্বংস হইবে—পৃথিবীতে সুখ রহিবে কি দুঃখের ও ধ্বংসের সূচনা হইবে, এ বিষয়ে পৃথিবীর বহু পণ্ডিতের মনে আজ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কার ও উদ্ভাবন মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা লক্ষ্য করিয়াই আজ এই সংশয়ের সৃষ্টি।

বিজ্ঞান একদিকে যেমন মানব-সভ্যতার বিকাশে সহায়তা করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি বর্তমান যুগে সভ্যতার বিনাশেও ইহা সাহায্য করিয়াছে। সেইজন্য বিজ্ঞানকে বলা হইয়াছে 'Handmaid of War'। কথাটি যে কিরূপ

রূঢ় সত্য, তাহা বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের পর বোধ হয় অস্বীকার করা অসম্ভব। নাইট্রোগ্লিসারিন, মাইন, বিষবাষ্প, ব্যাটারি, নৌ-বহর, বোমারু বিমান, হাউ-উইট্‌জার প্রভৃতি এবং সর্বোপরি আণবিক বোমা (Atom Bomb) বিশ্বে ধ্বংসলীলার যে কি বিরাট্‌ বিকট রূপ প্রকটিত করিয়াছিল, তাহা কাহারও আর অজানা নাই। বিজ্ঞানের বলে মানুষ যেমন সভ্য হইয়াছে, আবার তেমনি ইহার ভীষণ সর্বধ্বংসী রূপে মানুষ আজ ভীত, স্তম্ভিত ও বিমূঢ়। শান্তিকামী মানুষ বিজ্ঞানের ধ্বংসকারী রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া আজ ভাবিতেছে—বিজ্ঞান বুঝি বা বিধাতার আশীর্বাদ নহে, ইহা বিধাতার অভিশাপ!

কিন্তু সত্যই কি বিজ্ঞান বিধাতার অভিশাপ? সত্যই কি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস করা? একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিব যে, বাস্তবিকপক্ষে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মানবসেবা—মানব-সভ্যতার ধ্বংস-সাধন বিজ্ঞানের ব্রত নহে। অগ্নি বিনা আমাদের সভ্যসমাজের গৃহকর্ম অচল—ইহাই মানব-সভ্যতার আদি পত্তন করিয়াছিল। আবার সেই অগ্নি নিমেষে সব ভস্মীভূত করে। নোবেলের ডিনামাইট্‌ পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া রেলপথ প্রভৃতি নির্মাণের পথকে সুগম করিয়া দেয়; আবার ইহাই সমৃদ্ধ জনপদকে মুহূর্তে মরুভূমিতে পরিণত করে। যে ফায়ার-এঞ্জিনের জল অনল নির্বাপিত করিয়া মানুষকে রক্ষা করিতে সমর্থ, তাহাই পেট্রোলিয়াম ভর্তি হইয়া সৈন্য-শিবির ও মানবজাতিকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া নিঃশেষ করিতে সমর্থ। যে এরোপ্লেন তিনদিনের পথ তিন ঘণ্টায় অতিক্রান্ত হয়, সেই এরোপ্লেনকেই বোমারু বিমানে পরিণত করা যাইতে পারে।

কি কাজে আগুন বা ডিনামাইট্‌, ফায়ার-এঞ্জিন বা এরোপ্লেন ব্যবহৃত হইবে, তাহা নিরূপণ করিবে সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক ধর্মবুদ্ধি। মানুষ যদি বুদ্ধির দোষে ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তবে তাহার জন্য বিজ্ঞানকে অপরাধী করা চলে না। মানুষকে নীতিজ্ঞান শিখাইবার ভার বিজ্ঞানের নহে। সুতরাং অগ্নি, ডিনামাইট্‌, এরোপ্লেন আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানকে গাল দিলে চলিবে না। মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইলে, বিজ্ঞানের বলে মানুষ যে-শক্তির অধিকারী হইয়াছে, তাহার সহায়তায় মানব-সভ্যতার অমৃতরূপ একদিন না একদিন ফুটিয়া উঠিবেই।

শিক্ষাবিস্তারে চলচ্চিত্র

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে একাধারে আনন্দ ও শিক্ষাদানের সম্ভাব্যতা - নিত্যপ্রসারণশীল জ্ঞানরাজ্য ও চলচ্চিত্র—চলচ্চিত্রের শিক্ষা স্থায়ী ও অধিকতর কার্যকরী—চলচ্চিত্র প্রত্যক্ষ শিক্ষার বাহন—চলচ্চিত্র মানুষকে উন্নত করার ও মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করার সহায়ক।

সভ্যদেশমাত্রেরই মধ্যে চলচ্চিত্র শিক্ষাবিস্তারের কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। পূর্বে আমাদের যাত্রা-কথকতা-পাঁচালি প্রভৃতির মধ্য দিয়া অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যেমন শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা ছিল, বর্তমানে চলচ্চিত্রের সাহায্যে সেই কাজ সম্পন্ন হইতেছে। লোকসাহিত্য যেমন একাধারে জনসাধারণের হিতসাধন ও অবসররঞ্জনের কাজ করিত, আজ চলচ্চিত্র ঠিক সেইরূপ কাজ করিতেছে। ইহা একদিকে মানুষকে আনন্দ দান করে, অন্যদিকে পৃথিবীর নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা, ইতিহাসের কথা, পুরাণের কথা, বিভিন্ন সমাজের কথা, ভৌগোলিক আবিষ্কার ইত্যাদির কথা আমাদিগকে জানায়। তাই লোকশিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন চলচ্চিত্র। অশিক্ষিত নিরক্ষর জনসাধারণের ভিতরে শিক্ষাদানের কার্য চলচ্চিত্রের সাহায্যে যত সহজে এবং যত শীঘ্র সুসম্পন্ন হইতে পারে, তেমন আর কিছুরই দ্বারা সম্ভবপর নহে। ইহা মানুষকে বহির্জগৎ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলে, নিজের এবং পরের দেশের সমাজব্যবস্থা, রীতি-নীতি, জীবনযাপনের আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেয়।

পৃথিবীতে জ্ঞানের পরিধি নিরন্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সেই জ্ঞানরাজ্যের সহিত সংযোগরক্ষার অন্যতম বাহন চলচ্চিত্র। দেশবিদেশের নানা দৃশ্য, নূতন আবিষ্কৃত দেশের চিত্র, ভিন্ন ভিন্ন জাতির আচারব্যবহার, পৃথিবীর নানা দেশের কলকারখানার কার্যপ্রণালী—সমস্তই চলচ্চিত্রের সাহায্যে সর্বসাধারণের গোচরীভূত হইতে পারে। কেমন করিয়া চাষ-আবাদের উন্নতি করা যাইতে পারে, কেমন করিয়া দেশীয় কুটীরশিল্পের উন্নতি হইতে পারে, এইরূপ বহু

জ্ঞাতব্য বিষয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের নূতন নূতন কৃষি শিল্প বাণিজ্য পরিকল্পনার কথা চলচ্চিত্রের সহায়তায় অতি সহজেই সাধারণ্যে প্রচারিত হইতে পারে।

শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। মানুষ চিরদিনই অন্যের অভিজ্ঞতার সহিত নিজের চিন্তা-ভাবনার সমন্বয়সাধন করিয়া উন্নতির পথে চলিবার সাধনা করিয়াছে। কিন্তু এই শিক্ষা ও অন্যের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যদি আনন্দের সহিত বিজড়িত হইয়া মনোমধ্যে গৃহীত হয়, তবে তাহার স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা অনেক বেশি হইয়া থাকে। চলচ্চিত্র এ দিক দিয়া বিশেষ উপযোগী। ইহা একদিকে ইতিহাস, পুরাণ, ভূগোলের কাহিনী পর্দার উপর ফুটাইয়া তোলে, অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে উহা আনন্দের আবরণে পরিবেশিত হয়। তাই চলচ্চিত্রের শিক্ষা স্থায়ী, মানবমন হইতে সে শিক্ষার প্রভাব সহজে মুছিয়া যায় না। মনের গভীরে ঐরূপ শিক্ষা উহার গূঢ় গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া মানবমনকে অতি সহজেই জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। সে আলোক কখনও ম্লানতা প্রাপ্ত হয় না।

পুঁথিগত শিক্ষা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ শিক্ষার প্রভাব মানুষের মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের অধিকতর সহায়ক—একথা সকল দেশের শিক্ষাবিদ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। চলচ্চিত্র প্রত্যক্ষ শিক্ষার বাহন—চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়া আমরা ঐতিহাসিক কাহিনীর, মহৎ জীবনের, ভৌগোলিক আবিষ্কার-কথার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মানবমনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়।

পাঠ্যপুস্তকে আমরা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কথা পড়ি, এস্কিমোদের জীবনযাত্রার কথা পড়ি। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কথা পড়িয়া কল্পনায় উহার খানিকটা ধারণা আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে করি বটে। কিন্তু কল্পনা যখন আর চলে না, তখন ঐ অস্পষ্ট ধারণাই মনের মধ্যে পোষণ করিতে থাকি। কিন্তু যখন পর্দার উপরে Last Days of Pompeii উপন্যাসের ছবি দেখি, কিংবা কেবল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রদর্শন করিবার জন্য বিশেষভাবে গৃহীত কোন ছবি যখন পর্দার উপরে প্রত্যক্ষ করি, তখন আমরা দৃশ্যটি

যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই। কল্পনার পরিবর্তে বাস্তবের চিত্ররূপ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই,—ঈশ্বরের অনন্ত কীর্তির একটি ভীষণসুন্দর নিদর্শন দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাই,—লক্ষযোজন দূরের তারকার মধ্যে, কিংবা দূরদুর্গম মরু-মেরুদেশে কি আছে তাহার সংবাদও চলচ্চিত্র আমাদিগকে দিতে সমর্থ। পৃথিবীর উত্তরপ্রান্তের বিরাট্ ভূভাগ গ্রীনল্যাণ্ড। সে অঞ্চল বড় দুর্গম, চিরতুষারাচ্ছন্ন,—ভোরবেলাকার ফোটা জুঁইফুলের মত সাদা সেই যে ভূভাগ, তাহার পরিচয় পাইতে কত জাতির, কত বীরের যে জীবনসমাধি সেখানে হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু চলচ্চিত্র সেই দেশের চিত্র আমাদিগের গোচর করিয়াছে। সেদেশের অধিবাসী এস্কিমোদের জীবনযাত্রা-প্রণালীও চলচ্চিত্রের সহায়তায় আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হইয়াছে। কি করিয়া তাহারা ভেলায় চড়িয়া সীলমাছ ধরে, কেমন করিয়া মেরুদেশের এস্কিমোরা কুকুরের দল লইয়া শ্বেতভল্লুক শিকার করে—জগতের প্রত্যন্তদেশের এসকল রহস্য চলচ্চিত্রের কল্যাণে আজ আমাদের জানিতে বাকি নাই। অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকার সংবাদ, জল-স্থল-অন্তরীক্ষের গূঢ় গোপন সংবাদ আজ চলচ্চিত্রের সহায়তায় আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হইয়াছে। নান্‌সেন, পীয়ারী, স্কট্, এমাণ্ড্‌সেনের মেরু-আবিষ্কারের চিত্র আমরা দেখিয়াছি। দেখিয়াছি অজানা পৃথিবীটাকে জানার মুঠার মধ্যে আনিবার জন্য মানুষ কী অসীম সাধনাই না করিয়াছে! যীশু, বিবেকানন্দ, বুদ্ধের জীবনী, সীজার ক্লিওপেট্রার কাহিনী, সবই চলচ্চিত্রে আজ রূপ পাইয়াছে। মৌন অতীত চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়া কথা কহিয়া উঠিয়াছে, অজানা অপ্রত্যক্ষ দৃশ্য ও ঘটনাবলীকে জানার গণ্ডির মধ্যে আনিয়াছে চলচ্চিত্র।

মানুষকে একটা উদার উন্নত মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতেও চলচ্চিত্র কম সহায়তা করে নাই। উৎকৃষ্ট কোন উপন্যাসের চিত্ররূপ দেখিয়া ন্যায়-অন্যায়বোধ জন্মায়, উপন্যাসের চরিত্রের স্খলন-পতন-ত্রুটি দেখিয়া আমরা সচেতন হইতে পারি,—জীবনে ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গল-আলোক-দীপ্ত পথে আমরা পা বাড়াইতে পারি।

মানবকল্যাণে আণবিক শক্তি

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ সূচনা—পরমাণুর রহস্য আবিষ্কার ও মানুষের অমিত শক্তি লাভ—আধুনিক যুগকে আণবিক যুগ বলার সার্থকতা—পরমাণু কি ?—পরমাণুর শক্তি কিসে ?—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আণবিক শক্তিকে ধ্বংসের জন্য ব্যবহার—আণবিক শক্তির ধ্বংসলীলা—আণবিক শক্তির মঙ্গলকারী ক্ষমতা—চিকিৎসা শাস্ত্রে, কৃষিকার্যে, শিল্পে অভূতপূর্ব সুফল প্রসব করিবে—আণবিক শক্তি মানুষের শুভ অথবা অশুভের জন্য ব্যবহৃত হইবে তাহা নির্ভর করিতেছে মানুষের শুভবুদ্ধির উপর।

আদিম মানুষ যেদিন প্রথম আগুনের উদ্‌ভাবন করিয়াছিল, সেদিন সে এক মহাশক্তির অধিকারী হইয়াছিল। ঐ শক্তিবলেই সে অতিক্রম করিয়াছিল সভ্যতার প্রথম তোরণ-দ্বার। তারপর সভ্যতার পথে যতই সে অগ্রসর হইয়াছে, ততই প্রকৃতির উপর ক্রমান্বয়ে জয়ী হইয়াছে, উন্মুক্ত করিয়াছে তাহার রহস্যের বিচিত্র আবরণ। এইরূপে গত শতাব্দীতে সে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল বিদ্যুৎ-বাষ্পের যুগে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মানুষ সে-যুগও অতিক্রম করিয়াছে। বিশ্বশক্তির মূলাধার পরমাণুর নানা রহস্য আবিষ্কার করিয়া মানুষ আজ অমিত শক্তির অধিকারী হইয়াছে, আজ তাহার সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে ঐ এক শক্তি—পরমাণু-শক্তি,—যাহাকে আমরা সাধারণভাবে আণবিক শক্তি বলিয়াই জানি। মানুষের ইতিহাসের আধুনিক যুগকে আমরা তাই আখ্যা দিতে পারি—আণবিক যুগ।

পরমাণু কি ? পদার্থ মাত্রই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র কণার মধ্যেই পদার্থের গুণ বর্তমান থাকে। ঐ কণাগুলি এত সূক্ষ্ম যে, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও উহাদিগকে দেখা যায় না। এতদিন আমাদের ধারণা ছিল যে, অণু বা Molecule-ই পদার্থের ক্ষুদ্রতম উপাদান। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে অণুও বিভাজ্য ; এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণুই পরমাণু বা Atom। পরমাণুর ভিতরকার বাঁধন আল্‌গা। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া বাহির করিয়াছেন যে, যদি কোনো পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থ বা নিউক্লিয়াসকে ভাঙিয়া ফেলা যায়, তবে উহা হইতে প্রচণ্ড

মাত্রায় শক্তি নির্গত হয়। পরমাণুর কেন্দ্রীয় ভাগের এই ভাঙনকে বলা হয় 'ফিসন' (fission)। 'ফিসন' পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছেন—ইউরেনিয়ম 'ফিসনে'র সময় সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়।

এতকাল বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণুর শক্তির বিচিত্র লীলার পরীক্ষা-নিরীক্ষাই করিতেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সেই শক্তিকেই ব্যবহার করিল মারাত্মক মারণাস্ত্ররূপে। মানুষের জিঘাংসা-প্রবৃত্তি যখন আর টর্পেডো, মাইন, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন, 'ভি-ওয়ান', 'ভি-টু'তে চরিতার্থ হইল না তখন তাহার দৃষ্টি পড়িল পরমাণু শক্তির উপর। ঘৃণ্য রাজনীতির নিকট বিজ্ঞানীরা করিলেন আত্মবিক্রয়, বিসর্জন দিলেন মহান মানব-ধর্ম। ইউরেনিয়ম-ফিসনের প্রচণ্ড শক্তিকে তাঁহারা বোমার মধ্যে ব্যবহার করিবার উদগ্র চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন। ইউরেনিয়ম, বেরিলিয়ম ও প্যারাফিন এই ত্র্যহস্পর্শযোগে তৈয়ারী হইল মহামারণায়ুধ—আণবিক বোমা। ১৯৪৫ সালের ৫ই আগস্ট মিত্রশক্তি জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর একটি একটি করিয়া মোট দুইটি আণবিক বোমা নিক্ষেপ করিল। একটি বিস্ফোরণেই হিরোশিমার প্রায় আড়াই লক্ষ লোক হতাহত হইল। বোমা যেস্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার চারিদিকে নয় মাইল পর্যন্ত স্থানের ঘরবাড়ী অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তাহা ছাড়া, বহুদূর পর্যন্ত বোমার উত্তাপ-তরঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় আণবিক বোমার বিস্ফোরণ কি সাংঘাতিক!

কিন্তু এই আণবিক-শক্তি কেবল প্রাণনাশই করে না, উহার মঙ্গলকর ক্ষমতাও অসীম। ইহা যেমন জনপদভূমিকে শ্মশান করিতে পারে, তেমনি উহাকে শস্যশালিনী করিয়া সমৃদ্ধও করিতে পারে। উহা যেমন ঘরবাড়ী ধ্বংস করিতে পারে, তেমনি আলোকে-উত্তাপে ঘরবাড়ীকে উপভোগ্যও করিয়া তুলিতে পারে। উহা যেমন মানুষের প্রাণহরণ করিতে পারে, তাহাকে অকর্মণ্য করিতে পারে, তেমনি রোগহর ঔষধরূপে মানুষকে নবশক্তিতে সঞ্জীবিতও করিয়া তুলিতে পারে।

ইতিমধ্যেই আণবশক্তি দ্বারা আশ্চর্য রোগনিবারক ঔষধ প্রস্তুত সম্ভবপর হইয়াছে। রেডিও আইসোটোপ্‌স্ (Radioisotopes) আবিষ্কার ডাক্তারদে

নিকট এক অপূর্ব আশার বাণী শুনাইয়াছে। রোগনিবারণে ও ডাক্তারী গবেষণায় উহা প্রভূত সহায় হইয়াছে। আশা করা যায় শীঘ্রই এমন দিন আসিবে, যেদিন মা তাঁহার রুগ্‌ণ পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া আশাহীনভাবে ক্রন্দন করিবেন না; দেশের যুবশক্তি অকালে মৃত্যুর কোলে ঝরিয়া পড়িবে না।

কৃষিকর্মেরও ইহা এক বিস্ময়কর শক্তিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, আণব শক্তির ব্যবহারে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা ভূমির উর্বরতা শক্তিকে বর্ধিত করে, কীটক্ষয়ের কবল হইতে শস্যকে রক্ষা করে। কেবল তাহাই নয়, উহা দ্বারা নদীর গতিপথ পরিবর্তিত করিয়া মরুভূমিকেও শস্য-শ্যামল করিয়া তোলা যায়, পার্বত্য প্রদেশের রুক্ষতার অবসান করিয়া সেখানে শস্য উৎপাদন করা চলে। ভবিষ্যতে হয়তো এই আণবিক শক্তিই মানুষের সম্মুখে প্রয়োজনাতীত অফুরন্ত শস্যভাণ্ডার তুলিয়া ধরিয়া পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য ক্ষুধার তাড়না ও দুর্ভিক্ষের হাহাকারের অবসান করিবে।

শিল্প-ক্ষেত্রেও আণবিক শক্তি কোনোক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। ইহা দ্বারা শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন ত্বরান্বিততর হয়; ফলে সাধারণ মানুষের নিকটে বহু জিনিস সুলভমূল্য হইয়া উঠে। যে-জ্বালানি পৃথিবীতে আজ একটা বিরাট্ সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে, আণব শক্তি দ্বারা বহুলাংশে তাহার নিরসন হইতে পারে।

কিন্তু আজ জাতিতে জাতিতে যেভাবে হানাহানি চলিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদের যে জঘন্যতম লালসা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে মারণাস্ত্রের যে-নিন্দার্হ প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে, তাহাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। একজনে যদি দেখায় অ্যাটম্-বোমা, আর-একজন উঁচাইয়া আসে হাইড্রোজেন বোমা। আণবিক যুগের মানুষ আণবিক শক্তি দ্বারাই পরস্পর পরস্পরকে নিধন করিতে চাহিতেছে। যে-শক্তি তাহারা নিয়োজিত করিতে পারে মানবের কল্যাণে, তাহাকে নিয়োজিত করিতে চাহিতেছে নরমেধ-যজ্ঞে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, "বিশ্বের রাজনৈতিক নেতারা এখনও এই বিষয়ে সচেতন হন নাই যে, আণবিক অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধ না হইলে, বিগত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সযত্নে যে মানবসভ্যতা

গড়িয়া তোলা হইয়াছে তাহা বিশ্ব হইতে মুছিয়া যাইবে এবং পুনরায় প্রস্তরযুগ হইতে মানবসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।" আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বলিয়াছেন, "আমার ১৯০৫ সালের গবেষণার ফলেই আণবিক শক্তি আবিষ্কারের ভিত্তিভূমি নির্ধারিত হইয়াছিল। বিজ্ঞানের এমন অপব্যবহার হইবে জানিলে আমি বৈজ্ঞানিক না হইয়া প্লাম্বারেরই বৃত্তি লইতাম।" প্রসঙ্গত স্মরণীয় এই যে, চিরকাল শান্তির আকাঙ্ক্ষী ভারত আজও কোনরূপ হানাহানিতে যোগ না দিয়া নিরপেক্ষভাবেই আণবিক মরণাস্ত্রনিরোধ ও বিশ্বশান্তির প্রয়াসে আন্তরিক চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু উহাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিরোধ হইবে কি না, এখনও সন্দেহের বিষয়। কারণ যুদ্ধবাজ জাতিগুলি মৌখিক শান্তির আবরণতলে মারণাস্ত্র শাণ দিয়াই চলিয়াছে। আণবিক যুগে মানুষের নিকট আজ তাই এই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, অগ্নি দ্বারা রন্ধন করিয়া সে প্রাণধারণোপযোগী অন্ন প্রস্তুত করিবে, না উহার প্রলয়-শিখায় বিশ্বসংসারকে ভস্মীভূত করিবে; দুঃখের সাধনা দ্বারা যে-বর সে লাভ করিয়াছে তাহা জনকল্যাণে নিয়োগ করিবে, না মানব-নিধন যজ্ঞে প্রয়োগ করিবে? কাহার উপাসনা করিবে সে,—সৃষ্টির, না ধ্বংসের; অমৃতের, না নিষ্প্রাণ কঙ্কালের; শিবের, না শবের?

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

প্রবন্ধ-সংকেত: সূচনা—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও মানব-সভ্যতার অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ—ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ—বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কারসমূহ—প্রথম স্পুটনিক—উহার বিবরণ ও উহা নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্য—দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্পুটনিক্—উহাদের বিবরণ—আমেরিকার স্পুটনিক্—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'লুনিক্'—এগুলি নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্য—স্পুট্‌নিক্, লুনিক্ ও মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ।

যে বিরাট্ বিশ্বপ্রকৃতির বহু রহস্য আমাদের নিকট অজ্ঞাত, সেই সকল রহস্য উদ্ঘাটন করিতে করিতে মানব-সভ্যতা আগাইয়া চলিয়াছে। সেই প্রগতির পথে আবিষ্কৃত হইয়াছে বহু বিষয় ও বহু বস্তু। অগ্নির দাহিকা-শক্তি

হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত মানুষের সন্ধানী মন কত কিছুবই না আবিষ্কার করিল! কিন্তু গত দুই শত বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানী মানুষ যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, সমগ্র মানব-সভ্যতার বয়সের পরিমাপে তাহার দ্রুতি পরম আশ্চর্যের বিষয়। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ওআট্‌স্ আবিষ্কার করিয়াছিলেন বাষ্পীয় এঞ্জিন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে উহা এক বিশিষ্ট অধ্যায়। অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রধানতঃ আবিষ্কৃত হইয়াছে গ্যাসের আলো (মার্ডক—১৭৭৯), বেলুন (মঁগলফির—১৭৮৩), বেলগাড়ির এঞ্জিন (ষ্টিভেন্‌শন—১৮১৪), ডায়নেমো (ফ্যারাডে—১৮৩১), টেলিগ্রাফ (মর্স—১৮৩৫), ফোটোগ্রাফি (লুইড্‌গার—১৮৩৯), বার্ণার (বুনসেন—১৮৫৫), ডিনামাইট (নোবেল—১৮৬৭), টেলিফোন (গ্রেহাম বেল—১৮৭৬), ফোনোগ্রাফ (এডিসন—১৮৭৭), ইলেকট্রিক আলো (এডিসন—১৮৭৯), চলচ্চিত্র (এডিসন—১৮৭৭), বৈদ্যুতিক তরঙ্গ (হার্তজ—১৮৮৮), এক্স-রে (রণ্টজেন—১৮৯৫), বেতার (মার্কনি—১৮৯৬) ও রেডিঅম (কুরি-দম্পতি—১৮৯৮)।

বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কারসমূহ অধিকতর আশ্চর্যজনক, দ্রুতির হিসাবেও বিস্ময়কর। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হইল—এরোপ্লেন (রাইট ভ্রাতৃদ্বয়—১৯০৩), আপেক্ষিক তত্ত্ব (আইনস্টাইন—১৯০৫), হেলিকপ্‌টর ব্রেগেট—১৯০৯), পরিমাণবিক তত্ত্ব (রাদারফোর্ড—১৯১১), ইলেকট্রন তত্ত্ব (বর্—১৯১৩), টেলিভিশন (বেআর্ড—১৯২৫), অণু চূর্ণীকরণ (কার্সি—১৯৩৪), ইউরেনিঅম ভঙ্গ (হান—১৯৩৮) প্রভৃতি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কারই ছিল বর্তমান শতাব্দীর আবিষ্কার-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। কিন্তু অতি-সম্প্রতি সমাজতান্ত্রিক দেশ সোবিয়েত রাশিয়ার 'স্পুট্‌নিক্' ও 'লুনিক্' আবিষ্কার বিজ্ঞানী মানুষের সকল আবিষ্কারকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। উপকথা ও পুরাণ-গাথার কল্পনা আজ বাস্তবে রূপায়িত হইতে চলিয়াছে, পৃথিবীর মহাকর্ষকে অতিক্রম করিয়া মানুষ আজ মহাকাশ-বিচরণের পথে পা বাড়াইয়াছে। 'স্পুটনিক্' ও 'লুনিক্' অপরাজেয় মানবাত্মার সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছে 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার'!

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখটি মানবেতিহাসের এক চিরস্মরণীয় দিন। ঐ দিনটিতে সোভিয়েত ইউনিঅন হইতে সর্বপ্রথম একটি কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশপথে নিক্ষিপ্ত হয়। উহাই প্রথম স্পুটনিক্—এই রুশীয় শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হইল "পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী কৃত্রিম সহযাত্রী"। কেহ কেহ উহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'বেবি মুন' বা 'শিশু-চাঁদ'। এই কৃত্রিম গ্রহটির ওজন ছিল ১৮৪·৩ পাউণ্ড এবং ব্যাসার্ধ ২৩ ইঞ্চি। ঐদিন উহা ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৯০০ মাইল হইতে ৩০০ মাইল পর্যন্ত উর্ধ্বে সমগ্র পৃথিবীকে, চাঁদেরই মতো, প্রদক্ষিণ করিতে শুরু করে। উহার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় আঠার হাজার মাইল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে আসল চাঁদের যত সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে মানুষের গড়া এই শিশু চাঁদটি প্রায় পনের বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে। স্পুটনিক্টি দেখিতে ছিল ঠিক ফুটবলের মতো। উহার বহিরাবরণ স্বচ্ছ অ্যালুমিনিঅম ধাতুর অ্যালয় দ্বারা নির্মিত। ভিতরে ছিল নানারূপ স্বতঃক্রিয় যন্ত্রপাতি। তিনটি আণবিক শক্তি-সমন্বিত রকেট-বাহিত এই স্পুটনিক্টিকে প্রথম দুইটি রকেট মহাশূন্যে উর্ধ্ব হইতে আরও উর্ধ্বে লইয়া যায় এবং তৃতীয় রকেটটি উহাকে দান করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার গতিশক্তি। স্পুটনিক্টির মধ্যবর্তী যন্ত্রপাতি এমনভাবে সংলগ্ন ছিল, যাহাতে বায়ুমণ্ডলের চাপে উহা হইতে এক প্রকার 'পিপ্ পিপ্' শব্দ নির্গত হয় এবং বেতারযন্ত্র মারফৎ ঐ শব্দ পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে। পৃথিবীর বহু বৈজ্ঞানিক ঐ শব্দ শুনিয়াছেন। পৃথিবী হইতে গ্রহান্তরে বা উপগ্রহান্তরে যাতায়াত করিতে হইলে পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলের বিস্তৃতি, মহাকাশে বিদ্যমান পদার্থ এবং সেখানে পৃথিবীর প্রাণীর বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে কি কি উপাদান আবশ্যক—এই সকল বিষয় জানিবার উদ্দেশ্যেই প্রথম স্পুটনিক্টি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

সোবিয়েত ইউনিঅন হইতেই দ্বিতীয় স্পুটনিক্ নিক্ষিপ্ত হয় ১৯৫৭ সালের ৩রা নভেম্বর। প্রথম স্পুটনিক্টি ধ্বংস হইয়া যাইবার পূর্বেই উহা নিক্ষিপ্ত হয়। উহার ওজন ছিল ৫০৮ কিলোগ্রাম। মহাশূন্যে জীবন্ত প্রাণী বাঁচিয়া থাকিতে

পারে কি না এবং বাঁচিলেও কতদিন পর্যন্ত উহার আয়ু, তাহা জানিবার ও পরীক্ষা করিবার জন্য উহার মধ্যে 'লাইকা' নামক একটি কুকুরকেও রাখিয়া দেওয়া হয়। কয়েকদিন সুস্থ অবস্থায় জীবিত থাকিবার পর 'লাইকা' অবশ্য শূন্যপথেই মৃত্যুবরণ করে। তথাপি মহাকাশ-বিজয়ের ইতিহাসে 'লাইকা' অমর হইয়া থাকিবে।

তৃতীয় স্পুটনিক্ও নিক্ষিপ্ত হয় সোবিয়েত ইউনিঅন হইতেই। উহার তারিখ ১৯৫৮ সালের ১৫ই মে। এই স্পুট্নিক্টির ওজন ছিল ১৩২৭ কিলোগ্রাম এবং ঐটিই ছিল বৃহত্তম স্পুট্নিক্।

আমেরিকা হইতেও তিনটি স্পুট্নিক্ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু উহারা যেমন রুশীয় স্পুট্নিক্ হইতে আকারে ছোট ও ওজনে হালকা, তেমনি কৃত-কার্যতার দিক হইতেও নগণ্য।

স্পুট্নিকের পরবর্তী পদক্ষেপ আরও রোমাঞ্চকর। উহাকে আমরা 'লুনিক্'-অধ্যায় আখ্যা দিতে পারি। 'লুনিকে'র রুশীয় নাম 'মেছতা'। 'মেছতা'-র অর্থ স্বপ্ন, অর্থাৎ মানুষের মহাকাশ ভ্রমণের স্বপ্ন। চন্দ্রলোকাভি-মুখী প্রথম 'লুনিক্' নিক্ষিপ্ত হয় ১৯৫৯ সালের ২রা জানুআরি। উহা চাঁদের নিকটবর্তী এলাকা দিয়া গিয়া সূর্যের কৃত্রিম গ্রহ হইয়া আছে। সূর্যকে এক-একবার প্রদক্ষিণ করিতে উহার ৪৫০ দিন লাগে। পৃথিবী এবং মঙ্গল গ্রহের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভ্রাম্যমান এই লুনিক্টির অভ্যন্তরস্থ স্বতঃক্রিয় যন্ত্র-পাতির সাহায্যে মানুষের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলির তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে—মহাজাগতিক রশ্মিতে আলোকণার (photons) পরিমাণ, তাহার তেজোবিকিরণে ভারী নিউক্লিয়াসের বিন্যাস, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাহিরে সূর্যের কণিকাপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য, মহাশূন্যে উল্কাপিণ্ডের চরিত্র ও পরিমাণ।

কিন্তু অদ্যাবধি বিজ্ঞান-জগতের চরম বিস্ময় হইল দ্বিতীয় লুনিক্ বা চন্দ্রগামী রকেট। ঐ লুনিক্টি নিক্ষিপ্ত হয় ১৯৫৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর। রকেটটির বৈজ্ঞানিক ও পরিমাপক যন্ত্রপাতি এবং শক্তির উৎস ও আধারসমেত ওজন হইল ৩৯০.২ কিলোগ্রাম বা প্রায় ৮৬০ পাউণ্ড। ঐ মহাজাগতিক রকেটটি ১৪ই

সেপ্টেম্বর রাত্রি ২-৩২ মিনিটে চন্দ্রে পৌঁছায়। ঐ রকেটের সঙ্গে সোবিয়েত ইউনিঅনের প্রতীকচিহ্নযুক্ত একটি ফলকও ছিল, উহাতে ক্ষোদিত ছিল—"সম্মিলিত সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, সেপ্টেম্বর—১৯৫৯"। ফলকটি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তজ্জন্য বিশেষ পদার্থ দ্বারা উহা নির্মিত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মহাশূন্য-যাত্রী সোবিয়েত রকেটটির আধারটি চাঁদের পৃষ্ঠে গিয়া পড়িয়াছে। ঐ রকেটটির উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ভার ছিল—পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র, চন্দ্রের চৌম্বক ক্ষেত্র, পৃথিবীর চারিদিকের তেজস্ক্রিয় বলয়, মহাজাগতিক রশ্মিবিকিরণের তীব্রতা, মহাজাগতিক বিকিরণের অন্তর্ভুক্ত ভারী নিউক্লিয়স, আন্তঃগ্রহ পদার্থকণার গ্যাসীয় সংযুতি ও উল্কাকণাসমূহ। লব্ধ তথ্যাদি হইতে জানা গিয়াছে—চাঁদের কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র নাই; চন্দ্রের কাছাকাছি তড়িতাবিষ্ট কণাসমূহের কোনো তেজস্ক্রিয় বলয়ের অস্তিত্ব নাই; চন্দ্রকে ঘিরিয়া পৃথিবীর আয়নমণ্ডলের অনুরূপ একটি আয়নিত গ্যাসীয় কণিকার চাদর রহিয়াছে; আর না-হয় চন্দ্রের চারিদিকে কয়েক শত এনার্জিসম্পন্ন তড়িতাবিষ্ট কণার অধিকতর সমাবেশ ঘটিয়াছে; ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম স্পুট্‌নিক্ নিক্ষেপের ঠিক দুই বৎসর পর—১৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর সকালে সোবিয়েত ইউনিঅন হইতে তৃতীয় লুনিক্ বা 'স্বতঃক্রিয় গ্রহান্তর্বর্তী স্টেশন' ক্ষেপণ করা হইয়াছে। এই স্টেশনটির ওজন ৬১৩ পাউণ্ড। রুশ-বিজ্ঞানীগণ বলিয়াছেন যে, চাঁদে রকেট নামানো অপেক্ষা চন্দ্র প্রদক্ষিণকারী রকেট-ক্ষেপণ এত কঠিন যে, তাহার তুলনা অপরিমেয়। মানুষের চন্দ্র-যাত্রার পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করিবার জন্য ঐরূপ স্টেশন চাঁদে স্থাপন করা প্রয়োজন। মহাজাগতিক প্রমাণবিদ্যায় আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত সোবিয়েত বিজ্ঞানী আরি স্তের্নফেল্‌দ বলিয়াছিলেন, ঐ উপগ্রহে স্থাপিত টেলিভিশন ও অন্যান্য সরঞ্জাম দ্বারা চাঁদের পৃষ্ঠভাগের মানচিত্র-সদৃশ আলোক-চিত্র গ্রহণ করা যাইবে এবং এক মাসের মধ্যে সমগ্র চন্দ্রপৃষ্ঠ জরিপ করা যাইবে। অন্য একজন রুশ-বিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে, মহাজাগতিক গবেষণায় মানুষ এতকাল কেবল পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতেই কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু

রকেটের নিয়ন্ত্রিত সরঞ্জাম দিয়া এইবার মহাজাগতিক দেশ হইতেই মহাবিশ্ব সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ হইল। একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ঐরূপ মহাজাগতিক স্টেশন দিয়া মঙ্গলগ্রহের তথাকথিত 'খাল' ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তথ্যও পাওয়া যাইবে এবং শুক্রগ্রহের যে মেঘাবরণের দরুন পৃথিবীর সমস্ত দূরবীন হার মানিয়াছে সেই রহস্যও ভেদ করা যাইবে। ১৯৫৯ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখে মস্কো হইতে প্রকাশিত একটি সংবাদে প্রকাশ যে,—"চাঁদের যে দিকটি পৃথিবী হইতে দৃষ্টিগোচর নহে, তাহার আলোকচিত্র ইতিমধ্যেই তৃতীয় লুনিক্ হইতে আসিয়া গিয়াছে। তৃতীয় লুনিক্ ইতিমধ্যে চাঁদ প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে ২৮ হাজার মাইলের মধ্যে আসিয়াছিল (একটি পূর্ববর্তী সংবাদে জানা গিয়াছে, তৃতীয় লুনিক্টি যুগপৎ চাঁদ ও পৃথিবী উভয়ের উপগ্রহ হইয়া থাকিবে)। চাঁদে ল্যাবরেটরি স্থাপন করাই হইবে চাঁদ-সংক্রান্ত গবেষণার আশু কর্মসূচীর অন্যতম।"

সোবিয়েত বিজ্ঞানীগণ অতঃপর ক্রমশই অধিকতর আশাবাদী হইয়া উঠিতেছেন। মানুষ যে কী অসীম শক্তিধর, স্পুট্‌নিক্ ও লুনিক্ তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। ১৯৬০ সালের ১১ই ফেব্রুআরি সোবিয়েত প্রধান মন্ত্রী নিকিতা সের্গেইভিচ ক্রুশ্চেভ ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় 'সভা'র সদস্যদের সভায় তাঁহার ঐতিহাসিক ভাষণ প্রসঙ্গে সত্যই বলিয়াছেন, "মানুষ এখন ধীশক্তিবলে এবং প্রযুক্তিবিদ্যাবলে যথার্থই নিঃসীম মহাশূন্যদেশে সবলে নিজেদের পথ করিয়া লইয়াছে। মানুষের কল্পনা যদিও সদাই অগ্রগামী থাকা উচিত, তবু এখন কখনো কখনো মনে হয়—মানুষের কর্মকাণ্ড যেন কল্পনাকেও পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া যায়।" নহিলে পারমাণবিক যুগে বাস করিয়াও কিছুদিন আগে মানুষ কি কল্পনা করিতে পারিয়াছে যে, তাহারই সৃষ্ট কৃত্রিম গ্রহ এত শীঘ্র মহাশূন্যে বিচরণ করিবে? মানুষের এই অন্তরীক্ষ-জয়ের সাফল্য কেবল সোবিয়েত ইউনিয়নের সাফল্য নয়, ইহা সমগ্র মানবজাতিরই জয়। অন্ততঃ ১৯৬০ সালের ফেব্রুআরি মাসে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে মহাজাগতিক রকেটের অনুকৃতি উপহার দিবার সময় ক্রুশ্চেভ এইরূপ মন্তব্যই

করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "শ্রম ও বিজ্ঞানকর্মে রত মানুষ এই বিংশ শতকে কী বিপুল সাফল্য অর্জন করিতে পারে, তাহা ইহা (মহাজাগতিক রকেট) হইতে দেখা যাইতেছে।"

বিংশ শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার শুধু বিজ্ঞানের অগ্রগতির কাহিনী নয়, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে সমগ্র বিশ্বের মানবের জন্য শান্তি-বাণী। স্পুটনিক্ ও লুনিক্ মানব-প্রগতির নব নব আবিষ্কারের আনন্দ-বাণী বহন করিতেছে।

তোমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় লেখক

[**শরৎচন্দ্র**]

প্রবন্ধ সংকেত ঃ যিনি তোমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় লেখক তাঁহার নামোল্লেখ—কেন শরৎচন্দ্র প্রিয় লেখক? কারণ প্রদর্শন—বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনা—শরৎসাহিত্যের বিশেষত্ব—সাহিত্যসৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়।

শরৎচন্দ্র আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় লেখক। পূর্বসূরীদের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াই আমি শরৎচন্দ্রকে প্রিয় লেখকরূপে নির্বাচন করিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র যেন অনেক দূরের মানুষ, তিনি তাঁহার বজ্রগম্ভীর ব্যক্তিত্ব লইয়া সাহিত্যের দরবারেও যেন ডেপুটির আসনে বসিয়া আছেন! আমরা পাঠকমণ্ডলী সেখানে সভয়ে সাক্ষীর মত হাজিরা দিয়া থাকি বটে, কিন্তু তাঁহাকে আমাদের সমপঙ্‌ক্তিতে বসিবার জন্য আমন্ত্রণ করিব এমন সাহস হয় না। আয়েষার জন্য আমরা অশ্রুবিসর্জন করি, শৈবলিনীর প্রতি আমাদের সহানুভূতি কম নহে, কুন্দনন্দিনীকে আমরা কখনো ভুলিতে পারিব না। কিন্তু বঙ্কিম যেরূপ কঠোর ধর্মবোধ এবং নীতিজ্ঞানের দ্বারা তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রসমূহের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করাইয়াছেন, তাহাতে তিনি শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের আত্মার আত্মীয়—প্রিয় হইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাস্বর প্রতিভার দীপ্তি-স্পর্শে মানবমনের সকল কুঠরিই দিনের আলোর মত স্পষ্ট হইয়া উঠিলেও, আমরা সৃষ্টির পিছনে সেই স্রষ্টাকে ভুলিতে পারি না। দৈনন্দিন ঘটনার নানা জটিল চক্রান্ত এবং ঘূর্ণাবর্তে আমাদের জীবন নিরন্তর

পীড়িত হইতেছে, তাহার বাস্তব চিত্র রবীন্দ্রনাথে খুব সুলভ নহে। তাঁহার সাহিত্যে মানুষের মহত্ত্ব, অমরত্ব এবং আশার বাণী আছে বটে, কিন্তু স্খলন-পতনজীর্ণ সাধারণ মানুষের 'পতনঅভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'-র ঘনিষ্ঠ পরিচয় সেখানে মেলে না।

কিন্তু শরৎচন্দ্র একান্তভাবেই আমাদের কাছের মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উৎসবের দিনে আমাদের মাননীয় অতিথির আসন অলংকৃত করেন,—আর শরৎচন্দ্র আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার অংশভাগী। তাঁহার মধ্যে কোন কঠোর স্মার্ত পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পাই নাই। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার সামাজিক ধারণাগুলি আরোপ করিয়া উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টি করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র কোন অমূর্ত ভাবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া চরিত্র গড়েন নাই, দুর্বলতা ও মহত্ত্ব মিশ্রিত রক্তমাংসের নরনারীই তিনি আঁকিয়াছেন। মানবজীবনকে তিনি বৃহত্তর পটভূমিকায় ব্যাপ্ত করিয়া দেখেন নাই বটে, কিন্তু জীবনের অতল গভীরতায় নিমজ্জিত হইয়া অনেক মুক্তা-মানিক আহরণ করিয়া দিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ, গৃহদাহ, দেবদাস প্রভৃতি বাংলার পল্লীজীবনের বাস্তব পরিবেশকে তাহার মালিন্য-ক্লেদসহ যেমনভাবে উপস্থিত করিয়াছে, এমনটি আর কাহারো রচনায় ফুটিয়া উঠে নাই।

সমাজশক্তির সহিত ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্বই মূলত বাংলা উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়; বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে এবং আদর্শে এই দ্বন্দ্বের উদ্ভব এবং পরিণতির গতিপথ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রে ঐ সমাজশক্তি উপন্যাসের চরিত্রের প্রাণসত্তার সহিত একীভূত হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন, সামাজিক পরিবেশে লালিতপালিত ও পরিপুষ্ট ব্যক্তিচরিত্রের মানস-সংস্কারের মধ্যেই সমাজশক্তি তাহার নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছে—বিরোধের কেন্দ্র বাহির হইতে ভিতরে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বাঙালীর একান্নবর্তী জীবনের চিত্রও বোধ করি শরৎচন্দ্রের পূর্বে আর কেহ অমন স্পষ্ট করিয়া অঙ্কন করিতে পারেন নাই। অবশ্য, তাঁহার এই সকল মৌলিক সৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই তাঁহাকে আমার প্রিয় লেখক বলিতেছি না। তাঁহার

সমগ্র সাহিত্যিক জীবনে তিনি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি দিয়া মানুষের দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতাকে দেখিয়াছেন এবং সমবেদনার সহিত নরনারীর চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়াই তিনি আমার প্রিয় লেখক, আত্মার আত্মীয়।

বাংলার লোকসাহিত্য

প্রবন্ধ-সংকেত—সূচনা : লোকসাহিত্যের সংজ্ঞানির্দেশ—বাংলার লোকসাহিত্য : উহার বৈশিষ্ট্য—লোকসাহিত্যের বহুমুখী ধারা—লোকসাহিত্যের রচনাকাল—মেয়েলী ব্রতের ছড়া: লোক-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন—ছেলেভুলানো ছড়া—পল্লীগীতিকা—বাউল গান—যাত্রা ও পাঁচালি—আগমনী ও বিজয়া গান—ডাক ও খনার বচন—কবিওয়ালাদের গান—আধুনিককালে বাংলার লোকসাহিত্যের অবস্থা—উপসংহার।

সকল দেশেই উচ্চকোটির মার্জিতরুচি মানুষের সৃষ্ট সমালোচনাশাস্ত্র-সম্মত সাহিত্যের পাশে পাশেই অমার্জিত এবং অশিক্ষিত অগণিত লোকসাধারণের রচিত সাহিত্যও আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এরূপ সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য জনসাধারণের হিতসাধন ও অবসররঞ্জন। সমালোচকের বিচারে হয়ত ইহারা সাহিত্যের দরবারে প্রবেশের ছাড়পত্র পাইবে না, কিন্তু জনসাধারণের নিভৃত হৃদয়ে ইহারা আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছে। ইহাই লোকসাহিত্য।

বাংলাদেশের সুমহান্ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে ইহার লোকসাহিত্য অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। নাগরিক মানুষ রাজসভার জন্য কাব্যরচনা করিয়াছে—তাহাতে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, পাণ্ডিত্য আছে, বৈদগ্ধ্যের চিত্ত-সম্মোহনী শক্তির প্রকাশ আছে,—তাহাতে ভাব এবং কল্পনা সুসম্বদ্ধ, ছন্দ সুসম্পূর্ণ নিখুঁত। কিন্তু লোকসাহিত্য কোনো নিপুণ শিল্পীর উদ্ভাবিত নহে। তাই উহাদের ভাব মাঝে মাঝে অসংলগ্ন, ছন্দ অসম্পূর্ণ। তবু উহাদের মধ্যে বাঙালীর অনেক দিনের হাসিকান্না মুদ্রিত হইয়া আছে। লোকসাহিত্যে বাংলার মাটির মানুষের হৃদয়বৃত্তি অকুণ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বৈদগ্ধ্যের ঔজ্জ্বল্য ইহার স্বাভাবিক কমনীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। ইহার অসম্বদ্ধ কল্পনায়, নিপুণতা-বিহীন সরস স্বচ্ছন্দ ছন্দের হ্রস্বদীর্ঘ তানে এবং বাঙালীর দৈনন্দিন ব্যথারঞ্জিত চিত্রের মধ্যে বাংলাদেশের পল্লীপ্রকৃতি এবং পল্লীসমাজ একান্তভাবে ধরা দিয়াছে।

ব্রতকথা, পাঁচালি, যাত্রা, পল্লীগীতিকা, ভাটিয়ালি, সারি, জারি, মুর্শিদা, বোলান এবং হরগৌরী-বিষয়ক গানের মধ্য দিয়া বাঙালী লোক-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা অপূর্ব শিল্পরূপ পাইয়াছে। উহাই লোকসাহিত্য।

শিক্ষিত লেখকদের সাহিত্যের একটা জন্মতারিখ আছে। কিন্তু খ্যাতির দুর্গম সৌধশিখরে আরোহণ করিবার বাসনা ছিল না বলিয়াই হোক, বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, এইসকল সাহিত্য-রচকদের রচনাকাল জানিবার কোন উপায় নাই। মাঝে মাঝে যুগবিশেষের প্রতিবিম্ব ইহাতে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এত গৌণ যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পক্ষে তাহা অপ্রতুল। ইহাই স্বাভাবিক। ইহার ভাষায় এবং ভাবে চিরকালের বাঙালী মনের সীলমোহর আঁটা। এই চিরত্বের পরিচয়েই লোকসাহিত্যের উপকরণগুলি বাংলার মা এবং ঠাকুরমাদের মুখে মুখে যুগ হইতে যুগে উত্তরাধিকারসূত্রে চলিয়া আসিতেছে।

লোকসাহিত্যের মধ্যে ছড়াই বোধ করি প্রাচীনতম। ইহাদের মধ্যে আবার ছেলেভুলানো ছড়া অপেক্ষা মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলি প্রাচীনতর। সমাজের অনুশাসন বাঙলার নারীজাতিকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া কাহারও চিত্তকে বন্দী করিয়া রাখা যায় না; যাহার কল্পনাশক্তি আছে, হৃদয়বৃত্তির প্রাচুর্য আছে, তাহার মুক্তিকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তাই বাঙালী মেয়েরা শাস্ত্র-বহির্ভূত দেবদেবীর পূজায় নিজেদেরই কামনা-বাসনাগুলিকে নিঃসংকোচে মেলিয়া ধরিয়াছে এবং স্মার্ত পণ্ডিতের নির্দিষ্ট মন্ত্রের পরিবর্তে সেই কামনাগুলিকে আপন অন্তরের ভাষায় ছন্দে গানে ব্যক্ত করিয়াছে।

ভাদুলি, সেঁজুতি, তুষতুষুলি, পুণ্যিপুকুর, মাঘমণ্ডলব্রত ইত্যাদির ছড়া মেয়েলী ব্রতকথার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহার কোনটিতে সতীনের সর্বনাশ কামনা করা হইয়াছে, কোনটিতে প্রবাসী স্বামীর কল্যাণ যাচ্ঞা করা হইয়াছে। আবার কোনটিতে বা পিতৃকুল এবং স্বামিকুল উভয়ের মঙ্গলকামনা প্রকাশ

পাইয়াছে। সংসারের শ্রী এবং সম্পদের কামনাও অনেক ব্রতের ছড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়ঃ

আমি সতী লীলাবতী
ভাইয়ের বোন পুত্রবতী
হ'য়ে পুত্র ম'রবে না
পৃথিবীতে ধ'রবে না।

প্রকৃতি বর্ণনাতেও অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। বসুধারাব্রতের ছড়ায় আছেঃ

কালবৈশাখী আগুন ঝরে!
কালবৈশাখী রোদে পোড়ে!
গঙ্গা শুকু শুকু আকাশে ছাই!

দরিদ্র রমণী 'পিটালির চিরুনি' দিয়া ব্রতের অধিষ্ঠাত্রীর নিকট 'সোনার চিরুনি' কামনা করিয়াছে, অতিদুঃখে কখনো বা রুদ্ধ অন্তঃপুরিকাজীবনের মর্মবেদনাই অভিব্যক্ত হইয়াছে—

'বসুমাতা দেবী গো করি নমস্কার।
পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার॥'

ব্রতকথার ছড়ায় যেমন জীবনের ব্যবহারিক দিকের পরিচয় আছে, ছেলে-ভুলানো ছড়ায় তেমনি এক অপরূপ স্বপ্নজগতের ছবি প্রকাশ পাইয়াছে। ছড়ার জগৎ বাস্তব জগতের প্রতিরূপ নয়, অথচ পুরাপুরি রূপকথার কল্পনা-সর্বস্বতা হইতেও ইহা সম্পূর্ণ পৃথক। মনে রাখিতে হইবে, ছেলেভুলানো ছড়ার জগতের নাগরিক নিত্যস্বপ্নদর্শী বালকবালিকাগণ। সেখানে মাত্র একজন পরিণত-বয়স্কের প্রবেশাধিকার আছে—তিনি স্বয়ং বক্তা।

বাল্যপ্রকৃতিতে মন নামক দুর্ধর্ষ পদার্থটির প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ বলিয়াই এই সকল ছড়ায় চরিত্র-বিশ্লেষণ অপেক্ষা চিত্র-বিরচনই প্রধান। ছড়ায় চিত্রের পর চিত্র আছে, কিন্তু কোনো চিত্রই স্থায়ী নহে, পূর্ণাবয়ব নহে, চকিতে উদিত হইয়াই চকিতে পট-পরিবর্তন হয়। ছড়ার এই ত্বরিত-অঙ্কিত ছবিগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—'এই ছবিগুলি একটি-রেখা একটি-কথার ছবি।

দেশলাই যেমন এক আঁচড়ে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, বালকের চিত্তে তেমনি একটা কথার টানে একটি সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হয়।' কোনও এক যমুনাবতী সরস্বতীর বিবাহের প্রসঙ্গ পাড়িয়া তারপর একে একে কাজিফুলের মালা, হাত-ঝুমঝুম পা-ঝুমঝুম সীতারামের খেলা,—তাহার কাঁকাল-বাঁকানো নাচ, বক্তার আলোচাল খাইয়া গলা কাঠ হওয়া এবং ত্রিপূর্ণির ঘাটে মাছ ভাসিয়া ওঠার কথা ছড়ায় আসিয়া পড়িল! অবশেষে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিটি কেন যে ত্রিপূর্ণির ঘাটে জল পান না করিয়া মৎস্যচোর গুরুঠাকুরের দুইবোনকে হঠাৎ বিবাহ করিয়া বসিলেন তাহা বোঝা যায় না। ছড়ায় সব জিনিস বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে পদে পদে ঠকিতে হইবে, রসগ্রহণ সম্ভব হইবে না। শিশুরা স্বপ্নজগতের বাসিন্দা বলিয়াই এই ছড়া-রচয়িতৃগণ অনায়াসেই শিশুর মনকে অধিকার করিয়া বসেন, মনস্তত্ত্ববিদ্গণের অনুমোদিত পথে কোনদিন এমনটি সম্ভব হইতে পারিত না।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত পল্লীগীতিকাগুলিও লোকসাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। ইহাদের মধ্যে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' সবাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বহুতর গল্পের মধ্যে মধুমালা, কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা, মালঞ্চমালা এবং পুষ্পমালা—এই পঞ্চকন্যার কাহিনীতে বাঙালী কৃষক-জীবনের হাসিকান্না-মেশা জীবনধারার একটি অনবদ্য পরিচয় লাভ করি। তুলনায় বলা যাইতে পারে,—'যেরূপ মণিগণের মধ্যে কৌস্তভ শ্রেষ্ঠ, এই গল্পপঞ্চকের মধ্যে সেইরূপ মালঞ্চমালা শ্রেষ্ঠ।' মুসলিম কন্যা মদিনার প্রেম-পাতিব্রত্য অতিশয় উজ্জ্বল-বর্ণে ঐ গল্পের মধ্যে ফুটিয়াছে। স্বামিপরিত্যক্তা হইয়াও সে প্রতীক্ষায় দিন গণিয়াছে।

স্বামীর অধীর প্রতীক্ষায় সে—

'ছিক্কাতে তুলিয়া রাখে গামছা-বাঁধা দৈ।
আইজ বানায় তালের পিঠা কাইল বানায় খৈ।
শালি ধানের চিড়া কত যতন করিয়া।
হাঁড়িতে ভরিয়া রাখে ছিক্কাতে করিয়া।'

কুঠারাঘাতে অশ্বত্থ বৃক্ষ আমূল কাঁপিয়া ওঠে, কিন্তু কুঠার হইতেও কঠোরতর আঘাতে পুষ্পবল্লরীর ন্যায় এই রমণীর বিশ্বাস টলে নাই। প্রেমের এই

নিঃসংশয় নিষ্ঠার জন্যই বোধ করি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক রোঁমা রোঁলা মদিনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মার্জিত-শ্রেণীর সাহিত্যে অনেক সময় হৃদয়াবেগের মুখ চাপিয়া বন্ধ করা হয়; কিন্তু এই পল্লীগীতিকাগুলিতে বর্ণিত প্রেম এবং বিরহ-মিলনকথা সামাজিক বিধিনিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া হৃদয়াবেগের আপন নিয়মেই স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ভাটিয়ালি, মুর্শিদা, সারি, জারি, বোলান প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়াও বাঙালীজাতির অনুভূতিপ্রবণ মনটিই গীতিমূর্ছনার সৃষ্টি করিয়াছে।

সাধারণ গ্রাম্য মানুষ জটিল দার্শনিক গ্রন্থের তত্ত্বালোচনা বুঝিত না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের জ্ঞানপিপাসা কিছু কম ছিল না। অশিক্ষিত আউল-বাউল ও ফকিরগণ সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক জটিল সমস্যারই অতি সহজ সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছিল। সমাজ-নেতারা যখন সমাজবৈষম্যকে ক্রমশ আত্মঘাতী করিয়া তুলিতেছিলেন, তখনই বাংলার বাউল গাহিয়াছে:

তাই তো বাউল হৈনু ভাই।
এখন বেদের ভেদ-বিভেদের
আর তো দাবি-দাওয়া নাই।

বাউল গান বাংলার লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ্।

যাত্রা এবং পাঁচালি গানের মধ্য দিয়া লোকচিত্তের উপযোগী করিয়া রামায়ণ-মহাভারত এবং বিবিধ পুরাণের কাহিনীকেই পরিবেশন করা হইয়াছে। কিন্তু পরিবেশন মাহাত্ম্যে এই সকল কাহিনী সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। সীতার পাতিব্রত্য, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম-পরীক্ষা, রামের প্রজাবাৎসল্য, হরিশ্চন্দ্রের দানবত্তার কাহিনী উন্মুক্ত প্রান্তরে রাত্রির পর রাত্রি শুনিয়া বাঙালী লোকমানস ইহাদের অন্তর্নিহিত মর্মকথাটুকু জীবনে স্বীকার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। পাঁচালি-রচয়িতা দাশরথি রায়ের গানগুলি এখনও শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে বাংলার গ্রামসমূহের অধিবাসীদিগকে আনন্দদান করিয়া থাকে।

ইহা ছাড়া, দুর্গাকে অবলম্বন করিয়াও বাংলার লোকসাহিত্যের একটি ধারা পরিপুষ্টি ভ করিয়াছে।

'বাংলাদেশে একটি অন্তর্বেদন আছে—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো।' এই অন্তর্বেদনাই দুর্গাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার আগমনী এবং বিজয়া গানের মধ্যে রূপ পাইয়াছে, হিমরাজ এবং মেনকা বাঙালী পিতামাতারই ছদ্মবেশমাত্র। যখন কবি বলেন,—

> বৎসর হয়েছে গত, করছে শিবের ঘর।
> যাও গিরিরাজ আনতে গৌরী কৈলাস-শিখর॥

তখন মেনকার মধ্যে আমরা বাঙালী মায়েরই কন্যার জন্য আকুলতা প্রত্যক্ষ করি। বহুদিন পরে কন্যাকে পাইয়া—'গিরিরাণী কন বাণী চুমো দিয়ে মুখে, কও তারিণী জামাই-ঘরে ছিলে কেমন সুখে।' এ সকলই বাংলাদেশের মায়ের ছবি ; মেনকা শুধু নামেমাত্র অবস্থান করিতেছেন।

ডাকের বচন, খনার বচন এবং নানা প্রবাদের মধ্যেও বাঙালী লোক-জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক মনীষা নিহিত হইয়া আছে।

মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে রচিত হইয়াছিল কবিওয়ালাদের গান। পূর্বে বাংলায় কানু ছাড়া গীত ছিল না, কিন্তু কবিওয়ালা রামনিধি গুপ্তই প্রথমে 'টপ্পা' গানে মানবিক আনন্দবেদনার কথা কৃষ্ণ-রাধার রূপক ব্যতিরেকে সাধারণ্যে গাহিয়া শুনাইলেন। ধর্মভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের অবসর-রঞ্জনের জন্য গান রচনা বতমান বাংলায় কবিওয়ালারাই প্রথম প্রবর্তন করেন।

উনিশ শতকের নবজাগৃতির ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায়-সভ্যতায় বাঙালী বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে বটে ; কিন্তু লোকসাহিত্যের যে স্বভাবনির্মল পরিবেশ ছিল তাহা হইতে সে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। বর্তমানের সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের মধ্যে বিরাট্ ব্যবধান। মধ্যযুগে এই ব্যবধান এখানকার মত এমন হইয়া ওঠে নাই। উভয় শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে একটা আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল। অজ্ঞাত কতিপয় বঙ্গবধূর কল্পনায় যাহা ইতস্তত অসংলগ্ন ছড়ামাত্র ছিল, সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে কোন কবি তাহাকে একত্রে

গ্রথিত করিয়া বর্তমান সেঁজুতি ব্রতের ছড়ার আকারে রূপদান করিয়াছে। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যই এইসব ছড়া হইতে তাহাদের প্রাণরস আহরণ করিয়া পরবর্তী কালে ফুলে-ফলে সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'এমনি করিয়া একটা বড়ো জায়গায় আপনার প্রাণ-পদার্থকে মিলাইয়া দিয়া পল্লীসাহিত্য ফল ধরাইয়াই ফুলের পাপ্‌ড়ির মত ঝরিয়া পড়িয়া যায়।'

আশার কথা এই যে, সম্প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও এই অবহেলিত লোকসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে একদিন এই লোকসাহিত্যের সমাদর বাড়িবেই। লোকসাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের ভিতর দিয়া বাঙালীর সার্বিক সাহিত্যপ্রচেষ্টাকে পুরাপুরি জানা যাইতে পারে।

ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ছাত্রজীবন ঃ ইহার তাৎপর্য ও গুরুত্ব—ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য—ছাত্রসমাজ ও রাজনীতি—রাজনীতির সঙ্গে ছাত্রসমাজের যুক্ত হওয়ার পক্ষে যুক্তি—বিপক্ষ-যুক্তি—সামঞ্জস্য—এ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর উক্তি—দেশের কিরূপ অবস্থায় ছাত্রগণ রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে—দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ও ছাত্রগণের কর্তব্য—উপসংহার।

ছাত্রজীবন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিজীবনেরই একটি স্তরবিশেষ। তাই পূর্ণাঙ্গ জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে ছাত্রজীবনের সার্থকতা। মানুষ অবশ্য সারাজীবন ধরিয়াই প্রকৃতি হইতে নিত্য নূতন পাঠ গ্রহণ করিতেছে, জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে। কিন্তু তথাপি বাল্য ও কৈশোরের কালকেই যুগ্মভাবে আমরা ছাত্রজীবন আখ্যায় চিহ্নিত করিয়া লইয়াছি। মাটি যখন রৌদ্রের তাপে কঠিন হয় নাই, বর্ষার সদ্য-নীত পলিমাটির কোমল আস্তরণ যখন দুর্বার প্রাণশক্তিতে উর্বর হইয়া সৃষ্টির জন্য উন্মুখ হইয়া আছে,—সেই সময়ের সহিত ছাত্রজীবনের তুলনা চলিতে পারে। যখন সংসারের কূটচক্রের হিংসা বা বিদ্বেষের স্পর্শে মানুষের মন কলুষিত হয় নাই, এমন

সময়ই ছাত্রজীবন,—এমন সময়েই জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মহত্ত্বের বীজবপনের পালা। ইহাই হইল মানবজীবনের শুভলগ্ন। জীবনের এই শুভ অধ্যায়টিকে সার্থক করিয়া তুলিতে হয়। জীবনের এই শুভলগ্ন ব্যর্থ হইলে আর তাহা ফিরিয়া আসে না। ছাত্রজীবনে যাহার মনে সততা এবং নিষ্ঠার আদর্শ সঞ্চার করিয়া দেওয়া হইল না, পরবর্তী কালে সহস্র প্রযত্নেও আর সে ত'হাদিগকে প্রাণমনমজ্জার সহিত মিশাইয়া লইতে পারে না। চিত্তের স্থৈর্য-সংযম আরম্ভ করার প্রশস্ত সময় ছাত্রজীবন। এইজন্যই বোধ হয় প্রাচীন ভারতে ব্রহ্ম-চর্যাশ্রমে ছাত্রগণ তপোবনে গুরুর নিকটে থাকিয়া বিদ্যালাভ করিত। ইহাতে তপোবনপ্রকৃতির সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইত। পাঠার্থী ছাত্রগণের হৃদয় মন শান্ত হইত, সুন্দর হইত, সংযমের শুভশ্রী তাহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পাইত।

পরিণত জীবনের,—প্রৌঢ় পর্যায়ের সার্থকতা ব্যর্থতা অনেক পরিমাণে ছাত্রজীবনের উপরেই নির্ভর করে। সেই দিক দিয়া দেখিলে, সমগ্র জীবনেরই পটভূমিকায় ইহার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরজীবনের ব্যর্থতা অনেকাংশেই ছাত্রজীবনের অবহেলা ও ঔদাস্যের অনিবার্য ফল। আবার ভবিষ্যৎ বনস্পতির সম্ভাবনাও ঐ ক্ষুদ্র চারা গাছটির মধ্যেই অভিব্যঞ্জিত। জীবনের ভিত্তি-গঠনের কাজটা হয় ছাত্রজীবনেই, তাহার উপর সৌধ রচিত হয় উত্তরকালে। তাই যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের মনীষিগণ ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে ছাত্র-সম্প্রদায়কে বারবার অবহিত করিয়া গিয়াছেন।

'ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ'—ছাত্রজীবনে অধ্যয়নের গুরুত্ব সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ছাত্রজীবনে তপস্বিজনোচিত একাগ্রতা, সংযম ও কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণশক্তি প্রভৃতি গুণেরও স্বাভাবিক সম্ভাব্যতা মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে কোন্‌টি কৃত্য, আর কোন্‌টি অকৃত্য তাহা স্পষ্ট করিয়া তালিকাবদ্ধ করিয়া দেখানো চলে না। সাধারণভাবে বলা যায় যে—যাহা বৃহত্তর মানবতাবোধের সহিত কল্যাণের সম্পর্কে যুক্ত, নিপীড়িত আর্তের বিরুদ্ধে যাহা সতত সংগ্রামশীল, জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের পক্ষে যাহা

পরিপোষকতা করে, তাহাদেরই কৃত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আর যে-সকল প্রবৃত্তি মানুষকে ছোট করে, মনুষ্যত্বকে কুণ্ঠিত করে, জীবনকে সহজ স্বাভাবিকতার পরিপন্থী করিয়া তোলে, তাহাদের সর্বপ্রকারে বর্জন করিয়া চলিতে হইবে।

বর্তমান শতাব্দীতে ছাত্রদেব কর্তব্য সম্বন্ধে একটা জটিল তর্কের উদ্ভব হইয়াছে। রাজনীতির সহিত ছাত্রদের সম্বন্ধ কিরূপ হইবে? এই প্রশ্ন লইয়া বিদগ্ধমণ্ডলীর মধ্যে ঘোরতর মতানৈক্য আছে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রনীতিবিদ্ এবং অন্যতম প্রধান দেশপ্রেমিক। তাঁহার অভিমত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১৮৯৪ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে একটি বক্তৃতায় তিনি ছাত্রদের রাজনীতিচর্চার অধিকারের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, ছাত্রেরা রাজনীতির মধ্যে জড়াইয়া পড়িবেই।

কিন্তু ইহাতে একটা আশঙ্কা আছে। যদি ছাত্রদের সঠিক রাজনৈতিক পন্থার নির্দেশ না দেওয়া হয়, তবে তাহারা বিপথে চালিত হইবে এবং তেমন ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে, তথা দেশের মধ্যেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইতে পারে।

বিলাতে অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজে অবশ্য রাজনৈতিক সমস্যা হইতে ছাত্রদিগকে দূরে রাখা হয় না। বরং রাজনৈতিক বিভিন্ন সমস্যার আলোচনার জন্য বিভিন্ন নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যে মধ্যে আমন্ত্রণ করিয়াই আনা হয়। এরূপ পদ্ধতিতে ছাত্রসমাজে বা দেশে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না, বরং দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মতামত শুনিয়া ছাত্রগণ সে সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনই করিয়া থাকে।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও শ্রীযুক্ত খপর্দে ছাত্রদের রাজনীতির সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতেই পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এই দুই চরমপন্থী মতের মধ্যে চমৎকার একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া এ সম্বন্ধে নিজ মত দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে,—প্রবণতা ব্যতিরেকেও যেমন ছাত্রাবস্থাতে সকল শ্রেণীর গ্রন্থই পড়িতে হয়, তেমনি ছাত্রেরা সকল রাষ্ট্রনৈতিক দলেরই বক্তব্য শুনিবে, পরস্পরবিরোধী নানা মতের ভিতর হইতে প্রকৃত সত্যকে চিনিয়া লইয়া বাকিটুকু বর্জন করিবে।

যখন দেশব্যাপী প্রবল কোন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন চলে, তখন সাময়িক-ভাবে এই সকল নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিতে পারে। বিশেষতঃ দেশপ্রেমের প্রেরণায়, দেশের সঙ্কটকালে কখনো কখনো ছাত্রসম্প্রদায়কেও প্রত্যক্ষ রাষ্ট্র-নৈতিক যোদ্ধারূপে অবতীর্ণ হইতে হয়। বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত মিলিবে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবাসী দীর্ঘকাল ধরিয়া যে স্বাধীনতাসংগ্রাম চালাইয়াছে, তাহাতে ছাত্রসম্প্রদায়ও পিছাইয়া থাকে নাই। অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা-নির্যাতন ভোগ করিয়া মহাত্মার নির্দেশে এবং আদর্শে ছাত্রগণ যেভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। আজ আমরা যে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি, তাহাব প্রতিষ্ঠায় ছাত্রসমাজের দান তুচ্ছ নয়।

কিন্তু পরাধীন ভারতের শৃঙ্খল মোচন হইয়াছে, দেশে আজ স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের রাজনীতিক্ষেত্রের সেই অস্বাভাবিক অবস্থা আজ কাটিয়া গিয়াছে। কাজেই এখন আর ছাত্রদিগের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার প্রশ্ন উঠে না। এখন ছাত্রদিগকে তাহাদের স্বাভাবিক সুনির্দিষ্ট কর্তব্যসাধনে তৎপর হইতে হইবে। অধ্যয়নের মধ্য দিয়া জ্ঞানলাভ এবং অনুশীলনের দ্বারা চরিত্রগঠনের প্রতিই ছাত্রদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে।

সম্প্রতি মানুষের জীবন নানা সমস্যায় বড় জটিল হইয়াছে। কোনো দেশই আজ আর পৃথিবীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া থাকিতে পারে না। আজ পৃথিবী বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হইয়াছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আজ সকল দেশই কোনো-না কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। আজিকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি রাষ্ট্রবিশেষের নিরপেক্ষ ভূমিকা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতের নাগরিক ছাত্রসম্প্রদায়ের সকলেরই পক্ষে একটা মোটামুটি রাজ-নৈতিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ছাত্রগণকে আজ সুসভ্য সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির মূলতত্ত্ব জানিতে হইবে। কারণ, আজিকার দিনে যথার্থ রাষ্ট্রচেতনা ভিন্ন কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

কিন্তু দেখিতে হইবে যে, তাহারা যেন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে, রাজনীতিচর্চাই যেন তাহাদের একমাত্র ধ্যান ও ধর্ম হইয়া না উঠে; আমাদের দেশে আজকাল যে অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে এ জিনিসটি বিশেষ সুস্পষ্ট হইয়াই উঠিয়াছে যে ছাত্রদের অধ্যয়ন যেন অতিরিক্ত বিষয়, ধর্মঘট বা রাজনৈতিক আন্দোলনে মাতিয়া উঠাই যেন ছাত্রসম্প্রদায়ের নিকট বড় হইয়া উঠিয়াছে। ছাত্রগণের এই মনোভাব আত্মঘাতী এবং ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে ইহা স্বদেশঘাতীও বটে।

আশা করি ছাত্রেরা অচিরেই নিজেদের শুভবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সর্বপ্রকার একদেশদর্শী অতিশয়তাকে এড়াইয়া জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখিবার জন্য যত্নবান্ হইবে। কেননা, অপচয় তারুণ্যের ধর্ম নহে, প্রাণের পূর্ণ প্রকাশেই তাহার সার্থকতা। তরুণ সম্প্রদায় শক্তি সঞ্চয় করিবে, প্রয়োজন হইলে দেশের ও সমাজের কল্যাণ ও সমুন্নতির জন্য তাহারা সেই শক্তির ব্যবহার করিবে। অনর্থক তাহারা তাহাদের শক্তির অপব্যবহার বা অপচয় করিবে কেন?

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান

[আই. এ. বিশেষ বাংলা : ১৯৫২]

প্রবন্ধ-সংকেত : সূচনা : মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা—ইওরোপে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান : জাপান ও প্রাচীন বাংলায় মাতৃভাষায় শিক্ষাদান—শিক্ষার বাহনরূপে ইংরাজী ভাষা : বিদেশী ভাষায় শিক্ষাদানের অসম্পূর্ণতা ও কুফল—মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে গেলে সমস্যা—উপসংহার : শিক্ষা-প্রণালীর প্রতিকার।

শিশু মাতৃস্তন্যপানের সহিত যাহা শিক্ষা করে, তাহার জীবনে তাহা গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়, সে শিক্ষা জীবনে কোনদিনও সে বিস্মৃত হয় না। মাতার কাছেই মানুষের শিক্ষার সূত্রপাত, এবং মাতার প্রদত্ত শিক্ষাই মানুষের জ্ঞানের উন্মেষে, জীবনগঠনে যতখানি সহায়তা করে, তেমন আর কিছুরই দ্বারা সম্ভব হয় না। ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে যেমন, জাতীয় জীবনেও তেমনি—

মাতৃভাষার মাধ্যমে যে জাতি শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হয়, সে জাতির শিক্ষা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সে জাতির শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে। সে জাতির শ্রেষ্ঠত্বলাভের পথ খুলিয়া যায়। এই কারণে পৃথিবীব সকল দেশেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়াছে।

সমস্ত ইওরোপে এক সময়ে লাটিন ভাষাই ছিল শিক্ষাব ভাষা, বিদ্যার আধার। তাহাতে অবশ্য একটা সুবিধা ছিল এই যে, সকল দেশের ছাত্রই এক পরিবর্তনহীন সাধারণ ভাষার যোগে শিক্ষালাভ করিতে পারিত। কিন্তু তাহার প্রধান ক্ষতি ছিল এই যে, বিদ্যার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এড়াইয়া বাহিরে অতি অল্পই পৌছিত। তাই যখন হইতে ইওবোপেব প্রত্যেক জাতি আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করিল, তখন হইতে শিক্ষা ব্যাপ্ত হইল সর্বসাধারণের মধ্যে। কথাটা স্বতোবিরুদ্ধ হইলেও সত্যসত্যই সেখানে দেখা গিয়াছিল যে, ভাষার ক্ষেত্রে ঐ স্বাতন্ত্র্যই ইওরোপের চিৎপ্রকর্ষকে খণ্ডিত না কবিয়া আশ্চর্যরূপে সম্মিলিত করিয়াছিল। স্বদেশী ভাষায় বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইওবোপেব জ্ঞানের ঐশ্বর্য বাড়িয়া উঠিল, সেখানে বিদ্যা ব্যাপ্ত হইল সমস্ত প্রজার মধ্যে, যুক্ত হইল প্রতিবেশী ও দূরবাসীদের জ্ঞানসাধনার সঙ্গে,—স্বতন্ত্র জ্ঞানের ক্ষেত্রের শস্য,—বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের সহজ জ্ঞানধারা—নাগালের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাতে ইওরোপের সকল রাষ্ট্রেরই বড হইবার, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবাব পথ খুলিয়া গিয়াছিল।

এশিয়ার মধ্যে জাপান জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পাইয়া এমনটি হয় নাই, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিয়াই জাপান বড় হইয়াছে। আজ সেখানে বুদ্ধির জ্যোতি অবারিতভাবে দীপ্যমান্। আমাদেব দেশেও এককালে মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই শিক্ষা প্রদান করা হইত। টোল চতুষ্পাঠীতে, পাঠশালাসমূহে, কথক ঠাকুরের আসরে, যাত্রা পাঁচালি গানের আসরে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমেই শিক্ষার ধারা প্রবাহিত হইত। মাতৃভাষার মাধ্যমে সেই শিক্ষায় সেদিনকার

বাঙালী ন্যায়, দর্শন, ব্যাকরণ, অলংকার সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিল,—জনসাধারণও শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কথকতা যাত্রা পাঁচালি-কথা শুনিয়া তাহারাও শিক্ষার আলোকটুকু পাইত। তখন মাতৃভাষা শিক্ষাবিস্তারের সহায়ক ছিল বলিয়া সাধারণ বাঙালীরও ধর্মবোধ জাগ্রত হইত, ন্যায়-অন্যায়বোধ জাগিত।

কিন্তু এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইল,—এদেশের শিক্ষাবিধির সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইল। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের পরিবর্তে দেশময় ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সূত্রপাত করা হইল। তারপর প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া ইংরাজীশিক্ষাই আমাদের দেশে অপ্রতিহত আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিল। ইহার কিছু সুফল অবশ্য ফলিল। ইংরাজী ভাষা বিশ্বের সহিত আমাদের মিলনের সেতু রচনা করিয়া দিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের দেশীয় সাহিত্যের নূতন ভাবজাগৃতি হইল, ভারতের সকল প্রদেশেরই সাহিত্যে নব নব রচনাভঙ্গি প্রবর্তিত হইল। বিশেষ করিয়া বাংলা সাহিত্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল। তাছাড়া, বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান এদেশীয় শিক্ষার্থীদের অধিগত হইল। আমাদের মন মুক্ত ও স্বাধীন হইল, বুদ্ধির মুক্তি ঘটিল, দেশের কুপ্রথা কুসংস্কারের ভিত্তিমূল শিথিল হইল, আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটায় সে শিক্ষা সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পারিল না, এবং সুদীর্ঘ শতবৎসরকাল ধরিয়া ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিয়াও আমাদের দেশের শতকরা মাত্র আটজনের শিক্ষা-লাভ হইয়াছে। অবশিষ্ট ৯২ জন রহিল নিরক্ষরতার শোচনীয় অন্ধকারে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের অভাবহেতু জাতির চিত্ত ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়াছে, জন-সাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ব্যাহত হইয়াছে। ফলে আমরা যে পরিমাণ শিক্ষা পাইয়াছি, সেই পরিমাণ বিদ্যা বা জ্ঞান আহরণ করিতে পারি নাই। আমাদের শক্তির অপচয় হইয়াছে, শিক্ষাকে প্রভূত শক্তির বিনিময়েও আয়ত্ত করিতে পারি নাই। ইংরাজী বিদেশীয় ভাষা—সে ভাষাকে আয়ত্ত করিতেই আমাদের সমস্ত সময় ও সামর্থ্য ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে, কাজেই শিক্ষণীয় বিষয়টি আমরা

উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমাদের চিৎপ্রকর্ষের জন্য কোনো জাতীয় সাহিত্য সৃষ্ট হয় নাই। চিন্তা ও ভাবের ক্ষেত্রে আমরা দীন রহিয়া গিয়াছি, বুদ্ধি ও কল্পনার ক্ষেত্রে আমরা নাবালক রহিয়া গিয়াছি। আমাদের শিক্ষা-জীবন ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারি নাই। বিজাতীয় ইংরাজী ভাষার পাঠ্যপুস্তক আমরা কণ্ঠস্থ করিয়াছি, কিন্তু তাহার মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। ফলে আমাদের মন হইতে কেতাবী বিদ্যা নির্বাসিত হইয়া গিয়াছে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ না করায় দেশব্যাপী এক বিরাট অজ্ঞতা আজ সৃষ্টি হইয়াছে। এই অজ্ঞতার ফল আজ আমরা পদে পদে অনুভব করিতেছি। সুতরাং যদি বাঁচিতে হয়, যদি দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সমৃদ্ধি আমাদের কামনার বস্তু হয়, তবে দেশের সর্বস্তরের মধ্যে শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ করিতে হইবে। দেশের অগণিত জনসাধারণকে বিদ্যামন্দিরের সিংহদ্বার হইতে দূরে ঠেলিয়া রাখিলে চলিবে না। মাতৃভাষাকে যদি আমরা শিক্ষার বাহন করিয়া তুলিতে পারি, তবেই আমাদের সে উদ্দেশ্য সফল হইবে।

বর্তমানে আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি নাই। মাতৃভাষার মধ্য দিয়া যে দিন আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয় অধিগত করিতে সমর্থ হইব,—যেদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কথা বাংলার পল্লীর নিভৃততম ক্রোড়বাসীর নিকট পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হইব, সেদিন শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা স্বরাজ লাভ করিব। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে যতদিন আমরা শিক্ষালাভ করিতে থাকিব, ততদিন আমরা পরনির্ভরশীলই থাকিব।

তবে বিশেষ আশার কথা এই যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিবার অল্প কিছুকাল পূর্ব হইতেই আমরা বিজাতীয় শিক্ষার অস্বাভাবিক বাহ্য ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্যের মূল্যহীন অসারতা বুঝিতে পারিয়াছি। আমরা এক্ষণে উপলব্ধি করিয়াছি যে, ইংরাজীকে শিক্ষার বাহন করায় দেশের উপকারের চেয়ে অপকারই হইয়াছে বেশি। আজ আমরা নিজেদের চিনিতে পারিয়াছি।

বিজাতীয় ভাষা ও আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া আমরা দেশীয় ভাষার সেবা করিয়া দেশীয় ভাষা ও আদর্শকে সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।

অবশ্য বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে পরিণত করিতে হইলে আমাদিগকে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ, কিন্তু ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়া যেমন অনায়াসে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যায়, কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল কথা, যেভাবে ইংরাজীর সহায়তায় প্রকাশ করা চলে, বাংলার মধ্য দিয়া সেরূপ কার্য সম্পাদিত হইতে পারে কিনা সন্দেহজনক। এখনও বহু বৈজ্ঞানিক নাম ও সংজ্ঞার বাংলা পরিভাষা নির্ণীত হয় নাই। এজন্য কেহ কেহ এখনও বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চ-শিক্ষাদানের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এতকাল প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রয়োগ হয় নাই। আজ প্রয়োজন ঘটিয়াছে। বাংলা ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল আলোচনার ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইতেছে। একদিন অক্ষয়কুমার দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার আলোচনায়ই নিয়োগ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষা তখন বর্তমান অপেক্ষা অপরিণত ছিল। সেই অপরিণত বাংলায় যদি তাঁহারা পদার্থবিদ্যা রসায়নশাস্ত্র, ভূগোল প্রভৃতির আলোচনা করিয়া থাকেন, তবে আজিকার পরিণততর বাংলায় সকল বিষয়ের সার্থক আলোচনা কেন হইবে না তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আসল কথা, প্রয়োজন সাধনার। দেশকে যদি আমরা ভালবাসি, দেশের জনসাধারণের সমুন্নতির মধ্য দিয়া দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি যদি আমাদের প্রার্থনীয় হয়, তবে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করিতে হইবে। প্রয়োজনের তাগিদে দেশব্যাপী সাধনার শুরু হইবে। নূতন নূতন পরিভাষা সৃষ্টি হইবে, সকল প্রকার ভাব প্রকাশের সামর্থ্য বাংলা ভাষা লাভ করিবে। অচিরকালের মধ্যেই বাংলা ভাষা শিক্ষার যথাযোগ্য মাধ্যমরূপে পরিণত হইবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ সূচনা ঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাহাকে বলে—প্রাচীনকালের সম্প্রদায়গত বৃত্তির কথা—যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন ও ব্যবহারিক শিক্ষালাভের আবশ্যকতা-বৃদ্ধি—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৃত্তিশিক্ষা দানের ব্যবস্থা—তাহার সুফল—পুঁথিগত শিক্ষালাভের কুফল—বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের আবশ্যকতা ও উপকারিতা।

বর্তমান যুগে মানুষ বিবিধ বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। দর্জীর কাজ, কাঠের মিস্ত্রীর কাজ, চিত্রবিদ্যা, ইলেকট্রিকের কাজ, ছাপাখানার কাজ, চামড়ার কাজ প্রভৃতি নানারকমের জীবিকামূলক কাজ আছে। এই সকল কাজ শিখিলে চাকরি না করিয়াও স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করা সম্ভব।

এক সময়ে এই সকল বৃত্তির অধিকাংশই পিতা-পিতামহের নিকট হইতে মানুষ শিক্ষা করিত এবং এইভাবে বৃত্তি অনুসারে বাংলার সমাজে বিভিন্ন জাতিরও উদ্ভব হইয়াছিল। বাংলার তন্তুবায়, কর্মকার, স্বর্ণকার, মৃৎশিল্পী প্রভৃতি শ্রেণী এমনি করিয়াই উদ্ভূত হইয়াছিল। তখন বংশানুক্রমে মানুষ তাহার জাতিগত বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইত। পিতা পিতামহের নিকটে থাকিয়া বা আত্মীয়-পরিজনের সংস্পর্শে থাকিয়া, তাহাদের শিল্পকার্য দেখিয়া, মানুষ বিশেষ বিশেষ শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিত। তারপর উত্তরাধিকারীদেরও জাতিগত বৃত্তিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়া যাইত। মানুষ তখন বংশানুক্রমিক জাতিগত বৃত্তি গ্রহণ করিয়াই তাহার অর্থাভাব মিটাইতে সমর্থ হইত। তখনকার দিনে মানুষের সমাজ জীবন ছিল সরল ও স্বচ্ছন্দ।

কিন্তু পৃথিবীতে পরিবর্তন সূচিত হইল, যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন হইল। যন্ত্র-শিল্পের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন জটিল হইয়া উঠিল। কুটিরশিল্প ধ্বংস হইল, যে বৃত্তি এককালে আত্মীয়-স্বজনের নিকট গৃহে অনায়াসে শিক্ষা করা যাইত, যন্ত্রযুগে বিদ্যালয়ের সাহায্য ভিন্ন তাহা শিক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

কৃষিবিদ্যা, সাবান তৈয়ারি, চামড়ার কাজ, বেতের কাজ, বই বাঁধাইয়ের কাজ —সব কিছুই বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিদ্যালয়ে ভিন্ন অন্য উপায়ে শিক্ষা করার উপায় রহিল না।

এই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ ধরনের কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। আমাদের দেশের কথা বাদ দিয়া অন্য যে-কোনও দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না কেন, দেখিতে পাই যে সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য সমাপ্ত করেন না। দেশের জনসাধারণকে জীবিকা-উপার্জনের উপযুক্ত শিক্ষাদানও সমস্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের কর্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন। সকল দেশেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

ইওরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দেখা যায় যে, সেখানে প্রাথমিক জ্ঞান-লাভ করিবার পরেই কি ছাত্র কি ছাত্রী, সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভে প্রবৃত্ত হয়। তারপর উপযুক্ত বয়সে কাজ শিখিয়া জীবিকা উপার্জন করিতে আরম্ভ করে। উচ্চশিক্ষার মন্দিরে গিয়া সেখানে সকলে ভিড় করে না। তাই সেখানে এখানকার মত বেকারসমস্যাও প্রকট হয় নাই, সেখানকার অর্থনৈতিক সমস্যাও এখানকার অর্থনৈতিক সমস্যার মত এমন জটিল হইয়া উঠে নাই।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এদেশের ছাত্রেরা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে উচ্চশিক্ষাই কেবল করিয়া আসিয়াছে। উদ্দেশ্যহীন এই উচ্চশিক্ষার বিষময় ফলও ফলিয়াছে। ডিগ্রীর মোহ আমাদের সমাজকে নির্জীব করিয়া ফেলিয়াছে, দেশবাসীর মধ্য হইতে শ্রমের মর্যাদাবোধ একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। ডিগ্রীধারী যুবকেরা কেরানীগিরি, শিক্ষকতা বা ওকালতিকেই জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায় করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে বেকারসমস্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, সমাজের অর্থ-নৈতিক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক পরাধীনতা সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সকল সমস্যা হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য আজ দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন এবং সুখের বিষয় এই যে, এদেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। আজ সমাজে বিজ্ঞান শিক্ষা, বয়নবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, তাড়িত বিদ্যা এবং অন্যান্য আরও নানা প্রকারের শিল্পশিক্ষার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

মেধা সকলের সমান হয় না, মেধাবী ছাত্রেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করুক ইহাতে, আপত্তির কিছুই নাই। কিন্তু অল্প মেধাবী ছাত্রেরা উচ্চশিক্ষার মোহে শক্তির অপচয় করিবে, ইহা কোনক্রমেই সমর্থন করিতে পারা যায় না। তাহাদের জন্য বৃত্তিশিক্ষার আয়োজন অবিলম্বেই প্রয়োজন।

বাংলায় যে সকল জিলা-শহর আছে, মহকুমা-শহর আছে, সে সকলের প্রত্যেকটিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষালয় স্থাপন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ঘনবসতিপূর্ণ পল্লীগুলির মধ্যেও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষালয় স্থাপন করা যাইতে পারে। বর্তমানে দেশের সরকারের দৃষ্টি এদিকে খানিকটা গিয়াছে। তাঁহারা এক শ্রেণীর শিক্ষালয় স্থাপনে উদ্‌যোগী হইয়াছেন, যেখানে কেবল পুঁথিগত শিক্ষাই দেওয়া হইবে না, মানুষ তাহার উত্তরজীবনে যাহাতে আপন জীবিকা অর্জন করিতে পারে এমন সকল শিল্প ইত্যাদিও শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু এদিকে যে পরিমাণ চেষ্টা হইয়াছে, তাহা নগণ্য বলিলেই চলে। এই চেষ্টাকে ব্যাপক করিয়া তুলিতে হইবে। নতুবা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তিমূলকে দৃঢ় করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে না।

চাকরির লোভে উচ্চশিক্ষার প্রয়াসী হইয়া বাঙালী একদিন বৃত্তিশিক্ষার প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে গিয়া বাঙালী তাহার বৃত্তি হারাইয়াছে, কিন্তু চাকরিও জুটাইতে পারিতেছে না। নিরন্ন বাঙালীর সম্মুখে আজ কঠিন সঙ্কট। অতএব জাতিকে আজ তাহার নিশ্চিত মৃত্যু নিবারণের জন্য সর্বপ্রথমে জীবিকার সংস্থান করিবার জন্য সক্রিয় হইয়া উঠিতে হইবে। উচ্চশিক্ষার মোহ ত্যাগ করিয়া বৃত্তিশিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। এ বিষয়ে অবহিত না হইলে সমাজের উন্নতি-সমৃদ্ধির পথে আজ যে সকল বাধা দুর্লঙ্ঘ্য

পর্বতের মত রহিয়াছে, তাহাদিগকে অপসারিত করা যাইবে না। একমাত্র বৃত্তিমূলক শিক্ষাই বাংলার সমাজের আর্থিক উন্নয়নে সহায়তা করিতে পারে। বর্তমানের অর্থ নৈতিক সঙ্কটকালে এ কথাটি আমরা যেন কিছুতেই না বিস্মৃত হই।

বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ সূচনা ঃ সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—বৈদেশিক আক্রমণ ও সামরিক শিক্ষা—সামরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা, পরপীড়ন নহে—উপসংহার।

স্বাধীনতালাভের পর ভারতবর্ষে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবেই উপলব্ধ হইয়াছে। ভারতবাসী একদিন সাহসে, শৌর্যে, সামরিক শক্তিতে অতুলনীয় ছিল। দীর্ঘকাল পরাধীন থাকায় ভারতবাসীর সে শক্তি-সামর্থ্য, সাহস-শৌর্য লুপ্ত হইয়াছে। সেই লুপ্ত শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য, আধুনিকতম যুদ্ধকৌশলে ভারতবাসীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য একটা ব্যাপক প্রয়াস আমাদের দেশে আজ দেখা যাইতেছে। কলেজে কলেজে ন্যাশনাল ক্যাডেট্ কোর বা জাতীয় রক্ষী-বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কোনো কোনো বিদ্যায়তনের ছাত্রদিগকে নৌযুদ্ধ-কৌশল শিখান হইতেছে। ইহা আশার ও আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও সামরিক শিক্ষা আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হয় নাই। জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথকে প্রশস্ত করিতে হইলে, সামরিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

স্বাধীন ভারতে আজ প্রয়োজন নিপুণ ও নির্ভীক স্থলসৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী। পৃথিবীর প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্র তাহাদের ভবিষ্যৎ নাগরিককে সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে। অধিকাংশ দেশেই দেখা যায় যে, ছাত্রদিগকে তাহাদের শিক্ষাজীবনের একটি বিশিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষালাভে নিয়োগ করিতে হয়। সমরকৌশল এবং সামরিক

জীবনের কঠোরতা ও নিয়মানুবর্তিতা আয়ত্ত করাকে পাশ্চাত্য জগৎ তাহাদের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছে। তাই তাহাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকেও সেই পথ অনুসরণ করিতে হইবে।

বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার উপযোগিতা অনেক। নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলাবোধ মানব-জীবনের উন্নতির পথ খুলিয়া দেয়। সৈনিককে এই নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা করিতে হয়। ছাত্রগণ অন্যান্য নানা বিষয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহাদের মধ্যেও নিয়মশৃঙ্খলা-বোধ জন্মিবে,—তাহাদের জীবনের উন্নতির ভিত পাকা হইবে। সৈন্যদিগকে নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে শিখিতে হয় কুচকাওয়াজ, অস্ত্রের ব্যবহার। ইহাতে শরীর সুদৃঢ় হয়, কর্মঠ হয়, মনে সাহসের সঞ্চার হয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মে, কর্মে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। সামরিক শিক্ষার মধ্য দিয়া মানুষ আত্মত্যাগের প্রেরণা লাভ করে, স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ জন্মায়। একযোগে কর্ম করিবার প্রবণতাও সামরিক শিক্ষার মধ্য দিয়াই মানবজীবনে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ চিরকালই সম্পদশালিনী দেশ। এদেশের সোনার ফসল তরী বোঝাই করিয়া লইয়া যাইবার জন্য গ্রীক আসিয়াছে; ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী আসিয়াছে; ইংরাজ আসিয়াছে। আজ সেই ভারতভূমিকে রক্ষা করার ভার ভারতীয়দিগের উপরই বর্তিয়াছে। বিদেশী শত্রুর লোলুপ শ্যেনদৃষ্টি হইতে স্বদেশকে রক্ষা করার উপায় এখন আমাদিগকে উদ্ভাবন করিতে হইবে। যে স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি, সে স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হইবে। সামরিক শিক্ষা না থাকিলে সম্পদশালিনী ভারতভূমিকে রক্ষা করা আমাদের পক্ষে দুরাশামাত্র হইবে।

অন্যদেশকে শাসন এবং শোষণ ভারতবর্ষ কোনদিন করে নাই—ভবিষ্যতেও স্বাধীন ভারতবর্ষ তাহা করিবে না। কারণ, ইহা ভারতের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সুতরাং পরপীড়নের জন্য ভারত সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিবে না। আত্মরক্ষার জন্য ভারতে ব্যাপক সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন।

ভারতের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল থামাইবার জন্যও ভারতকে সামরিক শিক্ষায় দীক্ষিত হইতে হইবে। ভারত চিরদিন দেশের মধ্যে শান্ত তপোবন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করিয়া শক্তি, সাহস এবং নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণ আয়ত্ত করিয়া সেই শান্ত তপোবন আমাদিগকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নিজদিগকে যদি আমরা অসহায় করিয়া রাখি, তবে ভীরুতার প্রশ্রয় দিব—দেশের মধ্যে শান্ত পরিবেশ সৃষ্টির আশা মরীচিকার মত মিলাইয়া যাইবে।

স্বাধীন ভারতে ইংরাজী ভাষার স্থান

[আই. এ., আই. এস্ সি. বাংলা : ১৯৫১]

প্রবন্ধ-সংকেত : স্বাধীন ভারতে ইংরাজী ভাষার স্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত—ইংরাজী ভাষা প্রবর্তনের কারণ—ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সুফল—ইংরাজী ভাষায় কতটা ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা অপরিহার্য—শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা—উপসংহার : ইংরাজী ভাষা সম্পূর্ণ বর্জন সম্ভব কি না?

স্বাধীন ভারতে ইংরাজী ভাষার স্থান কিরূপ হওয়া উচিত, বর্তমানে তাহা লইয়া পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞ মহলে বাদানুবাদের অন্ত নাই। একদল বলিতেছেন, ইংরাজ যখন গিয়াছে, তখন ইংরাজী ভাষাটাই বা আর থাকে কেন? পরাধীনতার কোন চিহ্নই স্বাধীন ভারতে থাকা উচিত নয়। আর একদল বলিতেছেন, ইংরাজের সঙ্গেই আমাদের বাদ ছিল, ইংরাজী ভাষার সঙ্গে নহে। ঐ ভাষার সংস্পর্শে আসিয়াই আমাদের মধ্যে স্বাদেশিকতা জাগিয়াছে; বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষত বিজ্ঞানে, জ্ঞান লাভ করিয়াছি; আমাদের সাহিত্যও নানাভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এমন ভাষাকে পরিত্যাগ করা মূঢ়তা। তৃতীয় দল পূর্বোক্ত মতদ্বয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া বলিতেছেন, ইংরাজীকে একেবারে বাদ দিবার আবশ্যকও নাই, আবার

আগেকার মত উহাকেই 'ধ্যান-জ্ঞান' করিয়া তুলিবারও প্রয়োজন নাই। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরাজীর স্পর্শ যতটুকু রাখা দরকার, ততটুকুই রাখা কর্তব্য। উহার বেশিও নহে, কমও নহে।

তিনটি মতের পক্ষেই কিছু-না কিছু যুক্তি আছে। এক্ষণে প্রত্যেকটি মত যাচাই করিয়া দেখা যাক্—কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্তিপূর্ণ।

ইংরাজী ভাষা আমাদের দেশীয় ভাষা নহে, উহা বিজাতীয় ভাষা। এমন অবস্থায় ইংরাজী ভাষাকে বর্জনীয় বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইংরাজী ভাষা আমাদের অনেক উপকারও করিয়াছে। ভারতীয়—বিশেষত বাংলা সাহিত্যকে উহা সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিয়াছে। ইংরাজী ভাষার সংস্পর্শে না আসিলে আমরা মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে পাইতাম কি না সন্দেহ। তাহা ছাড়া, বর্তমান বৈজ্ঞানিক-বিশ্ব যে-পথে অনিবার্যরূপে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই পথে চলিতে হইলে ইংরাজী ভাষা অপরিহার্য। কারণ বিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সম্পর্কে উচ্চতর গ্রন্থ ভারতীয় কোনও ভাষাতে বিশেষ ছিল না, এখনও যে খুব বেশি আছে, তাহা নয়। এই কারণেই ইংরাজী ভাষাকে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে বাদ দেওয়াও চলে না।

সুতরাং সমন্বয়পন্থীদের যুক্তিই বর্তমানে গ্রাহ্য। কিন্তু কথা হইতেছে, ইংরাজীকে কতখানি গ্রহণ করিতে হইবে? প্রথমে সরকারী ক্ষেত্রের কথাই বিবেচনা করা যাক্। ভারত বহুভাষাভাষী দেশ। এখানে এখন একটি ভাষাকেই সরকারী মর্যাদা দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু অতি-বর্তমানেই উহা সম্ভবপর নহে। কারণ, বিভিন্ন প্রদেশবাসীকে সরকারী কার্যে সমান অধিকার দিতে হইলে, রাষ্ট্রভাষা হিন্দী শিক্ষার সুযোগও তাহা-দিগকে দিতে হইবে। বলা বাহুল্য—উহা সময়সাপেক্ষ। সুতরাং যতদিন সকলে সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারে, ততদিন এতদিনকার রাষ্ট্রভাষা ইংরাজীতেই সরকারী কার্য নির্বাহ হওয়া উচিত। অবশ্য সরকারী কার্য বলিতে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারী কার্যই বুঝাইতেছি। কারণ, প্রাদেশিক সরকারী কার্য প্রাদেশিক ভাষাতেই সম্পন্ন হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ইহা ছাড়া, আরও একটা কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। ইংরাজী এক্ষণে আন্তর্জাতিক ভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন দেশ এখন নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। এখন প্রত্যেক দেশকেই অপর সর্বজাতির সহিত একটা সম-স্বার্থের সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। জাতিসকলের মধ্যে স্বার্থের সমন্বয়মূলক রাষ্ট্রনৈতিক কুটুম্বিতা রক্ষা করিতে হইলে ইংরাজী ভাষা জাতির জীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয়। আবার ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্যও ইংরাজী ভাষা অপরিবর্জনীয়। ইংরাজী মাস, ইংরাজী তারিখ অনুসারেই এখনও আমাদের ব্যবসায়িক দিন গণনা করিতে হয়। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইলেও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ও অন্যান্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ইংরাজীকে আমাদের অবশ্যই স্থান দিতে হইবে।

এইবার শিক্ষাক্ষেত্রের কথা। মাতৃভাষার মাধ্যমেই যে শিক্ষা সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হয়, এ বিষয়ে তর্কের অবকাশই থাকিতে পারে না। স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয়। যাঁহারা ভবিষ্যতে সরকারী কার্য অথবা ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের জন্য প্রয়োজন মত সামান্য কিছু ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেই চলিতে পারে। ইহার জন্য প্রবেশিকাক্ষেত্রে ইংরাজীকে বিভীষিকা করিয়া তুলিবার আবশ্যক নাই। 'আই-এ', 'বি-এ'তেও এক্ষণে ইংরাজীকে যতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়, ততটা প্রাধান্য দিবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখা যায় না।

অবশ্য এ কথাও সত্য যে, উচ্চতর পাঠ্যের এমন বহু বিষয় আছে, সে-সকল বিষয়ে ভারতীয় ভাষায় আজিও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয় নাই। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন ইংরাজীর দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকার অর্থ জ্ঞানের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকা। সুতরাং এই দিক হইতে বিবেচনা করিলেও ইংরাজী বর্তমানে অপরিহার্য।

মোট কথা, ভারতীয় ভাষাগুলি যতদিন না ইংরাজীর মত সর্বভাবপ্রকাশক্ষম হইতেছে, ততদিন কি সরকারী ক্ষেত্রে, কি শিক্ষাক্ষেত্রে, ইংরাজী ভাষাকে স্থান দিতেই হইবে। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরাজী যে সর্বকালেই অপরিহার্য—এই সত্য তর্কের অপেক্ষা রাখে না।

স্বদেশপ্রেম

প্রবন্ধ-সংকেত : স্বদেশপ্রেম কাহাকে বলে?—স্বজাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেম—স্বাদেশিকতা কখন জাগিয়া উঠে—স্বদেশপ্রেমিকের স্বরূপ—উদার স্বাদেশিকতা—সংকীর্ণ স্বদেশপ্রীতির বিপদ।

নিজের দেশকে ভালবাসার নাম স্বদেশপ্রাণতা বা স্বাদেশিকতা। দেশকে ভালবাসার অর্থ দেশের লোককে ভালবাসা, দেশের প্রকৃতিকে ভালবাসা, দেশের নীতি ধর্ম আচার ব্যবহার,—এক কথায় দেশের যা-কিছু সবকে ভালবাসা। দেশ যদি কোন বিষয়ে দুর্বল হয়, যদি দেশের মধ্যে কুসংস্কার কুপ্রথা ইত্যাদি থাকে—তবে তাহা হইতে দেশকে মুক্ত করাও দেশপ্রেমিকতা।

স্বদেশিকতা প্রথমে স্বজাতীয়তা হইতে উদ্ভূত হয়। যখন আমরা দেখি, আমাদের জাতির মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা আর কোথাও পাই না, যখন অনুভব করি, জাতির সহিত আমাদের একটা নিগূঢ় বন্ধন আছে,—যাহা আমরা কাটাইয়া উঠিতে পারি না, অন্য সকল জাতি হইতে আমাদের স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্ব কিছু আছে, তাহা যত সামান্যই হউক—তখনই আমরা আমাদের জাতির প্রতি ভালবাসা পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করি। যখন আমরা আমাদের দেশের মধ্যে থাকি, তখন এই উপলব্ধি সুপ্ত থাকে, বিদেশে দূরদূরান্তে গেলে তাহা গাঢ়তর হইতে থাকে। এই উপলব্ধির নামই জাতীয়তা। ইহার সঙ্গে যখন দেশের প্রতি অনুরাগ যুক্ত হয়, তখনই আমাদের স্বজাতিপ্রীতি স্বাদেশিকতাতে পরিণত হইয়া থাকে। জাতীয়তা হইতেই আমরা স্বদেশ-প্রাণতা উপলব্ধি করি,—অর্থাৎ গণ্ডিটা একটু প্রসারিত হয়।

এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম এবং এক সুখদুঃখের ইতিহাস মোটামুটি-ভাবে স্বাদেশিকার ভিত্তিভূমি। কিন্তু বিভিন্ন জাতিপূর্ণ দেশেও স্বাদেশিকতা অসম্ভব নহে।

সাধারণতঃ দেশের দুঃখদুর্দশার দিনে স্বাদেশিকতা জাগিয়া উঠে। ইওরোপে প্রাচীন গ্রীসের স্পার্টান জাতির ইতিহাস এবং ভারতের রাজপুত জাতির ইতিহাস ইহার দৃষ্টান্তস্থল। গ্রীসের স্পার্টান জাতি স্বদেশরক্ষার জন্য অসাধারণ

শৌর্যের ও হৃদয়াবেগের পরিচয় দিয়াছিল। আক্রমণকারী মুঘলদিগের কৃপাণ যখন রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তাহাদের স্বাদেশিকতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই যে নিজের দেশ বা জাতিকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা এবং তজ্জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিতে প্রস্তুত থাকা, ইহাই স্বদেশপ্রীতির প্রকৃষ্ট লক্ষণ, এবং সকল ধর্মের উপরে ইহার স্থান।

স্বাদেশিকতা যাহার প্রাণে জাগিয়াছে, তাহার জীবন নিঃস্বার্থ। দেশহিতে তাহার নিকট আত্মসুখ তুচ্ছ। কিসে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে, কিসে দেশমাতৃকার সর্ববিষয়ে উন্নতি হইবে ইহাই তাহার একমাত্র ধ্যান, একমাত্র জ্ঞান। প্রকৃত দেশপ্রেমিক তাহার ব্যক্তিগত লাভক্ষতি তুলাদণ্ডে ওজন করে না—দেশহিতে আত্মত্যাগ করিতে সে সদা সমুৎসুক। সকল প্রকার সংকীর্ণতা, সামান্য লাভক্ষতি স্বাদেশিকতার আবেগস্রোতের সম্মুখে বন্যাবাহিত খড়কুটার মত ভাসিয়া যায়।

স্বদেশের এবং স্বজাতির বিপদে স্বদেশই একমাত্র প্রিয়, স্বদেশই শ্রেয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সংকীর্ণ স্বাদেশিকতায় স্বদেশের বিপদ ঘটে, অনিষ্ট হয়। বর্তমান জগতে শিক্ষাদীক্ষার ধারা ক্রমশই পরিবর্তিত হইতেছে, বিজ্ঞানের বলে পৃথিবীর দূরদূরান্ত আজ নিকটে আসিয়াছে। সমগ্র মানবজাতি যে এক, আজ তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। শিক্ষায় দীক্ষায় ও জ্ঞানে ধর্মে সমগ্র জগতে আজ এক নিগূঢ় ঐক্য স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং স্বাদেশিকতাকে আজ আর সংকীর্ণভাবে দেখিলে চলিবে না। স্বদেশপ্রেমের মধ্যে আজ আর হিংসার স্থান নাই—স্বদেশপ্রেমিককে বর্তমানে সর্বতোভাবে অহিংস হইতে হইবে। স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি অন্য জাতির অনিষ্টসাধনের জন্যই মানুষ তৎপর হয়, তবে তাহাতে অমানুষিকতাই প্রকাশ পায়—উহা উদার স্বদেশপ্রেমিকতার নিদর্শন নহে। বিশ্বমানবতার খাতিরে মনে রাখিতে হইবে যে, সংকীর্ণ স্বদেশপ্রাণতা প্রকৃত স্বদেশপ্রাণতা নহে।

বর্তমান বিজ্ঞান যেসকল ধ্বংসকারী যুদ্ধাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহার সহায়তায় অনায়াসে লক্ষ লক্ষ লোকের বিনাশ হইতে পারে, শস্যশ্যামলা ভূমির

জনসজ্ঘ লয়প্রাপ্ত হইতে পারে। পৃথিবীতে যে কয়টি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে, বর্তমান সভ্যতা সংকীর্ণ স্বদেশপ্রীতির ফলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তাই ভবিষ্যতে যাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ না ঘটে, তাহারই বিশ্বব্যাপী চেষ্টা হইতেছে। কারণ, সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহ হইতেছে সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার ফল। সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার মূল উৎপাটন করিয়া বিশ্বমৈত্রী স্থাপনই বর্তমান সভ্যজগতের অন্যতম সমস্যা।

আধুনিক জীবন ও সংবাদপত্র

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ সংবাদপত্র ও সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য—জনচিত্তের উপর সংবাদপত্রের প্রভাব—বহির্বিশ্বের সহিত যোগসাধনে সংবাদপত্র—প্রাক্-আধুনিক যুগে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা—সংবাদপত্রের উপকারিতা—সংবাদপত্রের দায়িত্ব।

উদ্ভিদের দুই শ্রেণী—ওষধি আর বনস্পতি। ওষধির আয়ু অল্প, সে ক্ষণকালের প্রয়োজন মিটাইয়া লুপ্ত হইয়া যায়। বনস্পতির আয়ু দীর্ঘ, সে দৈনিক আশু প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত মিলাইয়া যায় না। বরং, বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে রূপের এবং ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতে দিতে সে কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে আপনাকে প্রসারিত করিতে থাকে। উদ্ভিদ্-জগতের মত ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটা মানুষের প্রতিদিনকার প্রয়োজন সিদ্ধ করে,—ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদ-বহনে তাহার সমাপ্তি। আর একটা শাল-তমালের মতো দৃঢ় বলিষ্ঠ—অনন্তকালের মধ্যে সে নিজের বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য পরিবেশন করিতে করিতে চলে। ভাষার ঐ প্রথম শ্রেণীর প্রকাশকে বলা যাইতে পারে—সংবাদপত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকাশ—সাহিত্য।

সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র ওষধিরূপে দেখা দিলেও জনচিত্তকে অধিকার করার ক্ষমতা ইহার অপরিসীম। জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, ন্যায়-অন্যায়বোধ, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তীব্র মমত্ববোধ প্রভৃতি জাগাইয়া

দিতে সংবাদপত্র কম সহায়তা করে নাই। ক্ষণস্থায়ী ওষধি হইলেও সংবাদপত্র প্রতিদিনের তুষ্টি ও পুষ্টির প্রচুর ফসল ফলাইয়াছে।)

(আধুনিক যুগকে বিশেষ অর্থে মুদ্রণযন্ত্র এবং সংবাদপত্রের যুগ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে ইত্যাদি আবিষ্কার যেমন 'দূরকে করিল নিকট বন্ধু পরকে করিল ভাই', তেমনি মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে অধুনা বাহিরের বিশ্ব আমাদের নিকট প্রতিবেশীতে পরিণত হইয়াছে। এই বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীতে বসিয়াও নিত্য সংবাদপত্র-পাঠে বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ রাখা আজ কিছুমাত্র কঠিন নয়।)

প্রাক্-আধুনিক যুগে সমাজব্যবস্থা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, তখনকার নগর-নগরীগুলিও ছিল গ্রামেরই সুসজ্জিত অভিজাত সংস্করণ। ব্যবসায়-বাণিজ্যে শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির জন্যই ভূখণ্ডের অন্য প্রত্যন্তের সংবাদ জানিবার জন্য কাহারো কোন কৌতূহল তখন ছিল না। আর, দূর প্রদেশের সংবাদ জানিবার কৌতূহল থাকিলেও—দূত, চর প্রভৃতি ছিল তখনকার সংবাদ আহরণের উপায়। সেই সংবাদ সাধারণ্যে বিতরণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে পারস্পরিক নির্ভরতা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারে আধুনিক যুগ যেন আপন মুখপত্রকে খুঁজিয়া পাইয়াছে; নানাবিষয়ে পৃথিবীর দূর-দূরান্তের অধিবাসীরা পরস্পর আলোচনা-সমালোচনা, আদান-প্রদানের একটি অভিনব মাধ্যম লাভ করিয়াছে। উহাই 'সংবাদপত্র'। আজ সংবাদপত্র মনুষ্যজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।)

এখন সংবাদপত্রের কি ভূমিকা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। বর্তমান যুগ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান—সব দিক দিয়াই আন্তর্জাতিকতার পক্ষপাতী, ইদানীংকালে আর কেহ আপনার জন্মস্থানের চতুঃসীমার মধ্যেই সারাজীবন আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহাই বর্তমান সভ্যতার লক্ষণ। প্রত্যক্ষভাবে এই সংযোগ বহুব্যয়সাধ্য এবং প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সংবাদপত্রই ইহার সুলভতম অথচ প্রশস্ততম বিকল্প। কোন্ দেশে ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন,

কোথায় মালান সরকার সুদূর আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর অত্যাচার করিতেছে, তথাকথিত 'লৌহ-যবনিকা'র অন্তরালে সোবিয়েৎ দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সার্থকতার জন্য একনায়কতন্ত্রের অধীনেও জনকল্যাণরাষ্ট্র কিরূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, এ সকলই আমরা সংবাদপত্র মারফৎ জানিতে পারিয়াছি। বিশেষ বিশেষ ঘটনার গুরুত্ব বুঝিয়া সংবাদপত্রের আবার বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এখন আর পূর্বের মত পুরাতন খবরে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে হয় না।

ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংক্ষিপ্ততা—আধুনিক যুগের এই দুইটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্যক্তিপ্রতিভার বিকাশের অনুকূল কয়েকটি মৌলিক সুযোগ-সুবিধার তালিকা রাজনীতিকগণ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তাহার স্বপক্ষে জনমত গঠনের জন্য তাঁহারা বেতার, বক্তৃতামঞ্চ ও সংবাদপত্রের ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে সংবাদপত্রেরই যে জনপ্রিয়তা এবং প্রচার-ক্ষমতা বেশি, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই জন্যই আজ সংবাদপত্রের শুধু দৈনিক সংস্করণই প্রকাশিত হয় না, 'News digest'-শ্রেণীর সাপ্তাহিক এবং অর্ধ-সাপ্তাহিক সংস্করণেরও প্রকাশ দেখা দিয়াছে।

বর্তমান শতাব্দীতে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কোন আন্দোলনই সংবাদপত্রের সহায়তা ব্যতীত ব্যাপকতালাভ করিতে পারে না। পূর্বে 'Jack of all trades but master of none' সত্যই নিন্দনীয় ছিল, কিন্তু বর্তমানে যেন কালের তাগিদেই সকল মানুষকে সর্ববিষয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা রাখিতে হয়, নতুবা আধুনিক জগতের সহিত পুরাপুরি সামঞ্জস্য করিয়া চলা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য এজন্য বিশেষ কোন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিবার প্রয়োজনীয়তাও কমিয়া যায় নাই, বরং পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই উভয়বিধ জ্ঞানলাভের ব্যাপারেই একমাত্র সাহায্যকারী হইতেছে সংবাদপত্র; স্বল্প সময়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে চুম্বক আকারে সকল বিষয়কে অধিগম্য করিয়া তোলার কাজে ইহা সত্যই তুলনারহিত।

সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতির কথাকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করার বিষয়েও সংবাদপত্রের দান উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যের

মধ্যে ব্যবধান যেন অনেক কমিয়া আসিয়াছে। এখন সংবাদপত্রকেও স্থায়ী সাহিত্যসৃষ্টির বাহন করা হইয়াছে। ইহাতে ছোটগল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাকীর্তি, শিল্পকথা ইত্যাদিও আজ প্রকশিত হইতেছে। সাংবাদিকতাও আজ স্থায়ী সাহিত্যসৃষ্টিতে অনেক ক্ষেত্রে পর্যবসিত হইতেছে। আধুনিক জগতে সংবাদপত্র একাধারে দেশের ও সামাজিক জীবনের মুখপত্র, আবার মানসিক-সাংস্কৃতিক বৃহত্তর জীবনের মুখপত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব কম নহে। তাঁহাদের উপর পথ-প্রদর্শনের গুরুভার ন্যস্ত আছে। তাঁহারা ঠিক পথ প্রদর্শন না করিলে সমাজে সমূহ অকল্যাণ নামিয়া আসে। সংবাদপত্রে যদি বিকৃত সংবাদ পরিবেশিত হয়, অথবা বিভ্রান্তিপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে জনমতও সত্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

পূর্বে আমরা সংবাদপত্রের গঠনমূলক ভূমিকার কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইহার একটা আশঙ্কার দিকও আছে। আধুনিক কালে মানুষ যত অধিক পরিমাণে সংবাদপত্রকেই চরম সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিতেছে, ততই অনিবার্যভাবে আত্মবুদ্ধিতে হীন হইয়া পড়িতেছে এবং নানা বিভ্রান্তিকেও বিনা তর্কে মানিয়া লইতেছে। তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মিলিবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সংবাদপত্রগুলিতে। জার্মানীর সংবাদপত্রগুলিতে নাৎসীবাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হিটলারবাদকেই জার্মানজাতির মুক্তির একমাত্র পন্থা বলিয়া প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, মিত্রশক্তির সংবাদপত্রগুলিও অনুরূপভাবে নিজেদের জয়গানে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল।

বিগত দাঙ্গার সময়ে ভারতবর্ষের তথাকথিত জাতীয় সংবাদপত্রগুলির ভূমিকাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ সংবাদপত্রেই প্রত্যক্ষত অথবা পরোক্ষত সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উষ্ণতা প্রকাশ পাইয়াছিল। নীতির বদলে দুর্নীতি যখন রাজাধিরাজ হইয়া বসে, তখন জাতীয় অমঙ্গল জীবনকে নানাভাবে পঙ্গু করিয়া দেয়।

কিন্তু ইহার জন্য শুধুমাত্র সংবাদপত্রকে দায়ী করিলে চলিবে না। আধুনিক জীবনেরই ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন ইহার ধ্বংসাত্মক প্রবণতাগুলি লুক্কায়িত

রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্মরণীয়। নানা আত্ম-ঘাতী এবং ধ্বংসকারী চক্রান্তে মানুষেরই আবিষ্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে। তথাপি ইহার জন্য বিজ্ঞানকে ত' দোষ দিলে চলে না, বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরির ত' কোন প্রযোগশক্তি নাই! রাষ্ট্রপরিচালক-বর্গের অবলম্বিত বিশেষ রাজনৈতিক পন্থাই ইহার জন্য দায়ী। মানবকল্যাণ-কামী রাষ্ট্রশক্তির পরিচালনায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া-সকল ধ্বংসের পরিবর্তে মহতী সৃষ্টি এবং শান্তির পথকেই সুগম করিতে পারে। সংবাদপত্র সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা চলে। জাতীয় কল্যাণ এবং জনগণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংবাদপত্রের পরিচালন-নীতি নির্ধারণ করিলে, আশঙ্কার পরিবর্তে আশা-অভীপ্সাই বৃদ্ধি পাইবে।

কলেজীয় সাময়িকপত্র

প্রবন্ধ সংকেত ঃ সূচনা ঃ প্রচলিত সাহিত্যপত্রিকা ও কলেজীয় সাময়িকপত্রিকার মধ্যে বৈষম্য—কলেজীয় পত্রিকার বিশেষত্ব—কলেজিয় পত্রিকার উপকারিতা—উপসংহার।

ইংরাজী প্রবাদে রহিয়াছে—'Child is the father of man'; বাঙালী কবি ইহার অনুকরণে বলিয়াছেন, 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'। অর্থাৎ, প্রত্যূষের অরুণোদয় দেখিয়াই যেমন সমগ্র দিনটির সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া যায়, ঠিক তেমনি পরিণত বয়সে কে জীবনের কোন্ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে, তাহাও মানুষের শৈশব-প্রবণতা হইতেই নির্ধারণ করিতে পারা যায়। 'শিশুই জনক'—এই সিদ্ধান্ত কেবল মানুষের শারীর জীবন সম্বন্ধেই সত্য নহে, মানসিক জীবনের উপরেও ইহা পুরাপুরি প্রযোজ্য।

প্রচলিত সাহিত্যপত্রিকাগুলিতে কৃতী লেখক-লেখিকাদেরই রচনা প্রধানত প্রকাশিত হয়, নবাঙ্কুরিত উদীয়মান লেখকদের জন্য নির্দিষ্ট কয়েক পাতার বেশি

স্থান সংকুলান করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাছাড়া, প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত সাময়িকপত্রেরই একটা নিজস্ব মান (standard) এবং দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। ক্রেতাদের মুখ চাহিয়া সাময়িকপত্রিকাকে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা মানিয়া চলিতে হয়। পরিণত মনের ফসলসম্ভার বহন করিয়াই সাধারণ সাময়িকপত্র-গুলি আত্মপ্রকাশ করে। অথচ ফল ফলিবার আগে বীজবপন, জলসেচন, অঙ্কুরোদ্গম এবং ফুলধারণ ইত্যাদি ইহার অনেকগুলি যে পূর্বতন পর্যায় রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অন্তরালেই থাকিয়া যায়। বিদ্যায়তনিক সাময়িকপত্র-গুলি এই ফল ফলিবার আগের পালার সাক্ষী। টুক্‌টুকে রামায়ণ বা ঠাকুরমার ঝুলি পড়িবার আগে যেমন নির্জন ঘরে বসিয়া হাতেখড়ি করিতে হয়, তেমনি পরিণত লেখক হওয়ার পিছনে একটা সাহিত্যসাধনার হাতেখড়ি পর্ব আছে। এই পর্বের অপরিহার্য সামগ্রী বিদ্যায়তনিক সাময়িকপত্র। কলেজীয় পত্রিকা-গুলি সাহিত্যিক মূল্যে নিতান্তই ন্যূন, কেবল একটা 'খুশি'র আনন্দে তাহারা উদ্ভাসিত, 'লেখা'র গৌরবে তাহারা বড় নহে।

শিক্ষায়তনকে শুধুমাত্র পাঠ্যপুঁথির মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে শিক্ষণীয় বিষয়-গুলিকে ভালভাবে অধিগত করা যায় না, উহাতে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশও ব্যাহত হইয়া থাকে। তালিকা মুখস্থ করা শিক্ষা প্রাণেরই পরিপন্থী, তাহা কোনদিন মানব-জীবনের বৃহত্তর কল্যাণসাধনের পথে সহায়ক হইতে পারে না। 'অচলায়তনে'র শিক্ষার্থীরা প্রাণের অভাবেই জীবন্মৃত হইয়াছিল। মুক্তমনের স্পর্শে তাহারা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। কলেজ-জীবনের নানা জটিল পাঠ্য-বিষয়ের ভিড় বাঁচাইয়া ছাত্রছাত্রীরা একটু মানসিক অবকাশ উদ্‌যাপন করিতে চায়, কাজের চাপে ক্লান্ত মানুষ আবার নূতন উদ্যম ফিরিয়া পাইবার জন্যই উদার আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া দেয়। স্কুলগৃহের সংলগ্ন একটি খেলার মাঠ যেমন স্কুল-জীবনেরই অপরিহার্য অঙ্গ, কলেজ-জীবনেও সেইরূপ অপরিহার্য কলেজীয় সাময়িকপত্র। শিক্ষার কর্কশতা লঘু করিবার জন্যই খেলার আনন্দ প্রয়োজনীয়। কলেজ-পর্যায়ে এই আনন্দ শুধু শারীরিক খেলায় সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না,—আত্মার খেলা, মানসিক লীলাবিলাসের মধ্যেও তাহা আত্মপ্রকাশ করিবে। সাহিত্যিক প্রচেষ্টা সেই মানসিক লীলাবিহারের

সর্বোত্তম প্রকাশ। শিক্ষায়তনিক ঘেরাটোপের মধ্যে কলেজীয় সাময়িকপত্রই একমাত্র আনন্দের 'সন্দেশবহ'।

শিক্ষকেরাও এই পত্র মারফৎ নিজেদের পঠন-পাঠনপ্রণালীর প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিতে পারেন। তাঁহাদের শিক্ষণ-পাঠন আত্মসাৎ করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ কতখানি নিপুণভাবে সেই শিক্ষালব্ধ বিষয়কে পুনঃসৃষ্টি করিতে পারিল, তাহার পরিচয় সাময়িকপত্রের সর্বত্র ইতস্তত ছড়ানো থাকে। দধীচির মত তিলে তিলে আত্মরক্ষা করিয়া শিক্ষকসমাজ যে জাতিগঠনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কোন ব্যবহারিক প্রতিদান তাঁহারা পান না। আর্থিক দারিদ্র্য তাঁহাদের প্রায় নিত্যসঙ্গী; কেবল মন ও মননের প্রাচুর্যে এবং আদর্শানুরাগের টানে তাঁহারা নীরবে কঠোর তপশ্চরণ করিতেছেন। এইরূপ বিষণ্ণ-করুণ শিক্ষকজীবনও আনন্দ-ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যখন তাঁহাদের ছাত্রদের ভিতর হইতে কাহারো কোন প্রতিভার লক্ষণ প্রকাশ পায়। পাঠার্থী কবি-গল্পকার কিংবা শিল্পী-প্রবন্ধকার অনেকেরই প্রথম অনুরাগী পাঠক এবং সমালোচক তাঁহাদের শিক্ষক। কলেজীয় পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প প্রবন্ধের জন্য শিক্ষকের নিকট উৎসাহ পাইয়া অনেক শিক্ষার্থীই তাঁহাদের উত্তরজীবনে প্রতিষ্ঠাবান্ লেখক হইয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত খুঁজিলে বহু মিলিবে।

তাছাড়া, কলেজীয় সাময়িকপত্র প্রকাশনের একটা ব্যবহারিক দিকও আছে। বিশেষ কোন বিদ্যায়তনের শিক্ষাসমস্যা, অভাব-অভিযোগ বিশেষত সেই বিদ্যায়তনের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্যই। সাধারণের নিকট তাহার কোন আবেদন নাই। সর্বসাধারণের কৌতূহলের সামগ্রীই কেবলমাত্র সংবাদ-পত্র তথা প্রচলিত সাময়িকপত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিদ্যায়তনিক পত্রিকার মাধ্যমে ছাত্রদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে নিজেদের প্রতিষ্ঠানগত সমস্যাগুলির উপর তথা বৃহত্তর অর্থে ছাত্রকল্যাণকর এবং শিক্ষাসমস্যার উপরেই আলোকপাত করা সম্ভব হইয়া থাকে।

ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি দানা বাঁধিয়া উঠে। ছাত্রদের মানসজীবন আত্মপ্রকাশের একটি মাধ্যম খুঁজিয়া পায়। সম্পাদকীয় রচনা, বিতর্কমূলক আলোচনা, সাময়িক প্রসঙ্গ ইত্যাদি নানা বিভাগে শুধু যে

তাহাদের বুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নয়, এই কলেজীয় সাময়িকপত্র পরিচালনার মধ্য দিয়াই ছাত্রদের দায়িত্বজ্ঞান ও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে।

সাধারণত শিক্ষাপ্রাচীরের পিছনে ক্লাসরুমের মধ্যে শিক্ষক তাঁহার ছাত্রের যে পরিচয় পান তাহাই যেমন সবটুকু নয়, তেমনি পাঠ্যবিষয়ক বক্তৃতাশক্তির পরিমাপ করিয়াও অধ্যাপকমণ্ডলী সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা চলে না। কলেজীয় সাময়িকপত্রের অঙ্গনে অনেক তথাকথিত অকৃতী ছাত্রের গুণবত্তায় অধ্যাপকগণ মুগ্ধ হন; আবার বক্তা হিসাবে সুপটু নহেন এমন অধ্যাপকের হৃদয়ের ঐশ্বর্যের পরিচয়ও ছাত্রমনে চিরস্থায়ী হইয়া যায়। ছাত্র এবং অধ্যাপকের মধ্যে একটা পারস্পরিক আদান-প্রদানের এমন সুবর্ণসেতু আর নাই। প্রতি বিদ্যায়তনেই নিজস্ব সাময়িকপত্রকে কেন্দ্র করিয়াই সাহিত্য-সমিতি তথা একটি সাহিত্যিক এবং জিজ্ঞাসু পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠে।

বিদ্যায়তনিক জীবনে কলেজীয় সাময়িকপত্র অপরিহার্য হইলেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইদানীং এ বিষয়ে ছাত্রদের উৎসাহ অনেক হ্রাস পাইয়াছে। অবশ্য ইহার দ্বারা বর্তমান ছাত্রসম্প্রদায়ের সাহিত্যিক নিষ্ঠাই কমিয়া গিয়াছে এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। বর্তমানে ছাপার অক্ষরে বই বাহির করা পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ হইয়াছে। ছাত্রেরাই অনেক সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। তাই কলেজীয় পত্রিকাগুলির প্রতি ছাত্র-লেখকদের আর তেমন সুনজর নাই। প্রায় প্রতিমাসেই দুই-একটি করিয়া বাংলা মাসিকপত্র জন্মগ্রহণ করিয়া স্বল্পকালের মধ্যেই আবার অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ইহাদের অধিকাংশই আবার ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহাতে কলেজীয় পত্রিকার যথোচিত বিকাশ ব্যাহত হইয়াছে।

তরুণ বিদ্যার্থী সাহিত্যিকদের অসংখ্য নূতন পত্রগুলি দীর্ঘায়ু হইলেও কলেজীয় সাময়িকপত্রের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায় না। কলেজ উচ্চতর শিক্ষার পীঠস্থান, কলেজীয় পত্রিকা সেই শিক্ষারই অব্যবহিত ফল ধারণ করে। সুতরাং ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া ইহার উন্নতি ও সার্বিক সুষ্ঠুতার জন্য পাঠার্থী এবং শিক্ষকমণ্ডলী—উভয়েরই যত্নবান হওয়া উচিত।

যে সয় সে রয়

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ দুঃখ-বিপদ আঘাত-সংঘাত মানবজীবনের উন্নতির মূল—ইতিহাসের শিক্ষা—পৃথিবী শক্তিমানের জন্য—মানবজীবনে দুঃখ-বিপদ বিধাতাব আশীর্বাদ—দুঃখ-বেদনা কি করিয়া মানুষকে বড কবে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

দুঃখ, বিপদ, বিরোধ এবং আঘাতের মধ্য দিয়াই মানুষের জীবন সার্থকতায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়াই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়া থাকে। ধূপকে না পুড়াইলে যেমন তাহার গন্ধ বাহির হয় না, প্রদীপে অগ্নি-সংযোগ না করিলে যেমন উহার আলোক বিচ্ছুরিত হয় না, দুঃখ-বিপদের আঘাত প্রাপ্ত না হইলেও তদ্রূপ মানবজীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই কবি বলিয়াছেন—

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
　　গন্ধ তাহার নাহি ঢালে,—
আমার এ দীপ না জ্বালালে
　　দেয় না তাহার আলো।

পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিতে হইলে, কিংবা জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে মানুষকে নিত্যনিরন্তর প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, বিপদ-আপদ-দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। নিরন্তর সংগ্রামই জীবন। জীবনের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে।

পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, যে-জাতি দুঃখ-বিপদকে যত বেশি সহ্য করিতে পারিয়াছে, সেই জাতির স্থায়িত্বের ভিত্তি তত পাকা হইয়াছে। আঘাত যে জাতি সহ্য করিতে পারে নাই, সে জাতি কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। প্রাণিজগতেও দেখা যায় যে, যে শ্রেণীর প্রাণী প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত যত বেশি সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই শ্রেণীর প্রাণীই পৃথিবীতে আজিও টিকিয়া আছে। আর যে শ্রেণীর প্রাণী প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে নাই,

তাহারা কবে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরকালের জন্য অবলুপ্ত হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কত প্রাণীর কথা আমরা আজ জানিয়াছি। কিন্তু তাহারা আজ বিলুপ্ত।

সুতরাং ইতিহাস নিরন্তরই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, এ পৃথিবীটা শক্তিমানের জন্য। দুর্বলের স্থান এখানে নাই। নৈরাশ্য এবং ব্যর্থতায় মুহ্যমান হইয়া পড়িলে জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়িবে। দুঃখ-বিপদের সহিত সংগ্রামবিমুখ মানব কোনদিনই তাহার জীবনে শুভফল লাভ করিবে না।

মানুষ যে তাহার জীবনে পদে পদে দুঃখ-বিরোধের সম্মুখীন হয়, উহা বিধাতার অভিশাপ নহে—উহা বিধাতার আশীর্বাদ, কারণ সহিষ্ণুতাই মানব-জীবনে আনে শক্তি ও সাহস। উহাই মানুষের অন্তরকে সবল ও দৃঢ় করিয়া তোলে। যে মানুষ বা যে জাতি দুঃখ-বিপদ আঘাত-বিরোধ জয় করিতে পারে, তাহারই ললাটে বিধাতা অস্তিত্বের ও খ্যাতির জয়টিকা আঁকিয়া দেন। যে মানুষ বা জাতি দুঃখের দাবদাহে নিরুদ্যম হইয়া পড়ে, সেই মানুষ এবং সেই জাতি উন্নতির মুখ কখনও দেখিতে পায় না।

পৃথিবীতে যাঁহারাই বড় হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে যে কত বাধাবিঘ্ন, দুঃখকষ্ট আসিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবের জীবন, অথবা রামায়ণের রামচন্দ্রের জীবন কষ্টসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়াই সুন্দর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সীতা, সাবিত্রী ও বেহুলার জীবন দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়া খাঁটি সোনার মত দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বুদ্ধ, মহম্মদ, যীশু, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ধর্মগুরুগণ বহু বাধাবিঘ্ন, দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহারা হতোদ্যম হইয়া পড়েন নাই বলিয়া তাঁহাদের ধর্মমত আজিও পৃথিবীর কত লোক অনুসরণ করিতেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁহার প্রথম জীবনে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। পরবর্তী জীবনে সমাজসংস্কার-ব্রতে ব্রতী হইয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ দেশবাসীর লাঞ্ছনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু দারিদ্র্যের দুঃখ এবং সমাজের লাঞ্ছনা,—উভয়বিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অপার সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। আমেরিকা-আবিষ্কারক কলম্বসের জীবনে, বৈজ্ঞানিক গেলিলিওর

জীবনে কত বাধাবিঘ্ন আসিয়াছে; কিন্তু সহিষ্ণুতার গুণেই তাঁহারা কালজয়ী হইয়াছেন।

কেবল বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের জীবনেই নহে, সাধারণ মানুষের জীবনেও বাধাবিঘ্ন এবং দুঃখের আঘাত আসিয়া থাকে। সমাজ-জীবনে ও জাতির জীবনেও লাঞ্ছনা, নির্যাতন এবং দুঃখের কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিয়া থাকে। কিন্তু সেই দুঃখলাঞ্ছনাকে জয় করিয়াই মানুষকে, সমাজকে, এবং জাতিকে তাহার জীবনীশক্তির পরিচয় দিতে হয়।

মানবচরিত্রে জলবায়ুর প্রভাব

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ সূচনা—জলবায়ু ও মানবচরিত্র—প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে বিজয়ী মানুষ—মানবচরিত্রে প্রকৃতির প্রভাব—মরুভূমির মানবসম্প্রদায়ের চরিত্র—পার্বত্য-ভূভাগের মানবচরিত্রের বৈশিষ্ট্য—অতিরিক্ত শীত ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানবচরিত্র—নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানবচরিত্র—শীতপ্রধান ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মানবচরিত্র—জলবায়ুর প্রভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের মানবচরিত্র ঃ তুলনা।

পৃথিবীতে বহু দেশ, দেশে দেশে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের বাস। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির দৈহিক গঠন, শক্তি-সামর্থ্য, মানসিক গঠন, রীতি-নীতি, খাওয়া-পরা বিভিন্ন। কেন এমন হয়? উত্তরে বলিতে হয়—মানবজাতির এই বৈচিত্র্য জলবায়ুর প্রভাবে ঘটিয়াছে। মানুষের চরিত্র, তাহার আচার-অভ্যাস, মানসিক প্রবণতা ইত্যাদি অনেক পরিমাণে তাহার জন্মভূমির জল-বায়ুর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মানুষ বিজয়ী হইয়াছে সত্য,—মানুষ অগাধ অসীম বারিধিকে জয় করিয়াছে, রত্নাকরের তল হইতে কত মণি-মুক্তা রত্ন আহরণ করিয়া আনিয়াছে, জাহাজ ভাসাইয়া অকূল সাগরের কূল খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। অন্তরীক্ষে কল্পনার পুষ্পকরথকে মানুষ আজ সত্যসত্যই ছুটাইয়াছে, তুন্দ্রাভূমি পার হইয়া মেরুমণ্ডলে পৌঁছিয়াছে, অরণ্য কাটিয়া,

পর্বত বিদীর্ণ করিয়া, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া রেলপথ লইয়া গিয়াছে। দুর্গম প্রদেশে খনির আবিষ্কার করিয়াছে, মরুভূমিকেও উর্বরা করিয়া সেখানে ফসল ফলাইয়াছে, বিস্তীর্ণ অরণ্য ও তৃণভূমির স্থলে জনপদ বসাইয়াছে। প্রকৃতির যেখানে নিষেধ, মানুষ সেখানেই সক্রিয় সংগ্রামশীল এবং সেই সংগ্রামে মানুষই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হইয়াছে, পৃথিবীতে ইহাই দেখিতেছি। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির প্রভাব মানুষ এড়াইতে পারে নাই। মানুষ যেমন প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, প্রকৃতিও তদ্রূপ মানুষের উপর তাহার প্রভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে।

পৃথিবীর কোথাও বৃষ্টিহীন মরুভূমি, কোথাও বন্ধুর কঠিন পার্বত্য-ভূভাগ, কোথাও উর্বরা কোমল সমতলভূমি, কোথাও শীতের আধিক্য, কোথাও গ্রীষ্মের আধিক্য, কোথাও বৃষ্টিপাতের আধিক্য। জলবায়ু ও আবহাওয়ার এই বিভিন্নতা-হেতু মানবচরিত্র বিভিন্নভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে দেখা যায়।

বৃষ্টিহীন মরুভূমির অধিবাসীরা মরুর ঝড়ের মতই উদ্দাম চঞ্চল প্রকৃতির হইয়া থাকে। মরুভূমির প্রকৃতির মতই মরু-অঞ্চলের মানুষের প্রকৃতি রুক্ষ, উগ্র ও দুর্ধর্ষ। মরুভূমিতে জীবিকার্জনের সুযোগ নাই বলিয়াই তাহারা যাযাবর। মরুবাসীরা আজ যেখানে তাঁবু পাতিল, সেখানকার খাদ্যশস্য যাহা পাইল তাহা দিয়া দিনকয়েক বেশ অতিবাহিত করিল। তারপর মরুপ্রকৃতির সীমাবদ্ধ দান যখন নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন তাহারা খাদ্যসংস্থানের নিমিত্ত অন্য আর এক স্থানে যাত্রা করিল। বেদুইনগণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। যে প্রাকৃতিক পরিবেশে ইহাদের বাস, সে প্রকৃতি মমতাময়ী মাতৃরূপিণী নহেন। তাই বেদুইন প্রভৃতি মরুবাসীরাও নির্মম—লুণ্ঠন, নরহত্যায় ইহারা কুণ্ঠিত নহে।

বন্ধুর কঠিন পার্বত্য-ভূভাগের অধিবাসীরা দৃঢ় হয়, কর্মঠ হয়। পাথরের মতই উহাদের দেহের গড়ন—সাঁওতাল, নেপালী, ভূটিয়া, তিব্বতীয় প্রভৃতিরা ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

যেখানে শীত অত্যধিক, সেখানকার মানুষ পুরজনপদ গড়িতে পারে না, সভ্যতার জন্মদান করিতে সমর্থ হয় না। কারণ শীতাধিক্যবশত সে সকল

অঞ্চলে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না, দেহ-মনের শক্তি অসাড় হইয়া যায়। এই কারণে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ঘনবসতিপূর্ণ লোকালয় গড়িয়া উঠে নাই। অতিরিক্ত যেখানে গ্রীষ্ম সেখানে মানুষ অল্পায়ু এবং অসভ্য। অতিরিক্ত উত্তাপবশত মানুষ কর্ম-ক্ষমতাহীন হইয়া পড়ে, তাহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত যেখানে, সেখানে মনুষ্য-বসতি কম। ঐরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশও মানুষের মনুষ্যত্ব ও শক্তিবিকাশের অন্তরায়। অমন অঞ্চলেও মানুষ অসভ্য থাকিয়াই যায়। সভ্যতা সংস্কৃতির জন্ম দিতে তাহারা অসমর্থ।

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যে অঞ্চলে শীতও বেশী নয়, গ্রীষ্মও বেশী নয় এবং বৃষ্টিপাত পরিমিত—সেইখানে মানুষের শক্তির সম্যক বিকাশ ঘটিয়াছে। তাই দেখা যায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই পৃথিবীর সকল সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডল নদনদী পলিমাটির দেশ। ঐ অঞ্চলের জলহাওয়া যেমন আর্দ্র, তেমনি উষ্ণ। প্রকৃতি এই নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলে মমতাময়ী—এইজন্য মানুষকে এখানে জীবিকা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করিতে হয় নাই। ফলে এখানকার অধিবাসীদের মেধা ও কল্পনাশক্তি সম্যকভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। সামান্য সময় ও শক্তির প্রয়োগেই তাহারা তাহাদের জীবিকার সংস্থান করিয়াছে, বাকি সময় ও শক্তি তাহারা শিল্প সংস্কৃতি সভ্যতার উন্নতিসাধনে ব্যয় করিতে পারিয়াছে।

শীতপ্রধান ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই—তাহারা সাহসী ও কর্মঠ। জীবিকাসংস্থানের উপায় তাহারা নিজেদের দেশের মধ্যে করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই পৃথিবীর দিকে দিকে তাহারা বাণিজ্য-ব্যপদেশে গিয়াছে, কোথাও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, কোন দেশকে অধিকার করিয়া সে দেশের সম্পদে নিজেদের অভাব মোচন করিয়াছে। 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' আফ্রিকায়, রেড্ ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রো-অধ্যুষিত আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, এমনি আরও কত কত দেশে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। দুঃখ বিপদ, বিরোধ মৃত্যু—শত প্রতি-

বন্ধকতাকেও তাহারা গ্রাহ্য করে নাই। দিকে দিকে নিজেদের ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। গৃহের মায়া, পিছনের আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া তাহারা দূরদূরান্ত দেশে প্রবাসী হইয়াছে, সেখানে অরণ্য কাটিয়া নগর বসাইয়াছে, জনবিরল অঞ্চলকে অথবা অসভ্য-মানুষ-অধ্যুষিত অঞ্চলকে সুসভ্য মানুষের বাসভূমিতে পরিণত করিয়াছে। অপরদিকে ভারতবর্ষ ও বাংলার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই—ভারতবাসী ও বাঙালী গৃহের মায়ায় বদ্ধ, সম্মুখের আকর্ষণ অপেক্ষা পিছনের আকর্ষণ তাহাদের বেশি। তাহারা জগৎসংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিয়া গিয়াছে, অলস, শ্রমবিমুখ, উচ্চাকাঙ্ক্ষাবিহীন হইয়াছে, নানাবিধ জীর্ণ সংস্কারে জড়ীভূত হইয়া দারিদ্র্যের মাঝেই দিনাতিপাত করিয়াছে। এক কথায়, জলবায়ুর প্রভাবে প্রতীচ্য গতির পূজারী হইয়াছে, প্রাচ্য স্থিতিকেই শ্রেয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।

জনসেবা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ সূচনা—জনসেবার প্রয়োজনীয়তা—প্রাচীন ভারতে জনসেবা—স্বামী বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণ সেবা—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জনসেবা—জনসেবার প্রশস্ত ক্ষেত্র—যুবকদিগের কর্তব্য—উপসংহার।

জনসেবা পরম ধর্ম। প্রবাদে উক্ত হয় যে—জনসেবাই ভগবৎসেবা। মহাত্মা আবু বেন আদেমের কাহিনী সর্বজনবিদিত। তিনি স্বচক্ষে জীবন-পুস্তক লিখিত দেখিয়াছিলেন—যাঁহারা জনসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই ভগবানের আশীর্বাদ প্রথমে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। আবু বেন আদেমের কাহিনী কবির কল্পনা; কিন্তু ধীরভাবে বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, জনসেবা ভগবৎ-সেবার প্রথম সোপান।

আমরা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট অশেষ ঋণে আবদ্ধ। সুতরাং আমরা তাঁহাদের সেবা করিব। আমরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, একের ব্যতিরেকে অন্যে কখনও সাফল্য লাভ করিতে পারে না। এই সামাজিক ঋণ পরিশোধ করা—অন্তত পরিশোধের চেষ্টা করা—সভ্য মানুষের অন্যতম কর্তব্য।

যে সমাজ আমাদের খ্যাতি ও শক্তির লীলাভূমি, যাহার সাহায্যে আমরা জীবন বিকশিত ও সার্থক করিতে পারি, যে স্থানে অবস্থিত হইয়া শক্তি ও আত্ম-বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছি—সেই সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করা আমাদের সকলেরই প্রথম কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে সেবাধর্ম পরমধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যেও জীবসেবার ব্যবস্থা দেখা যায়। গৃহস্থগণের নিত্য-করণীয় পঞ্চযজ্ঞের দুইটি যজ্ঞ হইতেছে—নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। নৃযজ্ঞ হইতেছে—অতিথিসেবা এবং ভূতযজ্ঞ হইতেছে—ভূত অর্থাৎ জীবজন্তুদিগের সেবা। গৃহস্থগণই বিবিধ দান দ্বারা সমগ্র সমাজকে ধারণ ও পালন করিতেন। বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের পর এদেশে বৃহত্তর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া জন-সেবার চেষ্টা হয়। বৌদ্ধসঙ্ঘ জনসেবার অন্যতম বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। রাজানুগ্রহে দেশে বহু চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। নবজাগরণের সঙ্গে জনসেবার বিবিধ ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়।

ভারতবর্ষ বহু যুগ পূর্বে স্বীকার করিয়াছে—জনসেবা মানুষকে সত্যকার মানুষে পরিণত করে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাদ-প্রক্ষালন করিয়া অতিথিসেবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় প্রেমধর্মের আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য দরিদ্র-সেবাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রই ছিল—'দরিদ্র-দেবো ভব'। ঋষির এই মহান্ আদর্শ বিফল হয় নাই। দেশের বহুস্থানে আজ সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই বাংলার যুবক-সম্প্রদায় নানাভাবে সম্মিলিত হইয়া প্রশংসার সহিত সেবাকার্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। বাংলার যুবকসঙ্ঘ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িত দুর্গত জনসাধারণের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সেবাধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

আমাদের বর্তমান কর্তব্য সেবাধর্মের এই মহান্ আদর্শ দেশের যুবকবৃন্দের হৃদয়ে ব্যাপকভাবে জাগ্রত করা। বর্তমানে পল্লীই জনসেবার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশস্ত

ক্ষেত্র। যুবকদিগকে দেখিতে হইবে পল্লীর কোনও মেলায় বা উৎসবে জনসাধারণ যেন কোনরূপে বিপন্ন না হয়। আজিও পল্লীগ্রামে শত শত লোক কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে। বন্যায় ও দুর্ভিক্ষে পল্লীবাসীর দুঃখকষ্টের আর সীমা থাকে না। কিভাবে এই সকল দুঃস্থ হতভাগ্য দুর্গতগণের সেবা করিতে হইবে, যুগাচার্য বিবেকানন্দ স্পষ্টাক্ষরে তাহার নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। দেশের সর্বস্থল হইতে অর্থ, অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি লইয়া দুর্গতদের মধ্যে বিতরণ কর। আর্ত, ব্যথিত, রোগাক্রান্তদের শুশ্রূষা কর, তাহাদিগকে ঔষধ পান করাও।

"জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"—দুর্গতদের ঘৃণা করিয়া আমাদের ভগবানের নাম গ্রহণের অধিকার নাই—তাহাদের মধ্যেই ভগবান্ রহিয়াছেন। সেবাধর্মের ইহাই চরম আদর্শ।

কুটীরশিল্প

প্রবন্ধ-সংকেত: কুটীরশিল্প কাহাকে বলে—ভারতবর্ষের, বিশেষত বাংলার প্রাচীন এবং আধুনিক কুটীরশিল্প—কুটীরশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়—কুটীরশিল্প ও দেশের দারিদ্র্যমোচন—কুটীরশিল্পের অবনতির কারণ: যন্ত্রশিল্পের প্রসার—কুটীরশিল্পের পুনরুন্নয়ন: তাহার উপায়—উপসংহার।

এককালে ভারতবর্ষের গ্রামসকলই ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র, শিল্প-সৃষ্টিরও কেন্দ্রভূমি। তখন পল্লীতে পল্লীতে এক বস্তু হইতে বা একাধিক বস্তুর সমবায়ে মানুষের প্রয়োজন ও বিলাসের বিবিধ জিনিস তৈয়ারী হইত। তখন তাঁতীরা ঘরের তাঁতে কাপড় বুনিয়া হাটে বিক্রয় করিত, শাঁখারীরা শাঁখা তৈয়ারী করিত, কুমারেরা মাটির জিনিস তৈয়ারী করিত, মুচিরা চামড়ার জুতা তৈয়ারী করিত, অনেক গৃহস্থই ঝুড়ি-চাঙারি বুনিত, শীতলপাটি বুনিত। কোন কোন স্থানে হাতে তৈয়ারী কাগজ—যাহাকে আমরা আজিও তুলট কাগজ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি—তাহা উৎপন্ন হইত। স্ত্রীলোকেরা অতি উৎকৃষ্ট কাঁথা তৈয়ারী করিতে পারিতেন। ফুল-লতাপাতা-কাটা হাতে তৈয়ারী কাঁথা

আজিকার দিনের বাহারী শতরঞ্জির মতই সমাদর লাভ করিত। এই সকল শিল্প,—যাহা গ্রামবাসী গৃহস্থের কুটীরেই নিষ্পন্ন হইত, যে-সকল দ্রব্য নির্মাণ করিতে বেশী লোক, বেশী দামী সরঞ্জাম এবং মূলধন দরকার হইত না,—তাহাই কুটীরশিল্প।

প্রত্যেক গ্রামে এক একটি শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। যেমন, তাঁতী, কুমার, কামার, শাঁখারী, কাঁসারী প্রভৃতি। ইহারা পুরুষানুক্রমে আপন পিতা-পিতামহের শিল্পকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিত। বংশানুক্রমে একই শিল্পকার্যে রত থাকায় শিল্পকৌশল আয়ত্ত করা ও ক্রমশ তাহার উন্নতিবিধান করাও শিল্পীর পক্ষে সেদিন সম্ভব ছিল। পল্লীর শিল্পজাত দ্রব্যে পল্লীর অভাব মিটিত। সময়ে সময়ে গ্রামের অতিরিক্ত শিল্পসম্ভার বিদেশে রপ্তানী হইত। ভারতের,—তথা বাংলার কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য জগতের শৌখীন রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আদরের সামগ্রী ছিল। বাংলার সূক্ষ্ম বস্ত্র মসলিন ভারতের বাহিরের বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইত, সমাদৃত হইত।—

"বাংলার মসলিন বোগদাদ রোম চীন,
কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন।"

কেবল প্রাচীনকালে নয়, আজিও বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্যবিশেষের খ্যাতি আছে। ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুরের কাপড়; মুর্শিদাবাদের বাসন, রেশম ও রেশমী বস্ত্র, হাতীর দাঁতের জিনিস; কৃষ্ণনগরের মাটির জিনিস; কাঞ্চননগরের ছুরি কাঁচি প্রভৃতি এখনও বিখ্যাত। বাংলার কথা ছাড়িয়া অন্য প্রদেশসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় যে, ভারতের অন্য বহু প্রদেশেও কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য কম উৎপন্ন হয় না। স্থায়িত্বে ও সৌন্দর্যে তাহারা অতুলনীয়। দক্ষিণাত্যের বিভিন্ন প্রদেশে সূতীর কাপড়, চাদর, পর্দার কাপড় তৈয়ারী হইয়া থাকে। মহীশূর সরকারের উৎসাহে সেখানে আজিও প্রচুর রেশম উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহা হইতে অনেক রকম উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি নির্মিত হইতেছে। উড়িষ্যার ও মণিপুরের কাপড়, চাদর, পর্দার কাপড় বিখ্যাত। মাদ্রাজ অঞ্চলে বাজার-হাট করিবার জন্য একপ্রকার মোটা সূতার জালের

থলি ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় থলি খুব মজবুত, সস্তা অথচ সুদৃশ্য। এগুলি নানা রঙেরও হইয়া থাকে। মাদ্রাজে সূতী-দড়ির তৈয়ারী একরকম বিছানাপত্র বাঁধিবার স্ট্র্যাপ পাওয়া যায়। এগুলির দাম চামড়ার স্ট্রাপের চেয়ে কম, অথচ সুদৃশ্য এবং মজবুত।

বর্তমানকালে কুটীরশিল্পের টিকিয়া থাকার পক্ষে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কুটীরশিল্প টিকিয়া আছে। কারণ, কুটীরশিল্প যে কেবলমাত্র মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ তাহা নহে, ইহা মানুষের সৌন্দর্যপিপাসাকেও চরিতার্থ করিতে সমর্থ। যন্ত্রজাত বস্তুর বৈচিত্র্য কম এবং তাহাতে শুধু যন্ত্রেরই ছাপ, শিল্পীর কলাস্পর্শ তাহাতে নাই। এইরূপ জিনিসে জীবনযাত্রার স্থূল প্রয়োজন মিটিতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না। মানুষমাত্রেই শিল্পকলার সঙ্গে একটু ললিতকলা চায়, শৌখীন লোকে অনন্যসাধারণতাও চায়। এইখানে কুটীরশিল্পের জয়। এইজন্যই আজিও সহস্র প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কুটীরশিল্প আপন অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে। গঠনের বৈচিত্র্য, কারুকার্যের নবনবতা কুটীরশিল্পে যতখানি সম্পাদন করা সম্ভব, যন্ত্রশিল্পে ততখানি নয়।

জিনিসটা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই সুস্পষ্ট হইতে পারে। আমাদের দেশীয় তাঁত যে আজিও টিকিয়া আছে, তাহার কারণ শুধু কাপড়ের সুদৃশ্যতা এবং স্থায়িত্ব নয়। তাঁতী যত শীঘ্র বস্ত্রবয়নের ক্ষেত্রে তাহার পরিকল্পনা বদলাইতে পারে, কল তাহা পারে না। কলে কয়েকরকম মাত্র জিনিস বহুল-পরিমাণে করা যায়, তাঁতে অল্পপরিমাণে হইলেও অনেকরকম জিনিস তৈয়ারী হইতে পারে। যদি উপাদান সুলভ হয়, তবে তাঁতীর পক্ষে নূতন নূতন ধরনের কাপড় তৈয়ারী করা অসাধ্য হয় না। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, পাড়ের বৈচিত্র্যের প্রথম উদ্ভাবক তাঁতী। কল প্রথমটায় তাঁতীর নকল করিত, এখন অবশ্য কলওয়ালারা ক্রেতার রুচি অনুমান করিয়া নিজেই নিজের বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করিয়াছে।

(কুটীরশিল্প কেবল যে ক্রেতার প্রয়োজন মিটাইয়াছে, ক্রেতাকে আনন্দ দিয়াছে,—তাহা নহে। কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া পল্লীবাসীরা তাহাদের

দারিদ্র্য মোচন করিতেও সমর্থ হইয়াছে। পল্লীবাসীরা অনেকেই, বিশেষত পল্লীরমণীগণ অবসরকালে সূতা কাটিয়াছে, ঝুড়ি, দড়ি তৈয়ারী করিয়াছে। দড়ি দিয়া সিকা তৈয়ারী করিয়াছে, জাল বুনিয়াছে। ইহাতে পল্লীবাসীর জীবন দারিদ্র্যে জর্জরিত হইয়া উঠিতে পারে নাই।

আজ আমাদের দেশের কুটীরশিল্প লুপ্তপ্রায়। আমরা কুটীরশিল্পের সূক্ষ্ম কারিগরির সমাদর ভুলিয়া যন্ত্রশিল্পের নকল চাক্‌চিক্যে ভুলিয়াছি। বর্তমান যুগ যন্ত্রের যুগ। এ যুগে বাষ্পীয় শক্তির সহায়তায় অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির সহায়তায় কত শত কল চলিতেছে। যন্ত্রশিল্পের প্রসারে কুটীরশিল্প নির্জীব নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। তাহার ফলে বাংলার শিল্পীগণ অনেকেই বেকার হইয়া পড়িয়াছে। বাংলাদেশে আজ যে বেকার সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে কুটীরশিল্পের অধোগতি যে তাহার জন্য অনেকখানি দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

কলের সহিত প্রতিযোগিতায় কুটীরশিল্প আজ ধ্বংসোন্মুখ। কারণ, মানুষ হাতে করিয়া যে জিনিস বহুদিনে বা বহুক্ষণে তৈয়ারী করিবে, কলকারখানায় আজ সেই জিনিস অতি অল্প সময়ে তৈয়ারী হইয়া যাইতেছে। বর্তমানে প্রচুর জিনিস অল্প খরচে কলকারখানায় উৎপন্ন হইতেছে। ইহাতে বহু মানুষের প্রয়োজন যন্ত্রজাত দ্রব্য মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে এবং সে সকল জিনিস কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য অপেক্ষা অল্পমূল্যে বিক্রীত হইতেছে। মানুষ স্বভাবতই সস্তায় তাহার প্রয়োজন মিটাইতে চায়। কলকারখানা সেই উপায় করিয়া দিয়াছে বলিয়া আজ কলের তৈয়ারী জিনিসেরই চাহিদা বেশী। কুটীর-শিল্প কলে তৈয়ারী জিনিসের সহিত পরিমাণের ও মূল্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। ইহারই ফলে আমরা দেশে দেশে কাপড়ের নূতন নূতন কল প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতেছি, পুরাতন কাপড়ের কলগুলির সমৃদ্ধি বাড়িতেছে ইহাই দেখিতেছি। কিন্তু তাঁতীদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে।

এখন কলের তৈয়ারী নানা রঙের কাচের চুড়িতে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। হাতে তৈয়ারী গালার চুড়ি মেয়েদের হাতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

শাঁখা পরা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কলে তৈয়ারী কাচের পুতুল, চীনামাটির পুতুল, টিন বা স্টীলের খেলনা আজ গ্রাম্য শিল্পীদের তৈয়ারী মাটির পুতুল ও খেলনাগুলিকে প্রায় অপসারিত করিয়াছে। কারখানার তৈয়ারী নানা-রকমের শৌখীন জুতা ছাড়িয়া মুচিদের তৈয়ারী জুতা আর কেহ কিনিতে চায় না।

আজিকার দিনে আমরা যন্ত্রকে অস্বীকার করিতে পারিব না। কিন্তু তাই বলিয়া কুটীরশিল্পকে উপেক্ষাও করিতে পারিব না। বরং একটু মনোযোগী হইয়া আমাদিগকে কুটীরশিল্পের পুনরুন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ, কুটীরশিল্পের পুনরুজ্জীবন না হইলে দেশের বেকার-সমস্যার, অথবা দারিদ্র্যের অবসান হইতে পারে না। সর্বোপরি, প্রত্যেক দেশের শিল্পের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেক দেশের নিজস্ব শিল্পে শিল্পীর প্রতিভার ছাপটুকুও থাকে। দেশের শিল্পীর প্রতিভা ও সৌন্দর্যবোধকে আমরা যদি গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে না চাহি, তবে কুটীরশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে।

কিন্তু কোন্ উপায়ে? প্রথমত শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিল্পী নিজে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া শিল্পজাত দ্রব্য বেচিতে পারে না। এজন্য তাহাকে কোনো মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর শরণ লইতে হয়। ইহাতে লভ্যাংশের বেশী অংশই ঐ মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী পাইয়া থাকে, উহা শিল্পীর করতলগত হয় না। এই অবস্থার প্রতিকার না হইলে কোনও নূতন কুটীরশিল্পের প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন কুটীরশিল্পসকলের দৃঢ়ভিত্তি রচনা সম্ভবপর হইতে পারে না। কুটীরশিল্পের প্রসারের জন্য দ্বিতীয় প্রয়োজন—শিল্পীরা আজ সাধারণত যে-সকল দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিতেছে, তাহা ছাড়া অন্য নানাপ্রকার নূতন শিল্পকার্যে তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করা। সস্তায় সুন্দর জিনিস উৎপাদনের দিকেও দৃষ্টি সর্বদা নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। তাহা হইলে কলের জিনিস ছাড়িয়া লোকে কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যই গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহশীল হইবে।

জাপানে কুটীরশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য এক অভিনব উপায় তাহারা উদ্ভাবন করিয়াছে। সেদেশে ধনী ব্যবসায়ীরা শিল্পীদের ঘরে ঘরে ছোট ছোট নানাবিধ যন্ত্র বসাইয়া দিয়াছে। শিল্পীরা ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ের

মধ্যে বহু জিনিস তৈয়ারী করিয়া বড় ব্যবসায়ীদের হাতে তুলিয়া দিতেছে। বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে এইরূপ সহযোগিতার ফলে ওদেশে কুটীরশিল্প ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইয়া উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই চলিয়াছে।

সুতরাং কুটীরশিল্পকে নূতন যুগের উপযোগী করিয়া নূতন যুগের চাহিদা মিটাইবার মত করিয়াই আজ আমাদিগকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। ইহাতে ভারতের কৃষ্টি ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইবে, ভারতের সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে,—দেশের দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার তীব্রতা অনেক পরিমাণে হ্রাস-প্রাপ্ত হইবে।

জীবনে আমোদ-প্রমোদের প্রভাব

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ সূচনা—আমোদ-প্রমোদের শ্রেণীবিভাগ—ব্যক্তিগত আমোদ-প্রমোদ, সমষ্টিগত আমোদ-প্রমোদ—আমোদ প্রমোদের স্বরূপ—জীবনে আমোদ-প্রমোদ কেন অপরিহায ?—আমোদ-প্রমোদ কিরূপ ক্ষেত্রে অনিষ্টকর হয় তাহার উল্লেখ ও প্রতিকারের উপায়।

দেহ ও মনে সম্বদ্ধ দ্বিবেণীধারায় মানবজীবন প্রবাহিত। উভয়েই কর্মমুখী, উভয়ের ধর্মই এক। কর্মক্লান্ত দেহের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজন খাদ্য ও বিশ্রামের। কর্মশ্রান্ত মনের জন্যও খাদ্য অপরিহার্য। সেই খাদ্যই আমোদ-প্রমোদ।

যাহা মনের পক্ষে এমন আবশ্যক, মনের উপর তাহার সুগভীর প্রভাব বিস্তৃত হইতে বাধ্য। কিন্তু সে-আলোচনার পূর্বে আমোদ-প্রমোদের একটা শ্রেণীবিভাগ করিয়া লওয়া ভালো। তাহাতে বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে অনেকখানি সুবিধা হইবে। আমোদ-প্রমোদ—সাধারণত প্রায় শ্রমনিরপেক্ষ। অর্থাৎ, যাহাতে আমোদ-ভোক্তার কঠোর কায়িক পরিশ্রম হয়, তাহা আমোদ-প্রমোদের পর্যায়ে পড়ে না, উহা ব্যায়ামেরই অঙ্গীভূত। ফুটবল-ক্রিকেট খেলা, সন্তরণ প্রভৃতিকে আমরা আমোদ-প্রমোদ বলিব না। কিন্তু ফুটবল-ক্রিকেট খেলা দর্শনকে আমরা আমোদ-প্রমোদ বলিতে পারি এই অর্থে যে,

সেস্থলে দর্শককে কায়িক পরিশ্রম করিতে হয় না। যিনি মঞ্চের উপর নৃত্য করেন, তিনি নিশ্চয়ই আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করেন না, কিন্তু সেই নৃত্য যাঁহারা দর্শন করেন তাঁহারা নিঃসন্দেহে আমোদ-ভোক্তা।

আমোদ-প্রমোদকে প্রধান দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। একপ্রকার আমোদ-প্রমোদ আছে, যাহা কেবল ব্যক্তিগতভাবেই উপভোগ করা যায়। কোনো একটি ছেলে হয়তো ঘুড়ি উড়াইয়া আমোদ পায়। কোনো ভদ্রলোক হয়তো সিনেমা দেখিয়া আমোদ পান। কেহ হয়তো মাঠে গিয়া খেলা দেখিতে ভালোবাসে। কেহ বা গানের আসরে বসিয়া ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলির মুখে 'টোড়ী' শুনিয়া রসাপ্লুত হন। কাহারও মন পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দেখিয়া রোমাঞ্চিত হয়।

সমষ্টিগত আমোদ সৃষ্টিও হয় সমষ্টিগতভাবে, উপভোগও করিতে হয় সমষ্টিগতভাবে। আমার ব্যক্তিগত রুচি যাহাই হোক না কেন, এরূপ স্থলে আমি আপন রুচি অনুযায়ী আরও পাঁচজনের সঙ্গে মিলিত হই এবং সকলে মিলিয়া আনন্দ উপভোগ করি। থিয়েটার করিতে আমার ভালো লাগে। কিন্তু আমি একাই তো আর একটা নাটকের অভিনয় করিতে পারি না! সে জন্য আরও কয়েকজন অভিনেতৃর প্রয়োজন হয়। কয়েকজন অভিনয়ক্ষম ব্যক্তির সম্মিলিত শক্তিতে যখন একটি শৌখিন দলের নাট্যাভিনয় হয়, তখন সেই দলের প্রত্যেকেই আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিয়া থাকেন। 'ব্রীজ' খেলার আড্ডায় চারিজন না হইলে আসর জমে না; সেক্ষেত্রে চারিজনই একত্রে আমোদ উপভোগ করেন। সামাজিক উৎসবগুলির উৎস যাহাই হোক না কেন, উহারাও একরূপ সমষ্টিগত আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ। হোলির সময় রং দেওয়াও একপ্রকার আমোদ, দেওয়ালির সময় আতশবাজি পোড়ানও আমোদ।

আরণ্য জীবনে আদিম মানুষ অগ্নিকুণ্ডের চারিদিক ঘিরিয়া উদ্দাম নৃত্য করিত। উহাই ছিল তাহাদের আমোদ-প্রমোদ। ঐ নৃত্য শিকারের আনন্দও হইতে পারে, আহার পরিতৃপ্তির আনন্দও হইতে পারে। কিন্তু মূলত উহা ছিল অপ্রয়োজনের আনন্দ। কারণ, শিকার বা আহার-পরিতৃপ্তির সঙ্গে

নৃত্যের কোনো প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। কবিগণ ইহাকেই বলেন 'অপ্রয়োজনের আনন্দ'। তবে বৈজ্ঞানিক মন ভিন্নরূপ ভাবিয়া থাকে। সে বলে, কারণ ভিন্ন কোনো কার্যোৎপত্তিই হইতে পারে না। কর্মক্লান্ত মানুষের মন স্বভাবতই শ্রান্তি অপনোদন করিতে চায়। আমোদ-প্রমোদ অথবা আনন্দ সেই শ্রান্তি-অপনোদনেরই উপায়স্বরূপ।

কালভেদে এবং দেশভেদে আমোদ-প্রমোদের রূপ বিভিন্ন। আদিম মানুষের পক্ষে যাহা আমোদ-প্রমোদ ছিল, আধুনিক মানুষেব পক্ষে তাহা আমোদ বলিয়া গণ্য না-ও হইতে পারে। আবার ইংল্যাণ্ডবাসীরা যাহাতে আমোদ পান, ভারতবাসীরা তাহাতে আমোদ না-ও পাইতে পারেন। বয়সের তারতম্য অনুসারেও আমোদ-প্রমোদের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

আমোদ-প্রমোদের স্বরূপটি বোঝা গেল। এক্ষণে উহার প্রভাবের কথা আলোচনা করা যাক। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আমোদ-প্রমোদ মানসপুষ্টির পক্ষে অপরিহায। খাদ্যের প্রতি মানুষের যেরূপ আকর্ষণ, আমোদ-প্রমোদের প্রতিও তাহার সেইরূপ আকর্ষণ। আমোদ-প্রমোদে যোগ না দিয়া কোনো মানুষই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। অতি-দরিদ্র দিনমজুরেরাও সন্ধ্যার পর ঢোল-করতাল লইয়া সমবেত-সংগীতে বসিয়া যান। রাস্তায় খোলা জায়গায় ম্যাজিক দেখিতে পাইলে ভিখারী-চিত্তও তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং আমোদ-প্রমোদের প্রভাব মানবজীবনে খুবই বেশী। উহা না হইলে মানুষের মনোজীবন অর্থহীন হইয়া পড়ে।

সমষ্টিগত আমোদ-প্রমোদের প্রভাবও আমাদের জীবনে কম কাযকরী নহে। উহাতে মানুষে মানুষে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পাঁচজনের সঙ্গে মিশিতে গেলেই কতকগুলি নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হয়, শোভনতা ও শালীনতা রক্ষা করিতে হয় এবং এইরূপে আমাদের মনে সদাচার, কর্তব্যবোধ, ভদ্রতাজ্ঞান, নিয়মানুবর্তিতা, সময়নিষ্ঠা প্রভৃতি বহু সৎ প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে।

আমোদ-প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মন শুকাইয়া যাইত, মানবসমাজ পরিণত হইত এক বিরাট বন্ধ্যা মরুভূমিতে, সংস্কৃতি বলিয়া মানুষের কিছুই থাকিত না। প্রত্যেকটি মানুষকে তখন দেখাইত যন্ত্রের মতো, কাহারও মুখে

আর হাসি ফুটিত না। এরূপ চিত্র কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। মানুষের ইতিহাসে তেমন ভয়াবহ দিন যেন না আসে।

সুখাদ্য যেমন আমাদের দেহের সুপুষ্টি সাধন করে, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ তেমনি মনকে আনন্দের সঙ্গে শক্তি দান করে। কিন্তু আমোদ-প্রমোদের প্রকৃতি কু হইলে, মনের উপর উহার প্রভাবও কু হইতে বাধ্য। এরূপ আমোদের সংখ্যাও বড় কম নহে। ভালো সিনেমা দেখিলে জ্ঞানলাভ হয়, তেমনই দুর্নীতিপূর্ণ ছায়াচিত্র মানুষকে অধঃপতনের পথে টানিয়া লইয়া যায়। 'রেস্' খেলার আমোদে মানুষ প্রমত্ত হইয়া কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-বর্জিত হয়, ফলে অনেক সময় রাজাকেও ফকিরে পরিণত হইতে দেখা যায়। আবার কোনো আমোদ যদি নেশায় পরিণত হয়, তবে জীবনে উহার প্রভাবও অকল্যাণকর হইয়া উঠে। এই কারণে আমোদ-প্রমোদ নির্বাচন ব্যাপারে সকলেরই সচেতন ও সতর্ক হওয়া উচিত। যাহা মনকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তোলে, যাহা জীবনের উন্নতির পরিপন্থী, যাহা বুদ্ধি ও যুক্তিকে ধ্বংস করে, তেমন আমোদ-প্রমোদ সর্বথা পরিত্যাজ্য।

ভারতে শ্রমিকসমস্যা ও ধর্মঘট

প্রবন্ধ সংকেত : সূচনা—ধর্মঘট কাহাকে বলে—ধর্মঘট উৎপত্তির কারণ—ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থান—ভারতের শ্রমিকসমস্যা ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমিকসমস্যা—তুলনা—ভারতে ধর্মঘট—উহার বৈশিষ্ট্য—প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্যাপক ধর্মঘট হওয়ার কারণ—ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ধর্মঘট—শ্রমিক-সংজ্ঞার ব্যাপকতা—শ্রমিকসমস্যার সহিত সমগ্র দেশবাসীর সম্পর্ক—কংগ্রেসী শাসনব্যবস্থা ও শ্রমিকসমস্যা—উপসংহার।

পৃথিবীর সকল দেশের পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাহা পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, অতিরিক্ত লাভের আশায় পুঁজিপতিরা চিরদিন শ্রমিকদিগকে দিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রম করাইয়াছেন—শ্রমিকদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে পুঁজিপতিগণ অর্থে-সম্পদে স্ফীত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রমিকেরা দিন দিন দুর্বল হইয়াছে, দারিদ্র্য তাহাদের নিত্যসঙ্গী হইয়াই

রহিয়াছে। পরিশ্রম করিয়াও শ্রমিকেরা তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থানটুকু করিতে পারে নাই, চিকিৎসার সুযোগ তাহারা পায় নাই, আপন আপন পরিবারের শিশুদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হয় নাই। আনন্দ-বিরহিত রোগজীর্ণ জীবন শ্রমিকেরা যাপন করিয়াছে, তাহাদের পরিবারবর্গও ঐরূপ জীবনযাপনে বাধ্য হইয়াছে।

দীর্ঘকাল এমনিভাবে নিপীড়িত হইতে হইতে পৃথিবীর শ্রমিকসমাজ সচেতন হইল। কিন্তু তাহাদের একক ক্ষীণকণ্ঠনিঃসৃত প্রতিবাদ ও আবেদন-নিবেদন অসীম বিত্তশালী উদাসীন পুঁজিপতিগণের কর্ণে পৌঁছিল না। তাই তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইল। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকসকল পুঁজিপতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার উপায় বাহির করিল—ধর্মঘট। ধর্মঘটের অর্থ কর্মবিরতি। এই কর্মবিরতি অল্প-কালের জন্য কিংবা দীর্ঘকালের জন্যও হইতে পারে। শ্রমিকেরা তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত মাঝে মাঝে দাবি করে, সেই দাবির পূরণ হইলে আর ধর্মঘট হয় না। কিন্তু পুঁজিপতিগণ যদি শ্রমিকদিগের দাবি বা আবেদন-নিবেদন মানিয়া না লন, তাঁহারা যদি শ্রমিকদিগের অভাব-লাঞ্ছনার প্রতি উদাসীন থাকেন, তবেই শিল্পে অসহযোগিতার মধ্য দিয়া শ্রমিকেরা আপনাদের অন্ত-র্নিহিত অসন্তোষকে রূপ দিবার চেষ্টা করে। সুতরাং, শ্রমিকসমাজের ধূমায়িত অসন্তোষের চরমতম বহিঃপ্রকাশই ধর্মঘট। মানবতার দাবিতে শ্রমিকসমাজ রুটি ও রুজির দাবিতে যে শেষতম অস্ত্র হানে তাহাই ধর্মঘট। শ্রমিকদিগের বাসস্থান ও অন্য নানাবিধ সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবি লইয়াও ধর্মঘট হয়। ছাঁটাই, কর্মচ্যুতি বা রাজনৈতিক কারণেও আজকাল ধর্মঘট হইয়া থাকে।

ইহাতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যায়, অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। শিল্পপতিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য শিল্পপতি ও শ্রমিক সমাজের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা হইয়া যায়। শিল্প এবং উৎ-পাদনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়।

জগতে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন ও প্রসার হইতেই ধর্মঘট সৃষ্টি হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইওরোপে শিল্পবিপ্লব হইয়া গেল, পৃথিবীতে যন্ত্রযুগের সূচনা হইল। বাষ্পশক্তি আবিষ্কৃত হইল, বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কৃত

হইল, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্ক্রিয়া যেমন জীবনযাত্রাকে অনেক সুগম করিল তেমনি অমঙ্গলের পথকেও প্রশস্ত করিল। বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রসমূহ আসিয়া বহু লোককে কর্মচ্যুত করিল, বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হইল। কল-কারখানার কাজ করিবার জন্য গ্রামের লোক ক্রমশ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শহরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। শ্রমিকগণ অস্বাস্থ্যকর বস্তিজীবন যাপন করিতে লাগিল। শ্রমিকদিগের শারীরিক ও মানসিক অবনতি হইতে লাগিল। সমাজ ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। ধনতন্ত্র জন্মলাভ করিল, ধনসঞ্চয়ের লোভ দিগ্বিদিকে উপনিবেশ আবিষ্কারে মনোযোগ দিল। যন্ত্র আসিয়া কুটীরশিল্পকে ধ্বংস করিল, কারিগব পরিণত হইল কারখানার-শ্রমিকে, উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণশক্তি কেন্দ্রীভূত হইল মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে। ধনীরা তাঁহাদের প্রয়োজনের অনেক অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া অভিজাত-শ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। অন্যদিকে শ্রমিকদের দারিদ্র্য ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, শ্রমিকেরা বঞ্চিত প্রতারিতই রহিয়া গেল।

ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষত কোনো শিল্পবিপ্লব ঘটে নাই। তথাপি ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেলপথনির্মাণ, বড় বড কল-কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া এদেশেও ধনতন্ত্রের গোড়াপত্তন হইয়াছে। কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ভিত বলিতে গেলে তখন হইতেই যন্ত্রদানবের হুঙ্কারে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। দলে দলে কৃষকগণ ভূমিচ্যুত হইয়া কল-কারখানায় গিয়া শ্রমিক হইল। এইভাবে ছোট ছোট কুটীরশিল্পের কারিগরেরা ক্রমে ক্রমে কারখানা-মালিকের কুক্ষিগত হইয়া পড়িল।

ভারতের শিল্পপ্রসার এবং শ্রমিকসমস্যার রূপটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা পৃথক। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সরাসরি ধনতন্ত্রের পত্তন হইয়াছে। অর্থাৎ, শিল্পবিপ্লবের ফলস্বরূপ যন্ত্রপাতিসকল আয়ত্তে আনিয়া দেশের পুঁজি-পতিগণই শিল্পোৎপাদনের কাজে নামিয়াছেন। জাতীয় ধনিকশ্রেণী ন্যূনতম মাত্রায়,—অন্তত দেশাত্মবোধের জন্যও জাতীয় শ্রমিকশ্রেণীর উপর নির্যাতন কম করিয়াছেন, শ্রমিকদের জীবনধারণের মোটামুটি মান বজায় রাখিয়া তবে মুনাফা লইয়াছেন।

কিন্তু ভারতবর্ষে যখন যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন হইয়াছিল, তখন ভারত ইংলণ্ডের বণিকদিগের উপনিবেশ মাত্র। এদেশের জনসাধারণের সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তাঁহারা দৃক্‌পাত করেন নাই। তাঁহারা কেবলই শ্রমিকদিগকে বেশি খাটাইয়াছেন এবং উহাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে যে স্তূপীকৃত অর্থ তাঁহারা পাইয়াছেন তাহা ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন। এদেশে তাঁহারা স্থায়ী হইতে পারিবেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট নিশ্চয়তা ছিল না। তাই অবাধ শিল্পপ্রসারের চেষ্টা বিদেশী পুঁজিপতিগণ করেন নাই। ফলে ভারতীয় শ্রমিক-গণ প্রথম হইতেই অত্যধিক পরিমাণে লাঞ্ছিত হইয়া আসিয়াছে। যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে তাঁতী, ছুতার, কামার ইত্যাদি কারিগরগণ দলে দলে বেকার হইয়াছে। যাহারা কল-কারখানায় শ্রমিকরূপে নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা বণিক ইংরাজের চক্রান্তে পড়িয়া কেবল পরিশ্রমই করিয়াছে। পরিশ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত অর্থ পায় নাই। তাহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুখ-সুবিধা, কোন বিষয়ের প্রতিই মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ, এদেশের যন্ত্রশিল্পের লভ্যাংশ এদেশবাসীর কোনো উপকারেই আসে নাই। উহা বিদেশীয়দেরই সমৃদ্ধি-সৌধকে গড়িয়া দিয়াছে। জিনিসটি লক্ষ্য করিয়া যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগ হইতেই ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘটের মাধ্যমে তাহাদের আন্তরিক অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। ঔপনিবেশিক দেশ বলিয়াই শিল্পপ্রসারের কোন সুফল তাহারা পায় নাই, অথচ ভূরি পরিমাণ কুফল তাহাদের জীবনকে প্রায় পঙ্গু করিয়া দিয়াছে।

১৮২৫ হইতে ১৮৯০ সালের মধ্যে ভারতে অন্যূন ২৫টি ব্যাপক ধর্মঘট হইয়াছে,—তাহার মধ্যে সাঁওতাল ধর্মঘট, নীলচাষী ধর্মঘট রাজনৈতিক বিদ্রোহের আকার ধারণ করিয়াছিল। ১৮২৭ সালে নাগপুর এম্‌প্রেস্ মিলের ধর্মঘট প্রথম ব্যাপক শিল্প-শ্রমিক ধর্মঘট হিসাবে উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক চেতনা পরিণতি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রমিকসমস্যা শিক্ষিত ভারতীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভারতীয় শ্রমিকসমস্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা উন্মেষকাল হইতেই জাতীয় আন্দোলনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। ১৯০৭ সালের রেলধর্মঘটে শুধু কর্মচারীরা নহে, সাধারণ লোকেও শ্রমিকদের

প্রতি সহানুভূতি জানাইয়াছিল। ইহার পরবৎসরই লোকমান্য তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দেশব্যাপী ব্যাপক ধর্মঘট হইয়াছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে কোন দেশেই ব্যাপক ধর্মঘটের প্রচলন ছিল না। যুদ্ধজনিত কারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ও শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দুর্গতিই ঘন ঘন ধর্মঘটের অন্যতম কারণ। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় শ্রমিক-বিপ্লব সংঘটিত হইবার পর, সেখানে ধনিকশ্রেণী বিলুপ্ত করিয়া দিয়া শ্রমিক-সমাজই রাষ্ট্রপরিচালন তথা শিল্পোৎপাদন এবং মুনাফাবণ্টনের ভার হাতে লইল। পৃথিবীর সব দেশেই শ্রমিকশ্রেণীর এই বিজয়-সংবাদের ঢেউ পৌঁছিল। সকল দেশের শ্রমিকই নিজেদের সংগ্রামে প্রেরণা পাইয়া আরও সচেতন হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষেও এই চেতনা কার্যকরী হইয়াছিল।

অতঃপর এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল নিখিল ভারত ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস (১৯২০) লালা লজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে। তৎপরে ১৯২১ সালেই প্রায় ৪০০ ধর্মঘট সংঘটিত হইয়াছিল। ১৯২৫-এর দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটের পর সরকারী কর্তৃপক্ষ শ্রমিকসমস্যাকে আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তদন্ত কমিশন বসানো হইল। কমিশন রায় দিলেন,—স্বল্প মজুরি, দুর্ব্যবহার, শ্রম-সময়ের আধিক্য, বাসস্থানের অস্বাস্থ্যকরতা ইত্যাদি কারণেই শ্রমিকগণ অসন্তুষ্ট হইয়া ধর্মঘট করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই ধর্মঘট যেন সংক্রামক রূপ গ্রহণ করিয়াছে। আজকাল সংবাদপত্র খুলিলেই ভারতের কোন না কোন স্থানে শ্রমিক ধর্মঘটের সংবাদ চোখে পড়িবে। সম্প্রতি শ্রমিকসংগঠনও যেমন বাড়িয়াছে, তেমনই ধর্মঘটেরও নানা রূপভেদ ঘটিয়াছে। কর্মস্থলে থাকিয়াও সমবেত কর্মবিরতি—'অবস্থান ধর্মঘট', ধর্মঘট করিবার পূর্বে শেষবারের মত জানানি হিসাবে 'নমুনা ধর্মঘট', বৃহৎ কোন ধর্মঘটের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া 'সমর্থনসূচক ধর্মঘট' এবং আরও অনেকভাবে ধর্মঘট নিত্য নূতন রূপান্তর লাভ করিতেছে।

বর্তমানে শুধুমাত্র কারখানা বা শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যেই শ্রমিকসমস্যা সীমাবদ্ধ নাই। কেরানী, রেল-কর্মচারী, প্রেস-কর্মচারী ইত্যাদি সাধারণত যাহারা দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে পুঁজিপতিপ্রদত্ত মজুরি লইয়া জীবনধারণ

করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রমিকসমাজের অন্তর্ভুক্ত। অনেক অর্থনীতিবিদ্ মনীষীর মতে—বর্তমান ধনতন্ত্রশাসিত পৃথিবীতে বুদ্ধিজীবীরাও একশ্রেণীর শ্রমিক ব্যতীত অন্য কিছু নহেন।

এখন দেশের সমগ্র জনসংখ্যাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শিল্পজাত সামগ্রীর সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া শ্রমিকসমস্যা ব্যাপকতরভাবে সমগ্র দেশবাসীর জীবনকেই প্রভাবিত করে। কোন বিশেষ শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে সেই শিল্পজাত সামগ্রীর মূল্য কমিয়া যায়, আবার অন্য কোন কারণে বা শ্রমিক-বিক্ষোভের জন্য উৎপাদন-মূল্য বৃদ্ধি পাইলে বিক্রয়-মূল্যও অনিবার্যভাবে বাড়িয়া যায়। সমগ্র দেশবাসীর জীবনের সহিত বর্তমানের শ্রমিকসমস্যা সংশ্লিষ্ট বলিয়াই শিল্পপতিরা একেবারে স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। কারণ, সংহত শ্রমিকশক্তির বিক্ষোভে শিল্পে সংকট উপস্থিত হইতে পারে। উহা সমাজ-জীবনকেও বিপর্যস্ত করিয়া দেয়।

জাতীয় সরকারের আমলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিয়াছে বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তেমন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। বিদেশী পুঁজির জাতীয়-করণ হয় নাই, পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই, শ্রমিক-দের দুর্গত জীবনও পূর্বের মতই তিমিরাচ্ছন্ন রহিয়াছে।

ভারত সরকার সর্বতোমুখী আর্থিক উন্নতির জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রমিকসমস্যার সমাধানকল্পেও যথোপযুক্ত মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে, যদিচ এখনো ব্যাপক ছাঁটাই, বেকার, উৎপাদন-সংকোচ ইত্যাদি পূর্বের মতই অব্যাহত রহিয়াছে। 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিস্‌পিউট্‌স্ অ্যাক্ট' (১৯৪৭) পাস হওয়া সত্ত্বেও সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষে মালিকদের মনোভাব পূর্ববৎ অনমনীয়ই আছে। আশা করা যায়, জাতীয় সরকারের শ্রম-দপ্তর এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া শ্রমিকসমস্যার সমাধানে যত্নবান হইবেন। তবেই স্বাধীন ভারত আবার 'কর্মে মহান্, ধর্মে মহান্' হইয়া ভুবনমোহিনী রূপ ধারণ করিবে।

পশ্চিমবঙ্গের বন্যা ও তাহার প্রতিকার

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ বন্যা কাহাকে বলে—বন্যার সাধারণ দৃশ্য—পশ্চিমবঙ্গে বন্যার কারণ—পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিকতম একটি বন্যার বর্ণনা—সেই বন্যার কারণ—বর্তমান অবস্থায় বন্যা-প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ।

বন্যা প্রাকৃতিক বিপর্যয়সমূহের অন্যতম। অকস্মাৎ অতি-বর্ষণ অথবা নদীর উৎপত্তি-শৈলে অতিবৃষ্টিই প্রধানতঃ বন্যার কারণ। কখনো কখনো নদীর গতি-পরিবর্তন হেতু একাধিক নদী মজিয়া সেই জলস্রোত অন্য নদীর জলস্ফীতির কারণ হয় এবং এইরূপে বন্যার আবির্ভাব ঘটে।

বন্যার সংহার-মূর্তি রসঙ্গে আমরা—অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গবাসিগণ—বিশেষভাবেই পরিচিত। প্রবল জলোচ্ছ্বাস যখন উপকথার লক্ষ রাক্ষসীর মতো মুখব্যাদান করিয়া সগর্জনে উন্মত্ত আক্রোশে ছুটিযা আসে, তখনকার দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না। প্রচণ্ড জলস্রোতে তখন ঘরবাড়ি ডুবিয়া যায়, গরু-বাছুর ভাসিয়া যায়, শস্যক্ষেত্রের চিহ্ন অবলুপ্ত হয়, মানুষের দুর্গতির সীমা-পরিসীমা থাকে না। লক্ষ লক্ষ মানুষ সভ্যজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উচ্চ ভূমিতে কখনো বা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, সাহায্যের প্রত্যাশায় মৃত্যুকম্পিতবক্ষে সাশ্রুনেত্রে সম্ভাব্য ত্রাণপথের দিকে তাকাইয়া থাকে, বহু মানুষের প্রাণান্তও হয়।

বন্যার পরবর্তী দৃশ্য সম্ভবতঃ আরো মর্মান্তিক। জল সরিয়া গেলেও বন্যার্তদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের দুঃখ ও দুর্গতি অপরিমেয়। বাসস্থান নাই, বস্ত্র নাই, খাদ্য নাই, হয়তো বহু প্রিয়জনের কোনো চিহ্নও নাই! মায়ের কোল হইতে কত সন্তান জলে ভাসিয়া গিয়াছে, ভাইয়ের সুদৃঢ় বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া কত ভাই জীবন হারাইয়াছে, কে তাহার পরিমাপ করিবে? এতদ্ভিন্ন বিপদের উপর বিপদ আসে—সংক্রামক রোগ ও মহামারী। ত্রাণকার্যে রত মানুষের সেবাময় মূর্তিই তখন ঐ বেদনার মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা।

বন্যার প্রকোপ বহু দেশেই দেখা যায়, কিন্তু ভারতের বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের মতো আর কোনো দেশে বন্যার এমন ভয়াবহতা এখন আর বড় একটা দেখা যায় না। ইহার প্রধান কারণ, পশ্চিমবঙ্গ নদীবহুল দেশ, কিন্তু এই সকল নদীপথে সুষ্ঠু জলনিকাশের ব্যবস্থা নাই।

নদী-খালের গভীরতা বজায় রাখিয়া, নদীসংস্কার দ্বারা জল-নিকাশের সুষ্ঠু সুবন্দোবস্ত করিয়া এবং বন্যার বিপুল জলরাশিকে 'Dam' বা জলাধারে ধরিয়া রাখিয়া বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন বিশেষজ্ঞ মিঃ ভুরডুইন (Voordwin) টেনেসী ভ্যালী পরিকল্পনার অনুকরণে দামোদর-পরিকল্পনা ছকিয়া দিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়া পরিকল্পনা অনুসারে কয়েকটি বড় বাঁধও নির্মাণ করিয়াছেন। তথাপি গত ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহতম বন্যা হইয়া গেল!

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হইতে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ঐ বন্যার তাণ্ডবলীলা চলিয়াছিল। হাওড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশপরগণা, হুগলী, বীরভুম ও বাঁকুড়া—রাজ্যের এই নয়টি জেলাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বন্যাতাড়নে। বিশেষতঃ খানাকুল, বাগনান, আমতা, ঘাটাল, কাঁথি, কান্দী, ভরতপুর, রায়ান, পূর্বস্থলী, পাত্রসায়র, নবদ্বীপ, মগরাহাট, কাকদ্বীপ, সাগরথানা, নৈহাটি, হালিশহর, জগৎবল্লভপুর, ডোমজোড়, কাটোয়া, চন্দননগর, ব্যাণ্ডেল, লয়ালগঞ্জ, হাটগাছি প্রভৃতি অঞ্চলে ধ্বংসলীলার চিহ্ন বিশেষভাবেই প্রকটিত হইয়াছে। প্রায় বারো লক্ষ লোক গৃহহারা হইয়াছে, দুই লক্ষ গৃহ ধ্বংস হইয়াছে, জীবনহানি ঘটিয়াছে বহু মানুষেব। সর্বসুদ্ধ প্রায় অর্ধকোটি নরনারী ঐ বন্যার কবলে পড়িয়া কোনো-না-কোনোরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উদ্ধারকার্যের জন্য মিলিটারী পর্যন্ত তলব করিতে হইয়াছে। কত লক্ষ একর জমির ধান যে-নষ্ট হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। গবাদি পশু যে কত মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এমন কি, কলিকাতার মতো উন্নত শহরের পাতিপুকুর, দক্ষিণদাড়ি, কসবা, তিলজলা প্রভৃতি শহরতলী-অঞ্চলও বন্যার হাত হইতে রেহাই পায় নাই। প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য যে, বন্যা-প্রতিরোধকল্পে যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন-এর বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল

সেই মাইথন ও পাঞ্চেৎ বাঁধ রক্ষার জন্য ৩রা অক্টোবর দুর্গাপুর ব্যারেজ হইতে ৫ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়িয়া দেওয়ার জন্যই নিম্ন-দামোদরে বন্যা দেখা দিয়াছিল। অদৃষ্টের পরিহাস আর কাহাকে বলে !

কিন্তু ইহার কারণ কী ? বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাঁধ বাঁধা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে কেন বন্যা হইল,—এই প্রশ্ন আজ সকল পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনকেই আলোড়িত করিতেছে। বিশেষজ্ঞগণ ইহার একটিমাত্র উত্তরই দিয়াছেন—"সুষ্ঠু জল-নিকাশই পশ্চিমবঙ্গে বন্যা-নিরোধের একমাত্র উপায়।"

ডি.ভি.সি.-র বন্যানিরোধ-পরিকল্পনায় আটটি বাঁধের কথা ছিল, কিন্তু বাঁধ নির্মিত হইয়াছে মাত্র চারিটি। ১৯৫৬ সালের বন্যার সময়েও ডি.ভি.সি.-র জলে বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল প্লাবিত হইয়াছিল। উনষাট সালের বন্যার জল ছাড়িয়া দেওয়ার ফলে রাজ্যের বৃহত্তর অংশ প্লাবিত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ এখন বলিতেছেন—"বাঁধের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া, বাঁধগুলির বিপদসীমা ছাড়াইয়া জল উঠিলে যে-পরিমাণ নূতন জল জলাধারে উঠে সেই পরিমাণ জল ছাড়িয়া দিতেই হইবে।" অর্থাৎ বাঁধের ক্ষতি এড়াইতে হইবে, মানুষের ক্ষতি যাহা হয় হোক !

উনষাট সালের বন্যার পর সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গের জলনিকাশ ব্যবস্থা অনেকখানি বিনষ্ট হইয়াছে। গঙ্গার দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতম জলনিকাশী প্রণালী হইল ভাগীরথী-হুগলী নদী। এই নদীর জল-নিকাশী ক্ষমতা গত পাঁচ বছরে (১৯৫৪-৫৯) প্রায় শতকরা চল্লিশ ভাগ নষ্ট হইয়াছে। ভাগীরথী-হুগলীর উপনদীগুলির সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। আগে প্রথম বর্ষার ছোট ছোট বন্যার তরবেগ (momentum) দামোদর-রূপনারায়ণের খাত দিয়া নামিয়া, হুগলীর মোহানার চরগুলি কাটিয়া দিয়া, প্রতিবৎসর যথাসাধ্য হুগলী নদীর জলপ্রবাহের ঢাল (hydraulic gradient) বজায় রাখিত। দামোদর পরিকল্পনার বন্যাবিরোধী বাঁধ নির্মাণের ফলে এই স্বাভাবিক কাজ বন্ধ হইয়া রূপনারায়ণ-হুগলী নদীর মোহানা মজিয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া, ডি. ভি. সি.-র খালগুলি এমনভাবে খনিত যাহাতে স্বাভাবিক জলনিকাশের অন্যান্য ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত। মিঃ ভুরহুইনও স্বীকার করিয়া

গিয়াছেন যে, দামোদরের উচ্চ উপত্যকায় যতগুলি বাঁধই নির্মাণ করা হোক না কেন, নিম্নাঞ্চলের প্লাবন প্রতিরোধের সামর্থ্য তাহাদের থাকিবে না; চাই দামোদর-রূপনারায়ণের জলনিকাশী-ব্যবস্থার উন্নয়ন। কিন্তু এই স্বীকৃতি কাগজে-কলমেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বাস্তবে উহার অনুসরণে কোন কর্মপদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই। মাইথন ও পাঞ্চেৎ বাঁধ নির্মাণকালেও নিম্ন দামোদর ও নিম্ন হুগলীর ক্ষতির কথা ভাবা হয় নাই।

দামোদর-পরিকল্পকগণ জানিতেন যে, উচ্চ উপত্যকায় যত জলাধারই সৃষ্টি করা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত পাঞ্চেৎ ও মাইথনের বন্যানিরোধী বাঁধ দুইটি হইতে কোন-না-কোন সময়ে সর্বোচ্চ আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়িতেই হইবে। আর দুর্গাপুরের ব্যারেজ দিয়া সেই পরিমাণ জল নিম্ন দামোদরে ছাড়িবার সময় যদি নিম্নাঞ্চলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হইতে থাকে (সচরাচর হইয়াই থাকে) এবং সঙ্গে সঙ্গে দারকেশ্বর, কাঁসাই, রূপনারায়ণ নদগুলি ভরা থাকে, তাহা হইলে নিম্নাঞ্চলে প্লাবন হইবেই।....শুধু তাই নয়, দামোদর পরিকল্পনায় উচ্চ-উপত্যকার বন্যানিরোধী বাঁধ নির্মাণের ফলে যে হুগলীনদীর মোহানাই মজিয়া যাইবে, কলিকাতা বন্দর ধ্বংস হইবে, সারা পশ্চিমবঙ্গে প্লাবনের করাল লীলা প্রবর্তিত হইবে, একথা পরিকল্পকগণ আদৌ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনা সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। ঐ কল্পনার ত্রুটির ফলেই উনষাট সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্লাবনের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমাদের জাতীয় সরকার বহুকাল ধরিয়া বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উহা যে কার্যকরী হয় নাই—উনষাট সালের বন্যা তাহা প্রমাণ করিয়াছে। বন্যা আশীর্বাদস্বরূপ, বন্যার দুঃখের ভিতর দিয়া দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণ সাধিত হয়—ইত্যাদি ধরণের চিন্তাই যদি মুখ্য হয় এবং বন্যার অপরিসীম ক্ষয়-ক্ষতি ও বন্যার্তদের জীবনের শোচনীয় অবস্থার ব্যাপারটা যদি গৌণ হয়, তাহা হইলে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের উপর স্বভাবতঃই জোর পড়ে না,—এই তিক্ত সত্যকে আজ অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। এ বিষয়ে আমরা জনৈক বিশেষজ্ঞের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি,

—"প্রকৃত পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে সুষ্ঠু জলনিকাশ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা মোটেই অসাধ্য নয়। সম্যক্ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার উপর নির্ভর করে আমার এই সিদ্ধান্ত যে, সহজেই সুষ্ঠু জলনিকাশ-ব্যবস্থার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে প্লাবনের প্রকোপ প্রশমিত করা যায়। তাছাড়া শুধু কলিকাতা বন্দরকেই রক্ষা নয়, তার নাব্য পথের যথেষ্ট উন্নয়ন করা যায়। আর সুষ্ঠু জলনিকাশ-ব্যবস্থা অবলম্বিত না হলে পশ্চিমবঙ্গ ভিক্ষুক-রাজ্যে পর্যবসিত হবে।"

গ্রামে ফিরিয়া যাও

প্রবন্ধ-সংকেত : সূচনা : প্রাচীন বাংলার শান্তিময় জীবনের চিত্র—পল্লীবর্জনের কুফল—পল্লীতে প্রত্যাবর্তনের আবশ্যকতা—পল্লীতে প্রত্যাবর্তন ও গঠনমূলক কর্মসূচী—উপসংহার।

ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল ভারতীয় গ্রামসকল। 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' গ্রামসকলের মধ্য হইতেই ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্ভব একদিন হইয়াছিল। ভারতের ধ্যান-ধারণা আদর্শ, ভারতের শিল্প,—সকল কিছুরই জন্ম হইয়াছিল পল্লীর ক্রোড়ে। কিন্তু সেই শান্তিময়, সুখময় পল্লীক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া, সরল অনাড়ম্বর জীবনরঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া আজিকার মানুষ নগরকেন্দ্রিক হইয়াছে। পল্লীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ হইতে মানুষ আজ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। রোগে-শোকে জর্জরিত হইয়া আজিকার মানুষ নগরজীবন যাপন করিতেছে। অন্ন-বস্ত্রের অভাবগ্রস্ত ভারতবাসী কল্যাণের পথ আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাই মহাত্মা গান্ধী একদিন ভারতবাসীকে নাগরিক জীবন ত্যাগ করিয়া পল্লীর সহজ সরল অনাড়ম্বর শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—গ্রামে ফিরিয়া যাও। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে যদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাও, যদি অনিবার্য ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চাও তবে—গ্রামে ফিরিয়া যাও। দেশ ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই জাতির জনকের কণ্ঠে একদিন এই

পরম কল্যাণময়ী বাণী উদ্গীত হইয়াছিল—গ্রামে ফিরিয়া যাও। রবীন্দ্রনাথও আকুলকণ্ঠে একদিন বলিয়াছিলেন—

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
লহো তব লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা!

মোহমুগ্ধ পতঙ্গ যেমন আগুন দেখিয়া সেদিকে ছুটিয়া যায়, ভারতবাসীরাও তদ্রূপ গান্ধী রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনিয়াও চেতনাগ্রস্ত হয় নাই,—তাহারা মোহাবিষ্ট হইয়া নগরীগুলিতে ভিড় করিয়াছে। ফলে ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির কেন্দ্র পল্লীসকল জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু ভারতীয় পল্লীর এরূপ অবস্থা চিরদিন ছিল না। দেড়শত বৎসর পূর্বের পল্লীচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দেখিবে—কি আনন্দোজ্জ্বল ছবি! পল্লীতে পল্লীতে গোয়ালভরা গরু, ক্ষেত্রভরা খাদ্যশস্য—বাংলার গ্রামে গ্রামে গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ—মানুষের অন্ন-বস্ত্রের অভাব নাই। পল্লী-বাসীর দেহভরা স্বাস্থ্য, মানুষের মনের স্ফূর্তি বিবিধ উৎসবের ভিতর দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। গ্রামের কামার কুমার ছুতার কাহারও উপজীবিকার কোন সমস্যা নাই। গ্রামে গুরুগৃহে পল্লীবাসীর শিক্ষালাভ হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যাত্রা পাঁচালি কথকতার মধ্য দিয়া পল্লীবাসিগণ শিক্ষালাভ করিতেছে; তাহাদের ধর্মবোধ, ন্যায়-অন্যায়বোধ জাগিতেছে। সমাজের মাথার উপর রহিয়াছেন জমিদার। পথঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, জলাশয়-দেবালয় প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার—এ সবই তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। তিনি আর্তের আশ্রয়, নিরন্নের অন্নদাতা। প্রত্যেকটি পল্লী স্বয়ংসম্পূর্ণ। পল্লীগ্রামে কোন কিছুর অভাব নাই। সকলে একযোগে কাজ করিয়া যাইতেছে। এই পরিপূর্ণ শান্তিময় জীবনের তুলনা কোথায়?

কিন্তু আজ পল্লীসকল নিষ্প্রাণ হইয়া গিয়াছে। সেই শান্তির নীড়—পল্লীকুঞ্জ আর নাই! নাগরিক সভ্যতার একটা তীব্র মোহ পল্লীর বায়ু বিষায়িত করিয়া তুলিয়াছে। জমিদারবাবু নাগরিক জীবনের মোহে আকৃষ্ট

হইয়া চিরতরে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। যন্ত্রশিল্প ধীরে ধীরে দেশের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রামের কুটীরশিল্পগুলি লোপ পাইয়াছে। পিতা ও পিতামহের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের বিভিন্ন শিল্পিগণ কৃষকে পরিণত হইল। নগর ক্রমশই পুষ্ট ও স্ফীত হইতে লাগিল। শিক্ষিত সঙ্গতিশালী লোকেরা নায়েব-গোমস্তার উপর ভার দিয়া নগরবাসী হইলেন। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার ও কেরানীতে নগর পূর্ণ হইতে লাগিল। আর গ্রামের হইতে লাগিল অবনতি—প্রথমে গেল সংস্কৃতি, পরে গেল সুখ ও স্বাস্থ্য। পথঘাট জলাশয় সংস্কারের অভাবে অব্যবহার্য হইয়া উঠিল; পল্লী বনজঙ্গলে ভরিয়া গেল। গ্রামের স্বাস্থ্য চিরতরে নষ্ট হইল। আজ ম্যালেরিয়া, কাল ওলাউঠা—মহামারীর আর বিশ্রাম নাই! গ্রামে ডাক্তার বৈদ্য নাই, থাকিলেও তাঁহাদের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার সঙ্গতি কাহারও নাই। সহায় ও সহানুভূতির অভাবে কৃষির হইতে লাগিল শোচনীয় অবহেলা। বৎসরের পর বৎসর অর্ধেকের অধিক জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে লাগিল। যে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র কর্ষিত হইল, তাহাতে আট-আনা শস্যও আর ফলে না। দেনায় কৃষকের চুল পর্যন্ত বিক্রীত হইয়া গেল। পল্লীর ধ্বংসের আর বিলম্ব নাই। পল্লীবর্জনের প্রথম বিষময় ফল ইহাই।

দ্বিতীয় ফল—নগরবাসীদের শোচনীয় দুর্দশা। নাগরিক সভ্যতায় আকৃষ্ট হইয়া পল্লীবাসী নগরে আসিলে, প্রথম প্রথম সুবিধাই হইতেছিল। সামান্য ইংরাজী শিক্ষা করিয়া প্রথমে লোকে দায়িত্বশীল পদ পাইতেন। চিকিৎসক, উকিল, এঞ্জিনিয়ার হইয়া অনেকেই যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়া দেশের ও দশের মঙ্গলার্থে দানধ্যান করিয়া সুনাম কিনিতেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইতে বেশি বিলম্ব হইল না। চাকরি ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তিতে অতিরিক্ত ভিড় জমিয়া যাইতে লাগিল। নগরবাসী বিলাসী জমিদারেরা তাহাদের প্রাপ্য খাজনা পূর্ণমাত্রায় আদায় করিতে পারিলেন না। বৃত্তিশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বড় হইল না। ফলে বেকারসমস্যা গুরুতর রূপে দেখা দিল। এ অবস্থা নিশ্চয়ই স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের অনুকূল নহে।

আজ আমাদের চোখ খুলিয়াছে। আজ আমরা বুঝিয়াছি পল্লীবর্জন আমাদের পক্ষে অন্যায় হইয়াছে। 'গ্রামে ফিরিয়া যাও'—মনীষিগণের এই উক্তির তাৎপর্য আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি।

সত্যই আজ পল্লীতে প্রত্যাবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যান্ত্রিক সভ্যতার প্রবর্তনের ফলে আমাদের কুটীরশিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, অথচ যান্ত্রিক শিল্প দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত, পল্লীর শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে বাংলার কৃষি ও কৃষক ধ্বংস হইতেছে। তৃতীয়ত, নাগরিক সভ্যতা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের বাঁচিবার একমাত্র পথ পল্লীগ্রামে যাইয়া তাহাকে পুনর্গঠন করা, কৃষি ও কৃষককে নবমন্ত্রে দীক্ষিত ও সঞ্জীবিত করা। পল্লীর পথঘাট ও জলাশয়ের সংস্কার সাধন করা, বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পল্লীকে স্বাস্থ্যকর বাসোপযোগী স্থানে পরিণত করা ও লুপ্তপ্রায় কুটীর-শিল্প পুনরুজ্জীবিত করা। মধ্যবিত্ত বেকার যুবক যদি গ্রামে যাইয়া জীবিকা অর্জনের সুযোগ না পায়, তবে গ্রামে প্রত্যাবর্তনের কোন অর্থ হইবে না। এই ভাবে যদি আমরা আয়র্ল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও জাপানের অনুকরণে গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠন করিতে পারি, তবে হয়তো আমাদের শক্তি ও সভ্যতা পুনরায় ফিরিয়া পাইব ও আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সুবিধাও গ্রহণ করিতে পারিব।

উপসংহারে আমাদের ইহাই স্মরণ করিতে হইবে যে, সুচিন্তিত গঠনমূলক পরিকল্পনা না লইয়া ভাবাবেগে পল্লীগ্রামে ছুটিয়া গেলে হিতে বিপরীত হইবে। বর্তমান অবস্থায় বাংলার জীবিকা অর্জনের নূতন পথ সৃষ্টি করিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোকদের কৃষি হইতে অপসারিত না করিলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। তাই পল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে পল্লীকে পুনর্গঠিত করিয়া তাহাকে বাসোপ-যোগী করিয়া লইতে হইবে, পল্লীতে বিভিন্ন স্তরের লোকের জীবিকা নির্বাহের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যথায় 'গ্রামে ফিরিয়া যাও' এই উক্তি অসার প্রলাপে পর্যবসিত হইয়া জাতির ধ্বংসকেই ডাকিয়া আনিবে।

সর্বোদয় ও ভূদান আন্দোলন

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ সর্বোদয়ের অর্থ—মহাত্মা গান্ধী ও সর্বোদয় সমাজ—সর্বোদয় পরিকল্পনায় গ্রামের প্রাধান্য—ব্যক্তি-ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ—নঈ তালিম—ভূমিসমস্যা ও ভূদান আন্দোলন—আচার্য বিনোবা ভাবে।

সর্বোদয় কথাটির অর্থ হইতেছে—সকলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। প্রতিটি মানুষের আত্মবিকাশের সমান সুযোগ লাভ। পাশ্চাত্যের মিল বেন্থাম প্রভৃতি দার্শনিকগণ সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য "greatest good of the greatest number" কামনা করিয়াছিলেন। সাম্যবাদী আদর্শেও অধিকসংখ্যক লোকের কল্যাণসাধনের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সর্বোদয়ের লক্ষ্য হইতেছে প্রত্যেকটি লোকের অর্থনৈতিক উন্নতি। পাশ্চাত্যের উন্নতি-আদর্শ বা সাম্যবাদী আদর্শের সঙ্গে সর্বোদয় আদর্শের একেবারে মূলে প্রভেদ। সর্বোদয়-আদর্শ সকল মানুষকে সমানভাবে জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে।

এই সর্বোদয়ের আদর্শ সর্বপ্রথম মহাত্মা গান্ধীর কল্পনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মনে স্বাধীন ভারতে নূতন সমাজ-গঠনের একটা পরিকল্পনা ছিল। স্বাধীন ভারতে এমন একটি সমাজ-গঠনের স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছিলেন, যেখানে সার্বিক কল্যাণ হইবে লক্ষ্য, যেখানে কোনো শ্রেণীভেদ থাকিবে না, জাতিভেদ বা বর্ণভেদ থাকিবে না, ধনী দরিদ্রের মধ্যে কোনো বৈষম্য থাকিবে না। সে সমাজে ন্যায়ধর্ম বিরাজ করিবে, অহিংসা ও মৈত্রীর বন্ধনে সকলে আবদ্ধ থাকিবে। স্বাধীন ভারতের সমাজ সকল প্রকার শোষণ, হিংসা ও অন্যায় অবিচারশূন্য হইবে। সেখানে মানুষ সমানাধিকার ভোগ করিবে, দুর্বলের উপর প্রবলের নিপীড়ন থাকিবে না। সাম্য সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যকে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ভারতের উন্নতির ভিত্তি করিতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু সর্বোদয় সমাজের যে-আদর্শ কল্পনায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া গান্ধীজির পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কারণ, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনকে সফল করার জন্য তাঁহার সমস্ত চেষ্টা তখন নিয়োজিত,—আর দেশের স্বাধীনতা আনিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবনাবসান ঘটিল। গান্ধীজি তাঁহার কল্পনার বাস্তব রূপায়ণ দেখিয়া যাইতে

পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার স্বপ্নসাধ ব্যর্থ হয় নাই। মৃত্যুর পরে গান্ধীজির স্বপ্নকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার কাজে আচার্য বিনোবা ভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন।

সর্বোদয় কোনরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন নহে। ইহা সমবায়ের ভিত্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাবলম্বী গ্রাম গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। ভারতবর্ষের উন্নতি-সমৃদ্ধির কেন্দ্র, প্রাণকেন্দ্র হইতেছে ইহার গ্রামগুলি। একদিকে সেই সকল গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলা, অন্যদিকে বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে যোগা-যোগের মধ্য দিয়া প্রত্যেকটি গ্রামের কৃষি শিল্প ইত্যাদির যাহাতে উন্নতি হয় সর্বোদয় পরিকল্পনা সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছে। সর্বোদয়ে জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনের খাদ্যবস্তু, বস্ত্র প্রভৃতির উৎপাদন এবং বণ্টনের ভার প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে গ্রামের সর্বোদয় সমাজের উপর।

ব্যক্তির ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সর্বোদয়ের মূল লক্ষ্য। ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা থাকিলে সমাজে নানারূপ দুর্নীতি জন্মলাভ করে, দুবলকে শোষণের প্রবৃত্তি জাগে, রিক্ত নিঃস্বের হাহাকার সৃষ্টি হয়, নানারূপ কৃত্রিম বৈষম্যে সমাজ ভরিয়া উঠে। সর্বোদয়-সমাজে এ সকলের স্থান নাই। এ সমাজ কায়েমী স্বার্থের আত্মপ্রকাশকে রুদ্ধ করে, দুর্বল অসহায়কে শোষণের হাত হইতে উদ্ধার করে। ইহাতে সমাজের দারিদ্র্য ঘুচে।

এই সর্বোদয় পরিকল্পনাকে সার্থক করার জন্য চাই মানুষের শুভবুদ্ধির উদ্বোধন। ইহাতে বলপ্রয়োগের, হিংসাত্মক কার্যকলাপের স্থান নাই। উপযুক্ত শিক্ষাবিধি প্রবর্তন করিয়া মানুষের মনুষ্যত্ব ও কল্যাণবুদ্ধিকে জাগ্রত করার উপর সর্বোদয় পরিকল্পনা বিশ্বাসী। ইহার আবেদন মানুষের উন্নততর নীতিবোধের কাছে। মানুষের নীতিবোধ জাগাইয়া তাহারা যাহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া সমষ্টিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখে, সর্বোদয় পরিকল্পনা তাহাই চাহিয়াছে। এজন্য পরিকল্পনায় নূতন এক শিক্ষা স্থান পাইয়াছে। উহা 'নঈ-তালিম' নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই শিক্ষাবিধি শিক্ষার বাঁধা প্রথা বা প্রণালী মানিয়া লয় নাই। কেতাবী, পুঁথিঘেঁষা বিদ্যাকে ইহা আমল দেয় নাই। 'নঈ তালিম' মানুষকে কালোপযোগী শিক্ষা দিতেছে। জীবনযাত্রানির্বাহের সহায়ক শিল্পশিক্ষাদানই ইহার উদ্দেশ্য। কাজেই ইহা

শিক্ষার্থীর সৃজনীশক্তির স্ফুরণ ঘটাইতেছে, মানুষকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতেছে। 'নঈ তালিমে' মাতৃভাষার প্রাধান্য—শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইতেছে।

সর্বোদয় পরিকল্পনা সার্থক করিতে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে ভূমিসমস্যা আমাদের দেশের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সেইজন্য ইঁহারা 'ভূদানযজ্ঞ' আরম্ভ করিয়াছেন। 'যজ্ঞ' অর্থ মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য স্বার্থত্যাগ। স্বার্থত্যাগে এই সর্বোদয় আন্দোলন জনসমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। "প্রতিবেশী যদি অভুক্ত থাকে, তবে আমার মুখের গ্রাস কেমন করিয়া আমার মুখে উঠিবে ?"—এই প্রেমের ভাব হইতেই ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন। এ আন্দোলনের পিছনে কারুণ্যের প্রেরণা। আকাশ বাতাস জল আলো, এগুলিকে ভগবান যদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন সকলের মঙ্গলের জন্য, মাটিরও নিশ্চয়ই সৃষ্টি হইয়াছে সমাজের সকলেরই কল্যাণের জন্য। আকাশ আলো জল বাতাসকে কেহ যেমন আমার বলিয়া দাবি করিতে পারে না, মাটিও তেমনি কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। গ্রামের জমি গ্রামের সর্বসাধারণের সম্পত্তি। সমস্ত গ্রাম বাস করিবে একটি বৃহৎ পরিবারের মত। গ্রামে কেহই ভূমিহীন অথবা অভুক্ত থাকিবে না। জীবন-ধারণের জন্য যাহার যতটুকু প্রয়োজন, তাহার অধিক জমি কখনও মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে থাকিবে না। ভূমির মালিক হইবে গ্রাম্য-সমাজ। গ্রাম্য-সমাজ ভূমিকে ব্যবহার করিবে সকলকে খাদ্য যোগাইবার নিমিত্ত।

মানবকল্যাণের এই মহৎ আদর্শকে সার্থক করিবার জন্য আচার্য বিনোবা ভাবে ভারতবর্ষের প্রতি রাজ্যে ঘুরিয়া যাহাদের বাড়তি জমি আছে তাহাদের কাছে জমি-দানের আবেদন করিয়াছেন। জোর করিয়া নয়, প্রেমের দ্বারা লোকের হৃদয় জয় করিয়া ভূমিহীন কৃষককুলের কল্যাণসাধনের ব্রত বিনোবাজি গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে যে জমি আদায় হইয়াছে, তাহা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভূমির পুনর্বণ্টন আচার্য বিনোবা ভাবে যে-ভাবে করিতে চাহিতেছেন, তাহা সার্থক হইলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোটাই বদলাইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য, জনসাধারণের দৃষ্টি-ভঙ্গিকে পরিবর্তিত করিবার জন্য, তাহাদের বিবেকের জাগরণ ও নৈতিক চেতনার উজ্জীবনে বিনোবাজি জোর দিয়াছেন। মানুষের কল্যাণবুদ্ধিকে জাগাইয়া তোলার কাজে নিজেকে নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার পথ প্রেমের পথ, সাম্যবাদীদের ভয়াবহ কৃষি-বিপ্লবের পথ নয়। সাম্যবাদিগণ জোর করিয়া সমস্ত জমি দখল লইয়া তাহার পর উহার পুনর্বণ্টন করিতে চায়। কিন্তু লোককে বুঝাইয়া তাহাদের মনের পরিবর্তন ঘটাইয়া বিনোবাজির আন্দোলন জমির পুনর্বণ্টন করিতে চাহিতেছে। এই সর্বোদয় পরিকল্পনা সাম্যবাদের বিকল্প পরিকল্পনা। প্রেমশক্তির দ্বারা চালিত এই বিরাট্ বিপ্লব যদি সার্থক হয়, তবে বহু দেশেরই ভূমিসমস্যার সমাধান ঘটিবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি কাহারও থাকিবে না, আবার ভূমিহীন নিরন্নও কেহ থাকিবে না। বস্তুত সম্পত্তির সমান বণ্টন করিয়া আজ এই সর্বোদয় আন্দোলন দেশকে নিরন্নের, রিক্ত-নিঃস্বের হাহাকার হইতে মুক্ত করিতে চাহিতেছে। এই আন্দোলন সার্থক হইলে সামাজিক বৈষম্যের বিলুপ্তি ঘটিবে—জাতিভেদ, পক্ষ-ভেদ, ব্যক্তিভেদ, সকল প্রকারের ভেদবুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটিবে। মহৎ উদ্দেশ্যে—গ্রামসমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য যাহার সম্পত্তি আছে সে সম্পত্তি দিবে, যাহার শ্রম করিবার শক্তি আছে সে শ্রমদান করিবে, যাহার বুদ্ধি আছে সে বুদ্ধি দিবে,—আর যে অক্ষম সে অন্তত সমাজের কল্যাণচিন্তা করিবে।

যুদ্ধ ও শান্তি

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ শান্তি ও সমৃদ্ধি—জগতে যুদ্ধের কারণ—যুদ্ধের কুফল—শান্তিই মানুষের কাম্য, যুদ্ধ নহে—জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্তরায় কি ?—উপসংহার।

মানুষ চায় শান্তি। অশান্তি মানুষের কাম্য নয়। ইহার কারণ, সৃষ্টির সুরটি বাজে শান্তিতে। সভ্যতা-সংস্কৃতির উপকরণ মানুষ শান্তির মধ্যেই আবিষ্কার করিয়াছে। জগতের সমৃদ্ধি আসিয়াছে শান্তির মধ্যে। মানুষের

মনে যখন আধিপত্য করিয়াছে শান্তি ও স্বস্তি, তখনই সৃষ্ট হইয়াছে জ্ঞান-ধর্ম-কাব্য-কাহিনী।

তবু যুদ্ধ হয় কেন? এ পর্যন্ত যত যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—স্বাধিকার বিস্তারের স্পৃহাই জাতিকে যুদ্ধের জন্য উন্মাদ করিয়া তোলে। মানুষ নিজের গণ্ডীটুকু লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, সে চায় বিস্তৃতি। দেশ জয় করিবার ইচ্ছা এই প্রবৃত্তি হইতেই সঞ্জাত হয়। ইহা ছাড়া, যুদ্ধের অন্যতম কারণ,—দুই দেশের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত। স্বার্থ লইয়া যখন বিবাদ বাধে, তখন শান্তিচুক্তির দ্বারা তাহার মীমাংসা হয় না—তাহার চরম মীমাংসা করা হয় যুদ্ধ দিয়া। এইভাবে যুদ্ধের কাল-অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। বর্তমান জগতে সাম্রাজ্যবাদের পাণ্ডা ধনিকশ্রেণী। যুদ্ধের সুযোগে এই ধনিক শ্রেণী নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিতে প্রয়াস পায়। তাহারা কেবল পরদেশকেই শোষণ করে না, নিজের দেশের লোকদিগকেও শোষণ করে। যুদ্ধের প্রতিবেশে এই শোষণের সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হয়। এই জন্যই যুদ্ধ বাধে।

যুদ্ধের কুফল বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। যুদ্ধের ফলে একটি সমৃদ্ধ দেশ ধ্বংস হইয়া যায়। শান্তির সময় সহস্র সহস্র মানুষের চেষ্টায় যে শিল্প, যে চারু কারুকার্যশোভিত স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সাহিত্য গড়িয়া উঠে, যুদ্ধ এক নিমেষে তাহা লুপ্ত করিয়া দেয়। যুদ্ধের ফলে কত সীমন্তিনী স্বামী হারায়, কত জননী পুত্রহারা হন, কত পুত্র হয় পিতৃহীন, অনাথ। যুদ্ধে দয়া, মায়া, মানবতার স্থান নাই। যুদ্ধের সময় জনসাধারণের দুর্গতির একশেষ হয়। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য ক্রমশ বর্ধিত হয়—অতি সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে। বর্তমান যুগের যুদ্ধে নিরীহ জনসাধারণের জীবনও বিপদাপন্ন হয়। একটি মাত্র বোমার আঘাতে রণাঙ্গনের বহির্ভূত অংশও ধ্বংসমুখে পতিত হয়।

যুদ্ধের সময় মুনাফাখোর ব্যবসায়ী এবং ধনিক শ্রেণীর পোয়াবারো। তাহারা সুযোগ বুঝিয়া এই সময় চোরাবাজার ফাঁদিয়া বসে। চোরাবাজারের দুর্নীতি কেবলমাত্র বাজারেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রেও তাহা প্রবেশ করে। ইহার ভয়ঙ্কর কুফল—সামাজিক কল্যাণবন্ধনের বিপর্যয়। বিপন্ন

জনসাধারণ তখন শান্তির জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে! রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে তখন মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

"হে বৈরাগী, কর শান্তি পাঠ!"

অনেকের হয়তো ধারণা থাকিতে পারে, দুর্বল মানুষই কেবল শান্তির পক্ষপাতী। আসলে তাহা নয়। স্বার্থান্ধ মানুষ ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক মানুষই শান্তি প্রার্থনা করে। শান্তিই জগতের স্বাভাবিক অবস্থা—যুদ্ধ অস্বাভাবিক। সংগ্রামেরও শেষ লক্ষ্য শান্তি। রণচণ্ডিকা যখন ভীমবাহু উত্তোলন করিয়া বজ্রহুঙ্কারে যুদ্ধে উন্মত্ত হয়, তখন দৈত্য বিনষ্ট হয়। কিন্তু অসুর নিহত হইলেই যুদ্ধের প্রয়োজন মিটিয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীর হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীও আজ শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এই শতাব্দীর অর্ধপাদ গত হইতে না হইতেই দুইটি প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। স্বার্থান্ধ লোভী মানুষের স্বার্থ-এষণা ও লোভ তথাপি শান্ত হয় নাই; আবার শোনা যাইতেছে তৃতীয় এক বৃহত্তর যুদ্ধের আগমনী সংবাদ। শান্তিকামী মানুষ যুদ্ধের কুফল হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছে—তাই আরম্ভ হইয়াছে বিশ্বশান্তির অভিযান, মানুষ প্রচার করিতেছে—অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী!

কিন্তু শান্তি কি সত্যই আসিবে? অহিংস মানুষের প্রস্তাবে কি সম্মত হইবে সহিংস হিংস্র শ্বাপদ? 'শান্তির ললিতবাণী' ঘোষণা করিয়া যুগে যুগেই জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন—প্রেমের অবতার বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য। তাঁহাদের বাণী কি হিংসামত্ত মানুষকে শান্ত করিতে পারিয়াছে?—পারে নাই। জগতে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যতদিন মানুষের স্বাধিকার প্রচারের বাসনা নির্মূল না হইবে,—যতদিন লোভ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইবে—যতদিন যুদ্ধের জন্য ইচ্ছুক মানুষকে নিরস্ত্র করা না হইবে—ততদিন—

"শান্তির ললিতবাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস!"

যুদ্ধকে পরিহার করিতে হইলে, হিংসার বিষ সমূলে বিনষ্ট করিতে হইবে। হয়তো এ কার্য কোনদিনই সম্ভব হইবে না—কিন্তু সাধারণ মানুষ তবু পৃথিবীতে শান্তিই কামনা করিবে, যুদ্ধ নয়।

ভারত ও বিশ্বশান্তি

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর অবস্থা—ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি—বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইলে পৃথিবীবাসী ভাবিয়াছিল, পৃথিবীতে বুঝি বা জাতিতে জাতিতে ঈর্ষা-বিদ্বেষের বহ্নি নির্বাপিত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। উহার পরিবর্তে স্বরু হইল পৃথিবীব্যাপী এক স্নায়ুযুদ্ধ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিজমের একনায়কতন্ত্রের উচ্ছেদ হইল বটে, কিন্তু পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিরোধ পৃথিবীতে প্রবল হইয়া উঠিল। দুই বিবদমান শিবিরের একটি অন্যকে অবিশ্বাস ও দারুণ সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিল। বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র আণবিক অস্ত্র ও অন্যান্য নানারূপ সৃষ্টি-ধ্বংসকারী অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবনে মনোযোগী হইল।

ইহার ফলে সমস্ত পৃথিবী আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। সকলের মনেই এই আশঙ্কা জাগিল যে, এই বুঝি পৃথিবীতে আর একটি নরমেধ-যজ্ঞের সূচনা হয়, —আর তাহার ফলে সৃষ্টি বুঝি বা ধ্বংস হইয়া যায়! সমস্ত পৃথিবী আজ গভীর আতঙ্কে কালযাপন করিতেছে।

সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। পৃথিবীতে জনমত শান্তির অনুকূলে। আবার পৃথিবীর কতকগুলি রাষ্ট্রও নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার আনুকূল্য করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ভারত অন্যতম। হিংসায় যখন সমস্ত পৃথিবী উন্মত্ত, ক্ষমতাগর্বে গর্বিত পৃথিবীর রাষ্ট্রসকল যখন চাহিতেছে দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতে, বৈজ্ঞানিক অস্ত্রে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলি যখন চাহিয়াছে যুদ্ধভয় দেখাইতে, সাম্রাজ্যবাদের নেশা যখন পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রগুলির অন্যতম লক্ষ্য হইয়া পড়িল—শিশুরাষ্ট্র ভারত তখন পৃথিবীকে শুনাইল শান্তি, স্বাধীনতা ও সাম্যের গান। হিংসাসঙ্কুল পৃথিবীর আকাশে ভারত জ্বালাইল আশার আলো, সঞ্চার করিল বাঁচার সাহসিকতা। পৃথিবীকে শুনাইল নবজীবনের গান, নবজাগরণের রাগিণী।

ভারতবর্ষের পথ চিরদিনই শান্তির পথ। ভারতের সংস্কৃতি-সভ্যতা শান্তির উপর গড়া। আজ পৃথিবীতে একদিকে যুদ্ধের দামামা বাজিতেছে, জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে হিংসাকলহদ্বেষের বিষবাষ্প পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে,—অন্যদিকে এই অমানিশার অন্ধকারে অতন্দ্র নিশি জাগিয়া বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, গান্ধীজির দেশ ভারতবর্ষ পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রেম অহিংসার দীপশিখাটিকে জ্বালাইয়া রাখিতেছে,—পৃথিবীকে ডাকিয়া বলিতেছে, "শুন বিশ্বজন! যুদ্ধ নয়, শান্তি!"

ভারতবর্ষ শান্তির দেশ। স্মরণাতীত কাল হইতে এখানকার প্রতিটি ধূলি-কণায় অনুরণিত হইতেছে সেই চিরন্তন সত্যটি—'শান্তি'! ভারতের তপোবনে একদিন শান্তির মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম এই ভারতের মাটিতে শান্তি সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিল। অশোক-কর্তৃক প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বাণী এখানেই প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য, কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতি মধ্যযুগের সাধক,—বাউল সাধকগণ প্রভৃতি সকলেরই শান্তি ও সাম্যের গান এই ভারতভূমি হইতেই উচ্চারিত হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর সাম্য শান্তির বাণী এখনও আমাদের কানে বাজিতেছে। আজ গণতান্ত্রিক ভারত তাহার শান্তির বাণী আবার পৃথিবীতে নূতন করিয়া জানাইবার ভূমিকা লইয়াছে।

ইওরোপের ইতিহাস রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক, রাজ্যগৌরব অর্জনেই ইওরোপ তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। তাই ইওরোপের ইতিহাস পার্থিব সম্পদ-সমৃদ্ধি সঞ্চয়ের ইতিহাস। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক ইতিহাস নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পার্থিব ঐশ্বর্য-সম্পদের নেশায় মাতিয়া অন্যের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হওয়ার কথা পাওয়া যাইবে না। নানাপ্রকার বিভেদ বিরোধের মধ্যে ঐক্য, অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্য, বহুর মধ্যে একের প্রতিষ্ঠাতেই ভারতের সকল কর্মপ্রচেষ্টা নিয়োজিত।

রাষ্ট্রনৈতিক গৌরবের অভিলাষী হইলে বিরোধকে প্রশ্রয় দিতে হয়, সঙ্কীর্ণ কলহদ্বেষের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িতে হয়। তাই তাপস ভারতবর্ষ রাষ্ট্র-গৌরবের প্রতি চিরকালই উদাসীন নিরাসক্ত। ভারতবর্ষের সাধনা-সমন্বয়ের সাধনা, মানুষে মানুষে মহামিলনের সাধনা।

আজিও ভারতবর্ষ তাহার শান্তির বাণী আবার নূতন করিয়া পৃথিবীতে জানাইবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। বান্দুঙের ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগদান করিয়া বিশ্বশান্তির পক্ষে ভারত তাহার অকুণ্ঠ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষের ভূমিকা সত্যই অনন্যসাধারণ। 'পঞ্চশীল চুক্তি' বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এক মহৎ দিঙ্‌নির্ণয়। মৈত্রীর মধ্য দিয়া ভারত আজ গড়িয়া তুলিয়াছে শান্তিকামী রাষ্ট্রের দল। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এই সকল রাষ্ট্রের কুণ্ঠাহীন প্রয়াস আজ দেখা যাইতেছে।

ভারতের প্রচেষ্টাতেই কোরিয়ার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বন্ধ হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালের কোরিয়ার যুদ্ধ মীমাংসার পথ ধরিত না, যদি ভারত সেখানে শান্তিস্থাপক সেনাদল প্রেরণ না করিত। ইন্দোচীনে শান্তিস্থাপন, ভিয়েৎনামে শান্তিপ্রতিষ্ঠা সমস্তই ভারতের প্রচেষ্টায়। ফরাসী আলজিরিয়া, টিউনিস, মরোক্কোর স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠার পথেও ভারত সমর্থন জানাইয়াছে। নিকট বর্তমানে সুয়েজ খাল লইয়া যে বিবাদের সূচনা হইয়াছিল, যাহা একটি বিশ্বযুদ্ধে পরিণতি লাভ করিতে পারিত, তাহাতে ভারত আপত্তি জানাইয়াছিল। ভারত মিসরে ব্রিটিশ শক্তির ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ সহ্য করে নাই, প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও ভারত Commonwealth-এ সম্মানিত হইয়াছে। হাঙ্গারীতে রাশিয়ার আক্রমণে ভারত প্রতিবাদ জানাইয়াছে। চন্দননগর, পণ্ডিচারী শান্তিপূর্ণ উপায়েই ভারতভুক্ত হইয়াছে। গোয়ার ব্যাপারে ভারত সেই নীতিই অনুসরণ করিয়াছে। তরবারির দ্বারা নয়, যুক্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া গোয়াকে ভারতভুক্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা-পরিষদে চীনের অন্তর্ভুক্তি ভারতের প্রচণ্ড দাবি। যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তির শক্তি যে অধিক, একথা ভারতের দৃষ্টান্ত হইতে বিশ্ববাসী বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়াই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আর একটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইতে পারে নাই। ভারতের প্রাণপণ চেষ্টায় যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তির প্রতি পৃথিবীবাসীর আস্থা ক্রমশঃ যেভাবে বাড়িতেছে, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিলে এ পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত হইবে, ইহা আশা করা যায়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

মঙ্গলকাব্য

বিভিন্ন ধর্ম এবং উপধর্মকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্য। ধর্মের বেদীতলে বসিয়া প্রাচীন বাংলার কবিগণ দেবদেবীর প্রশস্তিমূলক এক শ্রেণীর কাব্য রচনা করেন, উহা মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক আখ্যানকাব্য। এই শ্রেণীর কাব্যের ভিতর দিয়া বিভিন্ন কবি বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেই বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সব চেয়ে বেশী জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে এই মঙ্গলকাব্যগুলি।

মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণ অধিকাংশই লৌকিক দেবতা,—যে সকল দেবতার পূজা সমাজে প্রচলিত ছিল না, সাধারণত তাঁহাদিগকে মঙ্গলকারী শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রচার করিবার জন্য মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়। এক একটি মঙ্গল-কাব্যে কোনও এক দেবতার মহিমাকীর্তন এবং সেই সূত্রে ঐ দেবতার শক্তি ও প্রতাপের বর্ণনা—কিরূপে লোকসমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রচার হয়, তাহার বৃত্তান্ত। এককালে এই মঙ্গলকাব্যগুলি দেবদেবীর পূজা বা উৎসব উপলক্ষে উপর্যুপরি কয়েকদিন ধরিয়া স্থর-তাল-সংযোগে গীত হইত। তাই মঙ্গলকাব্যের অপর নাম হইয়াছিল 'মঙ্গলগান'। সেকালের লোকের বিশ্বাস ছিল—এই সকল গান শুনিলে মঙ্গল হয়।

চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি নানা দেবদেবীকে লইয়া মঙ্গলকাব্য লেখা হয়। চণ্ডীর মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে,—চণ্ডীকে মঙ্গলকারী ও শক্তিশালী দেবতারূপে চিত্রিত করিয়া যে সকল মঙ্গলকাব্য লিখিত হইয়াছিল—সেগুলি 'চণ্ডীমঙ্গল' নামে পরিচিত হইয়াছে। মনসার মহিমা গান করিয়া যে সকল মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, সেগুলি 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণ' নামে বিখ্যাত। শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবতাকে যে সকল কাব্যে জাগ্রত মঙ্গলকারী দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল, সেগুলি যথাক্রমে 'শীতলামঙ্গল' ও

'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্য নামে খ্যাত হইয়াছে। এইরূপ 'গঙ্গামঙ্গলে' গঙ্গামহিমা, 'কৃষ্ণমঙ্গলে' কৃষ্ণমহিমা, 'দুর্গামঙ্গলে' দেবী দুর্গার মহিমা বর্ণনা করা হইয়াছে। দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন-অঞ্চলে চিরকাল বাঘের ভয়। তাই সে-অঞ্চলে 'দক্ষিণরায়' নামে এক দেবতা কল্পিত হইয়াছিলেন। এই দক্ষিণরায়ের শক্তি-প্রতিপত্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্য,—পূজায় তাঁহার প্রসন্নতাসম্পাদন করিলে ব্যাঘ্রভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ইহা দেখাইবার জন্যও এক শ্রেণীর মঙ্গলকাব্য বচিত হইয়াছিল। উহার নাম—'রায়মঙ্গল'।

বাংলাদেশের শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা আপন সম্প্রদায়ের দেবতার প্রাধান্য এবং মহিমা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই সকল মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি করিয়াছিল। অর্থাৎ, ধর্মকলহে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তখনকার দিনে শাক্ত এবং শৈব, প্রত্যেক দলই চাহিয়াছে,—নিজেদের দেবতাকে বড় বলিয়া প্রচার করিতে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের দেবতা সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব কীর্তিকলাপপূর্ণ কাহিনী বচনা কবিয়াছে। এইভাবে শৈবগণ শিবের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া একখানি কাব্য রচনা করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শাক্তগণ শিবের মহিমা ও শক্তিকে খাটো করিয়া, চণ্ডী বা দুর্গার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া অপর একখানি কাব্য রচনা করিয়াছে। ইহারই ফলে বাংলার বহু প্রাচীন কাব্য রচিত হইয়া বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছে।

প্রথম অবস্থায় এই সকল মঙ্গলকাব্য ছড়া ও ক্ষুদ্র ব্রতকথাব আকাবে প্রচলিত ছিল। ক্রমশ বিভিন্ন কবির হাতে সেগুলি পল্লবিত হইয়া বিশাল কাব্যের আকার ধারণ করিয়া ছে।

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এদেশের সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস রহিয়া গিয়াছে। প্রাচীন বাংলার জনসমাজের সুখ-দুঃখের কাহিনী, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও ইহাতে আছে। বলিতে গেলে, এই মঙ্গলকাব্যগুলিই হইতেছে প্রাচীন বাংলার জনজীবনের আলেখ্য।

সাধারণ মানুষের জীবনের সহিত মঙ্গলকাব্যের যোগ যত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ, মধ্যযুগে রচিত আর কোনও সাহিত্যশাখার সহিত জীবনের যোগ তেমন ঘনিষ্ঠ নহে। এজন্যই এগুলি এককালে খুব জনপ্রিয় ছিল।

সেকালে মানুষ যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, সেই জীবন তাহারা অনুভব করিয়াছে এই সকল মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্য দিয়া। দেবতার কথার পাশাপাশি ইহাতে মানুষের কথাও ঠাঁই পাইয়াছে। মঙ্গলকাব্যগুলি দেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাহিনী, আবার মানুষের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের কাহিনীও বটে। এই সকল মঙ্গলকাব্যে সমাজের সুখ-দুঃখ, মানুষের আশা-আবেগ, দৈন্যব্যর্থতার বাস্তব চিত্রও পাওয়া গিয়াছে।

দেবতার লীলামাহাত্ম্যজ্ঞাপক এই মঙ্গলকাব্যগুলিকে দুইভাগে ভাগ করিয়া দেখিতে হয়। একভাগে লৌকিক দেবতাগণের লীলামাহাত্ম্য-প্রচারক মঙ্গলকাব্য। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল—এ সব হইতেছে লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যপবিপূর্ণ মঙ্গলকাব্য। এই লৌকিক ধারাটিই প্রথম এবং প্রধান। অনেককাল পরে, এগুলিরই প্রভাবে শিবমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী-সম্বলিত মঙ্গলকাব্যসমূহ রচিত হয়। লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা যায়, নূতন এক দেবতা প্রতিষ্ঠিত অপর এক দেবতাকে পরাভূত করিয়া নিজের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। প্রতিষ্ঠিত এই দেবতাটি অধিকাংশ স্থলেই শিব।

মঙ্গলকাব্যসমূহ কতকগুলি বাঁধা-ধরা রীতি বা ছাঁচ অনুসরণ করিয়া লিখিত। প্রায় সকল কবিই দেবতার স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের নায়ক নায়িকা শাপভ্রষ্ট দেবতা। নানা দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করিয়া, দেবতার অনুগ্রহে মঙ্গলকাব্যের পাত্রপাত্রীরা দুঃখমুক্ত হইয়াছেন। যে-দেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কাব্য রচিত, সেই দেবতার পূজা পৃথিবীতে প্রচার হইবার পর, এই সকল শাপভ্রষ্ট নায়ক-নায়িকা আবার দেবলোকে ফিরিয়া গিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের প্রারম্ভে গণেশবন্দনা, তারপর বিভিন্ন পৌরাণিক দেবতার বন্দনা। তৎপরে সৃষ্টিতত্ত্ব, দক্ষযজ্ঞ, বিশ্বকর্মার দেউল-নির্মাণ, কাঁচলি নির্মাণ, নারীগণের পতি-নিন্দা, বারমাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা, রন্ধনের বিশদ বিবরণ, চৌত্রিশ অক্ষর দিয়া দেবতার স্তুতি (চৌতিশা) ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যসমূহ অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। দেবতারা অলৌকিক শক্তিবলে ইঁহাদের ভক্তগণকে পুরস্কৃত করিয়াছেন। যাহারা ইঁহাদের প্রতি বিরূপ, তাহাদিগকে ইঁহারা আপন অলৌকিক মাহাত্ম্য ও শক্তি দেখাইয়া ভক্তে পরিণত করেন। মঙ্গলকাব্যে দেবতার অনুগৃহীত নায়কও কোন কোন ক্ষেত্রে অলৌকিক শক্তিবলে অসাধ্যসাধন করিয়াছেন,—যেমন ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন। অলৌকিকতার এইরূপ স্পর্শ থাকার ফলে, মঙ্গলকাব্যগুলি জায়গায় জায়গায় রূপকথার আকার ধারণ করিয়াছে।

এই শ্রেণীর কাব্যে স্ত্রী-দেবতার প্রাধান্য। পুরুষ-দেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যও রচিত হইয়াছিল। যেমন ধর্মমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, রায়মঙ্গল, গোবিন্দ-মঙ্গল, জগৎমঙ্গল, গোকুলমঙ্গল ইত্যাদি।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে মঙ্গলকাব্য রচনার সূত্রপাত হয়। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই মঙ্গলকাব্য রচনার ধারাটি অব্যাহত ছিল।

মনসামঙ্গল কাব্য

বাংলার বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্য অন্যতম। মনসা সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পদেবতা মনসার মহিমা ও শক্তির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। জনসমাজে কেন যে এই সর্পদেবতা কল্পিত হইয়াছিলেন, অথবা কেন যে তাঁহার পূজার প্রচলন সমাজে হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। সাপ মানুষের শত্রু। প্রতিবৎসর আমাদের এই বাংলাদেশে কত শত লোক যে এই সাপের কামড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেইজন্য সর্পদেবতা মনসার পূজার মধ্য দিয়া, তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া, সর্পদংশনের বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবার কথা মানুষের মনে জাগিয়াছিল।

পৃথিবীতে সর্পপূজার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মানুষ যে অবস্থায় প্রকৃতির পূজা করিত, সেই সময় হইতেই বোধ হয় সর্পপূজার প্রচলন। পৃথিবীর সকল দেশেই সর্পপূজা একসময়ে ছিল, এখনও কোথাও কোথাও এই সর্পপূজা

প্রচলিত আছে। আমাদের এই বাংলাদেশে আজও সর্পদেবতা মনসার পূজা প্রচলিত রহিয়াছে। বাংলার এই মনসাপূজার সময়ে দেবীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক গীত বা পাঁচালী গাওয়া হয়। মনসামঙ্গল গানের কাহিনীটি মোটামুটি-ভাবে এইরূপ।—

শিবের কন্যা মনসা পদ্মবনের মধ্যে জন্মলাভ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ইনি সর্পকুলের উপর আধিপত্য লাভ করিলেন। শিব ইঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলে, শিবগৃহিণী চণ্ডীর বড় ঈর্ষা জন্মিল। ফলে মনসা ও চণ্ডীর মধ্যে দারুণ বিবাদ বাধিল,—এই বিবাদ শেষ পর্যন্ত মারামারিতে গিয়া দাঁড়াইল। উহাতে মনসার একটি চোখ নষ্ট হইয়া গেল। ক্রুদ্ধ মনসা তাঁহার পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন। কিছুকাল পরে জরৎকারু মুনির সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। আস্তীক নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

চণ্ডীর উপর মনসার ক্রোধ জন্মিয়াছিল। কাজেই উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার জন্য মনসা ঠিক করিলেন,—চণ্ডী ও শিবের ভক্তগণের কাছ হইতে পূজা আদায় করিতে হইবে, চণ্ডীর মহিমাকে ম্লান করিতে হইবে।

প্রথমে সাধারণ লোকসমাজে পূজা-প্রচারের দিকে মনসা মন দিলেন। রাখাল বালক, জেলে, দরিদ্র মুসলমান প্রভৃতিকে আপন শক্তি দেখাইয়া, তাহাদের ভীতি জন্মাইয়া দেবী উহাদিগকে তাঁহার ভক্তে পরিণত করিলেন। তারপর সমাজের উচ্চস্তরে পূজা-প্রচারে মনসা মন দিলেন।

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীর উদ্ভব যে সময়ে হইয়াছিল, সে সময়ে বাংলার বণিক-সম্প্রদায় সমাজে খুব প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। তাই সেই বণিক-সমাজের কাছ হইতে মান-মর্যাদা লাভ করার জন্য মনসার আগ্রহ জন্মিল। বণিকসমাজের নেতা শিবোপাসক চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগর। শৈব চাঁদ সদাগরের কাছ হইতে পূজা-আদায়ের বিচিত্র কাহিনীই মনসামঙ্গল কাব্যের মূল কথাবস্তু।

শিবের পূজা ছাড়িয়া চাঁদ সদাগর মনসার পূজা কিছুতেই করিবেন না। অথচ চাঁদ সদাগর পূজা না করিলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচার হয় না। সুতরাং চাঁদ সদাগরের সহিত মনসা শত্রুতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মনসার

কোপে একে একে চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্র বিনষ্ট হইল। চাঁদ সদাগর 'মহাজ্ঞান' নামে এক অলৌকিক শক্তির বলে মনসার সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন। কিন্তু মনসার মায়ায় তিনি সেই 'মহাজ্ঞান' হারাইলেন।

অতঃপর চাঁদবেনে বাণিজ্যে গেলে তাঁহার সপ্তডিঙ্গা 'মধুকর' অমূল্য বাণিজ্যসম্ভার লইয়া জলমগ্ন হইল। চাঁদবেনে সমুদ্রের লোনা জলে পড়িয়া প্রায় অজ্ঞান হইলেন। এই অবস্থায় মনসা একরাশ পদ্মফুল চাঁদের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। উদ্দেশ্য চাঁদ সদাগর সেই ফুলকয়টি অবলম্বন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। নিজের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে মনসা চাঁদকে বিপর্যস্ত করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে মারিবার ইচ্ছা মনসার নাই। কারণ, চাঁদ হইতেই মর্ত্যের সম্ভ্রান্ত-সমাজে মনসার পূজা প্রচার হইবে—দেবীর প্রত্যাশা ইহাই।

রাত্রির অন্ধকারে ঈষৎ বিদ্যুতের আলোয় পদ্মফুলের স্তূপ দেখিয়া, উহাকে আশ্রয় মনে করিয়া বাঁচিবার আশায় চাঁদ সদাগর তাঁহার হাত বাড়াইয়াছেন। কিন্তু পদ্মফুল স্পর্শ করিয়াই তাঁহার মনে পড়িয়া গিয়াছে, মনসার অপর নাম 'পদ্মাবতী'। অমনি তিনি তাঁহার হাত সরাইয়া লইয়াছেন। মনসার কৃপার ভিখারী তিনি নহেন। মনসার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিবার সাধ তাঁহার নাই।

যাহা হউক, চাঁদবেনে বাঁচিলেন। নিজের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যেই মনসা তাঁহাকে বাঁচাইলেন। কৌপীনমাত্র সম্বল হইয়া তিনি বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তবু চাঁদবেনে অবিচলিত রহিলেন। শত দুঃখের আবর্তে পড়িয়াও চাঁদবেনে মনসার পূজার কথা মনের মধ্যে আমল দিলেন না।

ইতিমধ্যে চাঁদবেনের আর একটি পুত্র হইয়াছিল। তাহার নাম লক্ষ্মীন্দর। এই পুত্রটিকে লাভ করিয়া চাঁদসদাগরের পত্নী সনকা তাঁহার ছয়টি মৃতপুত্রের শোক ভুলিয়াছিলেন। চাঁদবেনের শোকক্ষত হৃদয়েও যেন অমৃতবর্ষণ হইয়াছিল কিন্তু দৈবজ্ঞ লক্ষ্মীন্দরের ভাগ্য গণনা করিয়া বলিল,—বিবাহের রাত্রেই সে সাপের কামড়ে মারা যাইবে।

চাঁদবেনের সম্মুখে আবার কঠোর পরীক্ষা। এখনও তিনি একমুঠা ফুল মনসা দেবীর পূজার উদ্দেশ্যে ফেলিয়া দিলেই লক্ষীন্দর রক্ষা পায়। যে ছয় পুত্র, আর সপ্তডিঙ্গা 'মধুকর' হারাইয়া চাঁদ সদাগর আজ শোকার্ত ও লক্ষীহীন —সেই সপ্তডিঙ্গা 'মধুকর' আর ছয় পুত্র তিনি ফিরিয়া পান। কিন্তু তবু মনসার পূজা তিনি করিলেন না। মনসার ক্রূর অভিসন্ধিকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য তিনি আদেশ দিলেন—লোহার বাসরঘর তৈয়ারী কর। সেই ঘরে লক্ষীন্দর বিবাহ-রাত্রি যাপন করিবে।

সাঁতালী পর্বতের উপরে লোহার বাসরঘর তৈয়ারী হইল। চাঁদ নিজে এই লোহার বাসরঘব-নির্মাণ তদারক করিলেন। পর্বতের উপর অসংখ্য নেউল ও ময়ূর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সাপের বিষকে নিস্ফল করে এমন অনেক গাছ-গাছড়া সাঁতালীতে লাগান হইল। সে-সকলের গন্ধে সাপের দল সে তল্লাট ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

যথাকালে বেহুলাব সহিত লক্ষীন্দরের বিবাহ হইল। লৌহবাসরে তাহারা বিবাহরাত্রি কাটাইবার জন্য গেল। কিন্তু চাঁদবেনের অত সতর্কতা সত্ত্বেও, সেই লোহার বাসরঘরে লক্ষীন্দর বিবাহের রাত্রেই সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল। মনসার অনুরোধে লোহার বাসর-নির্মাতা কারিগর সেই ঘরটির একজায়গায় চুলের মত সরু দুইটি ছিদ্র রাখিয়া দিয়াছিল। সেই ছিদ্রপথে মনসার আদেশে একটি সর্প গভীর রাত্রিতে ঐ লোহার বাসরঘরে ঢুকিয়া লক্ষীন্দরকে দংশন করিল।

বিবাহের রাত্রেই বেহুলা পতিহীনা হইল। কিন্তু বেহুলা তাহার স্বামীর মৃতদেহ ছাড়িল না। মৃত স্বামীর দেহটিকে লইয়া সে ভেলায় করিয়া ভাসিয়া চলিল। এই মৃত স্বামীকে লইয়া সে দীর্ঘ ছয়মাস ভেলায় ভাসিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে নানা জনে তাহাকে নানা প্রলোভন দেখাইয়াছে, মৃত স্বামীকে ত্যাগ করিবার কথা বলিয়াছে। কিন্তু বেহুলা তাহার স্বামীকে ছাড়ে নাই।

শেষ পর্যন্ত, বেহুলা ভেলায় করিয়া ভাসিতে ভাসিতে স্বর্গে গিয়া দেবতা-দিগকে নৃত্যগীতের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, তাহার স্বামীকে ও চাঁদবেনের অন্য ছয় পুত্রকে পুনর্জীবিত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া সে তাহার শ্বশুর চাঁদবেনেকে মনসার সহিত বাদ সাধিতে নিষেধ করিয়াছে।

চাঁদবেনে এতকাল কাহারও কথায় মনসার পূজা করেন নাই। কিন্তু পুত্র-বধূর মুখ চাহিয়া তিনি মনসার উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচারিত হইল।

বাঙ্গালা মনসামঙ্গল-কাহিনীগুলিতে চাঁদসদাগরের দৃঢ়তা, আর বেহুলার সতীত্ব চমৎকার ফুটিয়াছে। চাঁদসদাগর প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক। মানব-মহিমার এমন পরিপূর্ণ মূর্তি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। মনসার কোপে তাঁহার গৃহ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, শান্তিময় গৃহ শোকভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ভ্রূকুটিকুটিল-কটাক্ষে চাঁদ শত উৎপীড়ন ও কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। বেহুলার চরিত্রে কুলবধূর কোমলতার সহিত নির্ভীক তেজস্বিতা মিশিয়াছে। দুঃখ সহিবার শক্তিতে সে অতুলনীয়া। সতীত্বে সে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির সমজাতীয়া।

মনসামঙ্গলের কবি

প্রাচীনকালে কাব্যরচনার বিষয়বস্তু ছিল সীমাবদ্ধ। তাই একই বিষয় লইয়া বহু কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন। মনসামঙ্গলেও তাহাই দেখি। একজনের পর অন্য আর একজন কবি, ঐ একই কাহিনী লইয়া মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। এক মনসামঙ্গলের প্রায় একশত কবির পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এখানে আমরা মনসার গীতিরচয়িতা প্রধান প্রধান কয়েকজন মাত্র কবির সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম।

মনসার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গীত সর্বপ্রথম কাণা হরিদত্ত নামে এক কবি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা হইয়া থাকে। কাণা হরিদত্তের পরেই, মনসামঙ্গলের কবিগণের মধ্যে বিপ্রদাস পিপিলাই ও বিজয় গুপ্ত—এই দুইজন কবির নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইঁহারা সমসাময়িক কালের কবি—উভয়েরই আবির্ভাব হয় পঞ্চদশ শতকে। বিপ্রদাসের নিবাস ছিল—চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ার নিকটে বড়গাঁ বা বটগ্রামে।

বিপ্রদাসের কাব্যের নাম—'মনসা-বিজয়'। পুরাণ-প্রসঙ্গের অনুসরণ এ কাব্যখানির বিশেষত্ব। মনসামঙ্গলের দেবতা লৌকিক দেবতা, মনসামঙ্গলের কাহিনীও লৌকিক কাহিনী। কিন্তু কবি সেই লৌকিক কাহিনীকে পুরাণের মর্যাদা দিবার জন্য তাঁহার কাব্যের প্রথমাংশে বেশ যত্নসহকারে পুরাণ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন দেখা যায়। বিপ্রদাসের কাব্যে সামাজিক ও সমসাময়িক ইতিহাস বেশ আছে। চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রার প্রসঙ্গে নদীপথের যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, বা ভৌগোলিক যে বৃত্তান্ত তিনি দিয়াছেন, তাহা মূল্যবান্।

বিজয় গুপ্তের কাব্য পঞ্চদশ শতকের শেষ দশকের রচনা। কবির নিবাস ছিল বাখরগঞ্জ জেলার গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামে। কবির পিতার নাম সনাতন, মাতা রুক্মিণী। ইঁহারা বৈদ্যবংশজাত। কবি বলিয়াছেন—মনসার স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করেন। বিজয়গুপ্ত তাঁহার কাব্যকে 'মনসার গীত', 'মনসার পুঁথি'—এই নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

কাব্যখানিতে পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দুইই আছে। এ কাব্যের চরিত্রগুলিকে ঘিরিয়া বেশ একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য বিরাজ করিতেছে। বিজয় গুপ্ত অনলঙ্কৃত ভাষায় তাঁহার কাব্যের কাহিনী বর্ণনা করেন নাই,—অলঙ্করণের নানা ঐশ্বর্য তাঁহার কাব্যমধ্যে ছড়াইয়া আছে। কবির রচনার অন্যতম বিশেষত্ব—কথায় কথায় ব্যঙ্গের অবতারণা। হাস্যরসের প্রবাহ বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যখানিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

বিজয় গুপ্তের পরেই মনসামঙ্গল কাব্য-রচয়িতা কবিদিগের মধ্যে নারায়ণ দেবের নাম করিতে হয়। ইনি ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার বোর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবির পুরা নাম রামনারায়ণ দেব, উপাধি 'সুকবিবল্লভ'। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। নারায়ণ দেবের মনসাগীতির নাম 'পদ্মাপুরাণ'। ইঁহার কাব্য বাংলা দেশ ছাড়া আসামেও বহুল প্রচলন লাভ করে। অসমীয়া ভাষাতেও নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়। সেজন্য অসমীয়া সাহিত্যের প্রাচীন কবিগণের মধ্যে নারায়ণ দেবেরও নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের বহু কবি ইঁহার কাব্য অনুসরণ করিয়াই তাঁহাদের মনসা-গীতি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

নারায়ণ দেবের আবির্ভাবকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় নাই। তবে, আপন কাব্যমধ্যে কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীনত্বের ছাপ আছে। মনে হয়, ইঁহার আবির্ভাবকাল সপ্তদশ শতক।

করুণরস ফুটাইয়া তুলিতে এবং চরিত্রসৃষ্টিতে কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাছাড়া প্রাচীন বাংলার পল্লীজীবন, সলজ্জ বধূ, সতী নারীর অপূর্ব গরিমা, শৌর্য, পরাক্রম, সমুদ্রযাত্রা, সমাজ-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, সুখদুঃখ, হাস্যকৌতুক প্রভৃতির সুন্দর আলেখ্য নারায়ণ দেবের তুলিকায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণনাকে বাস্তবতাধর্মী করিয়া তুলিতে এ কবি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

দ্বিজ বংশীদাস মনসামঙ্গলের একজন প্রধান ও জনপ্রিয় কবি। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটওয়ারী গ্রাম ছিল কবির জন্মভূমি। ইনি খুব সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর কবি। কেহ কেহ ইঁহাকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের কবি বলিয়াও মনে করেন।

কবি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং মনসার পাঁচালী গান করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতেন। ইঁহার কাব্যের ভঙ্গি অনাড়ম্বর, ভাষা সরল। অনুভূতির তীব্রতায় এবং করুণরসের গভীরতায় কাব্যখানি এমনই যে, ইহা সহজেই শ্রোতা বা পাঠকের মনকে দ্রবীভূত করিয়া দেয়। শুনা যায়, ইঁহার এই মনসার গীতি শুনিয়া তখনকার দিনের নিষ্ঠুর নরহন্তা দস্যুসর্দার কেনারামের হৃদয় করুণরসে সিক্ত হইয়া গিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত, সে দ্বিজ বংশীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। দ্বিজ বংশীদাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"দ্বিজ বংশী ছিলেন পূর্ব ময়মনসিংহের প্রাণের কবি। বিবাহে, উপনয়নে ও অন্যান্য উৎসবে আজিও দ্বিজ বংশীর গান তাহাদের ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানাদির একটি প্রধান অঙ্গ।

মনসামঙ্গল কাব্যের অধিকাংশ পুঁথি পূর্ববঙ্গ হইতে পাওয়া। মনসার গীতি পূর্ববঙ্গেই বেশী সমাদৃত হইয়াছিল বলিয়া, এ কাব্যের অধিকাংশ কবিও পূর্ববঙ্গের। তবে পশ্চিমবঙ্গেও মনসামঙ্গল রচয়িতা কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। কেতকাদাসের কাব্য সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত। কবির আসল

নাম ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দ। ভণিতায় ইনি নিজেকে কেতকাদাস বা মনসার দাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,—কেতকার অর্থ 'মনসা'। কবির নিবাস ছিল দক্ষিণ রাঢ়ের কোনও স্থানে,—দামোদরের দক্ষিণ বা পশ্চিমের কোন গ্রামে। সমগ্র রাঢ় দেশে এ কবির কাব্যের বিশেষ সমাদর ছিল।

ক্ষেমানন্দ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাই পাণ্ডিত্যের প্রভা তাঁহার মনসা-মঙ্গলে পড়িয়াছে। বেহুলার চরিত্র, তাহার সতীত্বের তেজ, তাহার দুঃখ-বেদনার চিত্র কবি দক্ষতার সহিত আঁকিয়াছেন। ভেলায় মৃত স্বামীর শবদেহ লইয়া বেহুলার ভ্রমণকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি বর্ধমান জেলায় অনেক স্থানের যথাযথ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ দিয়াছেন। ইঁহার বর্ণনায় বাস্তবদৃষ্টির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। সহৃদয়তা ইঁহার রচনার প্রধান গুণ। বেহুলার চিত্রটি এই সহানুভূতি-রসে অভিষিক্ত হইয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

মনসামঙ্গল কাব্যসমূহে যেমন মনসার মহিমার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তেমনি চণ্ডীর মহিমার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেবীমহিমা যেমন বর্ণিত হইয়াছে, সেইসঙ্গে পৃথিবীর নরনারীর চরিত্র, সমাজের চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথাও চণ্ডীর চরিত্রের পাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চণ্ডী লৌকিক দেবতা। পুরাণের পার্বতীর সঙ্গে ইহার মিল আছে, তবে তাহা খুব ক্ষীণ। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী শুধু বিপদত্রাণকারিণী, শুধু বরাভয়দাত্রী।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবীমহিমা প্রচারের জন্য পরপর দুইটি কাহিনী বলা হইয়াছে। একটি কাহিনী ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী, অন্যটি ধনপতি সদাগরের কাহিনী। ব্যাধ কালকেতুর কাহিনীতে দেখানো হইয়াছে,—চণ্ডীর ইচ্ছা, পৃথিবীতে তাঁহার পূজা প্রচারিত হয় এবং ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর তাঁহার পূজা প্রচার করেন। কিন্তু নীলাম্বরকে কিভাবে মর্ত্যে পাঠানো যায়! দেবী তাই শিবকে অনুরোধ করিলেন, নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়া মর্ত্যে পাঠাও। কিন্তু

নিরপরাধকে অভিশাপ দিতে শিব কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন দেবীর মায়ায় নীলাম্বর শিবের কাছে দোষী প্রতিপন্ন হইলেন। শিবের অভিশাপে নীলাম্বরকে মর্ত্যে গিয়াই জন্মগ্রহণ করিতে হইল।

ইন্দ্র শিবপূজা করিতেন। একদিন ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর দেবরাজের শিবপূজার ফুল তুলিয়া দিয়াছেন। সেই ফুলের মধ্যে চণ্ডীর মায়াবলে একটি কীটের আবির্ভাব ঘটিল। নীলাম্বর তাহা জানিতে পারেন নাই। তারপর দেবরাজ ইন্দ্র যখন শিবের মাথায় পূজার অর্ঘ্য হিসাবে ফুল দিলেন, তখন ফুলের ভিতরকার সেই কীটটি মহাদেবের মাথায় দংশন করিল। দংশনের জ্বালায় অস্থির হইয়া মহাদেব ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন,—তুমি পৃথিবীতে গিয়া জন্মগ্রহণ কর। দেবলোকে তোমার ঠাঁই নাই। এই অভিশাপের ফলে নীলাম্বর পৃথিবীতে মানুষের ঘরে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার পত্নী ছায়াও স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়া পৃথিবীতে আসিলেন। স্বর্গলোকের এই নীলাম্বর কালকেতুরূপে ধর্মকেতু ব্যাধের ঘরে জন্মিলেন, তাঁহার পত্নী ছায়া ফুল্লরারূপে সঞ্জয়কেতু ব্যাধের ঘরে জন্মিলেন। কালকেতুর বয়স যখন এগার তখন তাহার সহিত সঞ্জয়কেতু ব্যাধের কন্যা ফুল্লরার বিবাহ হইল। ব্যাধের জীবন দুঃখময়। সুতরাং নিদারুণ দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে এই ব্যাধদম্পতির প্রথম জীবন কাটিতে লাগিল। কিন্তু চণ্ডীর অনুগ্রহে শেষ পর্যন্ত তাহাদের অতুল ঐশ্বর্য, অগাধ ধন-সম্পদ লাভ হইল। গুজরাটের বন কাটাইয়া কালকেতু নগর বসাইল, সেই নগরের সে অধীশ্বর হইল।

ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে দেখানো হইয়াছে,—চণ্ডীর রোষ উৎপন্ন করার ফল—দুঃখ-দুর্ভোগ-শাস্তি, লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ। আর, চণ্ডীর কৃপায় ও প্রসন্নতায় বিপদ হইতে মুক্তি। ঐ উপাখ্যানের নায়ক ধনপতি সদাগর। ইনি চণ্ডীকে গ্রাহ্য করেন না, ইনি শিবের উপাসক। ইঁহার পত্নী খুল্লনা চণ্ডীর ভক্ত,—তিনি স্বামীর মঙ্গলকামনায় একবার ঘট পাতিয়া চণ্ডীর পূজা করিলে, ধনপতি সদাগর ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সেই ঘটে লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার উপর চণ্ডীর আক্রোশ জন্মায় এবং ধনপতি সদাগর বাণিজ্য-যাত্রা করিলে চণ্ডীর মায়ায় সাগরে ভীষণ ঝড় উঠে। একে একে তাঁহার

ছয়টি বাণিজ্যের ডিঙ্গা ডুবিয়া যায়। কোনরকমে বাঁচিয়া তিনি সিংহলে গিয়া পৌছান, কিন্তু সিংহলরাজের কোপে পড়িয়া বন্দী হন। সবই চণ্ডীর মায়ায় ঘটিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত চণ্ডীর পূজা করিয়া এই ধনপতি সদাগর বন্দীদশা হইতে মুক্তি লাভ করেন, চণ্ডীর অনুগ্রহে তিনি তাঁহার নষ্ট সম্পত্তি ফিরিয়া পান।

চণ্ডীমঙ্গলের কবি

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি রচয়িতা খুব সম্ভবত মাণিক দত্ত। পরবর্তী কালে আরও অনেক কবি এই কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করেন। যেমন,—মুক্তারাম সেন, জনার্দন, ভবানীশঙ্কর, মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সুবিখ্যাত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার পূর্বগামী কবিদিগের বন্দনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

মাণিক দত্তেরে আমি করিলুঁ বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত পথ-পরিচয় ॥

মুকুন্দরামের এই উক্তিকে ভিত্তি করিয়া এই মাণিক দত্তকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি বলিয়া মনে করা হইয়াছে।

মাণিক দত্তের ভণিতাযুক্ত একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিখানিতে প্রাচীনতার ছাপ সুস্পষ্ট।

মাণিক দত্তের পরেই চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচয়িতা কবির মধ্যে মাধবাচার্যের বা দ্বিজ মাধবের নাম করিতে হয়। আপন কাব্যমধ্যে এই কবি তাঁহার আত্ম-পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। উহা হইতে জানা যায় যে, মুঘল সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে সপ্তগ্রাম-নিবাসী এই কবি ১৫০১ শকে, বা ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনা সমাধা করিয়াছিলেন। ভণিতায় কাব্যখানির নাম—'সারদা চরিত'। মাধবাচার্যের বর্ণনা সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও কবির বর্ণনা উজ্জ্বলতাবিহীন নহে। সংক্ষিপ্ততার জন্য মাধবাচার্যে বাস্তবতা বেশ ফুটিয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচয়িতা কবিদিগের মধ্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব। ইঁহার উপাধি ছিল 'কবিকঙ্কণ'। কাব্যমধ্যে ভণিতায় এ কবির কাব্যের নাম পাওয়া যাইতেছে—'অভয়া মঙ্গল'।

মুকুন্দরামের কাব্যের মধ্য হইতে কবির বংশপরিচয়, কবির জীবনেতিহাস জানা গিয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ইহা হইতে জানা গিয়াছে,—কবির পিতামহের নাম হৃদয় মিশ্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বা উপাধি 'কবিচন্দ্র'। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার সেলিমাবাদ পরগণায় দামুন্যা নামক গ্রামে। সাতপুরুষ ধরিয়া ইঁহারা এই গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু মামুদ সরিপ নামে এক অত্যাচারী মুসলমান ডিহিদারের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া মুকুন্দরামকে সপরিবারে তাঁহার জন্মভূমি দামুন্যা পরিত্যাগ করিতে হয়। জন্মভূমি ছাড়িয়া নানা জায়গায় ঘুরিয়া, পথে বহু দুঃখকষ্ট পাইয়া কবি শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুরে আরড়া গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের শরণাপন্ন হন। বাঁকুড়া রায় কবিকে আশ্রয় দেন এবং তাঁহাকে আপন পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। কবির আশ্রয়দাতা বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর, রঘুনাথ রায় জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। ইনি কাব্যানুরাগী ছিলেন। ইঁহারই অনুরোধে মুকুন্দরাম তাঁহার বিখ্যাত 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। ইনিই মুকুন্দরামকে 'কবিকঙ্কণ' এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। একদিকে দেবীর স্বপ্নাদেশ, অন্যদিকে রাজাজ্ঞা যে মুকুন্দরামের কাব্যরচনার কারণ হইয়াছিল, তাহা কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। চরিত্র-চিত্রণে, বাস্তব-বর্ণনায়, দারিদ্র্যের দুঃখবর্ণনায় মুকুন্দরামের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যখানির অপূর্বত্ব। দরিদ্র গৃহস্থালির বর্ণনায়, ভাঁড়ু দত্তের শঠতার চিত্রাঙ্কনে, মুরারি শীলের কুটিলতা ও স্বার্থপরতা অঙ্কনে মুকুন্দবাম অসামান্য ক্ষমতার পরিচয়

দিয়াছেন। ইঁহার কাব্যের অপর বিশেষত্ব,—এখানে সেকালের রাষ্ট্র, সমাজ, গৃহস্থালি প্রভৃতির নিখুঁত বর্ণনা আছে; সমাজের রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠানের কথা এই কাব্যের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া আছে। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, বৈশ্য, কায়স্থ, বণিকদিগের সামাজিক মর্যাদার কথা কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন,—বিভিন্ন জাতির জাতিগত বৃত্তির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মুকুন্দরাম বাস্তবতার কবি। দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে বসিয়াও তিনি সমাজের নানা কথা, নানা সংবাদ দিয়াছেন। তাঁহার কাব্য মঙ্গলকাব্য,—তাই অলৌকিকতা তাঁহার কাব্যমধ্যে খানিকটা স্বভাবতই থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যের সেই অলৌকিকতা উহার বহিরাবরণ মাত্র। বাহিরের ঐ অলৌকিকতার আড়ালে বাস্তবরস বহিয়া গিয়াছে। সমস্ত অলৌকিকতাকে ছাপাইয়া তদানীন্তন বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালীর আশা-কল্পনা, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের কাহিনীই কাব্যখানির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মুকুন্দরামের খ্যাতি দুঃখের কবি বলিয়া। দুঃখবর্ণনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। নিজ জীবনে তিনি নানারূপ দুঃখদুর্দশা ও দারিদ্র্য ভোগ করিয়াছিলেন। দুঃখদারিদ্র্যের এইরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া, মুকুন্দরামের কাব্যের দুঃখসঙ্গীত অতি সহজেই পাঠকের মনটাকে একেবারে কাড়িয়া লয়; চিত্তকে দ্রবীভূত করিয়া দেয়।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

চণ্ডী, মনসা, ষষ্ঠী প্রভৃতির কাহিনী লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগে যেমন অসংখ্য মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তেমনি ধর্মঠাকুর নামে এক দেবতার মহিমাগান করিয়া,—এই দেবতাটিকে শক্তিশালী জাগ্রত দেবতা বলিয়া প্রচার করিয়া, এক শ্রেণীর মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। সেগুলির নাম—ধর্মমঙ্গল কাব্য।

আমাদের এই বাঙ্গালাদেশের সকল দেবতাই কিছু আর্য-দেবতা নহেন। এদেশে বহু অনার্য দেব-দেবী, অনেক বৌদ্ধ দেবতা, বৈদিক বা পৌরাণিক

দেবতার সহিত মিশিয়া একাত্ম হইয়া পূজা পাইতেছেন। 'ধর্মঠাকুর' এমনই এক দেবতা। আদিতে ইনি অনার্য দেবতা ছিলেন। কালক্রমে এই দেবতাটি শিব এবং বিষ্ণুর সহিত একাত্ম হইয়া,—বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া,—বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত সমাজে বাস করিয়া, সকলের কাছ হইতে পূজা আদায় করিয়া, বর্তমানে হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে 'ধর্মরাজ' বা 'ধর্মঠাকুর'—এই নাম লইয়া পূজা পাইতেছেন।

ধর্মঠাকুরের কোন বিগ্রহ নাই। কূর্মের আকৃতি-বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড ধর্মঠাকুরের প্রতীক। উহা দেখিতে অনেকটা বৌদ্ধ স্তূপ বা চৈত্যের মত। ধর্মঠাকুরের এই মূর্তি পরিকল্পনার মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বৌদ্ধ ত্রিরত্নের 'ধর্ম' অনেক সময়ে স্তূপের আকারে পূজা পাইতেন। স্তূপের পাঁচদিকে পাঁচটি কুলুঙ্গির মত থাকিত। তাহাতে স্তূপটি কূর্মের মত দেখিতে হইত।

শিলাখণ্ডের এইরূপ পূজা প্রস্তর-উপাসক আদিম মানবের পূজা-পদ্ধতির কথা মনে করাইয়া দেয়। বৃক্ষপূজা বা বনস্পতির পূজা যেমন অরণ্যবাসী আদিম মানুষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, প্রস্তর পূজাও তদ্রূপ অতি আদিম ইতিহাসের একযুগের পরিচায়ক।

এক সময়ে এই দেবতাটির পূজা নিম্নস্তরের জাতির মধ্যে,—অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং হিন্দুসমাজের নিকট হইতে পূজা পাইতে এই দেবতাটির বেশ সময় লাগিয়াছিল। মাণিক গাঙ্গুলী (ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি—অষ্টাদশ শতক) তাঁহার ধর্মমঙ্গলে বলিয়াছেন,—"জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান"। ধর্মঠাকুরের পূজা করিলে জাতিচ্যুত হইবার যে আশঙ্কা ছিল, তাহা এখানে দেখা যাইতেছে। এই দেবতাটির পূজা করিলে দেশের মধ্যে অখ্যাতি রটিত,—"অচিরাৎ অখ্যাতি রটিবে দেশে দেশে।"

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে এবং সম্ভবতঃ তাহারও পূর্বকালে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতক হইতে কেবল রাঢ় দেশে, বিশেষ করিয়া দামোদর ও অজয় নদের তীরবর্তী ভূভাগে এই ধর্মঠাকুরের পূজা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। বর্তমানে এই দেবতাটির পূজা রাঢ় দেশে ও উহার সন্নিহিত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে এই দেবতাটি ইঁহার অনার্য ও বৌদ্ধ পরিচয় ও সংস্কার যথাসম্ভব গোপন করিয়া, হিন্দুসমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লন। বর্তমানে এই ধর্মঠাকুরের কাছে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে নরনারী তাহাদের নানা অভীষ্ট পূর্ণ হওয়ার জন্য মানসিক করে। প্রার্থনা সফল হইলে দেবতার সম্মুখে শূকর, ছাগ, হাঁস, কবুতর, মুরগী প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। ভোগে প্রচুর পিঠা, মদ্য এবং চুন দেওয়া হইয়া থাকে। শূকর, হাঁস, কবুতর, মুরগী,—পূজার এই সকল উপকরণ দেখিয়াই বুঝা যায় যে, হিন্দু দেবতার ছদ্মবেশে কোন অনার্য দেবতাই পূজা পাইতেছেন। চুন পূজার উপকরণ হিসাবে কোনও হিন্দু পূজায় ব্যবহৃত হয় না। বর্তমানে এই দেবতাটি শিবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন এবং শিব হিসাবেই পূজিত হইতেছেন। ইঁহার পূজার সময়ে যে গীত গাওয়া হয়,—তাহা শিবের গাজন।

বাঙ্গালাদেশে ধর্মপূজা-সংক্রান্ত যে-সকল কাব্য গাওয়া গিয়াছে, সেগুলিকে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়া দেখিতে হয়। এক শ্রেণীর কাব্যে ধর্মঠাকুরের জন্মের কথা, তাঁহার পূজা-প্রবর্তনের কাহিনী, ধর্মপূজার শাস্ত্র আছে। ধর্মঠাকুরের পূজা কি করিয়া করিতে হয় তাহার বিধান আছে, ধর্মপূজার মন্ত্র আর ছড়া আছে। ধর্মপূজকদিগের নিজস্ব একটি সৃষ্টিতত্ত্ব আছে, তাহাও এই শ্রেণীর কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলিকে **ধর্মপুরাণ** বা **শূন্যপুরাণ** বলা হইয়া থাকে।

আর এক শ্রেণীর কাব্য হইতেছে **ধর্মমঙ্গল** কাব্য। এগুলি ধর্মপূজার সময়ে, অথবা অন্য কোনও উৎসবাদিতে রামায়ণ ও চণ্ডীমঙ্গল বা মনসামঙ্গলের মত নিষ্ঠা সহকারে গীত হইত। এই শ্রেণীর কাব্যসমূহেই একটি কাহিনীর মধ্য দিয়া ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। কাহিনীটির নাম লাউসেনের কাহিনী।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন। ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহে ইনি অসামান্য সাহস ও শক্তির অধিকারী। বহু অলৌকিক কার্য ইনি করিয়াছেন। মৃত শিশুর মুখে ইনি কথা ফুটাইয়াছেন, মৃত সৈন্যের প্রাণদান করিয়াছেন। ইনি ইন্দ্রিয়জয়ী। অনায়াসে ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি বন্যজন্তুদিগকে বশ করিয়াছেন,

বা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইছাই ঘোষ অপরাজেয়,—তাহাকেও পরাজিত করিয়া লাউসেন আপন বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া এমনিতর অনেক অসাধ্য-সাধন করার কথা ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহে বেশ ফলাও করিয়া বলা হইয়াছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহের জনপ্রিয়তার কারণ, এখানে ধর্মরাজকে সর্ববাঞ্ছাপূরণকারী দেবতারূপে অঙ্কন করা হইয়াছে।

ধর্মমঙ্গলের কবি

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত ধর্মমঙ্গলকাব্য রচয়িতা কবি অনেক। এই ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহের আদি কবি কে, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। তবে প্রায় সকল ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিই ময়ূর ভট্ট নামক কবিকে বলিয়াছেন—"ময়ূর ভট্ট বন্দিব সঙ্গীতের আদি কবি"। কিন্তু ময়ূর ভট্টের কাব্য পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার উপায় নাই।

কাহারও কাহারও মতে—খেলারাম নামক এক কবির কাব্যই প্রাচীনতম ধর্মমঙ্গল। কিন্তু ইহার কাব্যের অসম্পূর্ণ খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া যাওয়ায়, ইহাকে ধর্মমঙ্গলের আদি কবি হিসাবে গ্রহণ করিতে অনেকে রাজী নহেন। পরবর্তী কোন কোন কাব্যে রূপরাম নামক এক কবিকে ধর্মমঙ্গলের আদি কবি হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে। রূপরামের কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে এবং উহার বিচার করিয়া, অনেকে রূপরামের এই ধর্মমঙ্গলকেই প্রাচীনতম নিদর্শন মনে করেন।

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত। এ কাব্যের কাহিনী অতিশয় করুণ ও মর্মস্পর্শী। ইহাতে সেকালের বাঙ্গালী জীবনের যেরূপ পরিপূর্ণ বাস্তব, অথচ মনোহর চিত্র আছে, সেরূপ দৃষ্টান্ত এক কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ভিন্ন অন্য কোথাও বড় একটা নাই। রূপরামের কাব্যের চরিত্রগুলি অলৌককতাবর্জিত, বাস্তবানুগ। বাস্তব চিত্রাঙ্কনের জন্য

প্রাচীন বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে কয়খানি গ্রন্থ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছে, তাহার মধ্যে রূপরামের কাব্য শীর্ষস্থান অধিকারের দাবি করিতে পারে।

উপরে যে কয়জন ধর্মমঙ্গলকাব্য রচয়িতা কবির নাম করা হইয়াছে, তাছাড়াও অনেক ধর্মমঙ্গলের কবি পাওয়া গিয়াছে। যেমন,—রামদাস আদক, সীতারাম দাস, ঘনরাম চক্রবর্তী, মাণিক গাঙ্গুলী, সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি।

রামদাস আদক জাতিতে কৈবর্ত ছিলেন। ইঁহার বাসস্থান ছিল হুগলী জেলার হায়াৎপুব গ্রাম। রামদাসের কাব্যে রূপরামের প্রভাব আছে। ইঁহার কাব্যের নাম 'অনাদিমঙ্গল'। অনাদিমঙ্গলের ভাষা সহজ ও সরল। কবিত্বপূর্ণ ভাব ও উদ্দীপনার অভাব ইহাতে নাই।

সীতারাম দাসের বাস ছিল বর্ধমান জেলার সুখসাগর গ্রমে। স্বপ্নাদেশ পাইয়া ইনি ইঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন,—একথা কবি তাঁহার কাব্য-মধ্যেই বলিয়াছেন। প্রকৃতি-বর্ণনায়, বনভূমির শোভা বর্ণনায়, ঝড়ের চিত্র ইত্যাদি অঙ্কনে এ কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ইঁহার কাব্যের ভাষা লঘু-গতি সম্পন্ন। সাধারণত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে একটা একঘেয়ে সুর বাজিয়াছে। কিন্তু ঘটনার বৈচিত্র্য থাকায় সীতারাম দাসের কাব্যে সেই একঘেয়ে সুরটি ধ্বনিত হয় নাই।

ঘনরাম চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগের কবি। ইনি বর্ধমানের অন্তর্গত কৃষ্ণনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ইনি 'কবিরত্ন' এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বর্ধমানের অধিপতি মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের আদেশে ইনি ইঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ঘনরামের কাব্য অনুপ্রাসবহুল। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত বচনের বহুল প্রয়োগ আছে,—পাণ্ডিত্যেব প্রভায় কাব্যখানি সমুজ্জ্বল।

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রচিত। কাব্য হিসাবে ইহা ঘনরামের রচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু হাস্যরসের সৃষ্টিতে কবি বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

অষ্টাদশ শতকে ধর্মপূজা-সংক্রান্ত একখানি বিখ্যাত **ধর্মপুরাণ** রচিত হয়, উহা রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ। শূন্যপুরাণে নিরঞ্জন শূন্যমূর্তির বর্ণনা আছে,—

এই শূন্য নিরঞ্জনই হইতেছেন ধর্ম। ইনিই শূন্যপুরাণের প্রধান দেবতা। এই শূন্যমূর্তির পরিকল্পনার উপর বৌদ্ধপ্রভাব আছে। অষ্টাদশ শতকে আর একখানি উল্লেখযোগ্য ধর্মপুরাণ রচিত হয়। উহা সহদেব চক্রবর্তীর ধর্ম-পুরাণ বা 'অনিল পুরাণ'।

রামায়ণ

বাঙ্গালীর জীবনের উপর যে দুইখানি কাব্য সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার একখানি হইতেছে রামায়ণ, অন্যটি মহাভারত। এই দুই-খানি কাব্য বাঙ্গালীর জীবনকে গঠন করিয়াছে; বাঙ্গালীকে কত পুণ্যকথা, কত ত্যাগের কথা শুনাইয়াছে। এই দুইখানি কাব্যের গল্পকাহিনী ও নীতি উপদেশ বাংলার লোকশিক্ষার প্রধান সম্বল।

রামায়ণের আদি কবি বাল্মীকি। বাল্মীকি-রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। আমাদের দেশে আদি কবি বাল্মীকির এই সংস্কৃত রামায়ণ অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি বাংলা রামায়ণ রচিত হইয়াছিল।

বাংলা রামায়ণের আদি কবি কৃত্তিবাস। ইনি পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগের কবি। গৌড়েশ্বর দনুজমর্দন গণেশ নামক রাজার ইনি ছিলেন সভাকবি এবং রাজাদেশে ইনি রামায়ণ রচনা করেন।

বাল্মীকির রামায়ণ কাব্য অবলম্বনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হয়। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের হুবহু অনুবাদ নহে। রামায়ণ রচনায় কৃত্তিবাসের যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণ অবলম্বনে নূতন সৃষ্টি। অনেক জায়গায় তিনি মূলের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও কোথাও নিজের কল্পনার দ্বারা চরিত্র অথবা ঘটনাকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন। যেমন, বাল্মীকির রাম বীর। কঠোরতায় ও দৃঢ়তায় তিনি এক বিশাল পুরুষ। কিন্তু কৃত্তিবাসের রাম স্নিগ্ধ কোমল। বাল্মীকির সীতা একাধারে করুণা ও তেজের মূর্তি। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে শুধুই সীতার করুণমধুর শ্রীটুকুই ফুটিয়াছে। বাঙ্গালী

কোমল ভাবের ভাবুক। তাই কৃত্তিবাস বাঙ্গালীর মনের মত করিয়া তাঁহার রামায়ণ কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি রামকে শ্যামসুন্দর পল্লবের মত করিয়া আঁকিয়া গিয়াছেন। কোমল মধুরতার জন্যই তাঁহার কাব্য বাঙ্গালীর এত প্রিয় হইতে পারিয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙ্গালী চরিত্রের, বাংলার সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

কৃত্তিবাস সহজ ও সর্বজনবোধগম্য ভাষায় তাঁহার রামায়ণ কাব্যে আপন কবিত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সরলতার জন্য বাঙ্গালীর কাছে তাঁহার রামায়ণের সমাদর। কৃত্তিবাসী রামায়ণে উপমার আতিশয্য নাই, অলংকারের বাহুল্য নাই। তাঁহার বর্ণনায় স্বাভাবিক মাধুর্য আছে। তাঁহার রামায়ণ একদিকে আনন্দ দান করে, অন্যদিকে উচ্চতর নৈতিক আদর্শের সন্ধানও দিয়া থাকে। ইহা আমাদের হৃদয়কে মহত্ত্বের দিকে, কল্যাণের দিকে, মানবতার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। কৃত্তিবাসের এই রামায়ণ হইতে বাঙ্গালী ধর্ম শিখিয়াছে, নীতিশিক্ষা পাইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য।

কৃত্তিবাসের পরে বহু কবি রামায়ণ রচনা করেন। এই সকল রামায়ণ রচয়িতা কবিগণের মধ্যে কেহ বাল্মীকি রামায়ণ অনুসরণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ বা বাল্মীকি রামায়ণের অংশ বিশেষ অনুবাদ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালের কবি ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য সকল রামায়ণ-রচয়িতা কবি হইতেছেন—চৈতন্য-পরবর্তী কালের। কৃত্তিবাসের পরবর্তী কালে যেসকল রামায়ণ রচিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানি কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।—**অনন্ত রামায়ণ,**—ইহা অনন্ত কন্দলী নামে আসাম-নিবাসী এক ব্রাহ্মণের রচনা। **দ্বিজ হরিচন্দ্রের** (মধুকণ্ঠ) রামায়ণ। এ কবি খুব সম্ভবত সপ্তদশ শতকের। **ষষ্ঠীবর সেন** ও তাঁহার পুত্র **গঙ্গাদাস সেন**—ইহারা সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণ রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। **ভবানীদাসের লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়**। ভবানীদাস জয়চন্দ্র নামক কোন রাজার আদেশে প্রায় পাঁচ হাজার শ্লোকে পরিপূর্ণ এই কাব্যখানি রচনা করেন। **দ্বিজ দুর্গারামের** রামায়ণ। **রঘুনন্দন গোস্বামী** রচিত **রামরসায়ন**।

জগৎরাম রায়ের রামায়ণ। এই রামায়ণখানি অষ্টাদশ শতকের শেষে রচিত হয়। পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথ সিংহের আদেশে গ্রন্থখানি রচিত। **শিবচন্দ্র সেনের সারদা-মঙ্গল**। ইহা শ্রীরামচন্দ্র-কর্তৃক দুর্গাপূজার প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত কাব্য। কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। **অদ্ভুতাচার্যের** রামায়ণ। এই রামায়ণখানি এককালে উত্তরবঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। কবির নিবাস ছিল পাবনা জেলার অমৃতকুণ্ডা গ্রামে। ইঁহার আবির্ভাব সপ্তদশ শতকের শেষভাগ। কবির আসল নাম নিত্যানন্দ আচার্য। **রামানন্দ ঘোষের** রামায়ণ। **দ্বিজ সীতাসুত** রচিত রামায়ণ। অষ্টাদশ শতকে মল্লরাজ গোপালসিংহদেবের আদেশে ইহা রচিত হয়। **দ্বিজ লক্ষ্মণ**-এর রামায়ণ। এটি সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের রচনা। **রামমোহন** রচিত রামায়ণ। এখানি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত। **কবিচন্দ্রের** রামায়ণ। ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হয়। কবিচন্দ্র বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের অধিবাসী ছিলেন। মল্লরাজ ইঁহাকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন।

মনসামঙ্গলকাব্য রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা **চন্দ্রাবতী** সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত একখানি রামায়ণ-গাথা বা ছড়া পাওয়া গিয়াছে। চন্দ্রাবতীর জীবন ছিল বড় করুণ ও দুঃখের। সেই জন্য তাঁহার রামায়ণ-গাথায় এক মর্মভেদী করুণ বিলাপধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ণনাগুণে চন্দ্রাবতী-রচিত রামায়ণের সীতা চরিত্রটি ধৈর্যে, মাধুর্যে, তেজস্বিতায় ও মহত্ত্বে অতুলনীয় হইয়াছে।

মহাভারত

বাংলা দেশে অগণিত কবি সংস্কৃত মহাভারত-বর্ণিত বিষয় লইয়া ছোটবড় বহু বাংলা কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ সমগ্র মহাভারত কাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন, কেহ বা মহাভারত কাব্যের কোন বিশেষ পর্ব বা উপাখ্যান অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। মহা-

ভারতের আদিকবি ব্যাসদেব বা ঋষি দ্বৈপায়ন। ইঁহার কাব্যখানি বিশাল। বহু পরবর্তী কালে মুনিবর জৈমিনী ব্যাসদেবের ঐ বিশাল কাব্যখানিকে সংক্ষিপ্ত করেন। বাংলা মহাভারত-রচয়িতা কবিগণ প্রধানত এই জৈমিনী মহাভারত অনুসরণ করিয়াই তাঁহাদের কাব্যরচনা করিয়া গিয়াছেন। ব্যাসের সহিত ইঁহাদের সম্পর্ক অল্প।

সংস্কৃত মহাভারত কাব্যের প্রাচীনতম অনুবাদকর্তা কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক কবি। ইঁহার রচিত কাব্যের নাম 'বিজয় পাণ্ডব কথা' অথবা 'ভারত-পাঁচালী'। কাব্যমধ্যে ভণিতা দিতে গিয়া কবি তাঁহার কাব্যকে ঐ দুই নামেই অভিহিত করিয়াছেন। এই কাব্যখানি বাংলার শাসনকর্তা হুসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়। হুসেন শাহের এক সেনাপতি—চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর পরাগল খানের আদেশে ইহা লিখিত হইয়াছিল। এইজন্য কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতখানি 'পরাগলী মহাভারত' নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে। পরাগল খান বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন, মহাভারত-কথা শুনিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। তাঁহার সভায় প্রতিদিনই মহাভারত-কাহিনী পঠিত হইত। কবীন্দ্র পরমেশ্বর এসব কথা তাঁহার কাব্যের মধ্যে বলিয়া গিয়াছেন।

লস্কর পরাগল খান হএ মহামতি
পুত্র-পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥

কবীন্দ্রের এই ভারত পাঁচালীতে স্ত্রী-পর্ব পর্যন্ত আছে। বর্ণনাগুণে কাব্যখানি উৎকৃষ্ট। কবি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। মাঝে মাঝে মূলের আক্ষরিক অনুবাদ কবীন্দ্রের মহাভারতে পাওয়া যায়।

পরাগল খানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ছুটি খান চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হন। ইনিও ইঁহার পিতার মত বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের কাহিনীটি শুনিতে ইঁহার বড় ভাল লাগিত। ইনি শ্রীকর নন্দী নামক এক কবির দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের একটি বিস্তৃত অনুবাদ করান। উহা তাঁহার রাজসভায় নিত্য পঠিত হইত। শ্রীকর নন্দীর রচনার অন্যতম গুণ ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনে।

মহাভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দাস। ইঁহার আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ বা সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগ। কৃত্তিবাসী রামায়ণ যেমন বাল্মীকির হুবহু অনুবাদ নহে, কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদও তেমনি ঠিক সংস্কৃতের অনুযায়ী নহে। কবি মহাভারত-কাহিনী বলিতে গিয়া কিছু ব্যাসদেব হইতে লইয়াছেন, কিছু পুরাণান্তর্গত কাহিনী হইতে লইয়াছেন, কিছু বা তাঁহাদের পূর্ববর্তী বাঙ্গালী কবিগণের মহাভারত হইতে লইয়াছেন। আর বাকিটুকু কবি তাঁহার মৌলিক কবিপ্রতিভা ও কবিকল্পনার দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। সেখানে তিনি শব্দযোজনার মাধুর্য দিয়াছেন, সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন, উপমা-প্রয়োগে নিপুণতা দেখাইয়াছেন।

কাশীরাম দাস বাংলার চিরপ্রিয় কবি। ইঁহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোন কোন কবির মহাভারতের স্থানবিশেষ উৎকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে কাশীরাম দাসের মহাভারতখানি অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মহাভারতে সৌন্দর্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকিতে পারে; কিন্তু কাশীরাম দাসে আদ্যোপান্ত সর্বত্রই একটি সৌন্দর্যস্রোত প্রবাহিত হইয়া ইহার মাধুর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, ইহাকে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সৃষ্টিতে পরিণত করিয়াছে।

কাশীরাম দাস মহাভারতের অমৃত-সমান কাহিনী বাংলাদেশে প্রচার করিয়া বাঙ্গালীর অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। ভগীরথ যেমন মহাদেবের জটার মধ্য হইতে গঙ্গাকে মুক্ত করিয়া, গঙ্গার পূতবারিধারা জগতে বহাইয়া দিয়া পৃথিবীকে উর্বরা শস্যশ্যামলা করিয়াছেন, কাশীরাম দাসও তেমনি সেই ভগীরথের মত মহাভারতের ভাবধারা বাঙ্গালীর মনের গোচর করিয়া বাঙ্গালীর চিত্তকে সরস, উন্নত করিয়া গিয়াছেন।

কাশীরামদাসের জীবনী সম্বন্ধে যৎসামান্যই জানা গিয়াছে। বর্ধমান জেলার উত্তর দিকে ইন্দ্রাণী নামে এক পরগণা আছে। ঐ পরগণার মধ্যে ব্রহ্মাণী নদীর তীর-সন্নিহিত সিঙ্গি গ্রামে কাশীরাম দাসের নিবাস ছিল। কবি জাতিতে কায়স্থ। তাঁহার প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর,

পিতার নাম কমলাকান্ত। কমলাকান্তের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস, মধ্যম কাশীরাম দাস, কনিষ্ঠ গদাধর। ইঁহারা তিন ভ্রাতাই কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।

কথিত আছে যে, কাশীরাম দাস মেদিনীপুরের আওসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া শিক্ষকতা করিতেন। রাজবাড়ীতে পুরাণপাঠকারী পণ্ডিত ও কথকদিগের মুখে পুরাণ ও মহাভারতের প্রসঙ্গ শুনিয়া কাশীরাম দাস মহাভারতের অনুবাদে ইচ্ছুক হন। উহার ফলেই মহাভারতের অনুবাদ।

ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে অনেক মহাভারত, মহাভারতের পর্ববিশেষ, কিংবা মহাভারতের মধ্যবর্তী জনপ্রিয় কোন না কোন কাহিনীর অনুবাদ হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ঘটে এবং এই সকল ভারত-পাঁচালীর অনুবাদ ও প্রসার বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-রাজড়া বা ভূম্যধিকারীর পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই ঘটিয়াছিল।

ষোড়শ শতকে রচিত ভারত-পাঁচালী বা মহাভারতের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—১. রামচন্দ্র খানের অশ্বমেধ-পর্ব। ইহা জৈমিনী সংহিতা অবলম্বনে রচিত। কাব্যখানি বর্ণনাময়, কবির বর্ণনা সরস এবং জায়গায় জায়গায় বেশ বাস্তব। ২. মহাভারতের নল-দময়ন্তী কাহিনী অবলম্বনে পীতাম্বর নামে এক কবি একখানি 'নলদময়ন্তীচরিত্র' এই ষোড়শ শতকেই রচনা করেন। ৩. দ্বিজ রঘুনাথের অশ্বমেধ-পাঁচালী। উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের সভায় এই কাব্যখানি কবি পাঠ করিয়াছিলেন। ৪. কোচ-বিহারের রাজা জয়নারায়ণ এবং তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ বা 'চিলা রায়' কবি পণ্ডিতের বিশেষ সমাদর করিতেন। শুক্লধ্বজের আগ্রহে ও উৎসাহে অনিরুদ্ধ নামে এক কবি ষোড়শ শতকে একখানি মহাভারত-পাঁচালী রচনায় প্রবৃত্ত হন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত প্রধান প্রধান কয়েকটি মহাভারত কাহিনী: ১. নন্দরাম দাসের উদ্যোগ ও দ্রোণপর্ব। এই কবি কাশীরাম দাসের জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। ২. বিশারদ ভণিতাযুক্ত বন ও বিরাট পর্ব। ৩. নিত্যানন্দ ঘোষের ভারত-পাঁচালী। কবির উপাধি ছিল কবীন্দ্র। কাশীরাম দাসের কাব্যের তুলনায় এ কাব্যখানি সংক্ষিপ্ত। ৪. অনন্ত মিশ্র

রচিত অশ্বমেধ-পর্ব। ৫. দ্বিজ হরিদাসের অশ্বমেধ-পর্ব। ৬. রামেশ্বর নন্দীর মহাভারতের আদি পর্ব। ৭. শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ রচিত ভারত-পাঁচালী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান প্রধান মহাভারত-কাহিনী: ১. রাজীব সেনের উদ্যোগ-পর্ব। ২. দ্বিজ ঘনশ্যামের অশ্বমেধ-পর্ব। ৩—৪. দ্বিজ রামকৃষ্ণ, দ্বিজ প্রেমানন্দ প্রভৃতি কবিগণের রচিত অশ্বমেধ-পর্বও পাওয়া গিয়াছে। দ্বিজ কৃষ্ণরামের অশ্বমেধ-পর্ব সুবৃহৎ কাব্য। ৫. রাজেন্দ্রদাসের মহাভারত আদি পর্ব। ইহাতে শকুন্তলার কাহিনীই প্রাধান্য পাইয়াছে। কাব্যটিকে 'শকুন্তলার উপাখ্যান' বলাও যাইতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করেন—১. কবিচন্দ্র, ২. ষষ্ঠীবর সেন ও ৩. গঙ্গাদাস সেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও জীবনী

জাতীয় জীবনে কোনও গৌরবময় বৈচিত্র্য ঘটিলে সাহিত্যের উন্নতির ও সমৃদ্ধির পথ খুলিয়া যায়। বাংলার জাতীয় জীবনে এমনই এক গৌরবময় বৈচিত্র্য আসিয়াছিল শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে এবং তাহারই ফলে বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় সমৃদ্ধি হইয়াছিল, কাব্যসৃষ্টির নূতন কয়েকটি পথ খুলিয়া গিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যযুগ বিশেষভাবেই স্মরণীয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা সাহিত্য একটা বাঁধা খাত ধরিয়া চলিয়াছিল। তাহাতে না ছিল বৈচিত্র্য, না ছিল তেমন সমৃদ্ধি। তখন বাংলার কবিগণ শুধুমাত্র মঙ্গলকাব্য অথবা অনুবাদ কাব্যই রচনা করিতে-ছিলেন। এই দুই শ্রেণীর কাব্যরচনা ভিন্ন, অন্য আর কোনও উপায়ে যে কবিপ্রতিভার পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, এ ধারণা সে যুগের কবিদের মধ্যে জাগে নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে জাতির সুপ্ত সৃজনীশক্তি জাগিয়া উঠিল, বাঙ্গালীর মনীষা পূর্ণদীপ্তিতে ভাস্বর হইল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা সাহিত্যে কাব্যরচনার দুইটি নূতন ধারাপ্রবাহ উৎসারিত

হইল। উহার একটি তাঁহার জীবনের রাধাভাব-বিলসিত লীলাবৈচিত্র্য হইতে উদ্ভূত। উহা 'পদাবলী শাখা'। অন্য আর একটি ধারা তাঁহার জীবনকথা অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইল। উহা 'চরিত শাখা' নামে পরিচিত। শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব লইয়া বাংলা সাহিত্যের অনেক কবি জীবনীকাব্য রচনা করিলেন,—বাংলা সাহিত্যে মানুষের জীবনকাহিনী লইয়া কাব্য রচনার সেই প্রথম সূত্রপাত। ইহাতে বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়িল। সাহিত্য সেই প্রথম মানবজীবনাভিমুখী হইল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব যেন নদীমধ্যে অকস্মাৎ জোয়ারের সঞ্চার, বনভূমিতে অকস্মাৎ বসন্ত-সমাগম। জোয়ারের সময় নদী যেমন উচ্ছ্বসিত স্ফীত হইয়া উঠে, বিস্তৃতিলাভ করে,—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষীণ ধারাটিও ঠিক তেমনিভাবে স্ফীত হইয়া উঠিল। সাহিত্য তাহার গতানুগতিকতা মুক্ত হইল।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবৎকালেই তাঁহার জীবনের লীলামাহাত্ম্য কাব্যের উপাদান বলিয়া গণ্য হয় এবং তাঁহার জীবনকাহিনী লইয়া সেই সময় হইতেই কাব্য নাটক রচনা আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেবকে লইয়া কয়েকখানি সংস্কৃত জীবনীকাব্য ও নাটক রচিত হইয়াছিল। সেগুলি হইতেছে—১. মুরারি গুপ্তের কড়চা বা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত'। ২. কবি পরমানন্দ সেনের (কবি কর্ণপুর) 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য এবং 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক'। ইহার আর একখানি গ্রন্থও চৈতন্যজীবনী-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উহার নাম—'গৌরগণেশোদ্দীপিকা'। ৩. স্বরূপ দামোদরের কড়চা।

সংস্কৃতে লেখা এই সব চৈতন্যজীবনী হইতে চৈতন্যজীবনের নানা তথ্য জানা গিয়াছে। বাংলায় যে-সকল কবি চৈতন্যজীবনী রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই এই সকল গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' বাংলায় লেখা প্রাচীনতম চৈতন্যচরিত-বিষয়ক কাব্য। গ্রন্থখানি খুব সম্ভবত মহাপ্রভুর তিরোধানের পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবনদাসের এই চৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদি-খণ্ড, মধ্যখণ্ড, ও অন্ত্যখণ্ড। আদিখণ্ডে মহাপ্রভুর গয়া গমন পর্যন্ত কাহিনী। মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস। অন্ত্যখণ্ডে সন্ন্যাসের পর তাঁহার নীলাচল বাসের বর্ণনা। ইহার মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবনের কাহিনী অতিশয় সুন্দর করিয়া বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর অন্ত্যজীবনের কাহিনী এ কাব্যে সংক্ষিপ্ত।

চৈতন্যভাগবত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ছাঁচে গড়া। এই কাব্যে মহাপ্রভুর লীলা ভাগবতকাহিনী অনুযায়ী করিয়া চিত্রিত হইয়াছে, কাব্যমধ্যে বৃন্দাবন-দাস কৃষ্ণলীলার সহিত চৈতন্যজীবনের লীলার সঙ্গতি দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছেন। চৈতন্যলীলা যে কৃষ্ণলীলারই পুনরাবৃত্তি ইহা প্রদর্শন ও প্রমাণের জন্য কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে বিশেষ যত্নপর হওয়ায়, সময়ে সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম জন্মিযা থাকে। তবে গ্রন্থখানির মধ্যে চৈতন্যলীলার কেবল অলৌকিকত্বই ফুটিয়া উঠে নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যলীলা বর্ণনায়, যৌবনে তাঁহার বিদ্যানুরাগ বর্ণনায়, কিংবা সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বে মাতার সহিত মহাপ্রভুর সম্ভাষণ প্রভৃতি অংশে বাস্তবতাও বেশ ফুটিয়াছে। গ্রন্থমধ্যে এমন বহু জায়গা আছে, যেখানে মহাপ্রভুকে ধরণীর ধূলার মানুষ বলিয়াই মনে হয়। এই গ্রন্থে ষোড়শ শতকের সামাজিক, রাজ-নৈতিক ও লৌকিক জীবনের চিত্র বেশ দক্ষতার সহিত আঁকা হইয়াছে।

বৃন্দাবনদাসের পরে চৈতন্যচরিতবিষয়ে কাব্য রচনা করেন—লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও জয়ানন্দ।

লোচনদাসের কাব্য মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে রচিত। তবে মুরারি গুপ্তে যাহা সংক্ষিপ্ত লোচনদাসে তাহা বিস্তৃত। লোচনের কাব্যে মহাপ্রভুর শেষ জীবনের কাহিনী বিশেষ কিছুই নাই। ইহা চৈতন্যদেবের আদি ও মধ্য জীবনের কাহিনী-বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তাহাও লেখকের কবিত্বের জন্য তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। এই চরিতকাব্যটির মধ্যে অলৌকিকতার প্রাধান্য এবং কল্পনাপ্রবণতার আধিক্য। সত্য ঘটনা বা যথাযথ চিত্রের সমাবেশ ইহাতে নাই। লোচনদাস পদকর্তা কবি ছিলেন। তাহাতেই তাঁহার জীবনীগ্রন্থখানি কবিত্বময় হইয়াছে।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের পরবর্তী কালে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি রচিত হয়। বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে চৈতন্যজীবনের শেষভাগের কাহিনী বিশদরূপে বর্ণিত ছিল না বলিয়া, বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে একখানি চৈতন্যচরিত গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া এই চৈতন্য-চরিতামৃতের সৃষ্টি। ইহাতে মহাপ্রভুর শেষ বারো বৎসরের জীবনকথা বিশদভাবে বর্ণিত। বর্ণনায় লেখকের সত্যনিষ্ঠা অপূর্ব।

এই গ্রন্থের অন্যতম বিশেষত্ব—ইহাতে কেবল চৈতন্যজীবনীই বর্ণিত হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের গূঢ় রহস্য ও মহাপ্রভুর মূল্যবান্ উপদেশসমূহের তাৎপর্য অতিশয় দক্ষতার সহিত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৈষ্ণব দর্শন সম্যক ভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে।

চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়'ও চৈতন্যচরিতাখ্যানমূলক একখানি উল্লেখ-যোগ্য কাব্য। সে যুগে জীবনীকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেই, রচয়িতাগণ অল্প-বিস্তর চৈতন্যজীবনের অলৌকিক মাহাত্ম্য ফুটাইয়া তুলিতে যত্নপর হইয়াছেন। কিন্তু এ কাব্যখানিতে মহাপ্রভুর অলৌকিকত্ব ফুটাইয়া তোলার কোন চেষ্টাই নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যলীলা ও নবদ্বীপ লীলার বর্ণনায় কবি এখানে সহজ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত রচনার কিছু পরেই রচিত হয়। জয়ানন্দের কাব্য যে সময়ে রচিত হয়, তখন চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল। চৈতন্যদেব সম্পর্কে নানাবিধ জনশ্রুতি উদ্ভূত হইয়া চৈতন্যলীলার সত্যটুকুকে ঢাকিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। জয়ানন্দ সে সকলের প্রভাব হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচনায় শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতিমূলক কাহিনী ঢুকিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জয়ানন্দের রচনায় ইতিহাস আছে, সত্যঘটনার বর্ণনা আছে।

উপরে যে কয়খানি চৈতন্যজীবনীর উল্লেখ করা হইয়াছে—সেগুলি ছাড়া, গোবিন্দদাসের কড়চা নামে মহাপ্রভুর একখানি জীবনী কাব্যও পাওয়া গিয়াছে।

অনেকে মনে করেন, ইহা মহাপ্রভুর একখানি প্রামাণ্য জীবনীকাব্য এবং গোবিন্দদাস স্বচক্ষে চৈতন্যদেবের জীবনের অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, নীলাচলে ভ্রমণের সময়ে ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন,—কড়চাখানি প্রত্যক্ষ-দর্শীর বর্ণনা। কিন্তু নানা কারণে এই কড়চাখানিকে প্রামাণ্য বলিয়া অনেকে আবার মনে করেন না।

বৈষ্ণব পদাবলী

বাংলা সাহিত্যের প্রধান গৌরবস্থল হইল ইহার গীতিকবিতা। ষোড়শ শতাব্দীতে,—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী কালে বৈষ্ণব কবিগণের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের গীতিকবিতার এই চিরন্তন ধারাটি বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয়। পরচৈতন্যযুগে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ে পদরচনার একটা অভূতপূর্ব সাড়া পড়িয়া যায়, চৈতন্যদেব-সম্বন্ধীয় পদ এবং তাঁহার পার্ষদ ও শিষ্যগণের সম্বন্ধেও পদরচনা সুরু হয়। যশোদার বাৎসল্য, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ইত্যাদি লইয়াও পদ রচনা হয়। উহাই পদাবলী সাহিত্য। বলিতে গেলে, বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত জাগরণ হইয়াছিল বৈষ্ণব কবিতা রচনার মধ্য দিয়া।

চৈতন্য-পূর্বযুগে রাধাকৃষ্ণের লীলা লইয়া পদাবলী সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। তাহাতে ভাব, ভাষা ও ছন্দের কারিগরী ছিল সত্য, কিন্তু পরচৈতন্যযুগের রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলীর সহিত পূর্বচৈতন্যযুগের পদাবলীর তুলনা হয় না। ইহার কারণও ছিল। কারণ, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদকর্তারা শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির যে অপরূপ বিকাশ দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা তাঁহাদের কবিতায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা চৈতন্যদেবের কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের ছবি দেখিয়া রাধার কৃষ্ণভক্তির ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাই চৈতন্যদেবের কৃষ্ণভক্তি যে কত গভীর ছিল, তাহা বুঝিয়া তবে পদাবলী সাহিত্যকে বুঝিতে হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরে কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমে অধীর হইয়া তিনি কীর্তনে মাতিয়াছেন, কখনও ভক্তিতে তন্ময় হইয়া জ্ঞান হারাইতেছেন। ইহা ভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণের দেহের রঙের সহিত বা তাঁহার রূপের সহিত পৃথিবীর যাহা কিছুর এতটুকু সাদৃশ্য দেখিতেছেন, তন্ময় হইয়া তাহাই তিনি নিরীক্ষণ করিতেছেন, অথবা ভাবাবেগে পাগল হইয়া যাইতেছেন।

মেঘের নীল রং, ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের নীলিমা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তির কথা। তমাল তরুর ঘন-নীল নিবিড়তা তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী জাগাইয়া দিয়াছে। তাই উহাকেই কৃষ্ণ মনে করিয়া তিনি উহাকে ভাবাবেশে আলিঙ্গন করিয়াছেন। ঈশ্বরপ্রেমে কতখানি তন্ময় হইলে তবেই মানুষ এমনিতর আচরণ করিতে পারে!

বাংলা পদাবলী সাহিত্যে রাধিকার যে বর্ণনা কবিরা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমরা কৃষ্ণের জন্য রাধিকার যে আকুলতা দেখিতে পাই, তাহা যেন শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণের প্রতিচ্ছবি। রাধিকা শ্রীচৈতন্যদেবের মতই—

এক দীঠ করি ময়ুর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীখনে। —চণ্ডীদাস

একদৃষ্টিতে ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ করিয়াছেন। অপলক চোখে মেঘের পানে চাহিয়া সময় কাটাইয়া দিয়াছেন। কারণ ঘন মেঘের নীল রং দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের দেহের নীল নবঘন কান্তির কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গিয়াছে—

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।

রাধিকাও চৈতন্যদেবের মত তমাল তরুকে কৃষ্ণ কল্পনা করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন। কৃষ্ণনাম শুনিবামাত্র তিনি বক্তার পদে লুটাইয়া পড়িয়াছেন—

যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়॥—বৈষ্ণব পদাবলী

চৈতন্যদেবও এইরূপ কৃষ্ণনাম শুনিয়া বক্তার পায়ে লুটইয়াছেন, কৃষ্ণনাম শুনিয়া আনন্দে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন—

কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হৃদয়।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয়॥
প্রাণকৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে।
ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে॥

—গোবিন্দদাসের কড়চা

কল্পনার সাহায্যে যে বর্ণনা করা যায়, তাহার চেয়ে কোনও প্রত্যক্ষ অথবা সত্যকারের জীবন্ত ছবি দেখিয়া যে বর্ণনা করা হয়, তাহার স্পষ্টতা যে বেশী হইবে ইহা স্বাভাবিক! চৈতন্যদেবের ভক্তিময় জীবন দেখিয়া পরচৈতন্য-যুগের বৈষ্ণব পদকর্তারা রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন বলিয়া, এই যুগের পদাবলী সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা খুব স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল, মধুর এবং বৈচিত্র্য-পূর্ণ হইয়াছে।

ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার ভাব বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বিশেষত্ব। বৈষ্ণব পদাবলীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মার আত্মীয়রূপে কল্পিত—সেখানে দেবতা ও ভক্তের মধ্যে কোন দূরত্ব নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে এই জিনিসটি পরচৈতন্য যুগের পদকর্তারা দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তির আবেগে দেবতার সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছেন। চৈতন্যজীবনের এই ভাবটিকেই পদকর্তাগণ তাঁহাদের অঙ্কিত রাধার উপর আরোপ করিয়া গিয়াছেন।

জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর, শশিশেখর, বলরামদাস, লোচনদাস, নরোত্তমদাস, নরহরিদাস, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি কত কবি যে পদাবলী রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইঁহাদের মধ্যে চণ্ডীদাস হইতেছেন পদাবলী সাহিত্যের আদি কবি,—অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ কবি।

চণ্ডীদাসের গানে বাঙ্গালী মুগ্ধ। চণ্ডীদাসের নাম জানেন না, এমন বাঙ্গালী নাই বলিলেও চলে। ইঁহার গান ভক্ত এবং ভাবুক সকলেরই প্রিয়। চণ্ডীদাসের কবিতা আড়ম্বরবিহীন। তাই তাঁহার কবিতার ভাব আমাদের হৃদয়ের দ্বারে গিয়া আঘাত করে অতি সহজেই। উপমা অলঙ্কার প্রভৃতির বাহুল্যে তাঁহার

কবিতার মাধুর্য কোথাও ম্লান হয় নাই। তাঁহার কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে, সেগুলি যেমন মধুর তেমনি সরল। সেগুলিতে সহজ কথার মধ্য দিয়া অতিশয় গভীর ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। এই পদগুলি মানুষকে মর্ত্যের সীমার বাহিরে এক অধ্যাত্মরাজ্যে লইয়া যায়। কৃষ্ণচিন্তায় রাধার তন্ময়তা চণ্ডীদাসের পদে যেমন ফুটিয়াছে, তেমন অন্য আর কোনও পদকর্তার পদে ফুটে নাই।

চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "চণ্ডীদাসের গান সায়াহ্নসমীরণের দীর্ঘনিঃশ্বাস।" সত্যই রাধার বেদনামথিত হৃদয়ের দীর্ঘ-শ্বাসটুকু মিশিয়া থাকিয়া চণ্ডীদাসের কবিতাকে করুণ মধুর সৌন্দর্যে উদ্‌ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে।

চণ্ডীদাসের রাধা যেন এক মহাযোগিনী। এ রাধা ত্যাগে সমুজ্জ্বল, দুঃখবেদনার স্পর্শে মহীয়সী। বৈরাগ্য ও দুশ্চর তপস্যাকে বরণ করিয়া এ রাধা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কবি তাঁহার রাধার বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।

দুঃখের হোমবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া এ রাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ বাড়িয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধায় একটা ধ্যানলীনতা আছে।

জ্ঞানদাসের পরিচয় সামান্যই জানা যায়। সিউড়ী ও কাটোয়ার মধ্যবর্তী কাঁদড়া গ্রামে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে এক ব্রাহ্মণকুলে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। এই কাঁদড়া গ্রাম বর্তমানে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত।

জ্ঞানদাস শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তী অপরাপর বৈষ্ণব পদকর্তার মতই মহাপ্রভুর রাধাভাবের মূর্তিটিকে আদর্শ করিয়া তাঁহার পদাবলীতে রাধামূর্তি আঁকিয়া গিয়াছেন। কবির পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণলীলা কল্পনাসর্বস্বঃ নহে, তাহা বাস্তব বলিয়া মনে হয়। তাঁহার রাধিকা—

সখী কাঁধে হাত দিয়া অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবনে প্রবেশিল শ্যাম জয় দিয়া॥

ইহা যেন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল শ্রীচৈতন্যদেবেরই প্রতিমূর্তি।

পদরচনায় জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস সমশ্রেণীর কবি। চণ্ডীদাস যেমন সহজ ভাষায় সরলভাবে রাধিকার সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন, জ্ঞানদাসেও তাই। চণ্ডীদাসের পদাবলীর মতই ইহার পদাবলীতে একটা বেদনার সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে। জ্ঞানদাসের রাধিকার আত্মসমর্পণের ঐকান্তিকতা চণ্ডীদাসের মতই।

জ্ঞানদাস বাংলায় ও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্রজ বুলির পদে পাণ্ডিত্য ও রচনা-পারিপাট্যের পরিচয় আছে। কিন্তু তাঁহার বাংলা পদাবলীতে কবির প্রাণের আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কৃত্রিমতার বা অস্বাভাবিকতার লেশ তাহাতে নাই।

বৈষ্ণব পদকর্তা হিসাবে বিদ্যাপতি অতুলনীয় কবি। শ্রীচৈতন্যদেব ইহার পদ আস্বাদন করিতেন। ইনি মিথিলার কবি। তৎসত্ত্বেও বাংলার ও বাঙ্গালীর কাছে ইনি চিরপ্রিয় কবি। বাংলার পদকর্তা **গোবিন্দদাস** ইহার অনুসরণকারী ছিলেন। গোবিন্দদাসকে তাই 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।—

ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা—
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥

গোবিন্দদাস সত্যই দ্বিতীয় বিদ্যাপতি—বিদ্যাপতির সমতুল্য কবি তিনি। তাঁহার পদাবলী অপূর্ব। যেমন তাঁহার ভাষার লালিত্য, ছন্দের বৈচিত্র্য, পদবিন্যাসের চাতুর্য,—তেমনই তাঁহার আলঙ্কারিকতা ও ভাবপ্রকাশের কৌশল। গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভা বিদ্যাপতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক স্থলে রচনার লালিত্যে, ছন্দের ঝঙ্কারে ও অনুপ্রাস ইত্যাদির প্রয়োগে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। চাতুর্যের দ্বারা যে কতখানি মাধুর্যের সৃষ্টি করা যায়, গোবিন্দদাসের পদাবলী তাহার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।

তাঁহার কবিতায় বিদ্যাপতির মত আনন্দের লাস্য ও উল্লাস উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হইয়াছে। তাঁহার অঙ্কিত রাধা আনন্দের মূর্তি। তবে বেদনায় সমুজ্জ্বল, দুঃখে মহীয়সী তাপসী মহাযোগিনী রাধামূর্তিও তিনি সমান দক্ষতার সহিত আঁকিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের বাৎসল্যরসের পদ, গোষ্ঠবিহারের পদ এবং গৌরচন্দ্রিকার পদ উৎকৃষ্ট। গৌরাঙ্গের ভাবমূর্তি তাঁহার বহু পদে স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে। ইনি শুধুমাত্র ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের কবিত্বের প্রধান উপভোগ্য বিষয় হইতেছে—অনুপ্রাসের সাহায্যে অতুলনীয় শব্দচিত্র রচনা। আর, হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের মর্যাদা রক্ষা করিয়া ছন্দের হিল্লোল সৃষ্টি করা। তাঁহার অনেক পদ শুধুমাত্র ছন্দহিল্লোলে শ্রুতিসুখকর, সঙ্গীতধর্মী। যেমন—

নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর-ভঙ্গ॥
প্রেম আকুল গোপ গোকুল কুলজ-কামিনী-কান্ত।
কুসুম-রঞ্জন মঞ্জু-বঞ্জুল কুঞ্জ-মন্দির সন্ত।
গণ্ড-মণ্ডল বলিত কুণ্ডল উড়ে চূড়ে শিখণ্ড।
কেলি-তাণ্ডব তাল-পণ্ডিত বাহু-দণ্ডিত-দণ্ড॥
কঞ্জ-লোচন কলুষ-মোচন শ্রবণ-রোচন-ভাষ।
অমল-কমল চরণ-কিশলয় নিলয় গোবিন্দদাস॥

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা **লোচনদাস** একজন সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ ও গৌরাঙ্গলীলার পদ রচনায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক পদেরই ভাষা, ছন্দ এবং ভাবের মধ্যে একটা অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব আছে। এই জাতীয় পদগুলি লোচনের 'ধামালীর পদ' নামে বিখ্যাত। ধামালীর পদসমূহ বিশুদ্ধ কথ্য-ভাষায় লিখিত। বাংলা ছড়াগুলির মধ্যে যে ছন্দ, ধামালীতে সেই ছন্দ অনুসরণ করা হইয়াছে। যেমন—

ব্রজপুরে রূপনগরে
রসের নদী বয়।
তীর বাইয়া ঢেউ আসিয়া
লাগিল গোরা গায়॥
গৌর-অঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে
উঠিছে দিবারাতি।
জ্ঞানকর্ম যোগধর্ম
তপ ছাড়িল যতি॥
মনে মনে কতজনে
দিইছে রূপের দায়।
সে যে রূপ সুধাকূপ
ঠোর নাহিক পায়॥
রূপ-ভাবনা গলায় সোনা
ঘুচিবে মনের ধাঁধা।
রূপের ধারা বাউল পারা
বহিছে জগৎ আঁধা॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অব্যবহিত পরবর্তী কালে যেসকল পদকর্তা পদরচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা একদিকে যেমন রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ রচনা করেন, তেমনিই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ,—নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি মহাপ্রভুর পার্ষদগণের লীলাবিষয়ক পদও রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে বাংলা গীতিকবিতার এক নূতন উৎস খুলিয়া যায়।

শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশজাত নরহরিদাস সরকার গৌরাঙ্গবিষয়ক পদরচনার প্রবর্তক।

শাক্ত পদাবলী

গীতিকবিতা রচনার প্রতি বাঙ্গালীর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। তাই মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে বর্ণনাপ্রধান দেবদেবীর মাহাত্ম্যপূর্ণ বড় বড় মঙ্গলকাব্য অথবা চরিতাখ্যান ও অনুবাদ-কাহিনীর পাশে বসন্তের পুষ্প-মঞ্জরীর মত গীতিকবিতার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির পাশে বিরাট্ বৈষ্ণব-পদসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আখ্যায়িকামূলক কাহিনী-সকলের পাশাপাশি অনুভূতি ও আবেগপ্রধান শাক্ত-পদাবলীর উদ্ভবও হইয়াছে,—শ্যামা ও উমা-সঙ্গীত জন্মলাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে,—ভারতচন্দ্র যে যুগে অন্নদামঙ্গলকাব্য রচনা ক রয়াছেন, ঠিক সেই যুগেই শাক্ত পদাবলীর সৃষ্টি হইয়াছে।

শাক্ত পদকর্তাগণ তাঁহাদের উপাস্য দেব শাকে দূরে রাখিয়া পূজা করেন নাই। দেবতাকে তাঁহারা আত্মার আত্মীয় করিয়াছেন। সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকারিণী মহাশক্তিকে, লীলা-রসময়ী পরমানন্দময়ীকে একেবারে আপনার করিয়া মাতৃজ্ঞানে আস্বাদন করিয়াছেন এবং বাৎসল্যরসে জগজ্জননী দুর্গাকে বড় আদরের ঘরের মেয়ে করিয়াছেন। দেবতাকে ·উদ্দেশ্য করিয়া অকপটে মনের আবেগ, বিশ্বাস ও বিস্ময়কে প্রকাশ করিয়াছেন নিজেদের পদাবলীতে। ভক্তিকে চরিতার্থ করিয়াছেন আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়া।

মায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল শিশু যেমন জননীর প্রতি স্নেহের দাবিতে আবদার করে, শাক্ত কবিরা তেমনি ভাবে শ্যামা-জননীর কাছে আবদার করিয়াছেন, দুঃখবেদনায় দগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত কলহ করিয়াছেন, শ্যামা-জননীকে গালি দিয়াছেন। কিন্তু শাক্তের এই কলহ-গঞ্জনা কপট। উহারই মধ্যে শ্যামা-জননীর প্রতি অগাধ ভক্তিবিশ্বাসের পরিচয়টুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে। আত্মসমর্পণের সুরে শ্যামাসঙ্গীত পরিপূর্ণ। ব্রহ্মময়ী শ্যামাকে সকল শক্তির আধার জানিয়া শাক্তেরা দেবীকে কেবল অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন নাই। শ্যামা-জননীর সহিত নিগূঢ় স্নেহের মধুর সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাঁহার কাছে

অন্তরের প্রীতিও নিবেদন করিয়াছেন। আরাধ্য ও আরাধকের মধ্যেকার এই স্নেহ-মধুর সম্পর্ক শাক্ত পদসমূহকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে।

শাক্ত পদকর্তাগণ যে কালীমূর্তির বন্দনা করিয়াছেন, সে মূর্তি গূঢ় রহস্যে পরিপূর্ণ। ইঁহাদের কল্পনায় শ্যামা-জননী একাধারে সুন্দর ও ভৈরব। তিনি একদিকে ঝঞ্ঝা, উল্কাপাত, মহামেঘ ও চিতাভস্মের দেবতা। অন্যদিকে ইঁহাতেই আবার স্নেহাতুরা জননীর কল্যাণশ্রী বিরাজিত। শাক্ত জানেন, দুঃখের জ্বালা যে-দেবতা সৃষ্টি করেন, সেই দেবতার অঞ্চলচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়াই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। মাতৃপাদপদ্মের শরণ শাক্তের হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিল, নূতন আশার আলো জ্বালাইয়া দিয়াছিল।

শাক্ত পদাবলী মর্ত্যমানবের অনুভূতি ও আকুতিকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মর্ত্যজীবনের শোকতাপ, দুঃখবেদনা কবিগণের সংবেদনশীল মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। উহা লইয়াই শাক্ত কবিতা। তাই শাক্ত পদাবলী ধর্মাশ্রিত হইয়াও জীবনরসাশ্রিত কবিতা। উহাতে মানবীয় অনুভূতি ও আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে। বাস্তব রস ইহাতে খুব বেশী। শাক্তেরা দুঃখ পাইয়াও দুঃখবেদনায় কণ্টকিত এই পৃথিবীকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। মায়ের প্রতি ভক্তির শক্তিতে শাক্তের মধ্যে বীররসের সঞ্চার হইয়াছে। তাই শাক্ত কবি বলিয়াছেন—

১. আমি কি দুখেরে ডরাই!
দুখে দুখে জনম গেল,
আর কত দুখ দেও দেখি তাই!
সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে
আমি করি দুখের বড়াই ॥

২. ভূতলে থাকিয়া মাগো
করলে আমায় লোহা পেটা;
আমি তবু কালী কালী বলে ডাকি,
সাবাস আমার বুকের পাটা ॥

শাক্ত কবিগণ সুখ-দুঃখময় এই পৃথিবীটাকে মানিয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু অসীম সুদূরকে তাঁহারা একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। সীমা ও অসীমকে লইয়া শাক্ত কবিতা। তাই শাক্ত কবি বলেন—

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল।
কু-আশার কু-বাতাস লেগে ডবকা খেয়ে পড়ে গেল ॥

এখানে সুদূরের পিয়াসী একটি ব্যাকুল হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ পাইয়াছে। কবির মন সহসা একদিন এক শুভমুহূর্তে এই জড়জগতের সমস্ত সংস্কার এবং বস্তুর গণ্ডি ছাড়াইয়া শ্যামাপদরূপ অনন্ত আকাশের অসীমতার মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া দিয়াছিল। উহাতে ছিল বিরাট আনন্দ, অখণ্ড অনুভূতি। কিন্তু কবি বেশীক্ষণ সুদূরের—দূর আকাশের সেই কল্পলোকে থাকিতে পারিলেন না। কবির বাঁধনহারা মন আবার পৃথিবীতেই নামিয়া আসিল।

শাক্ত পদকর্তাদের কবিত্ব কেবল শ্যামাসঙ্গীতেই পর্যবসিত হইয়া যায় নাই। আগমনী ও বিজয়া গানেও ইঁহাদের কবিত্বের বিশেষ স্ফূর্তি ঘটিয়াছে। পদকর্তাগণ শ্যামা-সঙ্গীতে যেমন, আগমনী ও বিজয়া গানেও ঠিক তেমনই দেবীর সহিত এক মধুর সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে যেমন পুত্রের অদর্শনে মা যশোদা কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন, আগমনী গানেও তেমনি কন্যা উমার অদর্শনে মাতা মেনকার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে—'না হেরি তনয়া মুখ হৃদয় বিদরে'। উমাকে আনিবার জন্য গিরিরাণী মেনকা গিরিরাজকে কত তাগিদ দিয়াছেন,—জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

কবে যাবে বল গিরিরাজ আনিতে গৌরী।
আকুল হয়েছে প্রাণ দেখিতে উমারে হে ॥

উৎসুক প্রতীক্ষায় মেনকা কন্যা উমার আগমনের দিন গণিয়াছেন। কন্যার সহিত দীর্ঘ এক বৎসর পর তাঁহার মিলন হইবে এই আশায় তিনি বুক বাঁধিয়া আছেন। বিচিত্র বাসনা এবং কল্পনায় তখন মেনকার অন্তর পরিপূর্ণ। তিনি বলিতেছেন—

আমার মনে আছে এই বাসনা—
জামাতা সহিতে আনিয়ে দুহিতে,
গিরিপুরে করবো শিব স্থাপনা।
ঘর জামাতা করে রাখব কৃত্তিবাস,
গিরিপুরে করবো দ্বিতীয় কৈলাস।
হর-গৌরী চক্ষে হেরবো বারো মাস,
বৎসরান্তে আনতে যেতে হবে না।
সপ্তমী অষ্টমী পরে নবমীতে মা যদি আসে,
হর আসবে দশমীতে।
বিল্বপত্র দিয়ে পূজবো ভোলানাথে,
ভুলে রবে ভোলা, যেতে চাইবে না।

মায়ের মন তাহার স্নেহাঙ্কুরটিকে চিরদিনের জন্য ধরিয়া রাখিতে চায়, তাই বলে—

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥

মেনকার অধীর প্রতীক্ষা, সকল স্বপ্ন সার্থক করিয়া উমা আসিলেন! তনয়া-মিলনের আনন্দে অধীর হইয়া মেনকা বলিলেন—

উমা শশী না হেরিয়ে ছিল নয়ন অন্ধ হোয়ে,
এবে নয়ন তারা নিরখিয়ে আঁখি মম জুড়াইল॥

এইবার অধীর আগ্রহে স্নেহময়ী মেনকা কন্যাটিকে চিরদিনের জন্য নিজের কাছে ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মনে মনে নিয়তই বলিতে লাগিলেন—'যেতে নাহি দিব'। বলিতে লাগিলেন—

ওরে নবমী নিশি!
না হইও রে অবসান।
তুমি অস্তে গেলে নিশি
অস্ত যাবে উমাশশী,
হিমালয় আঁধার করে।

কিন্তু এত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও কন্যাকে তিনি ধরিয়া রাখিতে পারেন না। কন্যার সহিত মিলনের তিনটি দিন স্বপ্নের মত গড়াইয়া যায়। নবমীর নিশি পোহাইয়া দশমীর বিদায়-গোধূলি আসে। মেনকার অন্তর তখন কন্যার সহিত বিচ্ছেদের কাতরতায় উদ্বেল হইয়া উঠিতে থাকে।

আগমনী ও বিজয়া গানে বাংলাদেশের পারিবারিক স্নেহবাৎসল্যের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাংলার হৃদয়ের আকুতি ও আর্তি এই সব সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ধ্বনিত হইযাছে।

শ্যামাসঙ্গীত, আগমনী ও বিজয়া গানের মধ্যে বাঙ্গালীর অনুভূতি, আশা-কল্পনা, আনন্দবেদনা মিশিয়া রহিয়াছে। বাংলার মাটির সহিত বাঙ্গালীর জীবনের সহিত এসব গানের যোগ নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ।

এই শাক্ত পদসাহিত্যের আদি কবি রামপ্রসাদ সেন। একদিকে শ্যামা-সঙ্গীত, অন্যদিকে উমা ও মেনকাকে লইয়া আগমনী ও বিজয়া গান ইনিই সর্বপ্রথম রচনা করেন। রামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীত, আগমনী ও বিজয়া গান রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যে যে নূতন ধারার প্রবর্তন করেন, পরবর্তী অনেক কবিই এই ধারার অনুবর্তন করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের পরে অনেক কবি শ্যামাসঙ্গীত, আগমনী ও বিজয়া গান রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দেওয়ান রঘুনাথ, কবিওয়ালা রাম বসু, দাশরথি রায় প্রভৃতি। আধুনিককালেও এই শ্যামাসঙ্গীত, আগমনী ও বিজয়া গানের ধারাটিকে মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দতরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল।" কথাটি খুবই সত্য। সকল দেশের সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ পদ্যে। গদ্যে রচনা সকল দেশের সাহিত্যেই পদ্যের অনেক

পরে হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের বেলাতেও তাহাই ঘটিয়াছে। বৌদ্ধগান ও দোহা রচনার কাল হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল ধরিয়া, শুধু কবিতা ও গানের একাধিপত্য আমাদের সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছিল। ধর্মের কথা, জীবনী, অনুবাদ, মানুষের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের আখ্যায়িকা ইত্যাদি সবই পদ্যে লেখা হইতেছিল। অবশ্য চিঠি-পত্রে বা দলিল-দস্তাবেজে গদ্যের প্রচলন ছিল, কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টি ইহার দ্বারা হইত না।

চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের বাহিরে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম যে-সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য—দোম আন্তোনিও লিখিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' এবং মনোএল দা আস্‌সুম্পসাঁও রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। এই গ্রন্থ দুইখানিতে প্রশ্নোত্তরে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের তত্ত্বকথা আলোচিত হইয়াছে। দোম আন্তোনিও ছিলেন ভূষণার রাজপুত্র। মগ জলদস্যুরা দেশ লুঠ করিতে আসিয়া ইঁহাকে হরণ করিয়া আরাকানে লইয়া যায়। সেখানে এক পর্তুগীজ পাদ্রী টাকা দিয়া ইঁহাকে দস্যুদের হাত হইতে উদ্ধার করেন এবং তারপর ইঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন। মনোএল দা আস্‌সুম্পসাঁও ছিলেন জনৈক পর্তুগীজ পাদ্রী। ইঁহার 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়া পর্তুগালের রাজধানী লিসবন হইতে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই মনোএল দা আস্‌সুম্পসাঁও একখানি বাংলা শব্দকোষ এবং বাংলা ব্যাকরণও রচনা করেন। অবশ্য পর্তুগীজ ভাষায়। উদ্দেশ্য—যাহাতে পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকেরা এদেশে আসিয়া, সহজে এদেশের ভাষা শিখিয়া লইয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে পারেন। আমাদের এই বাংলাদেশে এইভাবে খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্ম-প্রচারের সূত্রে বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা সুরু হয়।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। পলাশীর প্রাঙ্গণে ভাগ্যপরীক্ষায় বাংলাদেশ, তথা ভারতবর্ষ ইংরাজের কাছে পরাজয় মানিল। তাহার পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে ভারতের রাষ্ট্রযজ্ঞের নায়ক হইয়া বসিল ইংরাজ। নবলব্ধ রাজ্যটিকে শাসনের

জন্য এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করার, বাংলা গদ্যে গ্রন্থরচনার প্রয়োজনীয়তা ইংরাজেরা তখন বেশ ভালভাবেই বুঝিতে পারিলেন।

এদেশে ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ইংরাজগণ-কর্তৃক শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসের সহিত এই শ্রীরামপুর মিশনের নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়াইয়া আছে। এখানকার ইংরাজ মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষার চর্চা আরম্ভ করেন, বাংলা গদ্যে গ্রন্থ-রচনায় ব্রতী হন।

শ্রীরামপুর মিশনের প্রধানতম কর্মী ছিলেন—জন টমাস ও **উইলিয়াম কেরী**। কেরীর প্রধান সহযোগী ছিলেন—উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জসুয়া মার্শম্যান।

শ্রীরামপুর মিশনের প্রথম প্রচেষ্টা—বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ। তারপর ইঁহারা যীশুর চরিত-বিষয়ক কয়েকখানি কাব্য ও নিবন্ধ লিখিয়া সাধারণের মধ্যে সে-সকলকে প্রচারের জন্য উদ্যোগী হন,—ইঁহারা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রকাশ করেন। মিশনারীগণের এই প্রচেষ্টা বাংলা গদ্যের পুষ্টিসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। বাংলা সংবাদপত্রের জন্মও এই মিশনারীদের হাতেই। শ্রীরামপুর মিশন হইতেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন হইতেই এদেশে সর্বপ্রথম বই ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাংলা গদ্যে বহু পাঠ্যপুস্তক সর্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স নামে জনৈক ইংরাজ সর্বপ্রথম বাংলা ছাপার অক্ষর তৈয়ারী করান। পঞ্চানন কর্মকার নামে এক শিল্পী উইলকিন্সের নির্দেশ অনুযায়ী বাংলা হরফ সর্বপ্রথম তৈয়ারী করিয়া দেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের জন্য ও কলিকাতার কয়েকটি মুদ্রণযন্ত্রের জন্যও বেশ কিছুকাল ধরিয়া এই পঞ্চানন কর্মকার বাংলা হরফ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন।

ইংরাজ মিশনারীগণের উদ্যোগে বাংলা ছাপার অক্ষর বা হরফ তৈয়ারী, এবং বাংলায় গ্রন্থাদি মুদ্রণের ব্যবস্থা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্য-পদ্য

গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার বাড়িয়া যায়। ইহার আগে বাংলা সকল বই-ই হাতে লেখা পুঁথি হইতে পড়িতে হইত। কিন্তু শ্রীরামপুর মিশনে বাংলা বই ছাপা আরম্ভ হওয়ায়, বাংলা গ্রন্থগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার অভূতপূর্ব সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই নূতন বাংলা হরফ হলহেড নামে এক সাহেবের লেখা 'বাংলা ব্যাকরণে' সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল।

একদিকে যেমন এইরকম ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে, তেমনি অন্যদিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও বাংলা গদ্য রচনা সুরু হইয়াছিল। সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইংরাজ-শাসনতন্ত্র বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইংলণ্ড হইতে যে-সব রাজকর্মচারী এদেশে শাসনের জন্য আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে বাংলা শেখান দরকার। এজন্য প্রথম কয়েক বৎসর জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল। তারপর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার একটি শিক্ষায়তন খুলিলেন,—অবশ্য জনসাধারণের জন্য নয়। যে-সব তরুণ ইংরাজ বিলাত হইতে চাকুরী পাইয়া এদেশে আসিবেন তাঁহাদের এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য। এই নূতন শিক্ষায়তনের নাম হইল—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

উইলিয়াম কেরী

ইংরাজ সরকার-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে উইলিয়াম কেরী প্রথমে সংস্কৃত ও বাংলার শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। পরে তিনি ঐ কলেজের অধ্যক্ষও হইয়াছিলেন। বাংলা গদ্যকে পুষ্ট করিয়া তোলার ব্যাপারে কেরীর কাজের তুলনা নাই। তাঁহার প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের যে উন্নতি হইয়াছিল, সেজন্য বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগ দিয়া কেরী দেখিলেন—এদেশীয় বিদ্যায় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এদেশীয় ভাষায় বইয়ের অভাব—বিশেষত বাংলা গদ্যগ্রন্থের। ইহা লক্ষ্য করিয়া কেরী বাংলা ভাষায় পাঠযোগ্য গদ্যগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিপূর্বে তিনি সংস্কৃত ও বাংলা শিখিয়াছিলেন।

বাংলায় তিনি বাইবেলের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এখন তিনি ইতিহাসমালা ও কথোপকথন নামে দুখানি গ্রন্থ লিখিলেন। সংস্কৃত হিতোপদেশের গল্প তিনি বাংলা গদ্যে অনুবাদ করিলেন।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। ইহাতে বাংলা দেশের নানা শ্রেণীর এবং বিভিন্ন জেলার স্ত্রী-পুরুষের কথ্য ভাষার নমুনা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বই-খানিতে বাংলা কথ্য ভাষার বিভিন্ন রকম দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগকে বাংলা ভাষা ও বাংলার সমাজের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার প্রয়াস আছে। 'কথোপকথনে' ৩১টি অধ্যায়। গ্রন্থখানির গুণ—ইহার বাস্তবতা। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চ-নীচ সমাজে ব্যবহৃত কথ্য ভাষার যে পরিচয় বইখানিতে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া জমিদার-রাইয়তের সম্পর্কের কথা, জায়গা-জমি, চাষ-বাস, ক্ষেত-খামার হইতে আরম্ভ করিয়া খাতক-মহাজন, যাজক-যজমান, ভদ্রলোক,—গ্রাম্য জীবনের দৈনন্দিন যত বিষয়, সাহেব-মুনসীর কথা, ভিক্ষুক, মুটে মজুরের কথা সবই বাস্তবতার দীপ্তি বুকে করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। বইখানিতে হাটের বিষয় আছে, আবার বাংলা দেশের বিবাহ, ঘটকালী, বিবাহ রাত্রির খাওয়া দাওয়া, রোশনাইয়ের কথাবার্তা—এ সবও বাদ যায় নাই। গ্রন্থখানির অন্যতম বিশেষত্ব—স্ত্রীলোকের কথোপকথন, বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের বাক্যালাপ। উহার ভিতর দিয়া বাংলার সমাজের আটপৌরে রূপটি সব চেয়ে বেশী স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। কোন এক বিদগ্ধ সমালোচক উইলিয়াম কেরীর এই 'কথোপকথন' গ্রন্থখানির সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"কেরী হইতেছেন প্যারীচাঁদ, দীনবন্ধু প্রভৃতির পথপ্রদর্শক"। অর্থাৎ, কথ্যভাষায় রচনা করিলে সমাজ ও জীবনের বাস্তবতা যে কত বেশী ফুটিয়া উঠে, তাহা প্রদর্শন করার কৃতিত্ব উইলিয়াম কেরীর। বাংলার সমাজ ও বাংলার জীবনের যে বাস্তব চিত্র আমরা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে' পাই, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রভৃতিতে পাই, তাহার পূর্বাভাস কেরীর 'কথোপকথনে' পাওয়া গিয়াছিল একথা ঠিক।

কেরীর অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল—'ইতিহাসমালা'। গ্রন্থখানি ১৮১২ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি ঠিক ইতিহাস-কাহিনী নয়। ইহাতে ছোট ছোট অনেকগুলি গল্প বা কাহিনী আছে। গল্পগুলি অনুবাদমাত্র। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতির গল্প ইহাতে আছে। আবার বাংলা দেশের গল্পও ইহাতে আছে। তিনটি গল্প ইতিহাস আশ্রয়ী—১. প্রতাপাদিত্য, ২. রূপ ও সনাতন এবং ৩. আকবর ও বীরবল।

ইহা ছাড়াও কেরী আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাইবেল অনুবাদের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উহা ভিন্ন, তিনি আর যাহা রচনা করেন তাহা অবশ্য বাংলা গদ্যের অন্তর্গত নয়। সেগুলি ইংরাজিতে লেখা। যেমন, তাঁহার বাংলা-ব্যাকরণ ও বাংলা-ইংরাজি অভিধান। গ্রন্থ দুইখানি ইংরাজিতে রচিত হইলেও উহারা কেরীর অসামান্য কীর্তি।

কেরী কেবল এই সকল বাংলা বা ইংরাজি গ্রন্থ রচনার জন্যই স্মরণীয় হন নাই। তাঁহার নেতৃত্বে, তাঁহার প্রেরণায়, উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে বহু পণ্ডিত শুধু বাংলা নয়,—সংস্কৃত, মারাঠী, পাঞ্জাবী, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষাতেও ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। উইলিয়াম কেরীকে বাঙ্গালী, তথা ভারতবাসী কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারে না। এ দেশীয় বিভিন্ন ভাষার উন্নতির ভিত্তি রচনার কৃতিত্ব তিনি দাবি করিতে পারেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কেরীর কয়েকজন সহযোগী পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা অনেকগুলি বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে নাম করিতে হয়—রামরাম বসুর, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের, চণ্ডীচরণ মুনসীর, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের ও হরপ্রসাদ রায়ের। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' আর 'লিপিমালা'; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজাবলী', 'হিতোপদেশ'; চণ্ডীচরণ মুনসীর 'তোতা ইতিহাস'; রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্'; হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা'—বাংলা গদ্য-রচনার প্রথম যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

এই সকল গ্রন্থের মধ্য দিয়া বাংলা গদ্য রচনার সূত্রপাত হইলেও,—এগুলি সবই ছিল পাঠ্যপুস্তক। এগুলির ভাষা হয় আরবী ফারসী শব্দের দ্বারা, নয় সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কণ্টকিত ছিল। বইগুলির ভাষা সকল জায়গায় সহজবোধ্যও হয় নাই। বাংলা গদ্য তখনও কেবল অনুবাদ ও অনুকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলা গদ্যের আড়ষ্টতা তখনও ঘুচে নাই, বাংলা গদ্য তখনও তাহার শিল্পরূপ পায় নাই।

রামমোহন রায়

পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডীর বাহিরেও যে বাংলা গদ্যকে ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহা সর্বপ্রথম প্রদর্শন করেন রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহন ছিলেন আমাদের দেশে আধুনিকতার অগ্রদূত। কেবল সমাজ-সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার ও রাজনৈতিক আন্দোলন প্রচারে তাঁহার প্রতিভা বা শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায় নাই, বাংলা গদ্যের মাধ্যমে ধর্ম ও দর্শনের কথা আলোচনা করিয়া তিনি বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

যে সময়ে তাঁহার আবির্ভাব, সে সময়ে বাংলা গদ্যে কেবল পাঠ্যপুস্তক রচিত হইতেছে, কেবল অনুবাদকার্যে বাংলা গদ্য তখন নিয়োজিত। সেই সময়ে, বেদান্তের মত দুরূহ বিষয়কেও তিনি বাংলা গদ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্পর্কে বলিয়াছেন—"বাংলা গদ্যকে তিনি গ্রানিট স্তরের উপর দাঁড় করাইয়াছিলেন।" কথাটি খুবই সত্য। বাংলা গদ্যকে তিনি এক দৃঢ়ভিত্তির উপরে দাঁড় করাইয়া যান। দুরূহ বেদান্তের আলোচনায়, সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রচারকার্যে তিনি যে বলিষ্ঠ গদ্যের ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা রামমোহনের নিজস্ব সৃষ্টি এবং এবিষয়ে তিনি তাঁহার সমসাময়িক ভাষা হইতে কিছুমাত্র সাহায্যই পান নাই।

রামমোহনের রচনা বিবৃতিসর্বস্ব, কিছুটা প্রচারধর্মী। এজন্য তাঁহার গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু কতকটা দায়ী। শাস্ত্র আলোচনা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। পরমত-খণ্ডন ও আত্মমত সমর্থনের জন্য তিনি প্রধানত গ্রন্থ রচনা

করিয়াছিলেন। সেইজন্য প্রতি পদে তাঁহাকে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। যেখানে তিনি অনুবাদ করিয়াছেন, সেখানেও যথেষ্ট স্বাধীন হইবার অবকাশ পান নাই। এজন্য রামমোহনের হাতে বাংলা গদ্যের শিল্পরূপ ফুটিয়া উঠার সুযোগ ঘটে নাই। তাঁহার গদ্যে গতি ছিল না, তাঁহার ভাষায় আবেগও ছিল না। থাকিবার কথাও নহে। কারণ, যুক্তির দ্বারা বিপক্ষকে নিরস্ত করা ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। রামমোহনের গদ্য যুক্তিনিষ্ঠ, তাহাতে বুদ্ধির দীপ্তি আছে—কাব্যশ্রী নাই।

অনেকের ধারণা যে, রামমোহন রায়ই বাংলা গদ্যের জনক। কিন্তু এরূপ ধারণা ঠিক নহে। বাংলা গদ্য একদিনে সৃষ্ট হয় নাই। ইহা একজনের চেষ্টাতে নির্দিষ্ট রূপ পায় নাই। অবশ্য রামমোহনের কৃতিত্ব—মিশনারীদের ও পণ্ডিতী বাংলায় খানিকটা কোমলতা আনয়ন। কিন্তু বাংলা গদ্যের শিল্পরূপ তিনি দান করিতে পারেন নাই। তাছাড়া, রামমোহনের পূর্ববর্তী কোন কোন গদ্য রচয়িতার ভাষা তাঁহার ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। রামমোহনের গদ্য সমসাময়িক বা পরবর্তী লেখকের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেও পারে নাই। অতএব রামমোহনকে বাংলা গদ্যের জনক বলা চলে না।

বাংলা গদ্যসাহিত্যে ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী। তৎপূর্বে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের গদ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য-ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। বাংলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর

যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিক্রম্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা—উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।"

সত্যই বিদ্যাসাগরের আগে বাংলা গদ্যে শ্রী বা ছন্দ বড় কিছু ছিল না। বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যে লালিত্য ও শ্রুতিমাধুর্য আনয়ন করিয়াছিলেন। বাংলা গদ্যের ছন্দ তিনি আবিষ্কার করেন। ছন্দোময় বাক্যগঠন-রীতির প্রচলন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতুলনীয় কীর্তি। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী কালে যে ধরনের গদ্য রচিত হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায়—চলিত ভাষার শব্দের সঙ্গে আভিধানিক শব্দের উৎকট প্রয়োগের আতিশয্য। ইংরাজি ছাঁচে বাক্যগঠন-প্রণালী—ইহা বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক গতিবেগের অন্তরায় হইয়াই ছিল। পণ্ডিতেরা, যাঁহারা বাংলা গদ্য লিখিতেন—তাঁহারা সংস্কৃতের একান্ত অনুসরণে বাক্যগঠন করিতেন। ইহাও বাংলা গদ্যকে দুর্বোধ্য গতিহীন করিয়াই রাখিয়াছিল। বাংলা গদ্যের এই জড়তা ও দুর্বোধ্যতা বিদ্যাসাগরের দ্বারা দূরীকৃত হয়।

তখন অনেক সাময়িক পত্র ও পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছিল। সেই সকল সাময়িক পত্র-পত্রিকার গদ্যরীতিরও অনেক দোষ ছিল। চলিত বাংলা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দপ্রয়োগের কোন সুনির্দিষ্ট রীতি ছিল না। বাক্যের বহর অযথা দীর্ঘ হইত। তাহাতে বাক্য সমাপ্তির সময়ে বাক্যের আরম্ভের কথা মনে থাকিত না। বাক্যে ছন্দ, তাল বা শ্রুতিমাধুর্য একেবারেই ছিল না। বাক্যরচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি প্রধানভাবে অবলম্বিত হইত এবং ছেদচিহ্নের যথোপযুক্ত প্রয়োগ না থাকায় বাক্যের অর্থ বুঝা কঠিন হইত।

এই সকল দোষ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা গদ্যকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। এই অকেজো শ্রীহীন গদ্যভঙ্গির সাহায্যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য-

সৃষ্টির সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। বাংলা গদ্যের এই সকল দোষ দূরীভূত করিয়া ও ইহার জড়তা মোচন করিয়া যিনি ইহাকে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের বাহন করিয়া তুলিয়া অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন, তিনি আধুনিক বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান—প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বেতাল পঞ্চবিংশতি, সীতার বনবাস, বোধোদয়, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী, শকুন্তলা, চরিতাবলী, বাংলার ইতিহাস, মহাভারত (উপক্রমণিকা পর্ব) ইত্যাদি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন সম্পর্কে ও বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য যুক্তিপূর্ণ গদ্যগ্রন্থও রচনা করেন। তাঁহার বহু গ্রন্থই হয় হিন্দি, নয় সংস্কৃত, নতুবা ইংরাজি গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের গ্রন্থরাজির বিষয়বস্তু ছাড়া সেগুলি সর্বাংশেই নূতন সৃষ্টি। অনুবাদ বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাঁহার রচনা সে শ্রেণীর নহে।

অনেকের ধারণা—বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝি বা শুধুই পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা। এ ধারণা ভুল। তাঁহার স্বাধীন রচনা হইতেছে—(১) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব; (২) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (দুই খণ্ডে); (৩) বাল্যবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচার (দুই খণ্ডে); বিদ্যাসাগর চরিত (আত্মজীবনী)। এই সকল রচনা সাহিত্য হিসাবে উপাদেয়।

বিদ্যাসাগর শুধু যে সাধুভাষায় গুরু-গম্ভীর ভঙ্গিতে লেখার ব্যাপারে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন তাহা নহে। কথ্য ভাষায় হালকা ছাঁদে কয়েকখানি বইও লিখিয়াছিলেন। যেমন—ব্রজবিলাস, রত্ন-পরীক্ষা ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থের ভাষা উপভোগ্য।

সাধু বাংলা গদ্যের জনক বিদ্যাসাগর। প্রাণহীন গদ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভাষার ওজস্বিতা তিনি বাড়াইয়াছিলেন, রচনায় লালিত্য আনিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য-রচনার ভঙ্গির উপর ভিত্তি করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির গদ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

অক্ষয়কুমার দত্ত

বাংলা গদ্যের শক্তি ও সমৃদ্ধি সম্পাদনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রধান সহযোগী ছিলেন—অক্ষয়কুমার দত্ত। বিদ্যাসাগরের সমকালে ইনি গদ্য-গ্রন্থ রচনা সুরু করেন। তবে বিদ্যাসাগরের গদ্য ছিল কাব্যধর্মী, অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্য ছিল যুক্তিধর্মী। ইনি গবেষণাপূর্ণ সুচিন্তিত প্রবন্ধরচয়িতা হিসাবে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়াছেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ রচনায় ইঁহার খ্যাতি। বিজ্ঞান বিষয়েব প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনার জন্য ইনি এক নূতন গদ্যভঙ্গি উদ্‌ভাবন করেন। সে গদ্যে আবেগ বা উচ্ছ্বাস ছিল না, কিন্তু একটা বলিষ্ঠ স্বকীয়তা ছিল। চিন্তা ও যুক্তিকে স্পষ্টরূপে ফোটান ছিল সে গদ্যের একমাত্র লক্ষ্য।

অক্ষয়কুমার দত্তের লক্ষ্য ছিল দেশবাসীকে বৈজ্ঞানিক চিন্তায় দীক্ষিত করা এবং উন্নতিশীল জগতের বিচিত্র সাধনাব ও উদ্দেশের সহিত সমাজকে পরিচিত করা। তাঁহার সাহিত্যসাধনায ইহারই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। অক্ষয়কুমারের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্বাধীন চিন্তার প্রবণতা ছিল। সেই স্বাধীন চিন্তা তাঁহার গদ্য রচনার মধ্যে স্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মধ্যে যেরকম বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধি ছিল, তত্ত্ব ও তথ্য বিশ্লেষণের যেরূপ মনীষা ও প্রতিভার পরিচয় তাঁহার মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা শুধু সেকালে নয়, একালেও অতিশয় বিরল।

অক্ষয়কুমার দত্ত প্রবন্ধকার। তাঁহার সাহিত্য-প্রেরণা রসসাহিত্যের অন্তর্গত নহে। পল্লবগ্রাহিতা বা কল্পনা-প্রবণতা তাঁহার ধাত ছিল না। কাজেই তাঁহার রচনার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইলে, তাঁহাকে প্রবন্ধকার হিসাবে দেখিলেই তাঁহার প্রতি সুবিচার করা হয়। তাঁহার রচনার মধ্যে যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধির প্রয়োগ ছাড়া কবিত্বের বালাই নাই। তবে মাঝে মাঝে রচনাকে সরস করিয়া তোলার জন্য একটু-আধটু হাস্যরসের অবতারণা তিনি করিতেন। ইহা তাঁহার রচনাকে আদর্শচ্যুত করিত না, বা বৈশিষ্ট্য-বর্জিত করিত না। বরং তত্ত্ব-তথ্যকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিত।

অক্ষয়কুমারের ভাষা খাঁটি গদ্য-লক্ষণযুক্ত। গদ্য বলিতে যে যুক্তিসম্মত (logical) গদ্যরূপ বুঝায়, অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্য তাহাই। অক্ষয়কুমার দত্ত সেদিন গদ্য রচনার জন্য যে পথে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে পথ আজ পর্যন্তও খুব বেশী জনসমাগমে ও জন-চলাচলে সুগম হইয়া উঠে নাই। তাঁহার পর বাংলা গদ্যসাহিত্য যে ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত রস-সাহিত্যের উদ্দেশ্যে। এইজন্য বাংলা গদ্য অনিবার্যরূপে কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে আমাদের দেশে রসসাহিত্য, তথা উপন্যাস ও ছোটগল্প বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাংলা গদ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার মত শক্তি সঞ্চয় করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই।

'ভূগোল', 'চারুপাঠ' (তিন খণ্ড), 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়', 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার', 'পদার্থবিদ্যা', 'ধর্মনীতি' প্রভৃতি অক্ষয়কুমার দত্তের রচিত গ্রন্থ।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখক—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ইনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে তাঁহার 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ' ও বিদ্যালয়-পাঠ্য 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান', 'ক্ষেত্রতত্ত্ব'. 'পুরাবৃত্তসার', 'ইংলণ্ডের ইতিহাস', 'রোমের ইতিহাস' প্রসিদ্ধ। সংস্কৃতানুগ হইয়াও গদ্য কতদূর প্রাঞ্জল হইতে পারে, ভূদেবের রচনা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। ভূদেবের ভাষা সাধারণত সংযত, আবেগ-উচ্ছ্বাস-বিহীন। তবে সেজন্য এ সিদ্ধান্ত করা উচিত হইবে না যে, কাব্য-গুণসম্পন্ন গদ্য রচনার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। কারণ, ১৮৫৭ সালে তিনি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা কবিত্বময় গদ্যে রচিত। এ বই প্রকাশের পরবর্তী কাল হইতেই বাংলা সাহিত্যিক গদ্যে একটা নূতনত্ব আসিয়াছিল একথা বলা যায়। এ পুস্তকের রচনারীতির সহিত বঙ্কিমের গোড়ার দিকের উপন্যাসগুলির ভাষারীতির মিল রহিয়াছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভাষা কোথাও কোথাও সংস্কৃত-বাহুল্যে বিদ্যাসাগরী গদ্যের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু ভূদেবের তথ্যনিষ্ঠা অনেকটা অক্ষয়কুমার দত্তের মত। ভূদেবের কোনও কোনও রচনা মাধুর্যগুণে বিদ্যাসাগরের বা অক্ষয়কুমারের গদ্যের বহু উপরে। এরূপ উৎকর্ষের কারণ এই যে, ভূদেব কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরাজি রোমান্সে অনুসৃত পদ্ধতির ইঙ্গিত লইয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাই প্রচুর সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজন-বোধে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা শব্দ ব্যবহার করিলেও, ভূদেবের রচনা সাধারণভাবে সংস্কৃত-বহুলই ছিল, কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁহার গদ্য কখনও শব্দাড়ম্বরপূর্ণ বা অযথা গম্ভীর হইয়া উঠে নাই। এই দুর্লভ গুণের জন্য তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি বহুকাল পাঠকবর্গের সমাদর লাভ করিবে।

প্যারীচাঁদ মিত্র

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থরাজি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুললিত সাধুভাষার প্রচলন হইয়াছিল। কিন্তু সে গদ্যেও সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য ছিল এবং ঐ গদ্যরীতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমকালীন ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী কালের গদ্যরচয়িতাদের দ্বারা অনুসৃত হইতে থাকায়, সাহিত্যের ভাষা ক্রমশ সাধারণের ভাষা হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়িতেছিল। এরূপ ভাষা সেকালের ইংরাজি শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়কে বিশেষ প্রভাবিত বা আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন—

"অনেকে এইরূপ ভাষাতে (অক্ষয়কুমার দত্তের ও বিদ্যাসাগরী ভাষায়) প্রীতিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকের নিকট, বিশেষত সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট,—ইহা অস্বাভাবিক, কঠিন ও দুর্বোধ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই সময়ে পাঁচজন ইংরাজি শিক্ষিত লোক কলিকাতায় কোন বৈঠকখানাতে একত্র বসিলেই এই বিদ্যাসাগরী ভাষা লইয়া অনেক হাসি-তামাসা হইত। অক্ষয়বাবু সংস্কৃত আশ্রয় করিয়া

'জিগীষা', 'জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তখন আমরা কলিকাতায় যে কোনও শিক্ষিত লোকের বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম—জিগীষা, জিজীবিষা প্রভৃতি শব্দের সহিত 'চিচ্চিমিষা' শব্দ যোগ করিয়া হাসি-তামাসা হইতেছে।"

এরূপ ভাষার পারিপাট্য ও সংস্কার-সাধন করিয়া ইহার মধ্যে নববেগ সঞ্চার করিবার জন্য,—ইহাকে প্রাঞ্জল ও সর্বজনবোধগম্য করিয়া তুলিবার জন্য, বিদ্যাসাগরী ভাষার মধ্য হইতে কিছুটা বর্জন ও উহার সহিত কিছুটা মিশ্রণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। এই মিশ্রণ ও বর্জনের জন্য বিদ্যাসাগর-বিরুদ্ধ একটা ভাষা-স্রোতের প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন সাধিত হইল—প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাবে।

১৮৫৮ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র—টেকচাঁদ ঠাকুর এই ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশ করিলেন। ধনীগৃহের ছেলে আদরে এবং অন্যায় প্রশ্রয়ে কেমন করিয়া নষ্ট হইয়া যায়, 'আলালের ঘরের দুলালে' তাহার সুস্পষ্ট উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

প্যারীচাঁদের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের এক স্মরণীয় ঘটনা। এতকাল অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতিরা হয় সংস্কৃত বা হিন্দি, না হয় ইংরাজি হইতে তাঁহাদের রচনার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিতেছিলেন। ইহাতে দেশবাসীর সাহিত্য-পিপাসা মিটিতেছিল না। এমনি সময়ে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস পাওয়া গেল। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। গ্রন্থখানির বর্ণনা আগাগোড়াই বাস্তব, বইখানির মধ্যে যেসকল চরিত্র আঁকা হইয়াছে, সেগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'আলালের ঘরের দুলাল' কথ্য ভাষায় রচিত। এ বইখানির ভাষা হইতেছে বিদ্যাসাগরী ভাষার প্রতিক্রিয়া। ইহাতে সংস্কৃত শব্দের চেয়ে চলিত দেশী এবং বিদেশী শব্দের প্রাধান্য—ক্রিয়াপদও প্রায়ই কথ্য ভাষার। টেকচাঁদ যে কোন শব্দের মধ্যে একটু সাধু রূপের গন্ধ পাইয়াছেন, তাহাই বাদ দিয়া গিয়াছেন। স্বেচ্ছায় যত পারেন, প্রচলিত এবং অপ্রচলিত দেশী

এবং তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ভাষা যাহাতে সর্বজনবোধগম্য হয়, তাহার চেষ্টা করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই।

বিদ্যাসাগরের ভাষার সহিত টেকচাঁদ ঠাকুর যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যরীতির সহিত টেকচাঁদ ঠাকুরের গদ্যরীতির সমন্বয়-সামঞ্জস্য সাধন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে এক নূতন গদ্যরীতির উদ্‌ভাবন করেন। সেই নূতন গঠিত গদ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলা গদ্যের ঐশ্বর্য, ধ্বনিলাবণ্য ছিল,—আবার টেকচাঁদ ঠাকুরের গদ্যের সহজ-বোধ্যতা ও গতিবেগও ছিল।

বাংলা গদ্য ও বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলা গদ্যের জয়যাত্রা-রথের শ্রেষ্ঠ সারথি বঙ্কিমচন্দ্র। তথ্য প্রকাশ ছাড়া, রসসৃষ্টি করাও যে বাংলা গদ্যের দ্বারা সম্ভব, ইহার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী কালে দেখা গেলেও, সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী বাংলা গদ্য ভাষার স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত রীতি অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনা সুরু হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। উহাতে বিদ্যাসাগরী রীতির অনুসরণ হইয়াছে। তাঁহার পরবর্তী রচনা 'কপালকুণ্ডলা'। 'কপাল-কুণ্ডলা'য় বিদ্যাসাগরী রীতি কাব্যোচিত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। দুর্গেশ-নন্দিনীর সমাসাড়ম্বর এ উপন্যাসে কমিয়াছে, অথচ শব্দচয়নের পরিপাট্যে ও বাক্যের বৈচিত্র্যময় সমাবেশে এ গ্রন্থখানি আরও উজ্জ্বল। বঙ্কিমের তৃতীয় রচনা—'মৃণালিনী'। এই সময় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—মৃণালিনীতে তাঁহার একটি নিজস্ব ভঙ্গি দেখা গিয়াছিল। এই ভঙ্গিটিই পরবর্তী কালে তাঁহার হাতে আরও পরিণত রূপ প্রাপ্ত হয়।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদন এবং 'বিষবৃক্ষ' রচনার কাল হইতে বঙ্কিমের নিজস্ব রচনারীতি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সময় হইতে হ্রস্ব বাক্য রচনার প্রবণতা এবং গদ্যে একটা লঘুগতি সঞ্চারের প্রচেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। 'চন্দ্রশেখর' রচনার কাল হইতে সমাসবর্জিত রচনারীতিকেই তিনি গ্রহণ করেন। অতঃপর কেবলমাত্র বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য, অথবা ভাবের গাম্ভীর্য সম্পাদনের জন্য তিনি সমাসবদ্ধ বাক্য রচনা করিয়াছেন—এই পর্যন্ত।

'রজনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব গদ্যরীতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের লিপিকৌশলের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন—রজনী ও কমলাকান্তের দপ্তর। কমলাকান্তের দপ্তরের গদ্য লঘুগতিসম্পন্ন। অথচ সেখানে গভীর সুরে অনেক কথা বলা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষাও সংযত, শ্রীসম্পন্ন।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা গদ্য সকল প্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগী সামর্থ্য লাভ করে। গদ্যে তিনি উপন্যাস লিখিয়াছেন, হাস্যরসাত্মক রচনা করিয়াছেন, দুরূহ তত্ত্ব ও চিন্তা প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের গদ্য ও আলালের ঘরের দুলালের গদ্যের সমন্বয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য সৃষ্ট হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার গদ্যে বিদ্যাসাগরী গদ্যের ওজস্বিতা আছে, গাম্ভীর্য আছে। আবার আলালের ঘরের দুলালের ভাষার যে গতিবেগ তাহাও আছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় বাংলা গদ্যভাষার সার্থক ব্যবহার যাঁহাদের হাতে হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অন্যতম। ইঁহার পূর্বেই অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা গদ্যে বিবিধ বিজ্ঞানের বিষয় লইয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের কৃতিত্ব—বিজ্ঞানবিষয়ে তিনি আলোচনা করিয়াছেন, অথচ উহা কোথাও নীরস হয় নাই, শুধু তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত হয় নাই। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাব-প্রকাশের ভঙ্গিটি ছিল অতীব সরস। বিজ্ঞানের তথ্যকে সহজ ও সরল করিয়া প্রকাশ করার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর শুধু বিজ্ঞান-সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন নাই। দর্শন, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, সংস্কৃতি ও ধর্ম, চরিতকথা, ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছিল। তাঁহার 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'চরিতকথা', 'শব্দকথা', 'যজ্ঞকথা' প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থ বিখ্যাত। প্রত্যেকটি বইয়ে তিনি বেশ সহজ ভাষাতেই নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ইনি প্রবন্ধরচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ইহার রচনার উপর রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গির প্রভাবও রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য যেমন বলার ভঙ্গির গুণে মনোজ্ঞ, রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যও তাই। রবীন্দ্রনাথের মতই গতানুগতিকভাবে চিন্তা করার পথ রামেন্দ্রসুন্দর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা বস্তুগর্ভ, যুক্তিপূর্ণ। আর যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা আবেগমিশ্রিত। তাঁহার আলোচনা মাত্রেরই মধ্যে ভাবের গভীরতা, মননশীলতার পরিচয় বিদ্যমান। ইহার সহিত মিশিয়াছে ভাষার পারিপাট্য, সহজ কবিত্ব। বক্তব্যের গুরুত্ব এবং বাচনভঙ্গির চারুত্ব—এই দুইয়ের হরগৌরী-মিলন হইয়াছে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায়। তথ্যের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার রচনায় শ্লেষ-কৌতুকের বিদ্যুৎ-দীপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতেই তাঁহার রচনায় তত্ত্বের গুরুভার থাকা সত্ত্বেও উহা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

বাংলায় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ও বাংলা নাটক

ইংরাজিতে একটি কথা আছে—"A nation is known by its theatre"; অর্থাৎ রঙ্গালয়ই জাতীয় উন্নতির মাপকাঠি। কথাটি খুবই সত্য। রঙ্গালয়ই সুকুমার-শিল্পের পীঠস্থান এবং নাটক হইতেছে রঙ্গালয়ের প্রাণ। রঙ্গালয় হইতেই নাটক রচনার প্রেরণা জাগ্রত হয়। রঙ্গালয়ের চাহিদাতেই নাটক রচিত হইয়া থাকে। আমাদের বাংলা দেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বাংলার নাট্যসাহিত্য বিভিন্ন রঙ্গালয়কে আশ্রয় করিয়াই পুষ্ট হইয়াছে বা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

বাংলা নাটক বলিতে গেলে আধুনিক কালের সৃষ্টি। এদেশে পাশ্চাত্ত্যের ধরনে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর হইতে বাংলা নাটকের উৎপত্তি। অবশ্য আমাদের এদেশে পাশ্চাত্ত্য ধরনের রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হওয়ার পূর্বেও এক শ্রেণীর খাঁটি দেশী অভিনয়প্রণালী প্রচলিত ছিল। উহা 'নাটগীতি' বা যাত্রাভিনয় নামে খ্যাত। উহার দ্বারা জনসাধারণের নাট্যরসপিপাসা চরিতার্থ হইত। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই শিব বা শক্তিমাহাত্ম্য লইয়া, অথবা রামায়ণ-কথা, মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী লইয়া আমাদের এদেশে যাত্রাভিনয় হইত। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাংলা দেশে কৃষ্ণলীলার যাত্রাভিনয় প্রচলিত হয়, কালীয়দমন যাত্রাও হইতে থাকে। এই সকল যাত্রা অনেকটা নাটকের মত। কিন্তু তবু এই সকল যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নাই। যাত্রার সঙ্গীতবাহুল্য, ভাবময়তা, আবেগ-উচ্ছ্বাস, কবিত্বময়তা, ও ধর্মভাব নাট্যসাহিত্য রচনার অনুকূল ছিল না। যাত্রার দৃশ্যপটের অভাবও নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরায় ছিল।

কিন্তু বাংলাদেশে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে নাটক রচনার অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চকে আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন রুচির দর্শকের জন্য নানা শ্রেণীর নাটক রচনা সুরু হয়।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হেরাসিম লেবেডেক নামে জনৈক রুশদেশীয় ব্যক্তি 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামে একটি রঙ্গালয় স্থাপন করেন এবং সেখানে দুইটি ইংরাজি প্রহসন অনুবাদ করাইয়া অভিনয় করান। নাটক দুইখানিতে কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের গান সংযোজিত হইয়াছিল। বাংলা নাটক রচনার সূত্রপাত— এই 'বেঙ্গল থিয়েটার'কে কেন্দ্র করিয়া।

এতকাল কলিকাতার ধনী ব্যক্তিরা যাত্রাভিনয় দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এখন থিয়েটারের নূতনত্বে তাঁহারা মাতিয়া উঠিলেন এবং রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়া বাংলা নাটক রচনা করাইয়া সেই সব নাটক ঐ সকল রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা তাঁহারা করিতে লাগিলেন।

১৮৩১ সালে পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় একটি রঙ্গালয় স্থাপন করেন। দেশীয় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত ইহাই প্রথম নাট্যশালা। ইহার পর

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসুর গৃহে শ্যামবাজারে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া নট-নটী কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। এতদিন পর্যন্ত এই সব রঙ্গালয় মৌলিক নাটক রচনার কোনও সহায়তাই করিতে পারে নাই। কিন্তু পাইকপাড়া রাজবাড়ীর, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর, রামজয় বসাক, আশুতোষ দেব প্রভৃতির পারিবারিক কতকগুলি রঙ্গমঞ্চ বাংলা মৌলিক নাটক রচনায় অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল।

উপরে যে-কয়টি রঙ্গালয়ের নাম করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পাইকপাড়া রাজবাড়ীর বেলগাছিয়া নাট্যশালা আধুনিক বাংলা নাটক রচনার পথটিকে প্রশস্ত করিয়া দিতে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করিয়াছিল। বেলগাছিয়া নাট্যশালা স্থাপিত হয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ—এই তিনজনের সমবেত চেষ্টায়। এই নাট্যশালার সংস্পর্শে আসিয়া মাইকেল মধুসূদনের প্রতিভা, বিকাশের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। ইতিপূর্বে মধুসূদন কেবল ইংরাজিতে রচনা করিতেছিলেন। কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে আসিয়া তিনি বাংলায় নাটক রচনার জন্য অনুপ্রাণিত হন। এই রঙ্গালয়টির সংস্পর্শে আসিয়া বাংলায় নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছিল।

বাংলা নাটক ও মাইকেল মধুসূদন

মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিভার উন্মেষ হয় নাটক রচনার মধ্য দিয়া। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের আবির্ভাব এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়। তৎপূর্বে বাংলাসাহিত্যে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছিল, সেগুলি হয় সংস্কৃত অথবা ইংরাজি নাটকের অনুবাদ, নতুবা সংস্কৃত রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী লিখিত নাটক। বাংলা নাট্যসাহিত্যের সেই যুগটিকে আমরা অনুবাদ ও অনুকরণের

যুগ বলিতে পারি। এই অনুবাদ ও অনুকরণের যুগের প্রান্তসীমায় মধুসূদনের আবির্ভাব। নাটক রচনার নূতন আদর্শ, নূতন পদ্ধতি লইয়া মধুসূদন বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। নাটকখানি মহাভারতের যযাতি উপাখ্যান লইয়া—ইহা পৌরাণিক আখ্যায়িকা লইয়া লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু নাটকখানিতে নূতনত্বের আভাস ছিল অনেক। ইহা রোমান্টিক নাটক—পাশ্চাত্ত্য নাটক রচনার ভঙ্গি বা আদর্শ নাটকখানিতে অনুসৃত।

শর্মিষ্ঠা নাটক রচনার পরে মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামে দুইখানি প্রহসন রচনা করেন। প্রথম প্রহসন-খানিতে তিনি উন্নতির নামে যথেচ্ছাচারী ইংবাজি শিক্ষিত নবীন সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র ও চরিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টিতে অধর্মাচারী প্রাচীন সমাজের কপটতা ও চরিত্রহীনতা আঁকিয়াছিলেন। মধুসূদনের এই প্রহসন দুইখানি বাস্তবতার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।

ইহার পর মধুসূদন রচনা করেন তাঁহার 'পদ্মাবতী' নামক নাটক। এই নাটকে তিনি গ্রীক পুরাণ হইতে নাট্যবস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। নাটকটির মধ্যে সংলাপে সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার হইয়াছে। 'পদ্মাবতী' নাটকের পর মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করেন। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' মধুসূদনের সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক। নাটকখানি বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। সার্থক ট্রাজেডি হিসাবেও নাটকখানি স্মরণীয়। এ নাটকে মধুসূদনের চরিত্রসৃষ্টি খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। বাস্তব-জীবনের সহিত নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের সংযোগ খুবই নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ।

নাটক রচনার ভাষা, সংলাপ, ঘটনাসংস্থান ও চরিত্রসৃষ্টি ইত্যাদি সম্বন্ধে আধুনিক যুগোপযোগী আদর্শ মধুসূদনই প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এজন্য বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

বাংলা নাটক ও দীনবন্ধু মিত্র

দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। বাংলার সমাজিক জীবনকে বিষয়বস্তু করিয়া দীনবন্ধু মিত্র অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় ছিল—মানুষের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি। নিকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করিতেও তিনি কাহাকেও কোন স্থানে কোন প্রকার শ্লেষ করেন নাই, অকারণ বিদ্রূপ করেন নাই, বা অন্যায় আঘাত করেন নাই।

শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মাত্রেই চরিত্র ও ঘটনা বর্ণনায় নির্বিকার, নিরাসক্ত থাকেন; নিবিকার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করেন। দীনবন্ধুর মধ্যে এই গুণটি পূরামাত্রায় ছিল। কোন দুর্বৃত্তের ছবি আঁকিতে গিয়া তিনি তাহাকে অভিশাপ দেন নাই, আবার সাধু চরিত্র আঁকিতে গিয়া তাহাকে দেবতা করিয়া তুলেন নাই। বাস্তবের আনুগত্য তাঁহার প্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল।

নাটক রচনা করিতে গিয়া তিনি যে সকল চরিত্র আঁকিয়াছেন, সেগুলি জীবন্ত হইয়াছে, স্বাভাবিক হইয়াছে। নিমচাঁদ (সধবার একাদশী), তোরাপ (নীলদর্পণ), ক্ষেত্রমণি (ঐ), রোগ সাহেব (ঐ), আদুরী (ঐ) প্রভৃতি চরিত্র তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, তেমন দক্ষতার পরিচয় আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কোন নাট্যকার প্রদান করিতে পারেন নাই। মানুষকে দেখিবার ও দেখাইবার একটা নূতন ভঙ্গি দীনবন্ধুর দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছিল। উহাই বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ দান। পরবর্তী কালের অনেক নাট্যকারের উপরেই দীনবন্ধুর প্রভাব পড়িয়াছে।

দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ'। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে এককালে বাংলার চাষীদের জীবনে যে দুঃখ সৃষ্টি হইয়াছিল, বাংলার চাষীরা যেভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নীলচাষ করিতে বাধ্য হইত, তাহার বিশদ ও বাস্তব

বর্ণনা এই নাটকে রহিয়াছে। এই নাটকে মৌন মূক অসহায়ের বেদনা ভাষা পাইয়াছে। নির্যাতন ও নিপীড়নে অসহায় দীন-দরিদ্রের গৃহসংসার কেমন করিয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, নাটকে তাহাই দেখানো হইয়াছে। নীলদর্পণ নাটকে নিঃসহায় দরিদ্র ও পীড়িতের মর্মবেদনা চমৎকার ফুটিয়াছে। নীলদর্পণ নাটকের চরিত্রগুলি যেরূপ জীবন্ত ও বাস্তব, তেমন চরিত্র দীনবন্ধুর পূর্বকালে বাংলা নাটকে ত' ছিলই না, পরবর্তী কালেও এরূপ চরিত্র বিরল। নাটকখানিতে করুণরসের প্রাধান্য। নিপীড়ন-জর্জর নীলচাষীদের অসহায়তা, তাহাদের দুঃখদুর্দশা ও উহাদের প্রতি সহানুভূতিই নীলদর্পণ নাটকের মুখ্যবস্তু।

নীলদর্পণের পর দীনবন্ধুর নিম্নলিখিত নাটকগুলি প্রকাশিত হয়ঃ—'নবীন তপস্বিনী', 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী', 'জামাই বারিক', 'কমলে-কামিনী'। তাঁহার নীলদর্পণ নাটকখানি ছাড়া, বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আর একখানি নাটক অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে পারে। তাহা হইতেছে—সধবার একাদশী। এ নাটকের চরিত্রগুলি জীবন্ত, বাস্তবানুগ।

দীনবন্ধু ছিলেন কৌতুকরসের রাজা। খাঁটি হিউমার বলিতে যাহা বুঝায়, দীনবন্ধুর সমাজ-সমস্যামূলক নাটকগুলিতে তাহার সন্ধান মিলিয়াছে। খাঁটি হিউমারে মুখের হাসি ও চোখের জলের অপরূপ এক সমন্বয় ঘটে। যাহাকে দেখিয়া হাসি, তাহারই দুঃখে আমরা কাঁদি,—তাহারই দুঃখ-বেদনায় আমাদের হৃদয় গলিয়া যায়, তাহার প্রতি সহানুভূতি জাগে। এ লক্ষণটি দীনবন্ধুর নাটকে খুব স্পষ্ট। মানবচরিত্র এবং ঘটনার একেবারে মর্মস্থলটুকু পর্যন্ত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার নাটকে হিউমার জীবনধর্মী হইয়াছে। বাঙ্গালী-জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীকে আশ্রয় করিয়া দীনবন্ধু নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই সীমাবদ্ধ জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও ব্যর্থতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্যই তিনি হাস্যরসকে তাঁহার নাটকে প্রধান অবলম্বন করিয়াছিলেন। মানুষের উপর ব্যাপক সহানুভূতি ছিল বলিয়াই হাস্যরসকে তিনি তাঁহার নাটকসমূহে মুখ্য করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাবে বাংলার নাট্যসাহিত্য বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। তাঁহার খ্যাতি—একদিকে নাটক রচনার জন্য, অন্যদিকে বাংলার রঙ্গালয়ের সংস্কার-সাধনের জন্য। গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বাংলা নাটকের অভিনয় প্রধানত কলিকাতার কতকগুলি ধনী পরিবারের পারিবারিক রঙ্গালয়েই শুধু হইতেছিল। সাধারণ রঙ্গালয় তখনও বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার আগে নাটকের দর্শক ছিলেন মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি। ইহাতে অতি অল্পসংখ্যক লোক নাট্যরস আস্বাদন করার সুযোগ পাইতেছিলেন, ইহাতে নাটক রচনার উৎসাহও সৃষ্টি হইতেছিল না। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সময়ে ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হইল—ইহাতে নাটক রচনার একটা অভূতপূর্ব প্রেরণা দেশের মধ্যে জাগিয়াছিল।

গিরিশচন্দ্রের সময়ে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ফলেই দীনবন্ধু প্রভৃতির নাটকের যথাযোগ্য সমাদর জনসাধারণের দ্বারা হইয়াছিল। উন্নত ধরনের, বিভিন্ন শ্রেণীর নাটক রচনার পথ খুলিয়া গিয়াছিল। বাংলা দেশের নাটকীয় আন্দোলনের পুরোভাগে রহিয়াছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও অভিনয়শিল্পের শিক্ষাদানে গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ বাংলায় কেহ জন্মায় নাই। গিরিশচন্দ্র বাংলার রঙ্গমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও পরিচালক। রঙ্গালয়ের সংস্কার করিতে গিয়া, রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে গিরিশচন্দ্রের ভিতরে নাটক রচনার যে প্রতিভা ছিল তাহা বিকাশের পথ খুঁজিয়া পায়।

গিরিশচন্দ্র যে সময়ে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন বাংলা নাট্যসাহিত্যের শৈশব ও কৈশোর অতিক্রান্ত হইয়া যৌবনের সূচনা দেখা দিয়াছে। গিরিশচন্দ্র সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়া বাংলার নাট্যসাহিত্যকে আরও পুষ্ট ও শক্তিসম্পন্ন করিলেন।

গিরিশচন্দ্রের নাটকসমূহ বাঙ্গালীর জাতীয় ভাবপ্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছিল। তাঁহার অধিকাংশ নাটকে ভক্তিরসের প্রবাহ

বহিয়াছে। ধর্মপ্রবণ এই বাংলাদেশে পৌরাণিক নাটকের অপ্রতুল ছিল না, তবু গিরিশচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন—বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিতে হইলে পৌরাণিক নাটক লেখা দরকার। এই জন্য তিনি পৌরাণিক নাটক রচনার দিকেই বেশী ঝোঁক দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাটকে রামায়ণ মহাভারত হইতে বিভিন্ন কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন।

সামাজিক নাটকে তিনি দীনবন্ধুর নীলদর্পণের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাই তাঁহার এই শ্রেণীর নাটকে করুণরসের প্রাধান্য। ঐতিহাসিক নাটকে তিনি স্বদেশী ভাব উদ্দীপন করিয়াছেন, বীররস পরিস্ফুট করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে—পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস, পাণ্ডবগৌরব, চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল, জনা, বলিদান ইত্যাদি। সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম, ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি তাঁহার দেশপ্রেমমূলক ঐতিহাসিক নাটক।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ঐতিহাসিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কৃতিত্ব। তাঁহার এই শ্রেণীর নাটকে গভীর আবেগ ও দেশপ্রীতির অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত, রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবার পতন, শাজাহান প্রভৃতি তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক। ইতিহাসের চরিত্রসমূহের আচার-আচরণ ও ভাবমূর্তি অঙ্কনে তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শ্রেণীর নাটক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে।

যে সময়কার কথা, তখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশে তুমুল আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে। দেশে তখন স্বাদেশিকতার হাওয়া বহিয়াছে। সেই স্বদেশী উন্মাদনা

দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'মেবারপতন' প্রভৃতি নাটকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় মন্ত্রে দীক্ষিত দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীনতার জ্বালা ও অপরিসীম বেদনার কথা তাঁহার এই সকল নাটকে ফুটাইয়া তুলিলেন। ভবিষ্যতের আশা ও আলোকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকে মহত্ত্বের উজ্জ্বল চিত্র আছে, দেশপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আছে। তাঁহার নাটকে মহাপ্রাণের আত্মবলিদানের ভিতর দিয়া, চারণের সঙ্গীতের ভিতর দিয়া করুণরসের প্রবাহ বহিয়াছে। তাঁহার নাটকে দুঃখ-লাঞ্ছনার চিত্র আছে, আবার উহা হইতে পরিত্রাণের ইঙ্গিতও আছে। একটা সুগভীর আশাবাদ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের বিশেষত্ব।

ঐতিহাসিক নাটকের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অদ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন। তাঁহার এই শ্রেণীর নাটকে যে-জগৎ তিনি চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা নাই। সেখানকার পাত্রপাত্রী সকলেই অসাধারণ। তাহাদের কথাবার্তা, চালচলন, হৃদয় ও মনের লীলা এক সমুন্নত মহিমায় এবং অনুপম ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের সীমাহীন শৌর্য। ক্রোধে তাহারা প্রচণ্ড, হিংসায় দুর্বার। প্রতাপসিংহের স্বদেশ-প্রেম, দুর্গাদাসের মহত্ত্ব, গোবিন্দসিংহের মহৎ সঙ্কল্প, মহবৎ খাঁর কর্তব্য-পরায়ণতা—ইতিহাসের এই সব চিত্র ও আদর্শ তাঁহার নাটকে চমৎকার ফুটিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে বীররসের প্রবাহ বহিয়াছে। বীরত্ব ও শৌর্যের বর্ণনায় লেখক যেন তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল কেবল ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন নাই। কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক, প্রহসন ও সামাজিক নাটকও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটক হইতেছে—পাষাণী, সীতা ও ভীষ্ম। প্রহসন হইতেছে—বিরহ, কল্কি-অবতার, ত্র্যহস্পর্শ, পুনর্জন্ম। তাঁহার সামাজিক নাটক—পরপারে ও বঙ্গনারী।

বাংলা উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাস খুব বেশীদিনের নহে। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম 'বাংলা উপন্যাস' হিসাবে গণ্য হইয়াছে। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল' বা অন্য আরও দুই-একখানি গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী কালে রচিত হইলেও সেগুলিতে পূরাপূরি উপন্যাস লক্ষণ ছিল না। আলালের ঘরের দুলালে চরিত্রচিত্রণ সুন্দর হইয়াছে, ইহাতে বাস্তব চিত্রের সমাবেশ আছে। কিন্তু ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত নাই অথবা ঘটনাবৈচিত্র্য নাই। মানবমনের রহস্য উদ্ঘাটন নাই, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রকেই প্রথম প্রকৃত উপন্যাস রচয়িতা বলিতে হয়। ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণের যেরূপ নৈপুণ্য তাঁহার উপন্যাসে পাওয়া গিয়াছে, ঘাত-প্রতিঘাতময় কাহিনী অবলম্বন করিয়া মানবমনের রহস্য উদ্ঘাটন তাঁহার রচনায় যেভাবে করা হইয়াছে, তেমন দৃষ্টান্ত বঙ্কিমের পূর্ববর্তী যুগে পাওয়া যায় নাই। বস্তুত উপন্যাস রচনায় তিনি পথপ্রদর্শক। অনেকের মতে উপন্যাসস্রষ্টা হিসাবে তিনি আজিও অপরাজেয় হইয়া রহিয়াছেন।

সমালোচকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম—ইতিহাস-আশ্রয়ী রোমান্স। যেমন, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী। দ্বিতীয়—সামাজিক বা পারিবারিক জীবনের চিত্র। যেমন, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, রজনী, রাধারাণী। তৃতীয়—জাতি-গঠনের আদর্শ-সম্বলিত আখ্যান। যেমন, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম। বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস একখানি রচনা করিয়াছিলেন। তাহা হইতেছে—রাজসিংহ।)

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আদর্শবাদী। সেইজন্য তাঁহার উপন্যাসগুলি ব্যক্তিগত আদর্শের আলোকে সমুজ্জ্বল। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতিতে তিনি নিজের উদ্দীপ্ত স্বদেশপ্রেম প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক উপন্যাস সমাজগঠনের উদ্দেশ্যে আদর্শের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। মানুষের জীবনকে তিনি গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে দেখিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মানুষের

মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছেন সুবিশাল সম্ভাবনা। তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাস আকস্মিক ঘটনানির্ভর। বাঙ্গালীর জীবনে বৈচিত্র্য কম। গতানুগতিক জীবনের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য মানুষের মধ্যে সম্ভাবনা ও সুপ্ত শক্তিকে বিকশিত করার জন্য তিনি তাঁহার বহু উপন্যাসেই নানাবিধ আকস্মিক ঘটনার উদ্ভাবন করিয়াছেন। আকস্মিক ঘটনার আবর্তে পড়িয়া মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন আসে, মানুষের জীবনে যে শক্তির বিকাশ ঘটে— তাঁহার উপন্যাসে তাহাই দেখানো হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান একটু স্বতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আদর্শবাদী। জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তাঁহার উচ্ছ্বসিত দেশভক্তি তাঁহার উপন্যাসগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ফলে সেগুলি কোথাও বা কবিত্বময় হইয়াছে, কোথাও বা সেগুলিতে কল্পনাপ্রবণতার মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে যে সকল চরিত্র আঁকিয়াছেন তেমন চরিত্র বাস্তব জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। লেখকের আদর্শবাদী কল্পনাতেই তাহাদের উদ্ভব। প্রতিদিনকার নানা ঘটনার আবর্তে পড়িয়া যে সকল নরনারীর জীবন নিরন্তর পীড়িত হইতেছে, তাহার বাস্তব চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রে দুর্লভ। তাঁহার উপন্যাসে মানুষের মহত্ত্ব, অমরত্ব এবং আশার বাণী আছে। বাস্তব জগৎ এবং জীবনের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ অতিশয় ক্ষীণ।

কিন্তু শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবনকে অপূর্ব সহানুভূতির সহিত চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদের সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এক ধারার প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যে যাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অপাংক্তেয় ছিল, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তাহারা অক্ষয় স্থান অধিকার করিয়াছে। সমাজ যাহাদিগকে হীন বা পতিত বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল, শরৎচন্দ্র তাহাদের আনন্দবেদনার কাহিনী গভীর সহানুভূতি ও দরদের সঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন। এইজন্য বাঙ্গালীর কাছে তিনি দরদী কথাশিল্পী নামে পরিচয় লাভ করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে যে সকল চরিত্রের মধ্যে আমরা কোন গুণ

দেখিতে পাই না, যাহাদিগকে আমরা হীন বা পতিত বলিয়া মনে করি, তাহাদের মধ্যেও শরৎচন্দ্র মহত্ত্ব স্নেহ করুণা প্রভৃতির বিকাশ দেখিয়াছিলেন।

তিনি অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দরের উজ্জ্বল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। পতিত হীন বলিয়া বাংলার সমাজ যাহাদিগকে অবজ্ঞা করে, শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন তাহাদেরও হৃদয় আছে। সমাজের নির্দিষ্ট বিধানে এবং অদৃষ্টচক্রে তাহারা হীন অধঃপতিত। কিন্তু তাহাদেরও মন আছে, তাহাদেরও মহত্ত্ব আছে, অনুভূতি আছে। তাহাদের জীবন একেবারে ব্যর্থ নয়।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সকলেরই স্থান আছে। অসুন্দর বা ছোট বলিয়া কেহই উপেক্ষিত হয় নাই। বাহিরের দীনতা যে মানুষের প্রকৃত পরিচয় নয়, তাহা তিনি হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্য শরৎচন্দ্রের মধ্যে হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতিপ্রবণতা খুব বেশী ছিল। আবেগ ও সহানুভূতি বেশী ছিল বলিয়াই, যাহা সামান্য তাহাও তাঁহার কাছে অসামান্য বলিয়া মনে হইয়াছে। ক্ষুদ্র তুচ্ছ সামান্য সাধারণ ঘটনাও তাঁহার চোখে গভীর তাৎপর্য বহিয়া আনিয়াছে। কোথায় আমাদের পল্লীসমাজে পঙ্গু বিকারগ্রস্ত জীবনের বিষ ফেনাইয়া উঠিতেছে, কোথায় উপেক্ষিত ও ব্যথিত মানুষের চোখের জল সকলের অগোচরে নীরবে ঝরিতেছে, কোথায় কোন্ নর বা নারীর জীবন সমাজের চক্রান্তে পড়িয়া অথবা অদৃষ্টচক্রে পড়িয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতেছে—এ সমস্ত তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। মানুষের দুঃখের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রাণ। এই সুগভীর সহানুভূতিতেই তিনি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নিজের একটি স্বতন্ত্র আসন করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের চরিত্রসৃষ্টি অসাধারণ। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্র অর্ধেক বাস্তব অর্ধেক কল্পনা। কিন্তু শরৎচন্দ্র চরিত্রসৃষ্টিতে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। নিজের চোখে যাহা তিনি দেখিয়াছেন, উপন্যাসে তাহাকেই তিনি রূপ দিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে আমাদের অতি পরিচিত ঘরের লোক ও প্রতিবেশী বলিয়া মনে হয়। তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলি জীবন্ত।

তিনি তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রসমূহের বিচার করিয়াছেন তাহাদের বাহিরের আচরণে বা পরিচয়ে নহে; তাহাদের অন্তরের পরিচয়ে। তাই দেখি, তাঁহার একাদশী বৈরাগীর মধ্যে একদিকে হৃদয়হীনতা, অন্যদিকে স্নেহশীলতা। সমাজের চোখে সে হৃদয়হীন, পাষাণ। কিন্তু সহানুভূতিসম্পন্ন লেখক তাহার মধ্যেও স্নেহ-মমতার আভাস পাইয়াছেন। অরক্ষণীয়ার 'পোড়াকাঠ' বাহিরে কঠিনা, কিন্তু তাহার অন্তরে কোমলতা। বৈকুণ্ঠের উইলে গোকুলের বাহ্যিক কর্কশতার আড়ালে আপন ভাইয়ের প্রতি তাহার যে স্নেহকোমলতা সঞ্চিত ছিল, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার শ্রীকান্ত উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ ডানপিটে। শ্রীকান্ত ভবঘুরে। কিন্তু উহাদের মধ্যেই আবার নির্ভীকতা ও পরদুঃখকাতরতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস মানবজীবনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাতে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিকতা নাই।

রমেশচন্দ্র দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি বঙ্কিমের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচনার বহিরঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। অবশ্য একথা সত্য যে, বঙ্কিমের মতো উচ্চাঙ্গের কবি-প্রতিভা এবং ভাব-কল্পনার ঐশ্বর্য তাঁহার ছিল না। তথাপি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় তিনি যে সত্যনিষ্ঠার এবং বাস্তবানুসারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসার্হ।

তাঁহার রচিত গ্রন্থ ছয়টি,—(১) বঙ্গবিজেতা (১৮৭৩), (২) মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৬), (৩) মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত (১৮৮৫), (৪) রাজপুত-জীবন-সন্ধ্যা (১৮৮৬), (৫) সংসার (১৮৯৩) ও (৬) সমাজ। ইহার মধ্যে প্রথম চারিটি ঐতিহাসিক এবং শেষ দুইটি সামাজিক উপন্যাস।

'মহারাষ্ট্র-জীবন-প্রভাত' এবং 'রাজপুত-জীবন-সন্ধ্যা'য় ভারতের দুইটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জাতির উত্থান ও পতনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। দুইটি-তেই জলন্ত স্বদেশপ্রেম, রাজনৈতিক সংঘর্ষের বিদ্যুৎচমক, যুদ্ধ-বিগ্রহের

রোমাঞ্চকর উদ্দীপনাময় বর্ণনা এমন বাস্তবানুগ হইয়াছে যে, উহা পাঠ করিতে করিতে আমরা সেই যুগের বর্ণনীয় ঘটনার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হই। ইতিহাসের এমন সত্যনিষ্ঠ অবিকৃত অনুসরণ আর কোনো ঔপন্যাসিকের মধ্যে দেখা যায় না। ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতা হিসাবে এইখানেই রমেশচন্দ্রের কৃতিত্ব।

তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সাধারণ জীবনের সঙ্গে ঐতিহাসিক আবর্তের সমন্বয়ে যে উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়, রমেশচন্দ্রের কোনো ঐতিহাসিক উপন্যাসই সেইরূপ উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। মানব-মনের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব,—উপন্যাসের যাহা প্রাণ, রমেশচন্দ্রের রচনায় ঐতিহাসিক ঘটনার চাপে তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তদুপরি যে বাণী-সুষমা বিষয়বস্তুর সঙ্গে হর-গৌরীর মত অচ্ছেদ্য থাকে, রমেশচন্দ্রে সেই সুষমার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়।

রমেশচন্দ্র তাঁহার সামাজিক উপন্যাস দুইটিতে পল্লীর নিতান্ত সাধারণ সুখ-দুঃখ অনাড়ম্বর বিশ্লেষণের সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আবেগ ও জটিল সংঘাতের অভাবে উহা আমাদের হৃদয়কে তেমন স্পর্শ করে না।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস ও গল্প-রচনার ক্ষেত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলির নাম—রমাসুন্দরী, নবীন-সন্ন্যাসী, রত্নদ্বীপ, সিন্দূরকৌটা প্রভৃতি।

ছোটগল্প-লেখক প্রভাতকুমার অপেক্ষা ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমারের স্থান অবশ্যই অনেকখানি নীচে। তাঁহার উপন্যাসে ব্যাপ্তি, সংহতি এবং বিশ্লেষণের গভীরতার অভাব। সেখানে চরিত্র-সৃষ্টির চেয়ে ঘটনা-বিন্যাসের প্রতি লেখকের আগ্রহ অধিক। অনেক সময়ে মনে হয়, যেন ছোটগল্পকেই টানিয়া-বুনিয়া উপন্যাসে দাঁড় করানো হইয়াছে। এছাড়া তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে দ্বন্দ্ব-সংঘাতেরও অভাব। কিন্তু যেখানে তিনি তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে লঘু হাস্য-পরিহাসের অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার উপন্যাসে সমস্যা নাই, আছে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্গতি ও ভুলভ্রান্তির হাস্যোজ্জ্বল নিখুঁত চিত্র।

বাংলা ছোটগল্প

বাংলা ছোটগল্প রচনার ইতিহাস খুব বেশীদিনের নহে। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে আমাদের বাংলা সাহিত্যে নাটক ও উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু ছোটগল্পের জন্য বেশ কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। উপন্যাস-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রও ছোটগল্পের সীমানা পর্যন্ত আপন রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। তিনি সার্থক উপন্যাসের স্রষ্টা। কিন্তু তিনি ছোটগল্প রচনা করেন নাই। তাঁহার ইন্দিরা, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয় আকারে ছোট হইলেও সেগুলি ঠিক ছোটগল্প নহে। সেগুলি বড় গল্প বা উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ

বলিতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ হইতেই বাংলা ছোটগল্প রচনার ইতিহাসের সুরু। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে ছোটগল্প রচনার শুধু উদ্যোগ-পর্ব পরিলক্ষিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্পের যেরূপ প্রসার ও বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। তাঁহার গল্পে বাংলার পল্লীজীবনের ছোট-খাট আশা-নিরাশা, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ-বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার গল্পের ভিতর দিয়া আমরা পাইয়াছি বাংলার পল্লীর সহজ সরল চিত্র। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের জীবনে যে আশা-নিরাশার তরঙ্গ, যে আনন্দবেদনাময় অনুভূতি জাগিতে থাকে, তাহাকে আমাদের সাহিত্যে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই ফুটাইয়া তোলেন তাঁহার ছোটগল্পসমূহে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশেষভাবে ছোটগল্প রচনারই উপযোগী ছিল। তিনি ছিলেন গীতিকবি। বাহুল্যকে এড়াইয়া, ঘটনাপুঞ্জকে মুখ্য না করিয়া নিভৃত একটি রাগিণী বাজানোই গীতিকবিতার রীতি। ছোটগল্পেরও তাই। ছোটগল্পের সঙ্গে গীতিকবিতার একটা স্বাভাবিক সাধর্ম্য রহিয়াছে। ছোট-গল্পে ধারাবাহিক কোন ইতিহাস থাকে না, বহু চরিত্র সেখানে ভিড় করে না। দুই-চারিটি ঘটনায়, দুই-চারিটি কথায়, অল্প কয়েকটি চরিত্রের বেদনাকে

আভাসে ইঙ্গিতে স্পষ্ট করিয়া তোলাই ছোটগল্পের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্য দিয়া তাঁহার গীতিকবিসুলভ মনই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্পের জন্ম পদ্মাতীরে। পদ্মাতীরে শিলাইদহে ঠাকুর-পরিবারের জমিদারি ছিল। জমিদারির কাজ উপলক্ষে যৌবনে কবিকে দীর্ঘকাল এই পদ্মাতীরে শিলাইদহে বাস করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে পদ্মার দুই তীরের ছোট ছোট গ্রামের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে, অসংখ্য চাষী-প্রজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে তিনি আসেন। তাহাদের অভাব-অভিযোগ তাঁহাকে শুনিতে হয়। নিতান্ত লৌকিক সুখ-দুঃখের মধ্যে তিনি তখন আপন আসন রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সামান্য সাধারণের মধ্যে তিনি অসামান্য অসাধারণকে প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উপেক্ষিত অবহেলিত মানুষের মধ্যেও স্নেহ, মমতা, করুণা লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহাদের অন্তরের মধ্যে যে বেদনার তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহাকে আপন ছোটগল্পসমূহে চির-স্থায়িত্ব দান করিয়া গিয়াছেন। পোস্টমাস্টার গল্পের ‘রতন’ সামান্য এক গ্রাম্য বালিকা। কিন্তু গল্পটির মধ্যে রতনের যে কোমলতা ফুটিয়াছে, তাহার ব্যথিত অন্তরের যে সুরটি স্পন্দিত হইয়াছে, তাহা সামান্য বা সাধারণ নয়। সমস্ত আটপৌরে পরিবেশকে তুচ্ছ করিয়া রতনের অন্তর্গূঢ় বেদনা সাহিত্যের নিত্য-বস্তু বা চিরকালের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পটির মধ্যেও এইরূপ অন্তর্গূঢ় বেদনার ঝঙ্কারটাই শুনা গিয়াছে। সুদূর পার্বত্য দেশের একটি কাবুলিওয়ালার সঙ্গে বাংলার একটি বালিকার স্নেহ-সম্বন্ধ গল্পটির বিষয়বস্তু। কিন্তু কবির সহানুভূতিতে কাবুলিওয়ালা আর কাবুলিওয়ালা নাই। দেশকালের গণ্ডি মুছিয়া গিয়া গল্পটিতে এক স্নেহবুভুক্ষু পিতৃহৃদয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর গল্প আছে, সেগুলিতে প্রকৃতির সঙ্গে মানব-হৃদয়ের এক নিবিড় যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির পটভূমিতে রচিত এই গীতিধর্মী গল্পগুলির পাশাপাশি আমরা রবীন্দ্রনাথের আর এক ধরণের গল্প পাই। সেগুলি অতিপ্রাকৃতের সমাবেশে বিস্ময়কর হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ গল্প হইতেছে—নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি। ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের ভাষা বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ।

রবীন্দ্রনাথের আর এক ধরনের ছোটগল্প আছে, যেগুলিতে মানুষের হিংসা-দ্বেষ, স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাত ফুটিয়াছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছোটগল্পে কেবল ভাবের রূপকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন নাই, জীবনের বাস্তবতাকেও স্থান দিয়াছেন। 'মধ্যবর্তিনী' প্রভৃতি কতকগুলি গল্পে সমাজ-জীবনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে। ঘরোয়া জীবনযাত্রার মধ্যেও যে কত বড় ট্রাজিডি থাকে, নিপুণ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। 'শাস্তি' গল্পে আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে নিম্নশ্রেণীর নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটি একদিকে অতি করুণ, অন্যদিকে আমাদের দেশের রাষ্ট্রজীবনের অসন্তোষ ও আমলা-তান্ত্রিক অনাচারের কাহিনী উহাতে ফুটিয়াছে। গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথ একদিকে কল্পনার দূর স্বর্গে বিচরণ করিয়াছেন, অন্যদিকে ঘটনা ও চরিত্রের ভিড় সৃষ্টি না করিয়া ভাবের ইঙ্গিত দিয়াছেন। এসকল গল্পে আছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবের চিত্র, হৃদয়াবেগের তীব্রতা। অন্যদিকে সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন লইয়াও তিনি গল্প লিখিয়াছেন। বৈচিত্র্যে ও ভাবে তাঁহার গল্প অতুলনীয়।

শরৎচন্দ্র

রবীন্দ্রযুগের শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের গল্প বাস্তবধর্মী। আমাদের পরিচিত সমাজ হইতে উপকরণ লইয়া তিনি সাহিত্যের রূপলোক নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। মাটির আকর্ষণ এড়াইয়া তিনি স্বপ্নসুন্দর কল্পনা-জগতের দিকে অগ্রসর হন নাই। তাঁহার গল্পের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে বাংলার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ। বাংলার সমাজের সহিত তাঁহার নিবিড় ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে সম্বল করিয়া এবং নিজের ভাবুকতাময় দৃষ্টি লইয়া তিনি গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ছোটগল্পে বাংলার সমাজজীবনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। যে সমাজ-ব্যবস্থা মানুষের প্রাণশক্তিকে তিলে তিলে ক্ষয়িত করিতেছে, তাহাতে কোন্ সত্য, কোন্ মঙ্গল আছে—ইহাই শরৎসাহিত্যের প্রধান জিজ্ঞাসা।

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের বিশেষত্ব আছে। সাধারণত ছোটগল্পের আয়তন ছোট এবং ইহার পটভূমিও সংকীর্ণ। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এমন কতকগুলি গল্প আছে যেগুলি আয়তনে দীর্ঘ, পটভূমিও বিস্তীর্ণ এবং চরিত্রও অনেক। এগুলি যেন উপন্যাসেরই খসড়া। বিস্তৃত বিশ্লেষণ যুক্ত হইলে এগুলি সহজেই উপন্যাস হইয়া উঠিতে পারিত। তবে তাঁহার আবার এমন গল্পও আছে যেগুলিতে ঘটনার বৈচিত্র্য নাই, আছে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাহাদের তীব্র অন্তর্বিপ্লব। এ সকল গল্প ঘটনার তরঙ্গবিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ হয় নাই—চরিত্রগুলির হৃদয়ের তলদেশে যে আবর্তের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারই আভাস আছে। বাংলার পারিবারিক জীবনের স্বার্থসংঘাত, সমাজ ও সংস্কারের কঠিন প্রাচীরে আবদ্ধ থাকার জন্য নরনারীর প্রাণের গভীরে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, যে ব্যথাবেদনার তরঙ্গ গুমরিয়া উঠিতে থাকে, তাঁহার গল্পে তাহারই চিত্র পাওয়া গিয়াছে। সমাজের অনাদৃত, অবহেলিত মানুষের ভাগ্য-বিড়ম্বনা, সমাজের অসাম্য ও বৈষম্যজনিত বহুবিধ অত্যাচার—এই সমস্ত বিষয় হইতেছে শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের উপজীব্য। মাতৃস্নেহ ও নারীহৃদয়ের করুণা তাঁহার কতকগুলি গল্পকে অমৃতধারায় অভিষিক্ত করিয়াছে। 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে' গল্প দুইটি এই শ্রেণীর গল্পের নিদর্শন।

সমাজের অসহায় উপেক্ষিত, মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও মমত্ববোধ, অন্তরের সমস্ত দরদ ঢালিয়া দিয়া তাহাদের সীমাহীন বেদনাকে রূপদান, সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ-স্পৃহা জাগাইয়া তিনি তাঁহার গল্পগুলিকে প্রাণের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন। যেখানে মানুষের চোখের জল সকলের দৃষ্টির অগোচরে ঝরিতেছে, সেখানে মমতা ও সহানুভূতি অমৃতধারার মতো উৎসারিত হইতেছে, শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি সেখানে প্রসারিত হইয়াছে। তাঁহার গল্পগুলি নিপীড়িত মানবের প্রতি সহানুভূতিতে অভিষিক্ত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প রচনার প্রণালী রবীন্দ্রনাথ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। রবীন্দ্রনাথের গল্পে কাব্য-সৌন্দর্য রহিয়াছে। তাঁহার গল্পে তথ্য কম, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও কল্পনার সমৃদ্ধিই বেশী। কিন্তু শরৎচন্দ্রের গল্পে বাস্তবতার সুরটাই

প্রধান। জীবন ও সমাজের বাস্তবতা শরৎচন্দ্রের গল্পে কবিত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের আড়ালে চাপা পড়ে নাই। তাঁহার গল্পে ভালোমন্দ, হাসিকান্না, সুন্দর-কুৎসিত, সবই স্থান পাইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের গল্প বলিবার ভঙ্গিটি মনোজ্ঞ। তাঁহার ভাষা সহজ, সরল, প্রাঞ্জল। তাঁহার 'মহেশ' গল্পটি এক অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি। তাছাড়া—মন্দির, সতী, অনুরাধা, একাদশী বৈরাগী, দর্পচূর্ণ, মামলার ফল, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, মেজদিদি, অভাগীর স্বর্গ প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত গল্প।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের পর ছোটগল্প রচয়িতাদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যথাসম্ভব অতিক্রম করিয়া ছোটগল্প রচনায় তিনি নিজ বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গল্পে সমস্যা নাই, ভাবাবেশ কম। কিন্তু কাহিনীর আকর্ষণ খুব বেশী। হালকা হাস্যরস তাঁহার অধিকাংশ গল্পের উপজীব্য। আমাদের জীবনের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতিসমূহের উপর হাস্যরসের মৃদু আলোকসম্পাত করিয়া উহাকে তিনি স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। করুণরস সৃষ্টিতেও প্রভাতকুমার কম কৃতিত্ব দেখান নাই। তাঁহার কয়েকটি গল্প অতিশয় করুণ ও মর্মস্পর্শী। তাহার মধ্যে 'আদরিণী' গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে বেদনার রেশ ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন

মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবে বাংলা কাব্যসাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছিল। কাব্য ও কবিতা রচনার পুরাতন রীতি পরিত্যক্ত হইয়া নূতন রীতিতে কাব্যরচনা সুরু হইয়াছিল। মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টির কাল হইতেই বাংলা কাব্যসাহিত্য সম্পূর্ণভাবে নূতন এক পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিল,—নূতন ভাব, কল্পনা, ছন্দ ও রচনাভঙ্গি বাংলা কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

যে যুগে মধুসূদনের আবির্ভাব, সে যুগে বাংলা কাব্যসাহিত্যে প্রাচীন আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে,—সে যুগের কবিদের উপর তখনও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রভাব অক্ষুন্ন রহিয়াছে। অথচ তখন বাংলার যুবসম্প্রদায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া পাশ্চাত্ত্য কাব্যরসপিপাসু হইয়া উঠিয়াছে,— পাশ্চাত্ত্য ভাবরসের জন্য তাহারা উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মনের তৃষ্ণা মিটাইবার সামর্থ্য বাংলা কবিতা তখনও লাভ করে নাই। পাশ্চাত্ত্য কবিদিগের অনুসৃত আদর্শ, অথবা পাশ্চাত্ত্য কাব্যের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত করাইয়া দিবার মত সামর্থ্য লইয়া কোন কবির আবির্ভাব তখনও ঘটে নাই।

ঠিক এই সময়ে অসাধারণ প্রতিভা লইয়া, মধুসূদন দত্ত বাংলা-সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইলেন। প্রকৃতিদত্ত কবিপ্রতিভা এবং অসাধারণ অধ্যবসায় ও আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে এই কবি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিলেন,—গাম্ভীর্যে ও ভাববৈচিত্র্যে বাংলা ভাষাকে তিনি সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন। মহাকাব্য, গীতিকবিতা, খণ্ডকবিতা—কাব্যরচনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধুসূদন তাঁহার সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় দিলেন। নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া পর পর এমন কয়েকখানি কাব্য রচনা করিলেন, যাহাতে বাংলা কাব্যের রীতি ও প্রকৃতিটাই একেবারে বদলাইয়া গেল। কাব্যের রূপ ও রসের মধ্যে এক অভিনব সঙ্গীত, ধ্বনি-মাধুর্য ও প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া তিনি বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে একেবারে নূতন করিয়া গঠন করিলেন।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদনের প্রথম দান 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। কাব্যখানি আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এতকাল বাংলা সাহিত্যে পয়ার ও লাচাড়ী ছন্দে কবিতা বা কাব্যরচনা হইতেছিল। মধুসূদন মিত্রছন্দের বন্ধন ভঙ্গ করিয়া, ভাবের অবাধগতি ও মুক্তিসাধন করিয়া অসাধ্য সাধন করিলেন।

মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' কেবল যে ছন্দের অভিনবত্ব বা বিশেষত্বই আছে, তাহা নহে। এ কাব্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কল্পনার অপূর্ব

সমন্বয় ঘটিয়াছে। এ কাব্যে ভারতের অমর কবি কালিদাস এবং ইংলণ্ডের কবি কীটস ও মিলটনের প্রভাব আছে। এইভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের কল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া, উহার উপর আপন ব্যক্তিগত কল্পনা ও সৌন্দর্যচেতনার আলোকদীপ্তিটুকু ফেলিয়া,—বাংলা কাব্যে মধুসূদন নূতন আকর্ষণী শক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রকাশের পর মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হয়। এ কাব্যখানিও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহা মহাকাব্য। বাংলা সাহিত্যে এ শ্রেণীর কাব্য এই প্রথম। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আখ্যায়িকা রামায়ণ হইতে গৃহীত। রাবণের পুত্র মেঘনাদের নিধন এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু এ কাব্যের বিষয়বস্তু বর্ণনায় কবি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কাব্যের যাহা কিছু বিশিষ্ট সম্পদ তাহাকে নূতনতর সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। এইভাবে বঙ্গ-সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব স্বীকৃত হইয়াই আধুনিক যুগের উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' বীররস আছে, রৌদ্ররস আছে, অদ্ভুত ও করুণরস আছে, স্বদেশপ্রীতির কথা আছে। এক কথায় বলিতে গেলে—এই কাব্যখানি বিচিত্র রস ও ভাবের আধার। এই কাব্যে মধুসূদন একজন দক্ষ স্রষ্টা,—ইহার আদ্যন্ত উদ্দাম কল্পনাশক্তি ও বর্ণনাদক্ষতার পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া আছে।

প্রতিভা এমনই জিনিস যে, ইহা যাহা কিছু স্পর্শ করে, তাহাকেই বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত করে। কবি মধুসূদনের প্রতিভা ঠিক এইরূপ ছিল। তিনি যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই সোনার দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করিয়াছেন, আবার মিত্রচ্ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া নূতন ধ্বনিমাধুর্যে উহাকেও যে অপূর্ব সৌন্দর্য দান করিতে পারা যায়, তাহাও প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কবির 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'। ব্রজাঙ্গনা বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে রচিত কাব্য।

ব্রজাঙ্গনার পরে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা পত্রকাব্য। মধুসূদনের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে এ শ্রেণীর কাব্য ছিল না।

পত্রাকারে যে কাব্য রচনা করা সম্ভব, এই ধারণার জন্য মধুসূদন ইটালীর কবি ওভিদের নিকট ঋণী। কিন্তু 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তু, কবিত্ব ও প্রকাশভঙ্গী—সমস্তই কবির নিজস্ব। ভারতীয় পুরাণান্তর্গত রমণীগণের—যেমন শকুন্তলা, জনা, দ্রৌপদী প্রভৃতির পত্র ইহাতে আছে। কোনও পত্রে অপরূপ করুণ-কোমলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোনটিতে বা গাম্ভীর্য ও তেজ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র ছন্দ অমিত্রাক্ষর। এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ পূর্ণপরিণত হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলা ভাষায় 'সনেট' ছিল না। মধুসূদনই এই শ্রেণীর কবিতা বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। চতুর্দশপদী কবিতায় মধুসূদন ভারতের কবি জয়দেব, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। ভারতের দেবদেবী, বাংলার পূজাপার্বণ, স্বীয় জন্মভূমি, কপোতাক্ষ নদের কথা, 'বউ কথা কও' পাখীর কথা, শ্রীমন্তের টোপর, ঈশ্বরী পাটনীর কথা—সকলই এক অভিনব সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া কবির স্মৃতিপটে উদিত হইয়াছে। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি, নিষ্ঠা এবং অনুরাগ প্রদর্শনই মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতার মর্মকথা।

মধুসূদনের অলোকসামান্য প্রতিভার স্পর্শে বাংলা কাব্যের আধুনিক যুগের আরম্ভ সূচিত হয়।

কাব্যসাহিত্যে হেমচন্দ্র

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদনে যে ধারার প্রবর্তন হইয়াছিল, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ধারাটিই অনুসরণ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের পূর্বে মধুসূদন বাংলার কাব্য-অঙ্গনে অতীতের বন্ধন-মোচনের গীতি গাহিয়া যে নবীন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহারই উত্তরাধিকারী হেমচন্দ্র। মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও খণ্ডকবিতা রচনা করিয়া তিনি

বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃত্রসংহার কাব্য মহাকাব্য; ছায়াময়ী, আশাকানন, দশমহাবিদ্যা, বীরবাহু, চিন্তাতরঙ্গিণী প্রভৃতি তাঁহার খণ্ডকাব্য। এছাড়া, কবি কিছু খণ্ড কবিতাবলীও রচনা করেন। এগুলি তাঁহার জীবনের বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়।

হেমচন্দ্রের মহাকাব্য বৃত্রসংহার কাব্যখানি বিষয়গৌরবে মহান্। বৃত্রাসুর-কর্তৃক স্বর্গজয় এবং ইন্দ্র-কর্তৃক স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধারের কাহিনী লইয়া পুরাণে এক বৃহৎ আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই আখ্যায়িকার মধ্যে দধীচি মুনির মহান্ আত্মত্যাগের কথা ছিল। হেমচন্দ্রের কল্পনাকে ইহা আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং উহারই ফলে তিনি তাঁহার বৃত্রসংহার কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যে কবির কল্পনা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রসারী। কল্পনার আলোকচ্ছটায় কবি কখনও মর্ত্যে, কখনও স্বর্গে, কখনও বা পাতালপুরীতে বিচরণ করিয়াছেন এবং যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই এক অভাবনীয় সৌন্দর্যলোক আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন। বৃত্রসংহার কাব্যে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের কল্পনাসমৃদ্ধ ছবি আছে।

বৃত্রসংহার কাব্যে বিরাট ও বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের ভিতর দিয়া কবি সমুন্নত চরিত্রসৃষ্টির কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এ কাব্যের ইন্দ্র, শচী, ইন্দুবালা চরিত্রগুলি মহান্ হইয়াছে। দধীচির চরিত্রটি মাহাত্ম্যে সব চেয়ে উজ্জ্বল। পরহিতব্রতের অতুলনীয় মাহাত্ম্য এই চরিত্রটিকে স্পর্শ করিয়াছে। দেবতাগণকে স্বর্গরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য দধীচি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অস্থির দ্বারা যে বজ্র নির্মিত হইয়াছে, উহাই দেবতাগণকে বিজয়ী করিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া কবি দেখাইয়াছেন, ত্যাগের অমিত শক্তি। এইরূপ ত্যাগ স্বাধীনতা আনে, স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যে জাতীয় আদর্শ রহিয়াছে, স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে। বৃত্রসংহার কাব্য দেশপ্রীতির উজ্জ্বল চিত্র। পরাধীন ভারতের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও অনুভূতি দেবতার কাহিনীর রূপকে বৃত্রসংহার কাব্যে সুপরিস্ফুট হইয়াছে। বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আশা ও আদর্শ তাঁহার কাব্যে রহিয়াছে।

বৃত্রসংহার কাব্যে দেবদৈত্য-সংগ্রামের উদ্দীপনাময় ভাবটি চমৎকার ফুটিয়াছে। দুই পক্ষের সমবেত সেনার অজস্রতা, ভীষণতা ও যুদ্ধের অবিরাম গতিপ্রবাহ কবি গুরুগম্ভীর শব্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে প্রত্যক্ষবৎ করিয়া তুলিয়াছেন। বীররস এবং রৌদ্ররসের বর্ণনায় হেমচন্দ্রের একটা আকর্ষণ ছিল। তাই তাঁহার হাতে এই দুই রসই ভালো ফুটিয়াছে। যেখানে বীরত্ব, গাম্ভীর্য ও অলৌকিক মহিমা, সেখানেই কবি যেন তাঁহার প্রতিভার যথার্থ ক্ষেত্রটি লাভ করিয়াছেন। তাই বৃত্রসংহার কাব্য বীররস ও রৌদ্ররস-প্রধান।

হেমচন্দ্র কেবল মহাকাব্য রচনা করেন নাই। তিনি গীতিকবিতাও রচনা করিয়াছেন। অন্তরের যে দরদে, যে সহৃদয়তায় ও সহানুভূতিতে, যে গূঢ় অনুভূতির রসে গীতিকবিতার জন্ম, হেমচন্দ্রের মধ্যে তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল। কবির সুগভীর দরদ ছিল লাঞ্ছিত জাতির জন্য, পরাধীন মাতৃভূমির জন্য। তাঁহার অন্তরের মধ্যে সঞ্চিত ছিল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, বন্ধনের বেদনা, জাতীয় গৌরবে উল্লাস, ব্যর্থ জীবনের নৈরাশ্য।

এক শ্রেণীর কবি আছেন, যাঁহারা আলো ধরিয়া জাতিকে পথ দেখান, জাতির জীবনকে গৌরবের শিখরের পানে চালনা করেন। হেমচন্দ্র সেই শ্রেণীর কবি। তিনি জাতীয় জীবনের কবি। জাতির প্রাণের কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কবি তাঁহার বহু কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্য বহু কবিতা তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। এসব কবিতায় তিনি বাঙ্গালীকে স্মরণ করাইয়াছেন তাহার মহৎ ঐতিহ্যের কথা। নিষ্ক্রিয় নিষ্প্রাণ বাঙ্গালীকে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন মহৎ প্রেরণায় ও দেশ-প্রীতিতে।

হেমচন্দ্র স্বদেশানুরাগের কবি। তাঁহার অধিকাংশ কবিতায় স্বদেশানুরাগের পূর্ণ বিকাশ। কবি Burns যেমন স্কটল্যাণ্ড দেশীয়দের জাতীয় কবি, হেমচন্দ্রও সেইরূপ বাংলার জাতীয় কবি। জাতীয় ভাব তাঁহার কবিতায়। তাঁহার কবিতা বাঙ্গালীর প্রাণে আশা-উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছে, জাতীয় ভাব, জাতীয় আশা-আদর্শ জাগাইয়াছে। পরাধীন এই দেশে একদিন তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়া স্বাধীনতার পাঞ্চজন্য-শঙ্খ বাজিয়াছিল।

কাব্যে নবীনচন্দ্র সেন

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে কয়জন কবির নাম উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে, নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাদের অন্যতম। ইংরাজি ভাবধারার প্রভাবে বাংলার জাতীয় জীবনে, তথা বাংলা সাহিত্যে যে নূতন অনুপ্রেরণা আসিয়াছিল, তাহারই স্পন্দন নবীনচন্দ্রের কাব্যে ও কবিতায় শুনা গিয়াছিল। তাঁহার পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, অমিতাভ, অমৃতাভ, অবকাশরঞ্জিনী বাংলার কাব্যজগতে অভিনব সৃষ্টি, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই সমস্ত কাব্যের মধ্যে নবীনচন্দ্রের প্রতিভার যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে—তাঁহার রচনায় জাতীয় ভাবের আধিক্য। দেশপ্রীতি তাঁহার সকল কাব্যের মূল সুর। মানবমাহাত্ম্য বর্ণনা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে মহামানবরূপে দেখিয়াছেন—তাঁহার মাহাত্ম্য ও শক্তির পরিচয় বিবৃত করিয়াছেন। অমিতাভ কাব্যে বুদ্ধের মহিমা কীর্তিত, অমৃতাভে শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা কীর্তিত।

নবীনচন্দ্রের অধিকাংশ কাব্যই ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। পলাশীর যুদ্ধ ঐতিহাসিক কাব্য। কাব্যখানি কবির দেশপ্রীতির উজ্জ্বল আলেখ্য। মোহনলালের চরিত্রে যে সজীব জাতীয়তার পরিচয় রহিয়াছে, তাহা এই কাব্যখানিকে মহনীয় করিয়াছে। যুদ্ধের শেষে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া মোহনলাল যে খেদোক্তি করিয়াছেন তাহার মধ্যে ভারত, তথা বাংলার জাতীয়তার ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়াছে। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—এই কাব্যত্রয়েও জাতীয় ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। এই কাব্য তিনখানিতে খণ্ড বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষে একটি অখণ্ড ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র এই কাব্য তিনখানিতে জাতীয়তাদীপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

নবীনচন্দ্র সেনের কবিতার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে, তাঁহার গীতিপ্রীতি। তাঁহার কাব্য রোমান্টিক কাব্যের ধর্মানুযায়ী আত্মগত ভাবকল্পনায় পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

নবীনচন্দ্র সেন হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য লইয়া বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে বাংলা কাব্যে কল্পনার সমৃদ্ধি আসিয়াছিল, বাংলা কাব্যে নূতন সঙ্গীতধ্বনি শুনা গিয়াছিল।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রতিভা-বিকাশ হইয়াছিল। সে যুগ হইতেছে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার যুগ। তখন কবিগণ যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য রচনায় ব্যাপৃত, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা রচনায় কবিগণ তখন আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইতিহাস-পুরাণের ঘটনা হইতে কবিগণ তখন তাঁহাদের কাব্যের বিষয়বস্তু আহরণ করিতেছেন। তখনকার কবিদিগের দৃষ্টি বহির্মুখী, তাঁহাদের বর্ণনা ঘটনাপ্রধান। বিহারীলাল কিন্তু কাব্যরচনায় এই ধারাটি অনুসরণ না করিয়া সম্পূর্ণ নূতন পথে আপন কবিকল্পনাকে চালিত করিয়াছিলেন। তিনি মহাকাব্য রচনার পথ পরিত্যাগ করিয়া, গীতিকবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার কাব্যে ইতিহাস পুরাণের ঘটনা নহে, একান্তভাবেই যাহা কবির নিজের মনের অনুভূতি—কবির ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনা, আশা-কল্পনা, তাহাই প্রকাশিতহইল।

বিহারীলালের বিখ্যাত কাব্য 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন'। 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গ সন্দর্শন'ও কবির সার্থক সৃষ্টি। অনেক খণ্ড খণ্ড কবিতা ও গানও তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

বিহারীলালের কল্পনা ও বর্ণনাভঙ্গি বাংলা গীতিকবিতায় অনেক নূতনত্ব আনিয়াছিল। বিহারীলালের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতিবর্ণনা ছিল। কিন্তু সে বর্ণনা ছিল,—প্রথাসঙ্গত বর্ণনা মাত্র। ঐ সকল বর্ণনায় নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মার গোপন রহস্য ও মাধুর্যের আভাসটুকু ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু বিহারীলালের কল্পনায় জড় মৃন্ময়ী প্রকৃতি হইয়া উঠিল চিন্ময়ী। প্রকৃতির সহিত কবি এক অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা অনুভব করিলেন,—বিশ্বের বিচিত্র জীবনপ্রবাহের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা কবিমনে জাগিল। প্রকৃতি কবির দৃষ্টিতে প্রাণের ও সৌন্দর্যের উৎসরূপিণী হইয়া দেখা দিল। সৌন্দর্য-সন্ধানী কবি তাই প্রকৃতির প্রাণ-উৎসের সহিত পরিচয়লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। প্রকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ নূতন বোধ ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে এক নূতন যুগকে আহ্বান করিয়া আনিল।

বিহারীলালের সময়ে বাংলা কাব্যের ভাষা ও ছন্দ সঙ্গীতবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। বিহারীলাল সেই ভাষায় ও ছন্দে নূতন সুর ও সঙ্গীতলাবণ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। ছন্দে যুক্ত-অক্ষরের স্থান দিয়া তিনি বাংলা ছন্দকে ঝঙ্কারে ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্ত্য আদর্শের রোমান্টিক কল্পনাভঙ্গির উন্মেষ বিহারীলালে। পাশ্চাত্ত্যের রোমান্টিক কবিদিগের মতই সুদূরের সহিত মিলিত হইবার, কাছের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া দূরের সহিত মিলিত হইবার,—সীমাহীনতায় বিলীন হইবার আকুতি বিহারীলালে জাগিয়াছে। রোমান্টিক কবিতায় থাকে অপূর্ণতার বেদনা, পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাজনিত কবিচিত্তের আকুলতা। সেরূপ অনুভূতি বিহারীলালের কাব্যেও জাগিয়াছে।

বিহারীলাল ছিলেন অখণ্ড, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের পূজারী কবি। কবির আরাধ্য সৌন্দর্যদেবতা বা সৌন্দর্যলক্ষ্মী ছিলেন 'সারদা'। এই সারদার বন্দনাগান বিহারীলাল তাঁহার 'সারদামঙ্গল' কাব্যে ও 'সাধের আসনে' করিয়া গিয়াছেন।

যে কল্পনা-প্রবণতার ফলে পাশ্চাত্ত্যেব রোমান্টিক কবিগণ বিশ্বের খণ্ডসৃষ্টির মধ্যে অখণ্ড অনন্ত সৌন্দর্যসত্তাকে বিভাসিত দেখিয়াছেন, সেইরূপ কল্পনা-প্রবণতা বিহারীলালে ছিল বলিয়া তিনি জগতের সকল সৌন্দর্যের মধ্যে সারদাকে দেখিয়াছেন। কবির 'সারদা' বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী। দৃশ্যমান বস্তুর অন্তরালে তিনি সৌন্দযমূর্তি সারদাকে প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন।

বিহারীলাল ছিলেন একান্তভাবেই কল্পনাপ্রবণ কবি। কিন্তু কল্পনাপ্রবণ কবি হইলেও তিনি বাস্তবের মধ্যেই তাঁহার মানসী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে খুঁজিয়াছেন। অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ এই কবি কখনও বাস্তব জীবন ও জগতের সহিত সংযোগ-টুকু হারাইতে চাহেন নাই। তাঁহার কবিতায় ভাবাবেশ ও স্বপ্ন আছে। কিন্তু এই ভাবাবেশ ও স্বপ্ন কবির বাস্তব অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবকে বিহারীলাল তাঁহার কাব্যে যেভাবে আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া দেখিয়া-ছিলেন, তাহাই বাংলা গীতিকাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ।

কাব্যে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব-কাল বাংলা কাব্যের এক পরিপূর্ণ যুগ—সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। তাঁহার সুদীর্ঘ কাব্যসৃষ্টির কালকে মোটামুটিভাবে তিনটি যুগে ভাগ করিতে পারা যায়। কবির কাব্যসাধনার প্রথম যুগ হইতেছে 'প্রতিভা উন্মেষে'র যুগ। প্রতিভা উন্মেষের যুগে রবীন্দ্রনাথ যেসকল কাব্য বা কবিতা রচনা করিয়াছেন, সেখানে কবির চিত্ত ছিল অন্তর্মুখীন। হৃদয়াবেগের অস্পষ্টতা এবং অনুভূতিকে প্রকাশের ব্যাকুলতা এই যুগের কাব্যের ভাবকে কিছুটা অস্পষ্ট করিয়াছে, ভাষাকে ভাবাতুর করিয়াছে। 'বনফুল' রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যসৃষ্টি। এই কাব্যখানি রচনার পরবর্তী কালে তিনি পর পর রচনা করেন—কবি-কাহিনী, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ও সন্ধ্যাসঙ্গীত নামক কাব্য কয়খানি। 'বনফুল' হইতে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্য রচনার কালকে সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে 'হৃদয়-অরণ্য' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তখনকার কবিতার মধ্যে একটা বিষাদের ভাব ফুটিয়াছে। অব্যক্তের বেদনা, অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা তখন কবির মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছে। এ যুগে বিশ্বের সঙ্গে যোগের জন্য অবরুদ্ধ অবস্থার অধীরতা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির সহিত যোগস্থাপনের জন্য কবির প্রাণ তখন কাঁদিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি ও মানবের সঙ্গে যোগস্থাপন করিতে না পারায় কবির অন্তরে বিষাদের ভাব জমিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের পরবর্তী কাব্য প্রভাতসঙ্গীত। প্রভাতসঙ্গীত হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ। এই যুগ হৃদয়ের অরণ্য-আঁধার হইতে কবির 'নিষ্ক্রমণে'র যুগ। প্রকৃতি ও মানবের মিলনের যে ব্যবধান পূর্বযুগে ছিল, তাহা এখন ঘুচিয়া গিয়াছে। প্রকৃতি ও মানবজীবনের বৈচিত্র্যের সান্নিধ্যে আসিয়া কবিচিত্ত উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন কবির হৃদয়াবেগের অস্পষ্টতা কাটিয়া গিয়াছে এবং রূপরসময় প্রকৃতিজগতের ও মানবজীবনের নব নব সৌন্দর্য কবিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। এই যুগেই কবির প্রতিভাসূর্য মধ্যাহ্ন গগনে উঠিয়াছে এবং তাঁহার কাব্যের ভাব, ভাষা ও ছন্দ বিচিত্র সৌন্দর্য ও শক্তির বর্ণচ্ছটাবিকাশ দেখাইয়াছে।

'প্রভাতসঙ্গীত' হইতে 'উৎসর্গ' নামক কাব্যরচনার কাল পর্যন্ত রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্বিতীয় যুগ। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যতন্ময় ভাবপ্রবণ কবি। উৎসর্গের পরবর্তী কাব্য খেয়া। 'খেয়া' নামক কাব্যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি—এই কাব্য কয়খানির মধ্যে ভগবদ্ভক্তির বেদীতে আত্মোৎসর্গ করিয়া কবি অপার তৃপ্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। এই 'খেয়া-গীতালির' যুগ রবীন্দ্রপ্রতিভা-বিকাশের এক যুগসন্ধিকাল। রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র রূপ রস বর্ণ গন্ধ গানের পূজারী কবি। কিন্তু এ যুগে এক অরূপের ধ্যানে তিনি তন্ময় হইয়াছেন।

গীতালির পরবর্তী কাব্য বলাকা। বলাকা হইতে রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের তৃতীয় যুগের আরম্ভ। এই যুগে অধ্যাত্মলোক ছাড়িয়া কবি আবার বিচিত্র রূপ রসের আধার এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন। ধরণীর রূপ রস বর্ণ গন্ধ গান তাঁহার চোখে নূতন মায়া বিস্তার করিল। অতীতের স্মৃতি এই যুগের কাব্যগুলিতে প্রাধান্য পাইল। এ যুগের কোন কোন কাব্যে কবিচিত্ত কৈশোর ও যৌবনের আনন্দস্মৃতিতে তন্ময় হইয়াছে—কৈশোর ও যৌবনের আনন্দের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের আনন্দে কবিচিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের এই তৃতীয় যুগের (বলাকার পরবর্তী যুগের) কবিতাগুলি এক হিসাবে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ও কল্পনার ঐশ্বর্যে তাঁহার এই যুগের কবিতাগুলি সমৃদ্ধ। এ যুগে কবির পৃথিবীপ্রীতি অতিশয় নিবিড়। পৃথিবীর ধূলি কবির চোখে মধুময়। সামান্য, সাধারণ মানুষ, যাহাদের উপর 'ভর দিয়া চলিতেছে সমস্ত সংসার', এখন তাহাদের কথা অতিশয় সহানুভূতির সহিত বলিবার আকুতি কবির মধ্যে জাগিয়াছে। সকল মানুষের আনন্দবেদনার বাণীরূপ সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই বলিয়া তিনি এ যুগে তাঁহার কোন কোন কবিতায় আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

যুগে যুগে পৃথিবীতে নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়। সেই যুগ-সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া কবির কাব্য। কবিরা 'শুধু শূন্য দিবসের অলস গায়ক' নহেন,

কেবল কল্পনা লইয়া বেসাতি করা কবির কারবার নহে। সারাদিন ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত বাঁশী বাজাইয়া হেলাফেলায় দিন কাটানও কবির ধর্ম নহে। বড় কবির কাব্যমাত্রেই যুগধর্মী। যুগধর্মকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া কোন কবিই কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথও পারেন নাই।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে কৃত্রিম যন্ত্রসভ্যতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীতে যে নূতন রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কবি তাহাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত নাগরিক সভ্যতার পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে তিনি বন্দী মানবাত্মার ক্রন্দন শুনিয়াছিলেন। হিংসায় উন্মত্ত সেই পৃথিবীতে যখন দেখিয়াছিলেন—'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস', তখন বেদনায় বিমথিত-চিত্ত কবি তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। বর্তমান পৃথিবীর পানে চাহিয়া কবির মনে হইয়াছে—এ পৃথিবীটা উৎপীড়িত ব্যথার জগৎ এবং সেই ব্যথাবেদনায় পীড়িত বিশ্ববাসীর দুঃখদুর্দশার প্রতিকার তিনি চাহিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ এই যুগে উদ্ভাবন করেন গদ্য ছন্দের। এই নূতন ছন্দকে কবি তাঁহার উচ্চাঙ্গের দার্শনিক চিন্তা, অনুভূতি ও কল্পনার আধার করিয়াছেন। আবার, এই ছন্দকেই তিনি পৃথিবীর নানা ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, উপেক্ষিত নরনারী ও প্রাকৃতিক উপাদানের আধার করিয়াছেন। অতি সাধারণ মানুষ, আকন্দ, কুড়চি, কণ্টিকারী প্রভৃতি অবজ্ঞাত গরিমাহীন ফুলের কথা এ যুগে ঠাঁই পাইয়াছে কবির গদ্যচ্ছন্দে। রবীন্দ্রনাথের পদ্যচ্ছন্দ কারুকার্যখচিত পেয়ালা, আভিজাত্যের গৌরবে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাঁহার গদ্যচ্ছন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে বাস্তবতার দীপ্তি।

রবীন্দ্রনাথ আনন্দের কবি। তাই জগতের আনন্দ-যজ্ঞে তিনি যোগ দিয়াছেন এবং যোগ দিয়া অন্তরে যে আনন্দ উচ্ছলতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহার কবিতায়। পৃথিবীর সামান্য ধূলিকণা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার ফুল ফল, তাহার অসীমব্যাপ্ত নীলাম্বর, তাহার গর্জনমুখর সমুদ্র, সমস্ত কিছুর মধ্যে তিনি আনন্দের অবাধ প্রবাহ ও অভিব্যক্তি

দেখিয়াছেন। জগৎসৃষ্টির মধ্যে তিনি জগৎস্রষ্টার সন্ধান পাইয়াছিলেন। সীমার মধ্যে অসীমের আভাস পাইয়াছিলেন। সেইজন্য পৃথিবী তাঁহাকে বড় বেশী আকর্ষণ করিত।

মানবমুখিতাও রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

সুন্দর ভুবন এবং মানব—দুইই কবিকে সমানভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। সূর্যকরোদ্ভাসিত প্রফুল্ল কাননে জীবন্ত হৃদয়ের মধ্যে নিজের স্থানটি লাভ করিবার জন্য তিনি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।—

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির,
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী।

তাহাদের পাশে কবি দাঁড়াইতে চাহিয়াছেন, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি বোধ করিয়াছেন। এই মানবমুখিতার জন্য রবীন্দ্রকাব্য এমন অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছে।

দেশের প্রতি গভীর অনুরাগ রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ও গানের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কখনো শ্লেষতিক্ত তীব্র ভাষায় তিনি ধিক্কার দিয়াছেন জাতীয় দুর্বলতা ও হীনতাকে, আবার কখনো দেশবাসীর দুর্দশা দেখিয়া অশ্রুস্নাত বেদনায় কবির কবিতা বিষণ্ণ করুণরূপ ধারণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় তাঁহার সুগভীর প্রকৃতিপ্রীতি ব্যক্ত হইয়াছে। স্থল-জল-আকাশের সহিত একটা আত্মীয়তা এবং বিশ্বপ্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া বিলাইয়া দিবার ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি কবির কল্পনায় প্রাণময়ী, বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে তিনি একটা প্রাণস্পন্দন অনুভব করিয়াছেন; প্রকৃতির সহিত মানবচিত্তের একটা অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তার যে যোগ আছে, সে বোধ রবীন্দ্র-নাথের বহু কবিতায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

বেদ উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত ধর্ম ও কাব্য সাহিত্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রবাহ কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভারতীয় ভাব ভাবনা ও সংস্কৃতির প্রভাব বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজমান।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে নব নব ভাব কল্পনা ছন্দ আমদানী করিয়া যেভাবে উহার শ্রী ও ধ্বনিবৈচিত্র্য বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বর্তমান বাংলা কাব্যের রূপই একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।

অনুশীলনী

[ক]

মঙ্গলকাব্য

১। মঙ্গলকাব্য কাহাকে বলে? যে কোনও এক শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের কাহিনী-অংশ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া সেই জাতীয় মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের সম্বন্ধে যাহা জান তাহা লিখ।

২। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ও উহার কবিগণের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। মনসামঙ্গল কাব্য ও উহার কবিগণের পরিচয় দাও।

৪। ধর্মমঙ্গল কাব্য ও উহার কবিগণের পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।

৫। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা কর।

[খ]

রামায়ণ ও মহাভারত

১। বাঙ্গালা সাহিত্যে রামায়ণ রচনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর এবং প্রধান প্রধান রামায়ণ-রচয়িতা কবির নাম ও তাঁহাদের রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। কৃত্তিবাসের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যে মহাভারত রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর এবং মহাভারত রচয়িতা প্রধান প্রধান কবির নাম ও তাঁহাদের রচনা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। মহাভারতের কবি কাশীরাম দাসের প্রতিভা সম্বন্ধে যাহা জান তাহা লিপিবদ্ধ কর।

[গ]

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও জীবনী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে উন্নতি-সমৃদ্ধির সূচনা হয় তাহার পরিচয় দাও।

২। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া যে সকল জীবনী-কাব্য রচিত হইয়াছিল তাহাদের পরিচয় প্রদান কর।

৩। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

[ঘ]

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস

১। বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের প্রথম যুগ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

২। রামমোহন রায়ের গদ্যরচনা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।

৩। বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধিসাধনে বিদ্যাসাগর অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের দান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান কোথায়, নির্ণয় কর।

৫। অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে বাঙ্গালা গদ্যের যে বিশেষ রূপ ও শক্তি পরিস্ফুট হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর গদ্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

[ঙ]

গীতি-সাহিত্য

১। বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর।

২। পদাবলী সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবির সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। শাক্ত পদাবলী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর।

৪। শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দাও।

[চ]

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস

১। বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের একটি ইতিহাস লিখ।

২। মধুসূদন অথবা দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

[ছ]

উপন্যাস ও ছোটগল্প

১। বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র অথবা শরৎচন্দ্রের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। বাঙ্গালা ছোটগল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটি রচনা লিখ।

[জ]

বাংলা কাব্যসাহিত্য

১। বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদনের দান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে হেমচন্দ্র অথবা নবীনচন্দ্রের দান ও প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও।

৪। 'কবি রবীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।

চতুর্থ খণ্ড

ভাব-সম্প্রসারণ ও ভাবার্থ-বিশ্লেষণ

ভাব-সম্প্রসারণ ও ভাবার্থ-বিশ্লেষণ

(১)

শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

মানব-সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা লোকের এতটুকু উপকার করিলেও মহাদম্ভে তাহা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং যাহার উপকার করে তাহাকে সেই উপকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার প্রাণে অযথা আঘাত দেয়। শৈবালের প্রকৃতি সেইরূপ বা তদপেক্ষাও হাস্যকর। জলপূর্ণ বিরাট দীঘির বুকে তাহার দান মাত্র একবিন্দু শিশির। উহা দীঘির কাছে অকিঞ্চিৎকর, অনাবশ্যক। মাত্র একবিন্দু অকিঞ্চিৎকর, অনাবশ্যক শিশির দান করিয়া শৈবাল যেমন উচ্চৈঃস্বরে তাহা ঘোষণা করিতে বসিয়াছে, ঠিক সেইরূপ সামান্য উপকার করিয়াও লোকে অনেক সময়ে নিজের উপকার করার কথাটা আড়ম্বরের সহিত ঘোষণা করিয়া বেড়ায়। এইরূপ উপকারের কোন সার্থকতা নাই। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি উপকৃত হইলেও সে প্রাণে ব্যথা পায়। সুতরাং উপকার করিলে অহঙ্কার প্রকাশ বা উপকারের কথাটা প্রচার না করাই ভাল। এই জন্যই যীশু উপদেশ দিয়াছিলেন,—'তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করে, তাহা যেন তোমার বাম হস্ত জানিতে না পারে'। উপনিষৎ বলেন— শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে, সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সহিত দান করিবে। বস্তুত যে উপকারের সহিত বিনয় মিশ্রিত থাকে তাহাই প্রকৃত উপকার।

(২)

কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে—
"ভাই ব'লে ডাকো যদি দেবো গলা টিপে।"
হেন কালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন বলি উঠে, "এসো মোর দাদা।"

[ক. বি. মাধ্যমিক, '৪৬, '৪৭, '৪৯]

মাটির প্রদীপ ও কেরোসিন-শিখার কাজ একই। উভয়েই আলোক দান করিয়া থাকে। পার্থক্যের মধ্যে শুধু এই যে, মাটির প্রদীপের আলো ক্ষীণ, কেরোসিন-শিখা তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর। এই কারণে কেরোসিন-শিখা মাটির প্রদীপ-শিখাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতে চাহে না। কারণ, তাহাতে কেরোসিন-শিখার অগৌরবের সম্ভাবনা। যাহারা সঙ্কীর্ণমনা—তাহারা ছোটর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা অগৌরবের কারণ বলিয়াই মনে করে।

কিন্তু আকাশে যখন চাঁদ উঠিল, যখন তাহার স্নিগ্ধ আলোকে পৃথিবী উজ্জ্বল হইয়া গেল—তখন চন্দ্রালোকের উজ্জ্বলতার কাছে কেরোসিন-শিখার আলোক অতি ক্ষীণ বলিয়া মনে হইল। কেরোসিন-শিখা তখন চন্দ্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল। কারণ, তাহাতে তাহার গৌরব বাড়িবার সম্ভাবনা।

সংসারে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যাহারা হীনচেতা তাহারা অপেক্ষাকৃত নির্ধন ও নিম্নপদস্থ ব্যক্তির সহিত আত্মীয়তাটুকু এড়াইয়া চলিতে চাহে। কারণ, ছোটর সহিত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইলে সম্ভ্রমহানি হয় বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। কিন্তু তাহারাই আবার গায়ে পড়িয়া বড়র সহিত কুটুম্বিতা পাতাইতে ব্যগ্র হয়। পক্ষান্তরে, যাঁহারা উদারমনা ব্যক্তি তাঁহারা সমস্ত পৃথিবীকেই তাঁহাদের কুটুম্ব মনে করেন; ধনী দরিদ্র, উত্তম অধম, হীন পতিত অসহায়—সকলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য তাঁহারা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

(৩)

কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যা-রবি,
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল—স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।

অস্তগামী সূর্য পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্বে জানিতে চাহিল, কে তাহার কার্যভার গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে আলোক বিকিরণ করিবে?

তাহার প্রশ্নে পৃথিবী ছবির মত স্তব্ধ হইয়া রহিল, জগতের অন্ধকারটুকুকে দূর করার গুরুভার কেহই গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল না। কিন্তু মাটির প্রদীপ—ক্ষীণ তাহার শিখা, সাধ্য তাহার অল্প—সে বলিল যে, তাহার সাধ্যমত সে ধরণীর অন্ধকার দূর করিবার চেষ্টা করিবে। পরোপকার করার ক্ষমতা পৃথিবীতে সকলের সমান হয় না। কাহারও ক্ষমতা বেশী, কাহারও ক্ষমতা মাটির প্রদীপের মতই অল্প। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমতা অল্প হইলেও সাধ্যানুসারে পরোপকার-ব্রতে ব্রতী হয়, তাহার জীবনই সার্থক। মাটির প্রদীপের মত জগদ্‌বাসীকেও প্রয়োজনের সময়ে আপনার সকল শক্তি দিয়া সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নিরুদ্যম হইয়া বসিয়া না থাকিয়া, প্রত্যেকেই যদি মাটির প্রদীপের মত নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী পরোপকার করিতে থাকে, তবে পৃথিবীর কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। মানুষ অপ্রমেয় শক্তির অধিকারী নহে। ইহা জানিয়াও যে মানুষ কর্মের ও কর্তব্যের আহ্বানে নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া সাড়া দিতে পারে, সে-ই যথার্থ কর্মী, প্রকৃত মানুষ। সামর্থ্যের পরিমাণ দিয়া মানুষের বিচার চলে না, সামর্থ্য প্রয়োগের আগ্রহের মধ্যেই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৪)

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক ধিক করে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি বলে তারে ভাল আছ ভাই!

[ক. বি. মাধ্যমিক, '৪৬, '৪৮]

দীনহীন নগণ্য একটি ফুল উদ্যানের একপ্রান্তে প্রাচীরের উপর ফুটিয়াছিল। আভিজাত্যের গর্ব করিবার মত তাহার কিছু নাই—সে নামহীন—অতিশয় নগণ্য সে। তাই উদ্যানে প্রাচীরের গায়ে একপাশে সে তাহার স্থান করিয়া লইয়াছে। বাগানের মধ্যে ফুটিবার অধিকার তাহার নাই। এই অনাদৃত ছোট ফুলটি উদ্যানের অভিজাত-শ্রেণীর ফুলগুলির উপেক্ষা লাভ করিয়া সঙ্কোচে যেন মরিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে কিরণচ্ছটায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত

করিয়া সূর্যদেব পূর্বাকাশে উদিত হইলেন। তাঁহার নিকট ক্ষুদ্র বৃহৎ, গণ্য নগণ্য—এ ভেদ নাই; সকলের উপরই তাঁহার করুণাকিরণ সমভাবে বর্ষিত হইয়া থাকে। সূর্যদেব সেই নগণ্য ছোট ফুলটির প্রতিও ভালবাসা জানাইয়া তাহাকে অভ্যর্থিত করিলেন।

এই পৃথিবীতেও দেখা যায় যে,—যাঁহারা উদারচরিত ব্যক্তি, তাঁহাদের স্বভাব সূর্যের মত। দীন দরিদ্র, অসহায় নগণ্য, সামান্য সাধারণের প্রতিও তাঁহাদের অসীম করুণা ও প্রেম বরং উহাদের প্রতিই তাঁহাদের সহানুভূতি ও সমবেদনা বেশী করিয়াই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(৫)

রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা,
সূর্য নাহি ফেরে, শুধু ব্যর্থ হয় তারা।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলিয়াছেন, "এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি।"—কথাটা সত্য। অনন্তকে পাইতে হইলে, অধরার পিছনে যাইতে নাই। জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া যায়,—খণ্ড, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, সামান্য সুন্দর সৃষ্টি মাত্রকেই সেই অখণ্ড, বিরাট্, অসাধারণ জগৎস্রষ্টার বিকাশমন্দিররূপে দেখিতে হয়। নিকটে কামনার ধন থাকিতেও যে মানুষ ভ্রান্ত হইয়া তাহাকে দূরে খুঁজিতে যায়, সে মানুষ দূরের সম্পদ্‌কে ত' পায়ই না, বরং নিকটকেও হারাইয়া হাহাকার করিতে থাকে। সৌন্দর্য আমাদের জীবনের নানা শুভ মুহূর্তে চিরপরিচিত নানাবিধ সত্তার মধ্য দিয়া ধরা দিবার চেষ্টা করিতেছে। উহার দিকে লক্ষ্য না রাখিলে জীবন ব্যর্থ হইবেই।

রাত্রির আকাশে নীল আকাশের বুকে তারকারাজির স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ হয়। যে ব্যক্তি তারকারাজির সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য উপেক্ষা করিয়া সূর্যালোকের শোকে অধীর হইয়া উঠে, সে সূর্যালোককে ত' ফিরিয়া পায়ই না, বরং নক্ষত্র-সমূহের শান্ত সৌন্দর্য হইতেও সে বঞ্চিত হয়। মানুষ অভ্যাস ও সংস্কারের দাস। অভ্যাস ও সংস্কারের দাসত্বহেতু আমরা কাছের জিনিসকে করি তুচ্ছ,

দূরের স্বপ্নে হই বিভোর। বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া আদর্শের সন্ধানে নিজেদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করি। ফলে অপ্রাপণীয়কেও যেমন পাই না, করায়ত্তকেও তেমনি হারাইয়া ফেলি।

(৬)

কতো বড়ো আমি কহে নকল হীরাটি,
তাইতো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।

যে ব্যক্তি যথার্থ মহৎ সে ব্যক্তি কখনও নিজের মাহাত্ম্যের গর্ব অনুভব করেন না। সত্যনিষ্ঠ, নানাগুণে বিভূষিত মানব অন্যের নিকট নিজের গুণ-গানে মুখর হন না। নিজেকে বড় বলিয়া জাহির করিতে তিনি পরাঙ্মুখ। কিন্তু অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি আত্মগরিমা প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠালাভের জন্য উৎসুক হয়। অহঙ্কার হীনজনেই সম্ভব, মহতের গুণ বিনয়,—গর্ব করা ইঁহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

(৭)

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত-চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়॥

বিপদ এবং দুঃখ, বিরোধ এবং সংঘাত মানুষের জীবনকে সার্থকতা ও পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। দুঃখ-বিপদ মনুষ্যজীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত,—এবং দুঃখ-বিপদের সহিত নির্ভীক চিত্তে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হওয়ার মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব। যে মানুষ বিপদ-বিঘ্নকে ভয় পায়, দুঃখ-বিরোধের সম্মুখীন হইয়া যে মানুষের চিত্ত ভাঙিয়া পড়ে, সে মানুষ তাহার মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া থাকে। বিপদের সম্মুখীন হইয়া ভীরুর ন্যায় সেই দুঃখ হইতে উদ্ধারলাভের বাসনায় ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করার মধ্যে আত্মার দীনতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু যে মানুষ দুঃখ-বিপদ-সমাকীর্ণ এই পৃথিবীতে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া জীবনের যাত্রা-

পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন, তিনিই মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন। শক্তির নব নব বিকাশ আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়াই ঘটিয়া থাকে। দুঃখকে বর্জন করায় কল্যাণ নাই, দুঃখকে আত্মসাৎ করার মধ্যেই কল্যাণ। শেক্‌স্‌পীয়র বলিয়াছেন—'The fire in the flint does not show till it be struck' —সত্যই, দুঃখের কঠিন আঘাত না পাইলে মানবমহিমার উজ্জ্বল বিকাশ ঘটে না।

(৮)

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর—
লহ তব লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি,—সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল-বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণ পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদ রাজভোগ নব—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরাণে স্পর্শিতে চাই,—ছিঁড়িয়া বন্ধন—
অনন্ত এ জগতের হৃদয়-স্পন্দন।

মানবাত্মা স্বাধীনতাকামী, উদার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে বিচরণের প্রয়াসী। সেই মানবচিত্ত যদি বস্তুতান্ত্রিক নাগরিক সভ্যতার নাগপাশে আবদ্ধ অবরুদ্ধ হয়, তবে উহা পীড়িত হয়। পীড়িত মানবাত্মা সঙ্কীর্ণ গণ্ডি, জড়বস্তুর পরিবেশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অসীম অনন্তবিস্তৃত জগতের সহিত সংস্পর্শ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, প্রকৃতির বিচিত্রতা ও শ্যামলতার মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবার আকাঙ্ক্ষা তাহার হয়। নাগরিক সভ্যতায় পুঞ্জীভূত বস্তু ও ভোগের

ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু শান্তি নাই। তাই কবিমনে জাগিয়াছে প্রাচীন ভারতের তপোবন-সভ্যতার স্মৃতি,—সেই আরণ্য সভ্যতার মধুর স্বপ্ন। তখন মানুষের জীবনে সীমাহীন অবকাশ ছিল, গ্লানিহীন শান্তি ছিল, আত্মার নির্বিরোধ স্বাধীনতা ছিল। নিখিলের আনন্দযজ্ঞে মানুষ সেদিন অবাধে যোগদান করিত, নিগূঢ় এক শক্তির বলে মানুষ তখন বিশ্বনিখিলের আনন্দরসধারা পান করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু বর্তমানে নিখিলের সহিত সেই যোগ হইয়াছে বিচ্ছিন্ন,—নগরের লৌহ, লোষ্ট্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় পল্লী এবং মানুষের মধ্যে রচনা করিয়াছে এক দুস্তর ব্যবধান। মানবাত্মা ইহাতে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যথিত মানবাত্মার সেই ক্রন্দনকে কবি এখানে ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে,—মানুষের জীবনে আরণ্য সভ্যতার শান্তিময় দিনগুলি ফিরিয়া আসুক,—তপোবন-জীবনযাপনকালে মানুষ যেমন প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিল, আজিও প্রকৃতির সহিত সেইরূপ অবিচ্ছিন্ন যোগ প্রতিষ্ঠিত হউক।

(৯)

সে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

গতির মধ্যেই জীবন, স্থিতিতেই মৃত্যু। যে নদী নিয়ত প্রবহমান, তাহার শ্রীর অন্ত থাকে না, তাহার কূলে কূলে জল, এপারে ওপারে সবুজের সমারোহ, প্রাণের সঞ্চার, সভ্যতার লীলাভূমি। কিন্তু নদী তাহার স্রোত হারাইলে, নদীর গতি রুদ্ধ হইয়া গেলে সে তুচ্ছ হইয়া যায়,—সহস্র শৈবালদামে আকীর্ণ হইয়া ঐ নদী 'মরানদী' নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। মানবজীবন এবং মানব-জাতির সম্পর্কেও দেখা যায় যে, যে মানব বা যে জাতি চলমান নদীর মতই নিয়ত চলিষ্ণু, সেই মানব বা জাতি জীবিত, প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ। যে জাতি

গতির পূজারী, সে জাতি নিয়তই নব নব বিকাশের পথে ধাবমান হয়। মানুষ সেখানে আপন সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সকল সুযোগ লাভ করে; মানুষের আত্মা নিয়তই বৃহত্ত্বের ফল লাভ করে। তন্দ্রায় আবিষ্ট হইয়া যে জাতি তাহার গতিকে রুদ্ধ করে না, সে জাতির মহিমা দীপ্ত সূর্যের মতই চির-উজ্জ্বল। কিন্তু কোন জাতি তাহার গতি হারাইয়া ফেলিলে নানারূপ বিধিনিষেধ, বিচিত্র অর্থহীন লোকাচারের সৃষ্টি হয়, জাতির অগ্রগতি তখন ব্যাহত হয়। জীর্ণ সংস্কার তখন জাতিকে অচলায়তনের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখে। তন্ত্র, মন্ত্র, সংহিতা,—অর্থহীন কুসংস্কার ইত্যাদিকে জাতি চরণকে শৃঙ্খলিত করিলে, অচিরকালের মধ্যে জাতির জীবনপ্রবাহ মন্দীভূত হইয়া যায়,—শেষ পর্যন্ত উহাই জাতির ধ্বংসের পথকে প্রশস্ত করিয়া দেয়।

(১০)

বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী—
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে একেবারে ছাড়ে।

মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনীয় অন্নশস্যাদি পৃথিবী যোগাইতেছে। কিন্তু মানুষকে চাষবাস করিয়া, পরিশ্রম করিয়া শস্যাদি উৎপাদন করিতে হয়। পরিশ্রমের বিনিময়ে, দুঃখের মূল্যে মানুষ অন্নশস্য লাভ করিতেছে বলিয়াই মানুষের গৌরব। বিনা পরিশ্রমে, দুঃখবেদনা না সহিয়া অনায়াসে মানুষ যদি শস্যকণা লাভ করিত, তবে উহা মানুষের অগৌরবেরই কারণ হইত। নিশ্চেষ্টতা মানুষের মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়ক নহে, সক্রিয়তা, দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি ও আত্মনির্ভরশীলতার উপরেই মানুষের মর্যাদা নির্ভর করে।

(১১)

চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী ! ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালিয়া সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি ;—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি' ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সগর বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা, আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি,
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা, সে বিমল জলে !
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভুমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।—
হে কাশী, কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্ ॥

[ক. বি. মাধ্যমিক, ১৯৪৯]

গঙ্গা প্রথমে মহাদেবের জটাজালের মধ্যে আবদ্ধা ছিলেন। তপঃসিদ্ধ ভগীরথ দুশ্চর তপস্যায় গঙ্গার পূতধারাকে মর্ত্যভূমিতে প্রবাহিত করাইয়া সগর-বংশের মুক্তিসাধন করিয়াছিলেন, ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়াছিলেন,—মহর্ষি বেদব্যাসের মহাভারত-কাব্য ঐ গঙ্গাধারার মতই প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ ছিল। সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালী জনসাধারণ ঐ কাব্যের রস হইতে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু কবি কাশীরাম দাস অসীম সাধনাবলে সংস্কৃত মহাভারত বাংলাভাষায় অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালীর রসপিপাসা নিবারণ করিয়াছিলেন। কাশীরাম দাসের প্রতি বাঙ্গালী এজন্য চিরকৃতজ্ঞ।

(১২)

তোমার কে মা বুঝ্‌বে লীলে ?
তুমি কি নিলে, কি ফিরিয়ে দিলে ?

তুমি দিয়ে নিচ্ছ তুমি, বাছ রাখ না সাঁজ-সকালে,
তোমার অসীম কার্য অনিবার্য—
মাপাও যেমন যার কপালে।
তোমার অভিসন্ধি পদে-বন্দী ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে।
তুমি যেমন দেখাও তেমনি দেখি,
জলেই তুমি ভাসাও শিলে!
তোমার জারিজুরি আমার কাছে
খাটবে না মা, কোন কালে;
ওসব ইন্দ্রজালে যন্ত্র জানে—
রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে!

[ক. বি. মাধ্যমিক, ১৯৪৮]

বিশ্বধাত্রী শ্যামাজননীর বিচিত্র লীলা! তিনি পরম রহস্যময়ী। ঐ রহস্যময়ী মহামায়ার ইঙ্গিতে জগতে জীবন ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও বিনাশ ঘটিতেছে। মানবভাগ্যকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন—বিধান তাঁহার অনিবার্য। এই রহস্যময়ী মহাকালীর লীলারহস্য শিবও ভেদ করিতে অসমর্থ।

কিন্তু বিশ্বজননীর যাঁহারা ভক্ত সন্তান, তাঁহাদের স্বচ্ছ অধ্যাত্মদৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বধাত্রী শ্যামাজননীর এবং সৃষ্টির সকল গোপন রহস্যই সুস্পষ্ট। বিশ্বধাত্রী শ্যামাজননীকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া লইতে পারিলে, মহামায়ার সৃষ্টিরহস্য তখন আর রহস্যাবৃত থাকিতে পারে না। জগতের যাবতীয় সুখ-দুঃখ, সৃষ্টি-ধ্বংস সকল কিছুরই তাৎপর্য ও সার্থকতা তখন ভক্তের দৃষ্টিতে ধরা দেয়। ভক্ত তখন আনন্দের পিছনে যেমন মহামায়ার করস্পর্শ অনুভব করেন, দুঃখের মধ্যেও তেমনি তখন সেই বিশ্বধাত্রীরই করস্পর্শ অনুভব করেন। সুখ-দুঃখ সৃষ্টি-ধ্বংস—সবই মহামায়ার লীলা, এই বোধ জন্মিলে সুখের দিনে মহামায়াকে নিবিড় করিয়া ধরিবার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে, আবার দুঃখের দিনেও তাঁহারই ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া সকল দুঃখবেদনাকে মানুষ ভুলিয়া যায়।

(১৩)

বহুদিন গত চৈতি গাজন,
মেঘে মাঠে আজ অম্বুবাচন,
থামাও তোমার পাগুলে নাচন
বেঁধে নাও জটাজুট !
হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া
প্রলয়-শালায় পিটিয়া রাঙিয়া
গড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল
ধরো লাঙলের মুঠ।
আমাদেরি সাথে চলো গো ঠাকুর
ওই নাচে পোড়া মাঠে,
দুই হাতে চেপে চালাও লাঙল
পাথরও যেন গো ফাটে।
শঙ্কর ! হও সঙ্কর্ষণ
মাটি ছোঁওয়া মেঘে নামে বর্ষণ
শস্যে শ্যামল করো ধরাতল
বাঁচুক অন্নপূর্ণা।

[মাধ্যমিক বিশেষ বাংলা, ১৯৪৯]

বহুদিন হইল চৈত্রমাস অতিক্রান্ত হইয়াছে,—চৈত্রের শিবের গাজন-উৎসবের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। তারপর আসিয়াছে বৈশাখ। খর-বৈশাখে সংহার-ত্রিশূল হস্তে ভৈরবের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হইয়াছিল প্রকৃতির বুকে। মহাদেবের সেই তাণ্ডবে, সেই রুদ্রলীলায় ধরণী মুমূর্ষু, নীরস, পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল। তাই কবি রুদ্রমূর্তি মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—ধরণীতে আষাঢ় আসিয়াছে। মেঘে মাঠে আজ অবিরাম বারিবর্ষণ হইতেছে, রৌদ্রদগ্ধ নীরস মাটি সরস হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে প্রলয়ঙ্কর শিব হলধর বলরামের বেশে পৃথিবীতে আবির্ভূত হউন। অমিত শক্তির অধীশ্বর মহাদেবের হলচালনায় বর্ষার বারিসিক্ত ধরণী শস্যশ্যামলা হইয়া উঠুক। অন্নপূর্ণা এই বসুধার বুকে

দিকে দিকে জীবনের চিহ্নকে ফুটাইয়া তোলার জন্য আজ মানুষ যাইবে পোড়া মাঠে,—সেখানে গিয়া কর্মযজ্ঞে মাতিবে। এই কর্মযজ্ঞে শিব আমাদের সহায় হউন।

(১৪)

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির-বিন্দু॥

মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় জিনিস হইতেছে সৌন্দর্যতৃষ্ণা। মানুষের মনে সৌন্দর্যতৃষ্ণা আছে বলিয়াই সে মানুষ,—সুন্দরকে হৃদয়ের বেষ্টনে বেড়িয়া ধরিবার আকঙ্ক্ষা আছে বলিয়া জীবজগতের মধ্যে মানুষ একটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুন্দরের অন্বেষণে মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া সাধনা করিয়াছে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছে, পর্বতে অরণ্যে সমুদ্রের বুকে—অজানা হইতে অজানায় সে ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু ঘরের পাশে সামান্য একটি ধানের শিষের উপর একবিন্দু শিশির যখন ঝলমল করিয়া উঠে, তখন যে অপূর্ব রূপে সুন্দর সেখানে ধরা দেয়, তাহা মানুষ কখনও চোখ মেলিয়া দেখে না। কারণ, সে মনে করে, দূরের সুন্দরই সুন্দর,—কাছের জিনিসে, পরিচিতের মাঝখানে সুন্দর থাকিতে পারে না।

কবি এখানে দূরের সুন্দর এবং নিকটের সুন্দরের কথা বলিয়াছেন। দূরের সুন্দর আকর্ষণীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের ঘরের পাশের বাগানের গোলাপের পাপড়ি-ঝরা সন্ধ্যাবেলার মতো, প্রত্যুষের ঘুম-ভাঙানো পাখীর গানের মতো একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দুও যে অসীম সৌন্দর্যকে আপন মাঝে বন্দী করিতে পারে, তাহা আমাদের জানা নাই। তাই আমরা সমুদ্রের গানই শুনিতে চাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে সংরক্ষিত শঙ্খের বুকেও যে সমুদ্রের গান ধ্বনিত হইতেছে,

তাহা শুনিবার জন্য আমরা ব্যাকুল নহি। আমরা তাই সুইজারল্যাণ্ডের সৌন্দর্য দর্শনে ব্যাপৃত হই, আর আমাদের ঘরের কাছের হিমালয় প্রভাত-সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নে যে বাঁশী বাজায় তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়—সে বাঁশীর রাগিণী আমাদের কানে পৌঁছায়ই না।

সুন্দর আছেন পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপিয়া। সত্যকারের দৃষ্টি থাকিলে দূরের মাঝে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি খুঁজিতে হইবে না। ঘর হইতে পা বাড়াইয়াই 'একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির-বিন্দু'র মাঝেই আমরা আমাদের সৌন্দর্যতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া পাইব।

(১৫)

তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার, আবার সেইখানেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসারসমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রতিহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্মলা নদীতে আবর্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে, মনুষ্যহৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।

—বঙ্কিমচন্দ্র ॥

[মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৪৯]

আমাদের মন চিরকাল একরূপ থাকে না। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উহার রঙও বদলাইতে থাকে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। যৌবনে সাধারণত পৃথিবীকে রঙীন বলিয়া বোধ হয়, বয়োধর্মবশত তখন সংসার কেবলই

সুখের স্থান, সৃষ্টি কেবলই সুন্দর বলিয়া মনে হইতে থাকে। কিন্তু ঠেকিতে ঠেকিতে এবং শিখিতে শিখিতে মানুষ যখন আসিয়া বার্ধক্যের সীমানায় উপস্থিত হয়, তখন তাহার চোখের সম্মুখ হইতে যৌবনের সেই মোহময় ইন্দ্রজালের আবরণ সরিয়া যায়, পৃথিবীকে তখন সে খোলা চোখে দেখিয়া তাহার রূঢ় বাস্তব রূপ অনুভব করিতে পারে। তখন সে দেখিতে পায়, তাহার অনেক আশাই নিরাশা হইয়া গিয়াছে ; অনেক আনন্দই দুঃখে পরিণত হইয়াছে ; বুঝিতে পারে—সুন্দরের মধ্যেও কুৎসিত লুকাইয়া আছে, কোমলের মধ্যেও কঠোরতা গুপ্ত রহিয়াছে ; জানিতে পারে—মিথ্যাও সত্যের ছদ্মবেশ ধরিয়া সহজেই আমাদিগকে প্রতারণা করে, মূল্যহান বস্তুও বাহিরের ভান দ্বারা আমাদের নিকট অমূল্য বলিয়া বোধ হয়।

(১৬)

দেখ আমি চোর বটে ; কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি ? খাইতে পাইলে কে চোর হয় ? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু. চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোর চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে,—চোর যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয় ; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন ?

—বঙ্কিমচন্দ্র ॥

[মাধ্যমিক বিশেষ বাংলা, ১৯৫২]

পৃথিবীতে ধনীর অতিরিক্ত পরিমাণ লোভই চোরের চৌর্যবৃত্তির মূলীভূত কারণ। স্বার্থান্ধ ধনী প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করিয়া নিত্যই অপরকে বঞ্চনা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত ঐশ্বর্য করায়ত্ত করিতেছেন। সেইজন্য সমাজে দারিদ্র্য, অভাব-অনটনের সৃষ্টি হইতেছে। ধনিকশ্রেণী যদি সঞ্চয়বুদ্ধির প্রেরণায় প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনসঞ্চয়ে ব্যাপৃত না হইতেন, দরিদ্রকে শোষণ না করিতেন, তবে সমাজে দারিদ্র্য থাকিত না, নিরন্নের হাহাকার সৃষ্টি হইত না।

চোর পরস্বাপহারী বলিয়া তাহার দণ্ড হয়। সমাজের ধনিকশ্রেণীও পরস্বাপহারী,—অপরের শ্রমের ফল তাঁহারা সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন। সুতরাং পরস্বাপহারী চোরের যদি দণ্ড হয়, তবে যে ধনিক শ্রেণীর সঞ্চয়বুদ্ধির ফলে সমাজে দুঃখদারিদ্র্যের উদ্ভব, তাঁহাদেরও দণ্ড হওয়া বিধেয়।

(১৭)

লাঠি, তোমার দিন গিয়াছে। তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ। হায়! বন্দুক আর সঙীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। লাঠি! তুমি বাংলার আব্রু রাখিতে, পর্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। বদমাইস তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। তুমি তখন পীনাল কোড্ ছিলে—তুমি পীনাল কোডের মত শিষ্টের পালন করিতে এবং রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। পীনাল কোডের উপর তোমার এই সর্দারি ছিল যে, তোমার উপর আপীল চলিত না। তুমি লাঠি,—আর লাঠি নও, বংশখণ্ড মাত্র। ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগালকুক্কুরভীত বাবুবর্গের হাতের শোভা কর। কুকুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়। তোমার সে মহিমা আর নাই!

—বঙ্কিমচন্দ্র ॥

বাঙ্গালীর একদিন দেহে শক্তি ছিল, বাহুতে বল ছিল। তখন বাঁশের লাঠির সহায়তায় বাঙ্গালী তাহার সাহস প্রকাশ করিয়াছে, অন্যায় অধর্মের প্রতিকার করিয়াছে। উহার সাহায্যে বাঙ্গালী একদিন শত্রুর সহিত যুঝিয়াছে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছে। লাঠি ধরিয়া বাঙ্গালী তাহার স্বদেশের মান মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে বাঙ্গালী শক্তিহীন। সে এখন লাঠি ধরিতে অক্ষম। বিলাসী দুর্বল হইয়া বাঙ্গালী আজ ছড়ি ধারণ করিয়াছে। শক্তির প্রতীক লাঠি তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।

(১৮)

"কবিগণ কালের গতি রোধ করেন এবং অনন্তকালকে মুহূর্তকালে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন।"

— চন্দ্রনাথ বসু ॥

কাল অবিরাম গতিতে ছুটিয়া চলিতেছে, আমরাও অশ্রান্তগতিতে কালপ্রবাহের সহিত ছুটিয়া চলিতেছি। কালের গতি নিরীক্ষণ করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। মানুষের জীবনে কত মুহূর্ত আসে, মানুষ আকুল আগ্রহে সেই সকল মুহূর্তকে ধরিয়া রাখিতে চায়। বলে,—'এই ক্ষণটুকু হোক্ চিরকাল'—কিন্তু পারে না। সেই-সকল মুহূর্ত বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া যায়। কিন্তু এই নিত্যপ্রবহমান কালস্রোতকে রুদ্ধ করিতে পারেন কবি ও শিল্পীগণ। তাঁহারা ক্ষণকালের অচিরস্থায়ী ইতিহাসকে চিরন্তন করিতে পারেন। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য, মানব-জীবনের হাসিকান্না, আনন্দবেদনা—বস্তুজগতের সবই পরিবর্তনশীল। তাহাদের আয়ু ক্ষণমুহূর্তের। কিন্তু কবি ও শিল্পীর সৃষ্টিতে যখন সেই অনন্ত কালপ্রবাহের কোন একটি ঊর্মি একটি বিশিষ্ট সঙ্গীতে ও ভঙ্গিতে ধরা পড়ে, তখন ক্ষণকালের সামগ্রীও চিরস্থায়িত্ব লাভ করে। বস্তুজগতে যাহা হারাইয়া যায়, শিল্পজগতে তাহা চিরন্তন হইয়া যুগে যুগান্তরে মানুষকে আনন্দরসধারায় অভিষিক্ত করিতে থাকে। কবিগণই ক্ষণমুহূর্তকে—কালপ্রবাহকে রোধ করিয়া একটি পরম মুহূর্তের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন। কবি ও শিল্পীরাই একটি মুহূর্তকে সৌন্দর্যে ও তাৎপর্যে ভরিয়া দিয়া তাহাকে অনন্তের মর্যাদা দান করেন। কাব্যে ও শিল্পে শত সহস্র ক্ষণমুহূর্ত চিরন্তনত্ব লাভ করিয়া অনন্ত মুহূর্তে রূপান্তরিত হইয়াছে।

(১৯)

বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি? যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? গঙ্গা মা'র শোভা যা দেখ্‌বার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকবে না। দৈত্য-দানবের হাতে প'ড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন ইটের পাঁজা। যেখানে গঙ্গার ছোট-ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা কর'ছে সেখানে দাঁড়াবেন পাটবোঝাই ফ্লাট আর

সেই গাধাবোট। নীল আকাশ, মেঘের বাহার কি আর দেখতে পাবে? দেখবে পাথুরে' কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছে কলের চিমনি। —স্বামী বিবেকানন্দ ॥

[মাধ্যমিক বিশেষ বাংলা, ১৯৫১]

মানব-সভ্যতা বর্তমানে মানুষের অন্তর্জীবনকে ত্যাগ করিয়া কেবল জড়বাদের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, যান্ত্রিক দৈত্যের তাড়নায় চালিত হওয়াকেই উহা কাম্য ও সাধ্য করিয়া তুলিয়াছে। যত রকমে পারা যায়, প্রকৃতির নিকট হইতে লোভের ও ভোগের সামগ্রী আহরণ করিয়া একটা ক্ষণিক সুখ উপভোগ করিবার অদম্য স্পৃহায় মানুষ আজ প্রমত্ত। অগ্নিশিখা যেমন পতঙ্গকে আকর্ষণ করে, যন্ত্র-দৈত্য মানুষকে আজ তেমনই ভাবে আকর্ষণ করিতেছে, আর সেই শিখাকেই সুখ মনে করিয়া মৃত্যুমোহাচ্ছন্ন মানুষ মারণ-বহ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে এবং দগ্ধপক্ষ হইতেছে। যাহা কিছু সহজ তাহাকে জটিল করিয়া তোলা, যাহা কিছু সুন্দর তাহাকে মসীকলঙ্কিত করাই যন্ত্র-সভ্যতার ধর্ম। ঐ ধর্মসাধনের উন্মাদ আশায় মানুষ তাহার আন্তর-সত্তাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, জড়বাদের আবর্জনা তাহার স্বচ্ছ প্রাণ-প্রবাহিণীকে করিয়া তুলিয়াছে পঙ্কিল। তাহার হৃদয়ের শ্যামলতা ও সজীবতা আজ অন্তর্হিত; তাহার মানস-তরঙ্গের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস আজ দৈহিক প্রয়োজন মিটাইবার পণ্যসম্ভারের চাপে অবরুদ্ধ; তাহার হৃদয়ের সন্তোষ, শান্তি ও সারল্যের উদার উন্মুক্ত নীলাকাশ আজ ভোগ-মোহের ধূম্রজালে আচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট।

(২০)

শত সহস্র বৎসরের মহারণ্য অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে, যুগযুগান্তরের প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষার রত্নমুকুট সহজেই অম্লান হয়ে বিরাজ করে, কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখতে দেখতে জীর্ণ হয়ে যায় এবং তার লজ্জিত ভগ্নাবশেষ একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলতে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও মানুষের সেই রাজপ্রাসাদের মত। চারিদিকের জগৎ নূতন থাকে, আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার

কারণ, বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তুলছে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে চারিদিকে বিরাট্ প্রকৃতি থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেই ক্রমশ বিকৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি করে মানুষই এই চিরনবীন বিশ্বজগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন নয়—সে আপনাকে আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে তার বহুকালের আবর্জনা সঞ্চিত হতে থাকে—অবশেষে সেই স্তূপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে চারিদিকে সমস্তই সহজ, কেবল সেই মানুষই সহজ নয়।

[ক. বি. মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৫৩]

বিশ্বসৃষ্টির সকল কিছুই সহজে বিকশিত হইয়া উঠে, আবার 'পূর্ণের দান স্মরণ' করিয়া 'ভরা পাত্রটি শূন্য' করিতেও তাহার বাধে না। এমনি করিয়া মহারণ্য তাহার শ্যামলতাকে অক্ষয় রাখে, তুষারমৌলি শৈলরাশি শুভ্রশীর্ষকে অম্লান রাখে। এমনি করিয়া প্রকৃতি 'অলস ভোগের গ্লানি ঘোচায়', 'মৃত্যুর স্নানে কালিমা ঘোচায়' এবং চিরপুরাতনকে 'নূতন চেতনায়' উজ্জ্বল করিয়া তোলে। কেবল মানব-সৃষ্ট জগৎই ইহার ব্যতিক্রম। নিজের সৃষ্টির অহঙ্কারে মানুষ অন্ধ। যে-বিশ্বসৃষ্টির সে অঙ্গ, সেই সৃষ্টি হইতে পৃথক হইয়া সে যে স্বতন্ত্র একটি অচলায়তন গড়িয়া তুলিতেছে, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। বিশ্বসৃষ্টির চিরনবীনতার মন্ত্রটিকে ভুলিয়াছে বলিয়াই, মানুষ যেমন নিজে, তেমনই তাহার সৃষ্ট জগৎ, ক্রমে পুরাতন হইয়া, স্ব-অর্জিত আবর্জনার স্তূপের মধ্যে একদিন লুপ্ত হইয়া যায়। প্রকৃতির সঙ্গে যোগহীন হওয়াতেই মানুষের মর্মান্তিক বিয়োগ অনিবার্য।

(২১)

সভ্য জগতের এ জ্ঞান জন্মেছে যে, মানুষের মনোজগৎ কেউ আর এক-হাতে গড়েনি, এর ভিতর নানা যুগের নানা দেশের হাত আছে। কারণ, বিদেশী ভাষা ও বিদেশী সাহিত্যের চর্চা ছেড়ে দিলে মানুষকে মনোরাজ্যে একঘরে

এবং কুণো হয়ে পড়তে হয়। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চর্চায় মানুষের মন জাতীয় ভাবের গণ্ডির মধ্যেই থেকে যায় এবং এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই যে, মনোরাজ্যে কূপমণ্ডূক হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, সে কূপের পরিসর যতই প্রশস্ত ও তার গভীরতা যতই অগাধ হোক না কেন ; এবং এ কথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, যে জাতি মনে যতই বড় হোক না কেন, তার মনের একটা বিশেষ রকম সঙ্কীর্ণতা আছে, এবং তার মনের ঘরের দেওয়াল ভাঙ্‌বার জন্য বিদেশী মনের ধাক্কা চাই। বিদেশীর প্রতি অবজ্ঞা বিদেশী মনের অজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করে এবং এই সূত্রে জাতির প্রতি জাতির দ্বেষ-হিংসাও প্রশ্রয় পায়। সুতরাং বিদেশী সাহিত্যের চর্চায়, শুধু আমাদের মন নয়, হৃদয়ও উদারতা লাভ করে ; আমরা শুধু মানসিক নয়, নৈতিক উন্নতিও লাভ করি। অতএব মনোজগতে যথার্থ মুক্তিলাভ করতে হলে আমাদের পক্ষে বিশ্ব-মানবের মনের সংস্পর্শে আসা দরকার। মনোজগতে বৈচিত্র্য থাকলেও সে ক্ষেত্রে কোন দেশভেদ নেই ; আমরা আমাদের মনগড়া বেড়া দিয়ে তার মনগড়া ভাগ-বাঁটোয়ারা করি, সত্যের আলোকে এসব অলীক প্রাচীর কুয়াশার মত মিলিয়ে যায়।

[ক. বি. মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৫৩]

মানুষের মনোজগতের প্রসার না ঘটিলে মানুষ হিসাবে সে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই কারণেই মানুষের পক্ষে বিশ্বমানবের মনের সংস্পর্শে আসা প্রয়োজন। একমাত্র বিশ্ব-সাহিত্যই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে পারে। কারণ, বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমরা জগতের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মনের স্পর্শটুকু লাভ করিতে পারি। তাই বিদেশী সাহিত্য পাঠ মনুষ্য-মাত্রেরই কর্তব্য। আমরা জাতীয়-সাহিত্য ভিন্ন অন্য সাহিত্য পাঠ করিব না, এইরূপ সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ অনুকূল নহে। বিদেশীদের জানি না বলিয়াই বিদেশীর প্রতি যে-ঈর্ষা আমাদের মনে জন্মলাভ করে, একমাত্র বিদেশী সাহিত্যের সংস্পর্শেই সেই ঈর্ষা দূরীভূত হইতে পারে, এবং এইরূপে মনের সঙ্গে মনের সংস্পর্শে আমাদের নৈতিক উন্নতিও সাধিত হয়।

(২২)

লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে।

—রবীন্দ্রনাথ ॥

লক্ষ্মী সম্পদ-সমৃদ্ধির দেবতা। কিন্তু তাঁহার অন্তরের কথাটি হইতেছে কল্যাণ। কুবেরও মহাধনী, কিন্তু তাহার অন্তরের কথাটি হইতেছে সংগ্রহ। সে ধন কৃপণের ধন ; জগতের কোন কল্যাণে তাহা লাগে না।

যে মানুষ পৃথিবীতে কেবল ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করে, আপন সুখ এবং স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে মানুষ তাহার ধনরাশি নিয়োজিত করে, তাহার ধনসম্পদ যে ব্যর্থ, সেই কথা এখানে বলা হইয়াছে। ধনসম্পদের সার্থকতা জগতের কল্যাণসাধনে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'—ত্যাগের পথই ভোগের প্রকৃষ্ট পথ। অর্থসম্পদ যদি সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিয়োজিত হয়, তবে সে ধনসম্পদ বস্তুপিণ্ড মাত্র। ধনসম্পদ যদি মানুষের প্রতি মমত্ব, করুণা, প্রেম, প্রীতির দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া বৃহত্তর স্বার্থে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে ধনসম্পদের বস্তুত্ব ঘুচিয়া গিয়া উহা এক দিব্য আলোকে ভাস্বর হইয়া উঠে। ধনের বহুলত্ব সমাজকল্যাণ আনয়ন করে না, মানবহৃদয়ের মমত্ব ও সহানুভূতির যোগে ধন সমাজের কল্যাণ সাধন করে।

(২৩)

বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্য আছে বলিয়া মানুষ বড়। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সহিত তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতির রাজবাড়ীর নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা। কিন্তু খোলা থাকিলে কি হইবে ? এক এক ঋতুতে এক এক মহল হইতে যখন উৎসবের নিমন্ত্রণ আসে, তখন মানুষ যদি গ্রাহ্য না করিয়া আপন আড়তের গদিতে পড়িয়া থাকে, তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল ? পুরা মানুষ হইতে হইলে তাহাকে সবই হইতে হইবে, একথা না মনে করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বকে বিশ্ববিদ্রোহের

একটা সঙ্কীর্ণ ধ্বজাস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে কেন? কেন সে দম্ভ করিয়া বার বার একথা বলিতেছে, আমি জড় নহি, উদ্ভিদ নহি, পশু নহি, আমি মানুষ—আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্রোহ করি। কেন সে একথা বলে না, আমি সমস্তই—সকলের সঙ্গে আমার অবারিত যোগ আছে—স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা আমার নহে।

হায়রে সমাজ-দাঁড়ের পাখী! আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোখদুটির মতো স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মত নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মতো চঞ্চল—তবু তোর পাখাদুটো আজ বন্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতেছে—এই কি মানব-জন্ম?

স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা তুলিয়া বিশ্বজগতের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ হইয়া যায়। পৃথিবীতে ঋতুচক্রের আবর্তন হয়—এক এক ঋতুতে এক এক রকম সৌন্দর্যে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। মানুষ যদি সেই উৎসবসভায় যোগ না দেয়, সে যদি সারাজীবন ধরিয়া কেবল কড়াক্রান্তির হিসাব কষে, কেবল কাজের চাকায় নিজেকে আবদ্ধ রাখে, তবে তাহার জীবনে না থাকে বৈচিত্র্য, না থাকে আনন্দ উৎসাহ। জীবনটাকে বৈচিত্র্যময় ও আনন্দময় করিয়া তুলিতে হইলে, জীবনটাকে পরিপূর্ণতা দান করিতে হইলে, অন্তরের দুয়ার রুদ্ধ করিয়া রাখা চলে না। প্রকৃতি-রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হয়। আকাশের নীল হইতে, পাতার সবুজ হইতে, বসন্তের বাতাস হইতে যে অদৃশ্য সঙ্কেত, যে নীরব নিমন্ত্রণ নিত্যই আমাদের কাছে আসিতেছে, সে সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে হয়। বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্যের সহিত সংযোগস্থাপনের মধ্যেই আত্মার স্ফূর্তি ও মুক্তি। কর্মের শৃঙ্খল মানুষকে বন্দী করিয়া রাখে, কিন্তু প্রকৃতির আনন্দযজ্ঞে যোগদানে ঘটে আত্মার বন্ধনমুক্তি।

অনুশীলনী

ভাবার্থ বিশ্লেষণ কর:—

১। বুদ্ধদেবের সময়ে যদি সিনেমাওয়ালা এবং খবরের কাগজের রিপোর্টারের চলন থাকত, তাহলে তাঁর খুব একটা সাধারণ ছবি পাওয়া যেত। তাঁর চেহারা, চাল-চলন, তাঁর মেজাজ, তাঁর ছোটখাট ব্যক্তিগত অভ্যাস, তাঁর রোগ-তাপ-ক্লান্তি-ভ্রান্তি সব নিয়ে আমাদের অনেকের সঙ্গে মিল দেখতুম। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এই সাধারণ প্রমাণটাকেই যদি প্রামাণিক বলে

গণ্য করা যায়, তাহলে মস্ত একটা ভুল করি। সে ভুল হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিতের—ইংরাজীতে যাকে বলে পারস্পেক্‌টিভ্। যে-জনতাকে আমরা সর্বসাধারণ বলি, সে কেবল ক্ষণকালের জন্য মানুষের মনে ছায়া ফেলে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। অথচ এমন সব মানুষ আছেন যাঁরা শত শত শতাব্দী ধরে মানুষের চিত্তকে অধিকার করে থাকেন। যে গুণে অধিকার করেন সেই গুণটাকে ক্ষণকালের জাল দিয়ে ধরাই যায় না। ক্ষণকালের জাল দিয়ে যেটা ধরা পড়ে সেটা হ'ল সাধারণ মানুষ, তাকে ডাঙায় তুলে মাছ কোটার মত কুটে বৈজ্ঞানিক যখন তার সাধারণত্ব প্রমাণ করে আনন্দ করতে থাকেন, তখন দামী জিনিসের বিশেষ দামটা থেকেই তাঁরা মানুষকে বঞ্চিত করতে চান। সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষ অসামান্য মানুষকে এই বিশেষ দামটা দিয়ে এসেছে। সাধারণ সত্য মত্ত হস্তীর মত এসে এই বিশেষ সত্যের পদ্মবনটাকে দলন করলে, সেটা কি সহ্য করা যাবে —মাধ্যমিক বাংলা, ৯৫০

২। একদল লোক আছেন যারা বলেন,—'আর্ট করে কি পেট ভরবে?' এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভাষা-চর্চার যেমন দুটো দিক আছে,—একটা আনন্দ ও জ্ঞানের দিক, আর একটা অর্থলাভের দিক, তেমনি শিল্পচর্চারও দুটো দিক আছে। একটা আনন্দ দেয়, আর একটা অর্থ দেয়। এই দুটি ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্প। চারুশিল্পের চর্চা আমাদের দৈনন্দিন দুঃখে-দ্বন্দ্বে সংকুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, আর কারু-শিল্প আমাদের নিত্য-প্রয়োজনের জিনিসগুলিতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, অর্থাগমের পথও করে দেয়।

শিল্পশিক্ষার অভাব শুধু যে আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা অসুন্দর করে তুলেছে তাই নয়, আমাদের অতীত যুগের রসস্রষ্টাদের সৃষ্ট সম্পদ্ থেকেও আমাদের বঞ্চিত করেছে। আমাদের চোখ তৈরী হয় নি, তাই দেশের অতীত গৌরব যে চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য তা এতদিন আমাদের কাছে অবোধ্য ও অবজ্ঞাত ছিল, বিদেশ থেকে সমঝদার আসবার প্রয়োজন হল সেগুলি আবার আমাদের বুঝিয়ে দিতে। —মাধ্যমিক বাংলা, ১৯৫২

৩। নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।

৪। রথযাত্রা লোকারণ্য, মহা ধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।

৫। জন্মেছি যে মর্ত্যক্রোড়ে ঘৃণা করি তারে,
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

৬। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল'রে!

—মাধ্যমিক বিশেষ বাংলা, ১৯৫০

৭। নদীর পলিমাটিতে তৈরী এই বাংলাদেশ। এখানে ভূমি উর্বর। বীজমাত্রেই এখানে সজীব সফল হয়ে ওঠে। তাই এখানে প্রাণধর্মের একটি বিশেষ দাবি আছে। পলিমাটির দেশ বলেই এখানকার ভূমি কঠিন নয়। তাই পুরাতন মন্দির, প্রাসাদ প্রভৃতির গুরুভার এখানে সয় না। সেই সব গুরুভার এখানে ধীরে ধীরে তলিয়ে যায়। বাংলাদেশে তাই তীর্থ প্রভৃতি বেশি নেই। পুরাতনের ঐশ্বর্য তার খুবই কম। তাকে দুর্ভাগ্য বলব কি সৌভাগ্য বলব?

বাংলাদেশ বিধাতার আশীর্বাদে পুরাতনের ভার হতে মুক্ত। তবে জীবন-সাধনার দায় বিধাতা তাকে বেশি করেই দিয়েছেন। বাঙালীর দেশ পলিমাটির উর্বরভূমি। প্রাণ এখানে ব্যর্থ হতে পারবে না। পুরাতনের মৃত পাষাণভার এখানে না সইলেও জীবনের দাবিদাওয়া এখানে পুরোপুরি সফল হবে। প্রাণের নামে মানবতার নামে দাবি করলে এখানে সাড়া মিলবে। জীবন্ত ক্ষেত্রে জীবনের দাবিই চলে।

৮। একটা বরফের পিণ্ড এবং ঝরণার মধ্যে তফাৎ কোন্‌খানে। না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতি নেই। তাকে বেধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এইজন্য বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙ্গে যায়, তার ক্ষয় হ'তে থাকে—এইজন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হ'য়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু ঝরণার যে গতি, সে তার নিজের গতি;—সেইজন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এইজন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায়, ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনই সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়-ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সে নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনি তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার-বিচার, যত শাস্ত্র-শাসন। তখন মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ।

৯। আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের ওপরে নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধু আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে; মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই, এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়। যাঁরা বলেন শ্রমিকরাজ বা গণরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তাঁরাও বোধ হয় একটু ভুল করেন। কারণ 'রাজ' কথাটাই তো ঊর্ধ্বলোকের কথা। প্রকৃত সাম্যবাদের ভিত্তি যথার্থ সমানাধিকারের ওপরে গড়ে ওঠাই কাম্য। এ অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই দ্রুতগতিতেই আসা খুবই বাঞ্ছনীয়। প্রতিশোধ-স্পৃহার মধ্য দিয়ে নয়, সর্বমানবের যথার্থ কল্যাণকামনার ভেতর দিয়েই যেন আমরা সমাজের একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নূতন রূপকে প্রত্যক্ষ করতে পারি।

১০। রাখালকে কেউ ভুলেও রাজসিংহাসনে আমন্ত্রণ করে না, এইজন্যই বটতলায় সে বাঁশী বাজাবার অবসর পায়। কিন্তু যদি দৈবাৎ কেউ করে বসে, তাহলে পাঁচনিকে রাজদণ্ডের কাজে লাগাতে গিয়ে রাখালি এবং রাজত্ব দুইয়েরই বিঘ্ন ঘটে।

পরিশিষ্ট

HIGHER SECONDARY EXAMINATION—1960

Bengali—Paper II

১। উদাহরণ-সহ যে-কোনও পাঁচটি বুঝাইয়া দাও ঃ—

অন্তঃস্থ বর্ণ, আ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ, অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়, অর্ধতৎসম, বর্ণাগম, সাধিত ধাতু, সমধাতুজ কর্ম, প্রযোজক কর্তা, পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ।

অথবা,

নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোনও পাঁচটিতে 'ন' ও 'ণ' এবং 'স' ও 'ষ' ব্যবহারের বিধান বুঝাইয়া দাও ঃ—

ম্রিয়মাণ, কীর্তন, কণ্টক, দুর্নাম, করকমলেষু, সুচরিতাসু, বুভুক্ষা, ভূমিসাৎ, পরিবেষিত।

২। নিম্নরেখ পদগুলির মধ্যে যে-কোনও পাঁচটির কারক নির্ণয় কর ঃ—

(ক) আমা হতে এ কার্য হবে না সাধন।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত আনন্দমঠ

(গ) বিবাদে ক্ষান্ত হও

(ঘ) তিনি পীড়ায় কাতর

(ঙ) মহাশয়ের কোথায় থাকা হয়?

(চ) মৃতজনে দেহ প্রাণ।

(ছ) সে তাস খেলছে।

(জ) বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

(ঝ) গুরু শিষ্যে কথা বলে।

অথবা,

ব্যাসবাক্য-সহ যে-কোনও পাঁচটির সমাস নির্ণয় কর ঃ—

তুষারধবল, যথাশক্তি, পুরুষসিংহ, স্বাধীনতা-দিবস, চিরসুখ, ন্যূনাধিক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, হাসাহাসি, রাজপথ।

৩। যে-কোনও পাঁচটি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :—
লোনা, মেটে, দাঁতাল, সহিষ্ণু, সৌমিত্রি, ছিন্ন, শব্দায়মান, দিশারু, পড়ন্ত, লাজুক।

অথবা,

যে-কোনও পাঁচটি শব্দ দ্বারা পাঁচটি বাক্য রচনা কর :—
ভঙ্গুর, মানবেতর, রূপদক্ষ, বদ্ধাঞ্জলি, হিরণ্ময়, অধিগত, অন্তঃসলিলা, নিখরচা, বেদরদী।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্য হইতে যে-কোনও একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা কর :—

(ক) গ্রামের হাট
(খ) মানুষের আকাশ বিজয়
(গ) আধুনিক যুগে যন্ত্রই শক্তি
(ঘ) জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।

৫। যে-কোনও একটি প্রশ্নের উত্তর লেখ :—

(ক) মঙ্গলকাব্য কাহাকে বলে? মনসা-মঙ্গল কাব্যের উপাখ্যান বর্ণনা কর এবং মনসা-মঙ্গল কাব্যের প্রধান কয়েকজন কবির উল্লেখ কর।

(খ) ঊনবিংশ শতকে বাঙ্গালা গদ্য কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাও।

(গ) রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

অথবা,

যে-কোনও দুইটি প্রশ্নের উত্তর লেখ :—

(ক) চৈতন্যদেবের জীবন ও জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(খ) বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়-বস্তু কি? বৈষ্ণব পদাবলী হইতে অন্যূন তিনটি উদ্ধৃতি দ্বারা তোমার কথা বুঝাইয়া বল।

(গ) বঙ্কিমচন্দ্র কি কি জাতীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(ঘ) নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(ঙ) কবি মধুসূদন দত্তের রচিত প্রধান কাব্যগুলির পরিচয় দাও ও কবি হিসাবে মধুসূদনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

৬। নিম্নে প্রদত্ত অনুচ্ছেদটির ভাবার্থ তোমার নিজের ভাষায় সম্প্রসারণ কর ঃ—

প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরপ্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারসঙ্গীত। অনন্তকাল এই মহাসঙ্গীত-সহিত মনুষ্য-হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপরে যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

অথবা,

নিম্নে প্রদত্ত গদ্যাংশটিকে সংক্ষিপ্তাকারে (এক শতকের অনধিক শব্দে) লেখ ঃ—

গোবিন্দ মাণিক্য বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন ঠাকুর কহিলেন, "এ কোন কাজের কথাই নহে।"

রাজা কহিলেন, "আমি রাজত্ব করিবার যোগ্য নহি, তাহারই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সেই জন্য আমার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাস নাই, সেই জন্যই দুর্ভিক্ষের সূচনা, সেই জন্যই এই যুদ্ধ। রাজ্য-পরিত্যাগের জন্য এ-সকল ভগবানের আদেশ।"

বিল্বন কহিলেন, "এ কখনোই ভগবানের আদেশ নহে। ঈশ্বর আপনার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন; যতদিন রাজকার্য নিঃসংকট ছিল ততদিন আপনার সহজ কর্তব্য অনায়াসে পালন করিয়াছেন, যখনই রাজ্যভার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, তখনই তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনি স্বাধীন হইতে চাহিতেছেন এবং ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া আপনাকে ফাঁকি দিয়া সুখী করিতে চাহিতেছেন।"

কথাটা গোবিন্দমাণিক্যের মনে লাগিল। তিনি নিরুত্তর হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, অবশেষে নিতান্ত কাতর হইয়া বলিলেন, "মনে করো না ঠাকুর, আমার পরাজয় হইয়াছে, নক্ষত্র আমাকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছে।"

বিল্বন কহিলেন, "যদি সত্য তাহাই ঘটে, তাহা হইলে আমি মহারাজের জন্য শোক করিব না। কিন্তু মহারাজ যদি কর্তব্যে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন, তবেই আমাদের শোকের কারণ ঘটিবে।"

রাজা কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলেন, "আপন ভাইয়ের রক্তপাত করিব!"

বিল্বন কহিলেন, "কর্তব্যের কাছে ভাই বন্ধু কেহই নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কী উপদেশ দিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া দেখুন।"

৭। যে-কোনও একটির ভাবার্থ তোমার নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর :—

(ক) সঙ্গীতের ন্যায় মানবজীবনেরও একটি মূলরাগিণী আছে। সুগায়ক-কণ্ঠের গীতি যেরূপ নানারূপ আলাপচারিতে ঘুরিয়া ফিরিয়াও স্বীয় মূলরাগিণীর বাহিরে যাইয়া পড়ে না, মানবচরিত্রেরও সেইরূপ একটি স্বপরিচায়ক স্বাতন্ত্র্য আছে—সেইটিকে জীবনের মূলরাগিণী বলা যায়; জীবনের কাযকলাপ সমগ্র-ভাবে বিবেচনা করিলে উহা আবিষ্কৃত হয়। যিনি যাহাই বলুন,—সেই অভিষেকো-পযোগী বিশাল সম্ভারের প্রতি অবজ্ঞার সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া অভিষেকব্রতোজ্জ্বল শুদ্ধ পট্টবস্ত্রধারী রামচন্দ্র যখন বলিয়াছিলেন—"তাহাই হউক, আমি রাজার প্রতিজ্ঞা পালনপূর্বক জটাবল্কল ধারণ করিয়া বনবাসী হইব।"—সেই দিনের সেই চিত্রই রামের অমর চিত্র,—এই অপূর্ব বৈরাগ্যের শ্রী তাঁহাকে চিনাইয়া দিবে। যেদিন রাবণ রামের শরাসনের তেজে ভ্রষ্টকুণ্ডল ও হতশ্রী হইয়া পলাইবার পন্থা পাইতেছিলেন না, সেদিন রামচন্দ্র ক্ষমাশীল গভীর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"রাক্ষস, তুমি আমার বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া এখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, আমি ক্লান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করি না, তুমি আজ গৃহে যাইয়া বিশ্রাম কর, কল্য সবল হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও।" সেই মহাহবের মহতী প্রাঙ্গণ-ভূমিতে ধার্মিক-প্রবরের সেই কণ্ঠস্বর স্বর্গীয় ক্ষমা উচ্চারণ করিয়াছিল; উহাই তাঁহার চিরাভ্যস্ত কণ্ঠধ্বনি।

(খ) রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা,
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা;
রঘু কহিলেন নমি চরণে তাঁহার,
"দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার!"

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশিসিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে হীরকে গাঁথা বলয় দু'খানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি দুই পাণি।
ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,
আবার সে পুঁথি 'পরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।
"আহা আহা" চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু'হাত।
আগ্রহে যেন তার প্রাণ-মন-কায়
একখানি বাহু হ'য়ে ধরিবারে যায়!
বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠ-সুখ।
কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছলভরা সুগভীর চুরির মতন।
দিবালোক চলি গেল দিবসের পিছু
যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু।
সিক্ত বসন লয়ে শ্রান্ত শরীরে
রঘুনাথ গুরু-কাছে আসিলেন ফিরে।
"এখনো উঠাতে পারি," করযোড়ে যাচে—
"যদি দেখাইয়া দাও কোনখানে আছে।"
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি দিয়া জলে,
গুরু কহিলেন, "আছে ওই নদীতলে!"

———— —

INTERMEDIATE EXAMINATIONS—1960

Bengali (Arts)

১। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের ভাবার্থ লিখ :—

কর্মশালার প্রবেশদ্বার অতি ক্ষুদ্র, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের ন্যায় ইহা অভ্রভেদী নহে—কিন্তু গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র লইয়া নহে—গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জন্য দ্বারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া আসিতে হয় ; এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নত ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট।

অথবা,

নিম্নলিখিত কবিতাংশের ভাবার্থ লিখ :—

প্রতিমা না হয় হয়েছে চূর্ণ, বেদীতে না হয় শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—
না হয় ধূলায় হল লুণ্ঠিত আছিল যে চূড়া উন্নতা
সজ্জা না থাকে কিসের লজ্জা ভয় ?
বাহিরে তোমার ঐ দেখ ছবি,
ভগ্নভিত্তিলগ্ন মাধবী,
নীলাম্বরের প্রাঙ্গণে রবি হেরিয়া হাসিছে স্নেহে।
বাতাসে পুলকি আলোকে আকুলি
আন্দোলি উঠে মঞ্জরীগুলি
নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি প্রাচীন তোমার গেহে।
সুন্দর এসে ঐ হেসে হেসে ভরি দিল তব শূন্যতা
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—
ভিত্তিরন্ধ্রে বাজে আনন্দে ঢাকি দিয়া তব ক্ষুণ্ণতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য 'জয় জয়'।

২। যে-কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর লিখ :—

(ক) শূন্যস্থানে একটি করিয়া পদ বসাইয়া বাক্য দুইটি সম্পূর্ণ কর। (সমাসযুক্ত পদ দিলে চলিবে না) :—

পরপীড়ন—যদি যথোপযুক্ত—থাকে—নিশ্চয় পরজন্মে আমি মাস্টার—এবং আমার মাস্টার মহাশয় ছাত্র হইয়া—। তাহার বিরুদ্ধে একটি– এই যে,—মাস্টার মহাশয়ের মাস্টার হইতে—অতিশয় অকালে– হইতে—লইতে হয়।

(খ) 'সে বসিয়া আছে', 'সে বসিয়াছে'—এই বাক্য দুইটি সমার্থক নহে তাহা বুঝাইয়া দাও।

(গ) ভালো, কালো, সাদা, মন্দ, নীল—এই পাঁচটি শব্দকে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করিয়া পাঁচটি বাক্য রচনা কর।

৩। নিম্নলিখিত যে-কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া **একটি** প্রবন্ধ রচনা কর :—

(ক) কলেজে তোমার অভিজ্ঞতা।

(খ) সাহিত্যের কোন্ শাখায় তোমার অনুরাগ এবং কেন।

(গ) "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি"।

(ঘ) জীবনে নিয়মানুবর্তিতার আবশ্যকতা।

INTERMEDIATE EXAMINATIONS—1960

Bengali (Science)

১। নিম্নলিখিত পদ্যাংশের ভাব-সম্প্রসারণ কর :—

শৈবাল দীঘিরে কহে করি উচ্চশির,—
লিখে রেখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

অথবা,

নিম্নলিখিত গদ্যাংশের ভাবার্থ লিখ :—

আমি জানি সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সঙ্কুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়—এই জন্যই সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ।

২। (ক) নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্য হইতে যে-কোনও **পাঁচটিকে** দুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া **দশটি** বাক্য রচনা কর :—

মাটি, অর্থ, কড়া, ডাল, গড়, তীর, লোক।

(খ) নিম্নলিখিত বাক্যাংশ ও সমাসযুক্ত পদগুলির মধ্য হইতে যে-কোনও **পাঁচটিকে** এক একটি শব্দে পরিণত কর (সমাস করিলে চলিবে না) এবং প্রত্যেকটি প্রয়োগ করিয়া **পাঁচটি** বাক্য রচনা কর :—

পথের উপযুক্ত (অর্থ); রাষ্ট্রসম্বন্ধীয়; বায়ুঘটিত; সহজে ভগ্ন হয়; যাহা পুনঃ পুনঃ দুলিতেছে; দণ্ডের যোগ্য; জানিতে ইচ্ছুক।

৩। নিম্নলিখিত যে-কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া **একটি** প্রবন্ধ রচনা কর :—

(ক) পল্লীবাস ও শহরবাসের তুলনা।

(খ) বিজ্ঞানবলে চন্দ্রলোকে অভিযান।

(গ) তোমার নিজস্ব পুস্তকাগারে তুমি কি কি পুস্তক রাখিবে ?